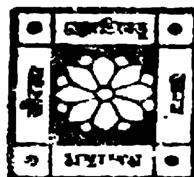
বনফুল রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩
সম্পাদনায় :
সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
মুদ্রাকর :
দুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

অখিকলাল

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

প্রাথমিক নিবেদন

অধিকলালের জীবনের অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কাহিনী এটি। অসমাপ্ত, কারণ অধিকলাল এখনও বাঁচিয়া আছে। অসম্পূর্ণ, কারণ কাহিনীর খানিকটা খানিকটা উই-পোকায় মাঝে মাঝে নিঃশেষ করিয়াছে। জীবন-কাহিনীটি লিখিয়াছিল অধিকলালের বন্ধু যোগেন এবং সেটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক।

অধিকলালের জীবনের প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মালমসলা আমিই যোগেনকে দিয়াছিলাম। কলিকাতায় যখন পড়িতে যাই তখন যোগেনের সহিত আমারও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যোগেন এ কাহিনী ছাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তখন অধিকলাল কিছুতেই মত দিল না। সে খাতাটি কাড়িয়া লইয়া একটা কাঠের সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই সিন্দুকের নীচের দিকটা উই-পোকায় ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে। অধিকলালের জীবন-কাহিনীর খানিকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে আমার কল্পনা কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়াছে। অধিকলাল রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই তাহার কণ্ঠস্থ। তাই মাঝে মাঝে তাহার জবানিতে আমি যোগেনকে রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতে উৎসাহিত করিয়াছি। কবিতা আমিই বাছিয়া দিয়াছি। বর্তমান যুগে অধিকলালের নাম কেহ জানে না। নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে বর্তমান যুগের ক্ষণস্থায়ী চেতনায় নিজেকে প্রতিফলিত করা সম্ভব নহে। অধিকলালের একটা জয়ঢাক আছে, কিন্তু তাহা সে পিটায় নাই, কাহাকেও পিটাইতে দেয়ও নাই। তাই আমাদের দেশের অসংখ্য নাম-না-জানা ভালো লোকের দলে সে হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের প্রকৃত ভালো লোকেরা সকলেই প্রায় অখ্যাত। এমন কি সে যখন চাকরি ছাড়ে তখনও তাহার নাম খবরের কাগজে বাহির হয় নাই। কাগজে নাম বাহির করিতে হইলেও যে তদ্বির করা প্রয়োজন সে তদ্বির করিবার উৎসাহও অধিকলালের ছিল না। আমি তাহার অধীনে চাকুরি করিয়াছি। আমি জানি সে কত ভালো অফিসার ছিল। কিন্তু ভালো অফিসারের কদর নাই। তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবারই নানারূপ আয়োজন চতুর্দিকে। অধিকলাল এখন আমাদের বাড়িতেই থাকে। তাহাকে না জানাইয়া তাহার ভাঙা বাক্স হইতে বইটা চুরি করিয়া ছাপিতে দিলাম। জানি না বই বাহির হইলে সে কি বলিবে। অধিকলাল স্বল্পবাক। হয়তো বিশেষ কিছু বলিবে না, একটু মুচকি হাসিবে শুধু। হয়তো মনে মনে ভাবিবে—কি একটা বাজে কাজ করিয়া পয়সা নষ্ট করিয়াছ। তনুর ছেলে বিলাত যাইতেছে, এই টাকায় তাহার কিছু ভালো জামাকাপড় হইয়া যাইত; কিংবা হয়তো—। এই ধরনের কথাই সে ভাবিবে। কিন্তু বইটি ছাপাইয়া আমি বড় তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইহার বেশী আমার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই।

শ্রীনক্ষত্রকান্তি ঘোষ।

প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

রংলাল রামগোবিন পাঁড়ের চাকর। রামগোবিন এখন অবস্থা-সম্পন্ন লোক, বড় গোলা আছে, ফালাও কারবার। তাছাড়া আছে জাহাজ ঘাটের কুলি কন্ট্রাক্ট। প্রচুর লাভ। জনশ্রুতি, কয়েক লক্ষ টাকার মালিক তিনি। কিন্তু আগে এমন ছিল না। আগে রামগোবিনও চাকর ছিল। রেলের চাকর। স্টেশন মাস্টার লক্ষ্মীবাবু তখন মালিক ছিলেন তার। রামগোবিন নামে যদিও ছিল পয়েন্টস্‌ম্যান, কিন্তু সব কাজ করিতে হইত তাহাকে। স্টেশনের অন্যান্য কুলিরা 'ডিউটি' শেষ হইলেই চলিয়া যাইত, রামগোবিন যাইত না। রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে গিয়া 'মাইজি'র আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। 'মাইজি' যদিও বন্ধ্যা ছিলেন, নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল না, কিন্তু পোষ্য ছিল অনেকগুলি। গাই ছিল, ছাগল ছিল, দুই তিন রকম পাখী ছিল, তাছাড়া ছিল ভুনিয়া, মুনিয়া, রামদাসোয়া, পেটি, রামদুলারী প্রভৃতি একপাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কুলিপাড়ার ছেলেমেয়েরা। ইহাদের সকলকেই প্রশ্রয় দিতেন লক্ষ্মীবাবুর সেকেলে স্ত্রী। অনেক রকম কুসংস্কার ছিল তাঁহার। স্বামীর নাম লক্ষ্মী বলিয়া তিনি লক্ষ্মীঠাকুরকে ফক্কিঠাকুর বলিতেন। প্রত্যহ কয়েক ঘড়া গংগাজল প্রয়োজন হইত। পাঁড়েই তাহা রোজ বহিয়া আনিত। মাঝে মাঝে যখন বাতে শয্যাগত হইয়া পড়িতেন পাঁড়েই রান্না করিয়া দিত। ঠাকুর ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ পূজা করিতেন সুরেশ্বরী। পূজার যোগাড়ও পাঁড়েই করিত। ফুল তুলিত, চন্দন ঘষিয়া দিত, পূজার ঘরটি গংগাজলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত সে। খুব কাজের লোক ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। এই সময়েই তাহার রংলালের সংগেও ভাব। রংলালও স্টেশনের একজন কুলি ছিল তখন এবং স্টেশন মাস্টারের বাড়ির বাসন মাজিত সে। কিন্তু সে দোসাদ ছিল জাতে। তাহার হাতের মাজা-বাসনও সুরেশ্বরী গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিতেন না। এজন্য তিনি একজন জল-চল চাকর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু রামগোবিন বলিল আমি গংগা হইতে জল আনিয়া মাজা বাসনগুলির উপর ঢালিয়া দিব, সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ ব্যবস্থায় সুরেশ্বরী আর আপত্তি করেন নাই। রংলালের উপর মনে মনে তিনি প্রসন্ন ছিলেন, বাসনগুলি যখন মাজিয়া আনে তখন ঝকঝক করে একেবারে। বাড়ির হাতা এবং বারান্দাগুলি যখন ঝাড়ু দেয় তখন একটুও ফাঁকি দেয় না। রংলালের জন্য তাঁহার বাড়ি ঘরদোর তক্‌তক করে। হ্যাঁ, রংলালের উপর মনে মনে খুশীই ছিলেন সুরেশ্বরী। ভাবিতেন, "লোকটা সত্যই ভালো। পূর্ব-জন্মের পাপে বোধহয় এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছে। আহা—"। রংলাল 'শুখা' বেতনে কাজ করিত। মাসে পাঁচ টাকা বেতন পাইত সে। কিন্তু সুরেশ্বরী রোজ তাহাকে কিছু খাইতে দিতেন। কোনদিন বাসী রুটি, কোনদিন মুড়ি, কোনদিন মোয়া, কোনদিন ছাতু। রংলাল বাড়ি যাইবার আগে রোজ বলিতেন, ওরে, দাঁড়া। খাবার নিয়ে যা। রংলাল মলিন গামছাটা পাতিয়া কুণ্ঠিত মুখে উঠানে দাঁড়াইত, সুরেশ্বরী আলগোছে ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া তাহার গামছায় খাবার দিতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

তোর ছেলেপিলে ক'টি ? রংলাল ছেকাছিনি ভাষায় যাহা বলিয়াছিল তাহার বাংলা— আপনার আশীর্বাদে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার। সুরেশ্বরী আরও খান চারেক রুটি দিয়াছিলেন তাহাকে। বলিয়াছিলেন—নিয়ে আসিস ওদের একদিন। রামগোবিন সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল, ওর বড় ছেলে অধিকলাল, খুব 'তেজ' আছে। পণ্ডিতজি বলছিলেন ছোকরা পহেলা নম্বরের। রামগোবিন মাঝে মাঝে বাংলায় নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করিত। রংলালের বড় ছেলে অধিকলাল ক্লাসে সব বিষয়েই প্রথম হয় এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিল সে। সুরেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, ও তাই নাকি। আচ্ছা, নিয়ে আসিস একদিন দেখব।

রামগোবিন সত্যই ভালবাসিত রংলালকে। সে যদিও পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহার ছোঁয়াছুয়ির বিচার ছিল না তেমন, রংলাল যখন হাতের চেটোয় চুন দিয়া খইনি মলিয়া তাহাকে দিত তখন আপত্তি করিত না সে। মুখবিবরে সেটা ফেলিয়া দিয়া জিহ্বার সাহায্যে ঠোঁটের তলায় সেটাকে চালান করিয়া দিত। তাহার পর 'পচ' করিয়া একবার থুতু ফেলিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিত রংলালের দিকে। রংলালের মুখেও হাসির আভা ফুটিত। সত্যই বন্ধুত্ব ছিল দুই জনের। 'মেকী' নয় খাঁটি।

বলিষ্ঠ তাগড়া জোয়ান ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল প্রশস্ত ছাতি, পেশীসমৃদ্ধ বাহু, জঙ্ঘা। মুখটা সুন্দর নয় কিন্তু শক্তিব্যঞ্জক। মনে হইত, একটা গণ্ডারের মুণ্ড কে যেন তাহার বৃষস্কন্ধের উপর বসাইয়া দিয়াছে। গণ্ডারের মতো উর্ধ্বমুখী খড়্গ নাই বটে, কিন্তু তাহার নাকটা খড়্গেরই মতো। তখন হইতেই রামগোবিন বুঝিয়াছিল, পুরুষকারই পুরুষের একমাত্র সম্পদ। তখন হইতেই তাহার দিনচর্যা বিস্ময়কর ছিল। সে থাকিত গুমটির নিকট রেলের একটা ছোট ঘরে। ঘরটা বে-মেরামত পড়িয়াছিল, লক্ষ্মীবাবুর অনুমতি লইয়া সেই ঘরটাতেই ঘুমাইত রামগোবিন। উঠিত ভোর চারটের সময়। তাহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি কম্বল, একটি খড়ের বালিশ, এবং একটি লোটা। উঠিয়াই সেগুলি গুছাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিত সে। তাহার পর করিত ৬ন বৈঠক। তাহার পর লোটা-কম্বল লইয়া সে চলিয়া যাইত গঙ্গার ধারে। স্টেশনের নীচেই গঙ্গা। জাহাজঘাটও আছে। সেখানে শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে নিজের কম্বলটি সে রাখিয়া দিত শিবলালের চাকর গঙ্গারামের নিকট। গঙ্গারাম তখন উঠিয়া উনানে আঁচ দিত। তাহার পর রামগোবিন চলিয়া যাইত ঠেটন গোয়ালার বাথানে। গঙ্গার ধারেই ঠেটন গোয়ালার বাথান। অনেক গরু-মহিষ ছিল তাহার। রামগোবিন সেখানে মহিষের দুধ দুহিত। খুব ভালো দুধ দুহিতে পারিত সে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে প্রায় আধমণ দুধ দুহিয়া ফেলিত। ইহার জন্য ঠেটন তাহাকে নগদ চার আনা পয়সা এবং খাঁটি এক সের দুধ দিত। দুধ দুহিবার পর সে আবার চলিয়া যাইত শিবলালের দোকানে। সেখানে দুধের ঘটিটি রাখিয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিত। শিবলালের দোকানেই তাহার শুকনো কাপড়টা থাকিত। ভিজা কাপড়টা ছাড়িয়া শিবলালের দোকানের পিছনেই লম্বা করিয়া শুকাইতে দিত সেটাকে। একটা খুঁট বাঁটিত বেঁটে আমগাছটার ডালে আর একটা খুঁট শিবলালের দোকানের ঝুঁকিয়া-পড়া চালের একটা বাতায়। গঙ্গা যথাকালে কাপড়টা তুলিয়া রাখিয়া দিত। গঙ্গা তখন হইতেই রামগোবিনের ভক্ত ছিল খুব। পরে সে রামগোবিনের ব্যবসায়ে 'মুনিমজি' অর্থাৎ ম্যানেজার হইয়াছিল।

গঙ্গাস্নান করিয়া রামগোবিন যাইত মহাবীরজির থানে। গঙ্গার ধারেই শিবলালের দোকানের একটু দূরে মহাবীরজির থান। একটি আমগাছের নীচে সিন্দূরলিপ্ত মহাবীরজির একটি প্রস্তর মূর্তি। বড় জাগ্রত দেবতা। রামগোবিন এই মূর্তির সামনে দুই কান ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, ঠোঁট দুইটি নড়িত কেবল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে সে প্রণাম করিত মহাবীরজিকে। তাহার পর সে আবার ফিরিয়া আসিত শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে। প্রকাণ্ড উনুনটা তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা দুধও গরম করিয়া রাখিয়াছিল। রামগোবিন উনুনের ধারে বসিয়াই অর্ধেকটা দুধ পান করিয়া ফেলিত। বাকিটা সন্ধ্যার পর আসিয়া পান করিবে। গঙ্গার হেপাজতেই দুধটা থাকিত। দুগ্ধ পান শেষ করিয়া রামগোবিন উনুনের পাশে একটা মোড়ায় বসিয়া গঙ্গাকে বলিত—আব, কঢ়াই চড়াও। গঙ্গা প্রকাণ্ড কড়াটা চড়াইয়া খানিকটা ঘি তাহাতে ঢালিয়া দিত। বড় ছান্‌চাটা হাতে লইয়া অপেক্ষা করিত রামগোবিন। গঙ্গা কিছু লুচি বেলিয়াই রাখিয়াছিল। ঘি গরম হইলেই রামগোবিন কড়াইয়ে লুচি ছাড়িতে শুরু করিত। সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত শিবলালের দোকানে লুচি ভাজিত রামগোবিন। ইহার জন্য মজুরি পাইত দশখানা লুচি, কিছু শাক (নিরামিষ তরকারি) এবং খানিকটা বুটের ডাল। সাড়ে ছয়টার সময় উনুনের ধারে বসিয়াই আহার সমাধা করিত রামগোবিন। তাহার পর স্টেশনে চলিয়া আসিত। স্টেশনে ঠিক সাতটার সময় ডিউটি। সাড়ে সাতটায় গাড়ি আসবে। স্টেশনেও নানারকম কাজ। স্টেশনের কাজ তো আছেই, তাছাড়া আছে বড়বাবু এবং ছোটবাবুর নানারকম ফাইফরমাশ। সদ্য-আগত টিকিট কালেক্‌টারবাবুর নববিবাহিত বধূটি বড়লোকের মেয়ে। গৃহস্থালীকাজে তেমন পারদর্শিনী নয়, তাহার উনুনটাও রামগোবিন রোজ ধরাইয়া দিয়া আসিত। ট্রেন চলিয়া যাইত নয়টার সময়। তাহার পর সমস্ত দিন স্টেশনের তেমন কোনও কাজ থাকিত না। কিন্তু লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে তখন প্রচুর কাজ। সেখানেও গরু দোহা, ছাগল দোহা, পাখীদের স্নান করানো, মাইজির জন্য গঙ্গাজল আনা, বাজার করা, এমন কি কাপড় কাচা পর্যন্ত—বাড়ির যাবতীয় কাজ রামগোবিনই করিত। সুরেশ্বরী যেদিন অসুস্থ হইয়া পড়িতেন সেদিন তাহাকে রান্নাঘরেও ঢুকিতে হইত। বাঙালী রান্না রামগোবিন রাঁধিতে পারিত না। ভাতে-ভাত, ডাল এবং 'ভুজিয়া' বানাইত। মাছ মাংস স্পর্শ করিত না সে। সে জন্য কোনও অসুবিধাও হইত না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে খবরটা পৌঁছাইয়া দিলেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মাছের তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। রামগোবিনের দুপুরের খাওয়াটা লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতেই হইত। লক্ষ্মীবাবুর নিকট সে কোন বেতন লইত না। বেতনের কথা বলিলেই হাত-জোড় করিত। কেন সে এরূপ করিত তাহার রহস্য জানিত কেবল রংলাল। কিন্তু সে কিছু বলিত না, মুচকি মুচকি হাসিত কেবল। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির কাজকর্ম শেষ করিয়া দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির বারান্দায় হাতে মাথা এবং চোখে গামছা দিয়া শুইয়া পড়িত খানিকক্ষণ। শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িত সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকিত। ঠিক আড়াইটার সময় উঠিয়া পড়িত সে। তিনটার সময় লক্ষ্মীবাবুর চা খাওয়ার অভ্যাস। তাঁহাকে চা করিয়া দিয়া রামগোবিন হাটে চলিয়া যাইত। কাছে-পিঠের প্রতি গ্রামেই একদিন না একদিন হাট বসে। লক্ষ্মীবাবুর জন্য রোজ টাটকা তরি-তরকারি কিনিয়া আনিত।

নিজেরও কাজ করিত একটু। যে কাজটা তখন 'একটু' ছিল, তাহাই বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পরে। হাটে যাইবার পথে সে রংলালের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া হাঁক দিত—হো রংলাল, চল্, চল্ টাইম্ ভে গেল্। রংলাল কাঁধে একটি বস্তা লইয়া বাহির হইয়া আসিত। বাহির হইতেই বোঝা যাইত বস্তার ভিতর ছোট বড় কয়েকটি পুঁটুলি আছে। এইবার ব্যাপারটা খুলিয়া বলা প্রয়োজন। স্টেশনে 'সাইডিং'-এ অনেক মাল গাড়ি থাকিত। মালগাড়িতে থাকিত মাল। নানারকম মাল। ধান গম চাল ডাল আটা ময়দা সবই বস্তা বস্তা। রামগোবিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বস্তায় ফুটা করিয়া প্রতি বস্তা হইতে চার পাঁচ সের করিয়া মাল সরাইত। তাহার পর গুণ ছুঁচ ও সুতলি দিয়া ছিদ্রটি মেরামত করিয়া দিত। মাল রাখিত সে রংলালের কুঁড়ে ঘরে। রংলাল ভীতু লোক। চোরাই মাল রাখিতে ভয় পাইত সে। কিন্তু সে আরও বেশী ভয় পাইত তাহার স্ত্রী সমুন্দরিকে। যদিও তাহার চারটি ছেলে মেয়ে, বয়স কিন্তু বাইশ তেইশের বেশী নয়। তাহা ছাড়া প্রচণ্ড যৌবন। তাহার সমুন্দরি নামটা সার্থক ছিল সত্যই। তাহার সর্বাঙ্গে যেন যৌবনের ঢেউ উত্তাল। রংলাল বাড়ির মালিক ছিল না, মালিক ছিল সমুন্দরি। সে যাহা বলিত তাহাই হইত। সে-ই রামগোবিনের চোরাই মাল লুকাইয়া রাখিত, তাহারই আদেশে রংলাল সেই চোরাই মালের পুঁটুলিগুলি বস্তায় ভরিয়া হাটে লইয়া যাইত। সমুন্দরির বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস ছিল না তাহার। কিন্তু মনে মনে খুবই বিরক্ত হইত সে। হাটে যাইবার পথে রোজই সে রামগোবিনকে বলিত—ভাইয়া, ই সব কাম ছোড় দে। চোরা কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনিত না। রামগোবিন তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত পৃথিবীতে সবাই চোর, সবাই ডাকাত। কিষুণজির ছেলেবেলায় নাম ছিল 'মাখখন চোর'। মহাবীরজিকে ডাকাত ছাড়া আর কি বলা যায়। অত বড় রাবণের লঙ্কাটা সে—। সমুন্দরি কিন্তু এসব দার্শনিক তত্ত্বে ভোলে নাই। তাহাকে টাকায় চার আনা বখরা দিতে হইত। সপ্তাহে সাতটি হাটে ঘুরিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা রোজগার করিত রামগোবিন। ইহা হইতে দশ বারো টাকা সমুন্দরিকে দিতে হইত। সমুন্দরি সে টাকা দিয়া 'জেবর' (গহনা) কিনিত। রুপার গহনা। এজন্য একটা বদনামও রটিয়া গিয়াছিল তাহার। অনেকেই সন্দেহ করিত রামগোবিনের সহিত নিশ্চয়ই একটু 'নট্ঘট্' আছে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। রামগোবিনের অবশ্য সামান্য একটু দুর্বলতা হইয়াছিল একদিন। সে তাহার গণ্ডারের মতো মুখটাকে যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিয়াছিল, "আনা মেরা পাস রাতসে একদিন গুম্টিমে—।' চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল সমুন্দরি। "চোট্টা ভাবনা, ফের ইসব বাত কহবি তো ঝাড়ু দেকে তোরা থোতনা চুরি' দেব—"। রামগোবিন চতুর লোক। সে সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর। সমুন্দরিও সঙ্গে সঙ্গে মাপ করিতে দ্বিধা করে নাই। যৌবনোচ্ছলা নারীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। তাহারা ইহাও জানে যে অধিকাংশ পুরুষদের চিত্তের ভারসাম্য তাহাদের সান্নিধানে বজায় থাকে না। সেজন্য তাহারা প্রায় অনুকম্পাশীলাও হয়। সুতরাং ক্ষতি কিছু হয় নাই। রামগোবিন-সমুন্দরি প্যাক্ট প্রায় তিন বৎসর অটুট ছিল। এই তিন বৎসরে রামগোবিন প্রায় দশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়া স্থানীয় পোস্টাফিসে জমাইয়া অবশেষে 'রাম-গোলা' নামে তাহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমুন্দরিও গহনা

গড়াইয়াছিল অনেক। রংলাল বেচারাই কেবল পায় নাই কিছু। সে কেবল হাটে হাটে বোঝা বহিয়া বেড়াইয়াছে মাত্র। কিন্তু কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিছু পাইয়াছিল বই কি। সৎ হইয়া থাকার যে আনন্দ তাহা সে পাইয়াছিল। তাছাড়া আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছিল—কিন্তু সে কথা পরে বলিব। যাঁহারা মনে করিতেছেন যে চোর রামগোবিনকে রংলালের পুলিসে ধরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল তাঁহারা রংলাল-জাতীয় লোকদের চেনেন না। রংলালদের শাস্ত্রে 'চুগলি' খাওয়া মহাপাপ। কাহারও সাতে-পাঁচে তাহারা থাকিতে চায় না। তাহারা পরের অসঙ্গত অন্যায় আবদার, এমন কি অত্যাচারও, মুখ বুজিয়া সহ্য করে। তাহা লইয়া চীৎকার চেঁচামেচি হাহুতাশ বা বিলাপ করা তাহাদের স্বভাব নয়। রংলালকে চিনিত তাহার বউ সমুন্দরি। মনে মনে শ্রদ্ধাও করিত তাহাকে। কিন্তু সে জানিত বাহিরে দাপটের চোটে দাবাইয়া না রাখিলে এই সব 'সাধুসন্ত' প্রকৃতির লোক সংসারটাকেই 'চৌপট' করিয়া দিবে। কিন্তু আসল লোকটাকে চিনিতে সে ভুল করে নাই। আর একজনও তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিল, সে তাহার আট বছরের ছেলে অধিকলাল। শুধু তাহাকে নয়, তাহার মাকে এবং রামগোবিনকেও চিনিয়াছিল সে। আমরা মনে করি ছোট ছেলেরা কিছু বুঝিতে পারে না। কিন্তু সেটা আমাদের ভুল ধারণা। ছোট ছেলেরা নিখুঁত বিচারক। তাহাদের বিচার নির্ভুল। অধিকলাল বুদ্ধিমান ছেলে, সে সবই বুঝিতে পারিত। সে তাহার নিরীহ গোবেচারা পিতাকে খুবই শ্রদ্ধা করিত। মাকেও সে ভালবাসিত, কারণ সে মা, কিন্তু তাহার রণচণ্ডী মূর্তিটা মোটেই ভালো লাগিত না তাহার। আর সে ঘৃণা করিত রামগোবিনকে। তাহার মনে হইত ও মানুষ নয়, ও দৈত্য। তাহার মন বিষাইয়া উঠিত যখনই সে ভাবিত ওই লোকটির সহিত তাহাদের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রামগোবিনের টাকা লইয়া তাহার মা যখন 'জেবর' (গহনা) গড়াইত, রামগোবিন যখন তাহার বাবাকে অভিভাবকী ভঙ্গীতে আদেশ করিত তখন যে ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ তাহার মনে জাগিত তাহাকে ভাষা দিবার মতো তাহার বয়স হয় নাই তখন। তখন অধিকলালের বয়স মাত্র আট বৎসর।

বছর তিনেক পরে লক্ষ্মীবাবু বারসোই বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন আবদুল জাব্বার নামে একজন মুসলমান ভদ্রলোক। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে মুরগী চরিতে লাগিল। বদনা, পিকদানি এবং পরদার আমদানি হইল। সেই সময়ই রামগোবিন স্টেশনের চাকরি ছাড়িয়া দিল। রংলালকেও সঙ্গে লইয়া গেল সে। বলিল স্টেশনে তুমি যে বেতন পাইতে আমি তাহার অপেক্ষা এক টাকা বেশী বেতন দিব। তুমি আসিয়া আমার গোলার কাজকর্ম কর। গ্রামের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া রামগোবিন তাহার গোলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। শিবলালের দোকানের গঙ্গা কিছু লেখা-পড়া জানিত। সেও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকানের কাজকর্ম কমিয়া গেলে গোলায় যাইত এবং সমস্ত দিনের হিসাবপত্র একটা খাতায় লিখিত। তখনই দেখা গেল রামগোবিনের স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। প্রত্যেক দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি—কাহাকে কত পয়সা দিল, কাহার নিকট হইতে কত পয়সা পাইল, কে কত ধান চাল ডাল প্রভৃতি লইয়াছে এ সমস্তই সে মনে করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ হইতে শুনিয়া গঙ্গা সে সব টুকিয়া রাখিত। রাত্রি নয়টার পর আসিতেন দুবেজি। স্থানীয় মাইনার স্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার নিকট রামগোবিন ইংরেজি,

হিন্দী এবং অংক শিখিবে প্রস্তাব করিয়াছিল। দুবেজি বলিলেন—ওসব তো তুমি অধিকলালের কাছেই শিখতে পারবে। ওর কাছে পড়া যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি পড়াব। এখন আমি বরং রোজ তোমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাই।

নয়টার পর দুবেজি রামগোলায় সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন। রামগোবিন জোড় হস্তে বসিয়া তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে রামগোবিনের সুরেশ্বরীকে মনে পড়িয়া যাইত বার বার। সুরেশ্বরী সমস্ত অশুদ্ধ জিনিসের উপর গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সেগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। দুবেজি তেমনি রামনামের ছিটা দিয়া তাঁহার সমস্ত পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করিতেছেন মনে করিয়া ভারি একটা তৃপ্তি হইত রামগোবিনের। দুবেজির আদেশও অমান্য করে নাই সে। অধিকলালের নিকটই সে হিন্দী ও ইংরেজি অক্ষরের প্রথম পাঠ লইল। অধিকলাল রামগোবিনকে তেমন পছন্দ করিত না কিন্তু রামগোবিনের মতো অমন একটা হোমরা-চোমরা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড লোক যে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চায় ইহাতে সে ভারি একটা আমোদ অনুভব করিল। সানন্দেই সে রামগোবিনের গুরুগিরি শুরু করিয়া দিল। তাহার আর একটা কথাও মনে হইত। রামগোবিনই তো তাহাদের সংসার চালাইতেছে। তাহার বাবা এখানেই চাকরি করে। কিছুদিন পরে মা-ও আসিয়া গোলায় বাহাল হইল। সে সমস্ত শস্য কুলায় ঝাড়িয়া বাছিয়া আলাদা আলাদা করিয়া রাখিয়া দেয়। রামগোবিনের নিকট দুবেজিও বেতন পান। অধিকলালের জীবনে রামগোবিন ওতপ্রোত হইয়া আছে। রামগোবিনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু—হ্যাঁ ওই 'কিন্তু'টাই তাহার সমস্ত মনকে মাঝে মাঝে বিষাইয়া দেয়। সে জানে রামগোবিনের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি—অসাধুতা—চুরি। ইহার বিরুদ্ধে বালক অধিকলালের সমস্ত চিত্ত মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত কিন্তু কার্যত কিছুই করিতে পারিত না সে। রামগোবিনের অনুগ্রহ-পাশ ছিন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহা একটা বিরাট অক্টোপাসের মতো তাহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

রামগোবিনের ব্যবসায় দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিল। সে মাল বহিবার জন্য দুইটি গরুর গাড়ি কিনিল। দুধ খাইবার জন্য এবং বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকটি মহিষও। মহিষের সমস্ত দুধ জাহাজঘাটের হালুয়াই শিবলালই কিনিয়া লইত। দুধ বিক্রি করিয়াও বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল রামগোবিনের।

কিছুদিন পরে দেখা গেল রামগোবিন জমিদারের কাছারিতে আনাগোনা করিতেছে। নায়েব মহাশয়ের বাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি দুধও পাঠাইতে লাগিল সে। একদিন কাজিগ্রামের হাট হইতে প্রকাণ্ড একটা রোহিত মৎস্য কিনিয়া নিজে গিয়া নায়েব মহাশয়ের বাড়িতে দিয়া আসিল। প্রায়ই দেখা যাইতে লাগিল সে হাত-জোড় করিয়া নায়েব মহাশয়ের সেরেস্তায় মাটিতে উবু হইয়া বসিয়া আছে। এইভাবে কিছুদিন ধর্না দিবার পর তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হাঁসোয়ারা গ্রামের প্রান্তে এক প্লটে যে দুইশত বিঘা জমি 'পড়াতি' ছিল সেটি কিছু সেলামী এবং নামমাত্র খাজনা দিয়া রামগোবিন নিজের নামে খারিজ-দাখিল করিয়া লইল। তাহার পরই সে মাতিয়া উঠিল চাষ-বাস লইয়া। বলদ কিনিল, হাল কিনিল, জমিরই একপ্রান্তে মাটি এবং খড় দিয়া ছোট একটা ঘরও বানাইয়া ফেলিলসে। সকলে সেটার নাম দিল রামগোবিনের 'ডোটা'। 'ডোটা'

কথাটার মানে সম্ভবতঃ আস্তানা। রামগোবিন তাহার দিনচর্যা পূর্ববৎ বহাল রাখিয়াছিল। খুব ভোরে উঠিয়া সে বার কয়েক ডন বৈঠক করিত, তাহার পর গঙ্গায় ডুব দিয়া মহাবীরজির সামনে কান ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত খানিকক্ষণ। তাহার পর গোলায় গিয়া কয়েকটি মহিষ দুহিয়া ফেলিত। শিবলালের দোকানে গিয়া লুচি ভাজিবার সময় আর সে পাইত না। শিবলালই একটু পরে তাহার জন্য লুচি, ডাল এবং শাক লইয়া হাজির হইত এবং মহিষের দুধ মাপিয়া দোকানে লইয়া যাইত। রামগোবিনের জন্য ভালো প্যাঁড়াও সে প্রস্তুত করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। রামগোবিন "জল খৈ" শেষ করিয়া পদব্রজে হাঁসোয়ারার দিকে রওনা হইয়া যাইত। মাত্র দুই ক্রোশ পথ। আটটা নাগাদ সেখানে সে পেঁছিয়া যাইত। সেখানে গিয়া যদি সে দেখিত যে 'হালবাহারা' (যাহারা হাল চালায়) কাজ আরম্ভ করে নাই তাহা হইলে তুলকালাম্ কাণ্ড করিয়া ফেলিত সে। গালাগালি তো দিতই, মারধোরও করিত। কেহ বিদ্রোহ করিত না, কারণ সকলেই রামগোবিনের খাতক। সকলকেই রামগোবিন ঋণের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের বিশেষত্ব, রামগোবিন ঋণের জন্য কখনও তাগাদা তো করিতই না, প্রয়োজন হইলে আবার ধার দিত। মাঝে মাঝে সুবিধা মতো তাহাদের বেতন হইতে কিছু কিছু কাটিয়া লইত। তাহাদের খাইবার জন্য 'সিধা'ও দিত সে। অর্থাৎ নূতন রকম দাসত্ব-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিল রামগোবিন। যে তাহার অধীনে একবার চাকরি করিয়াছে সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না, চাহিতও না।

সত্যই রামগোবিনের ভাগ্যদেবতা তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রামগোবিন যাহাই ধরে তাহাই সুফল-প্রসূ হইয়া ওঠে। সত্যই তাহার হস্তে ধূলি-মুঠি সোনা-মুঠিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

হাঁসোয়ারার দুইশত বিঘা জমিতে সেবার দুই হাজার মণ গম ফলিল। সেবার গমের দামও চড়িয়া গেল কিছু। বারো টাকা মণের কম ভাল 'দুধিয়া' গম দুষ্প্রাপ্য হইল বাজারে। রামগোবিন সাহেবগঞ্জের এক ধনী ব্যবসাদারকে বলিল 'তুমি যদি আমার সব গম একসঙ্গে কিনিয়া লও, তোমাকে দশ টাকা মণ হিসাবে গম বেচিব। শুধু তাহাই নয়, তুমি যদি বোরা দাও তাহা হইলে সেগুলি বোরায় পুরিয়া বিনা খরচায় নৌকাতেও উঠাইয়া দিব। আমার অনেক জনমজুর আছে তাহারা সেটা আমার খাতিরে বিনা মজুরিতে তোমার নৌকায় তুলিয়া দিবে। তবে টাকাটা আমাকে 'একাঠ্ঠা' (একসঙ্গে) দিতে হইবে। তিনি ইহাতে রাজী হইলেন। রামগোবিন একসঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়া গেল। নগদ পাঁচ সিকা খরচ করিয়া মহাবীরজিকে 'শিরনি' চড়াইল এবং নগদ পাঁচ টাকা খরচ করিয়া বন্ধুবান্ধবদের দহি চূড়া খাওয়াইল। ইহার কিছুদিন পরেই 'খুদ্দি' বাবুর সহায়তায় জাহাজঘাটের কুলি কন্ট্র্যাক্টিও পাইয়া গেল সে।

মুসলমান স্টেশন মাস্টারটি বেশী দিন রহিলেন না। কেন জানি না, হিন্দু-প্রধান স্টেশনে থাকিতে তাঁহার ভালো লাগিল না। তিনি নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটি মুসলমান-প্রধান স্টেশনে বদলী হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন খর্বকায় ক্ষুদিরাম মিত্র। খুব করিৎকর্মা লোক। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ও অঞ্চলে 'খুদ্দি' বাবু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রামগোবিন একদিন তাঁহার নিকট হাত-জোড়

করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে এক হাঁড়ি ভালো দই ও এক কাঁদি মর্তমান কলা। রামগোবিন তাহার জমির ধারে ধারে প্রচুর কলা গাছ লাগাইয়াছিল।

"এসব কি!" পুলকিত খুদ্দি বাবু প্রশ্ন করিলেন।

"আমি হুজুর লক্ষ্মীবাবুর নোকর ছিলাম। এখন সামান্য 'ক্ষেতি গিরস্তি' করি, কিছু 'বেওসাও' (ব্যবসা) আছে ছোটা-মোটা। আপনি হাকিম্ মানুষ, আপনাদের যদি 'কিরপা' থাকে—"

"আমিও সামান্য লোক। আমি আর তোমাকে কি কৃপা করতে পারি—"

"হুজুর হিন্ছা (ইচ্ছা) করলে বহুত কুছ্ হোতে পারে। শুনছি ঘাটের কুলি কনট্রাক্টে নতুন কনট্র্যাকটার নেবেন আপনারা। গিরবরধারিলাল কনট্র্যাক্ট্ নাকি ছেড়ে দিচ্ছেন—"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে কন্ট্র্যাকট কি তুমি নিতে পারবে, অনেক টাকার মামলা—"

"কত টাকা—"

"বেশ কিছু টাকা রেল কম্পানিতে জমা দিতে হবে জামানত স্বরূপ। তাছাড়া পানটানও খাওয়াতে হবে নানা জায়গায়। হাজার দশ বারো লেগে যাবে—"

"হুজুর যদি 'কিরপা' করেন যোগাড় করে ফেলব টাকা—"

খুদ্দিবাবু কৃপা করিয়াছিলেন শ' পাঁচেক টাকা সেলামী লইয়া। উপর-মহলে তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। রামগোবিনকে কন্ট্রাকটরিটি পাওয়াইয়া দিবার আগে তিনি আর একটি কাজও করিয়াছিলেন। তিনি রামগোবিনকে বলিলেন—"দেখ তোমার ওই পাঁড়ে উপাধিটা বদলাতে হবে। স্টেশনে স্টেশনে যারা প্যাসেঞ্জারদের জল দেয় তাদের নাম 'পানি পাঁড়ে।' আমাদের যিনি বড় সাহেব তিনি বিলেতের খানদানি বংশের ছেলে। তিনি হয়তো তোমার ওই 'পাঁড়ে' উপাধির জন্যই তোমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দেবেন। তিনি যে সে লোককে কনট্র্যাক্ট্ দেবেন না। তোমাকে একটা খানদানি উপাধি নিতে হবে—"

"সমঝা নেই হুজুর, খোলকে কাহিয়ে—"

"উপাধিটা রেস্পেক্টেবল (respectable) হওয়া চাই। শুনলেই মনে হবে—হ্যাঁ মানী লোক। শুনলেই যাতে 'গম্' করে কানে লাগে। সাহেব 'না' বলতে পারবে না—"

"কি করব আপনিই বাতিয়ে দিন—"

"তোমাকে আরও একশ' টাকা খরচ করতে হবে। কাশীতে আমার জানা-শোনা একটি টোল আছে। তারা একশ' টাকা পেলেই 'শাস্ত্রী' উপাধি দেয়। তুমি যদি টাকা দাও সেই উপাধি তোমাকে একটা আনিয়ে দিই।"

"আপনি যা হুকুম করবেন তাই হোবে।"

মাস দুই পরেই রামগোবিন শাস্ত্রী জাহাজঘাটের রেলোয়ে কুলি কন্ট্রাক্ট্ পাইয়া গেল। জাহাজ হইতে ট্রেনে এবং ট্রেন হইতে জাহাজে মাল তুলিবার জন্য যে কুলি দরকার তাহাই রামগোবিনকে প্রত্যহ জাহাজঘাটে মজুত রাখিতে হইবে এবং প্রতি কুলি পিছু রেল কম্পানি প্রত্যহ তাহাকে আট আনা করিয়া দিবে। ঘাটে দুইশত কুলি মাল বহিবার জন্য মজুত থাকা চাই। ইহাই হইল কন্ট্র্যাক্ট। রামগোবিনের হাতে জন-মজুরের সংখ্যা কম ছিল না। ইচ্ছা করিলে সে দুইশত কুলিই ঘাটে মজুত রাখিতে

পারিত। কিন্তু কোনদিনই সে তাহা রাখে নাই। চল্লিশ পঞ্চাশটি কুলির দ্বারাই সে কাজ চালাইত। তাহাদেরও পুরা মজুরি দিত না। কারণ তাহারা প্রায় সকলেই ছিল তাঁহার বেতনভুক ভৃত্য এবং অনেকেই অনুগ্রহপ্রার্থী খাতক। ওই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন কুলিই প্রত্যহ মুখ বুজিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া জাহাজের ও ট্রেনের মাল খালাস করিয়া দিত। ট্রেন অবশ্য মাঝে মাঝে 'লেট্' হইয়া যাইত এজন্য। কিন্তু স্টেশনের বাবুরা 'পান' খাইয়া সমস্ত 'ম্যানেজ' করিয়া দিতেন। রামগোবিন শাস্ত্রীকে মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি বাঁধিয়া একটা রেশমের শাদা কুর্তা গায়ে দিয়া জুতা পরিয়া দুবেলা ঘাটে হাজির থাকিতে হইত এবং সাহেব দেখিলেই সেলাম করিত সে। প্রত্যহ তাহাকে দুই ঘণ্টা করিয়া চার ঘণ্টা জামা-জুতা পরিয়া অকথ্য কষ্ট সহ্য করিতে হইত। খুদিবাবুর নির্দেশেই করিতে হইত। সুফলও ফলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রামগোবিন শাস্ত্রী ও অঞ্চলে বিখ্যাত ধনী বলিয়া সকলের নিকট সম্মান লাভ করিল। কিছুদিন পরে সে তাহার গোলার নিকটে জগন্নাথ পাঠকের দুই বিঘা জমিটাও হস্তগত করিয়া ফেলিল। জগন্নাথ জমিটা বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট দুইশত টাকা ধার লইয়াছিল। সে ধার সে আর পরিশোধ করিতে পারিল না। জগন্নাথকে রামগোবিন কিন্তু পথের ভিখারী করে নাই। তাহাকে তাহার 'ফাঁসিয়াতলা' কামতের কামতি করিয়া সেখানেই তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। রামগোবিন হু হু করিয়া চারিদিকে জমি কিনিতেছিল। ব্যবসায়েও খুব লাভ হইতেছিল তাহার। কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষপতি হইয়া গেল সে। এই সময়ে আর একটা জিনিস প্রকাশিত হইল যাহা আগে কেহ জানিত না। রামগোবিন জগন্নাথ পাঠকের জমির উপর একটি পাকা বাড়ি বানাইয়া ফেলিল এবং প্রচার করিল যে এইবার সে দেশে গিয়া তাহার 'কনিয়ান্'কে এবং পুত্রকে লইয়া আসিবে। দেশে যে তাহার বউ ছেলে ছিল একথা ঘুণাক্ষরেও সে জানায় নাই কাহাকেও। সকলেই অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে 'কনিয়ান্' তাহার পুত্র যোগীকে লইয়া আসিয়া পড়িল। স্টেশনে রামগোবিন ছিল না। সে কামতে গিয়াছিল। বয়েল গাড়ি লইয়া হাজির ছিল রংলাল।

বয়েল গাড়ি যখন রামগোবিনের নবনির্মিত পাকা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন অধিকলাল সেই বাড়িরই বারান্দার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিতেছিল। যোগী নামিল। তাহার ন্যাড়া মাথায় প্রকাণ্ড একটি টিকি। কানে সোনার মাকড়ি। পরনে হলদে কাপড়। কিছুদিন পূর্বেই তাহার উপনয়ন হইয়াছিল।

সে গাড়ি হইতে নামিয়া অধিকলালকে প্রশ্ন করিল—তুমি কে ?

তাহাদের আলাপ অবশ্য হিন্দীতেই হইয়াছিল। আমি বাংলায় তর্জমা করিয়া দিতেছি। অধিকলাল কোনও উত্তরই দিল না। রংলাল শশব্যস্ত হইয়া পড়িল যেন। একটু আগাইয়া আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"আমার ছেলে বাবুয়া—"

"তোমার ছেলে ! তুমি তো আমাদের 'নোকর'—"

"হ্যাঁ, বাবুয়া—"

"নোকরের ছেলে আমাদের বাড়িতে আছে কেন !"

"ও এখানে বসে পড়াশোনা করে। এখনি চলে যাবে—"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা গুছাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে কিছুদূর গিয়া ভাবিল—কোথায় যাইব ? আমাদের বাড়িতে তো পড়িবার স্থান নাই। একটা

ছোট কুঁড়ে ঘরে কতটুকুই বা স্থান থাকিবে। যতটুকু আছে ততটুকুও তাহার মা চাল-ডাল-ধান-গম প্রভৃতিতে ভরিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের গোলা হইতে রোজ সে যতটা পারে 'দানা'ই লইয়া আসে, নগদ পয়সা লয় না। কিছুদিন পরে যখন 'দানা'র দাম চড়ে তখন রামগোবিনের গোলাতেই তাহা বিক্রয় করিয়া বেশী পয়সা রোজগার করে সমুন্দরি।

অধিকলাল রামগোবিনের গোলার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিত। রামগোবিনকে সে কিছু 'হিসাব' এবং হিন্দী অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। রামগোবিন এখন হিন্দীতে নিজের নামটা সহি করিতে পারে। রামগোবিন রহস্য করিয়া তাহাকে 'গুরুজি' বলিয়া ডাকে। অধিকলাল যদিও মনে মনে রামগোবিনের উপর প্রসন্ন ছিল না, তবু তাহার কেমন যেন একটা ধারণা ছিল রামগোবিনের উপর তাহার একটা অধিকার আছে। কি সে অধিকার, সে অধিকারের বনিয়াদ কত শক্ত তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার মতো বয়স হয় নাই তাহার। কিন্তু যোগীর কথা শুনিয়া এক নিমেষে সে বুঝিতে পারিল রামগোবিনের বাড়িতে বসিয়া তাহার লেখাপড়া করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে রাস্তা ধরিয়া বই খাতা বগলে লইয়া হাঁটিতে লাগিল। স্কুলের দিকেই যাইতে লাগিল সে। হঠাৎ বটগাছটা নজরে পড়িল তাহার। স্কুলের সম্মুখে মাঠের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে সেই গাছটা। সে গিয়া তাহারই তলায় বসিয়া পড়িল। স্কুলের 'হোমটাস্ক' কয়েকটি অঙ্ক তখনও কষা হয় নাই। পেন্সিলটা কোমরে গোঁজা ছিল। খাতা বই বাহির করিয়া অঙ্কে মনোনিবেশ করিল সে। সেদিন রবিবার, স্কুলের তাড়া ছিল না। একমনে অঙ্ক কষিতে লাগিল অধিকলাল। অধিকলালের বয়স তখন তেরো বৎসর। আগামীবার সে মাইনর পরীক্ষা দিবে। স্কুলের উজ্জ্বল রত্ন সে। সব বিষয়েই প্রথম হয়। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই ভালবাসেন তাহাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার সম্বন্ধে হতাশ। প্রত্যেকেই জানেন গরীব রংলালের পুত্র অধিকলাল যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে তুচ্ছতার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। মাইনর স্কুলে তাহার বেতন লাগে না, বই খাতাও এখন যাহা লাগে তাহা রংলালের সাধ্যাতীত নহে, কিন্তু তাহার পর? তাহাকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তো রংলালের নাই। স্কুলের শিক্ষকরা এইসব জল্পনা-কল্পনা করিয়া নিজেদের মধ্যে দুঃখ করেন কিন্তু অধিকলাল ইহা লইয়া মোটেই মাথা ঘামায় না। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন জানে যে সে উন্নতি করিবেই। যত বাধাই আসুক না কেন সে বাধা সে উত্তীর্ণ হইবেই। কবে কি বাধা আসিবে কেমন করিয়া সে উত্তীর্ণ হইবে এ কথা সে জ্ঞাতসারে ভাবে না, কেবল নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন। সেইদিনই তাহার জীবনের একটা প্রধান ঘটনা ঘটিয়া গেল। অথচ কত সহজেই ঘটিল।

অধিকলাল একমনে অঙ্ক কষিতেছিল। হঠাৎ পেছন হইতে ডাক আসিল—"কি খুদরুয়া যে। এখানে কি করছ!" অধিকলালের ডাক নাম 'খুদরুয়া'। কথাটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' হইতে উৎপন্ন। ইহার বাংলা সংস্করণ 'খুদু'।

অধিকলাল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ডাক্তারবাবুর ছেলে নখু (ভালো নাম নক্ষত্র) এবং তাহার ছোট বোন তনু (ভালো নাম তন্ময়া) দাঁড়াইয়া আছে। নখু অধিকলালের চেয়ে বয়সে ছোট। তাহার চেয়ে নীচের ক্লাসে পড়ে। তনু আরও ছোট, তাহার বয়স

মাত্র ছয় বছর। কিন্তু তাহারা ডাক্তারবাবুর ছেলে মেয়ে। চাকরের ছেলে অধিক-লাল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্ভ্রমসহকারেই প্রশ্ন করিল—"আপনারা এখানে কেন এসেছেন ?"

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অধিকলাল যে মাইনর স্কুলে পড়িত সে স্কুলে বাংলা হিন্দী দুইই পড়ানো হইত। স্কুলের হেড পণ্ডিত ভুতনাথ শর্মা বাংলা এবং অংক পড়াইতেন। ভুতনাথ শর্মা একদিন অধিকলালকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন— "দেখ বাবা, তুমি ভালো ছেলে। তোমাকে একটা সৎপরামর্শ দিচ্ছি। হিন্দী তোমার মাতৃভাষা। সেটা এমনই তুমি বাড়িতে শিখতে পারবে। কিন্তু স্কুলে তুমি বাংলাটা শেখ। বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে একটি। বাংলা শিখলে তুমি লাভবান হবে।"

অধিকলাল স্কুলে বাংলাই পড়িত এবং ভালো বাংলাও শিখিয়াছিল। সে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের সহিত পরিষ্কার বাংলায় কথা বলিতে পারিত। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলকেই মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করিত সে। ডাক্তার তপনকান্তি ঘোষ এ অঞ্চলের একজন নামী ডাক্তার। খুব প্র্যাকটিস্‌, লোকও খুব ভালো। গরীবদের নিকট 'ফি' নেন না। বেশী গরীব লোক হইলে ঔষধের দামও দিয়া দেন। ছেলেবেলায় অধিকলালের একবার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। তপনবাবুই তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন বিনা পয়সায়। অধিকলাল দূর হইতেই ইঁহাদের বাড়ির সকলকেই শ্রদ্ধা করিত। কাছে যাইতে সাহস করিত না। ভাবিত উঁহারা এমন একটা জগতের লোক যেখানে আমরা বেমানান। সে উঁহাদের সহিত মিশিবারও চেষ্টা করে নাই কোনদিন। নখুবাবু কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া স্কুলে আসে, কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না, তাহার মুখে কখনও সে কোনও খারাপ কথা শোনে নাই। সেও খুব ভালো ছেলে, নিজের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অথচ কোন দেমাক নাই। একটা ভদ্র আভিজাত্য সর্বদা তাহাকে যেন ঘিরিয়া আছে।

অধিকলাল স্কুলের ভালো ছেলে। নখু তাহাকে চিনিত। সকলেই চিনিত তাহাকে।

নখু হাসিয়া বলিল—"তুমি এখানে বসে পড়াশোনা করছ ? বাঃ বেশ তো।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে রামগোবিনের ছেলে যোগী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

তনু বলিল—"দাদা, কি করে পাড়বে তুমি বটপাতা। ও তো অনেক উঁচুতে।"

"রামধনিয়া তো বলেছে একটু পরে পেড়ে দেবে !"

তনু মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল—"না এখুনি পেড়ে নিয়ে চল। তুমি পারবে না ?"

"আমি গাছে উঠতে পারি না।"

অধিকলাল বলিল, "আমি পারি। আমি পেড়ে দিচ্ছি। কি হবে বটপাতা নিয়ে ?"

"কাল আমরা একটা ছাগল কিনেছি। কি সুন্দর যে সেটা দেখতে। তাকে খাওয়াব। বটপাতা খেতে খুব ভালোবাসে। তুমি দেবে ?"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠিয়া গেল এবং উপর হইতে কয়েকটা বটের ডাল ভাঙিয়া ফেলিয়া দিল। আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল তনু। তাহার পর অধিকলাল যখন গাছ হইতে নামিয়া আসিল তনু বলিল—"তুমি দাদাকে 'আপনি'

বললে কেন ! তুমি তো রংলাল মামার ছেলে। তুমি তো আমাদের ভাইয়ের মতন। ভাইকে কেউ আপনি বলে নাকি !"

তনু হাসিমুখে উত্তরের প্রত্যাশায় অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল। অধিকলাল কোনও উত্তর দিতে পারিল না। একটা উত্তর তাহার মনে আসিয়াছিল—কিন্তু 'আপনারা আমার বাবার মনিব-পর্যায়ের লোক, আপনাদের আমি আমার সমান ভাবিব কি করিয়া'—এ উত্তরটা দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

নখু বলিল, "খুদের, তুমি এখানে বসেই রোজ পড় তাতো জানতাম না।"

"রোজ পড়ি না। আজই এসেছি। বাড়িতে আমার পড়বার জায়গা নেই।"

তনু বলিল—"তাই নাকি। তুমি আমাদের বাড়িতে চল। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে। সেইখানে তুমি পোড়ো।"

"যেতে পারি। কিন্তু—"

কথাটা কিন্তু অধিকলাল শেষ করিল না।

"কিন্তু আবার কি !" নখু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"সে তোমার বাবাকে বলব।"

"আমিও বাবুকে বলব। বাবু আমার কথা খুব শোনে—"

তনু গিন্নীর মতো মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিল অধিকলালকে।

তাহার পর বাস্তব সমস্যাটার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অধিকলাল বট-গাছের উপর উঠিয়া অনেক ডালপালা ভাঙিয়া নীচে ফেলিয়াছিল। এগুলিকে এখন বাড়ি লইয়া যাইবে কে।

"দাদা এগুলো কি আমরা নিয়ে যেতে পারব ? যতটা পারি নিয়ে যাই চল। ছিনটুর নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে খুব, সকাল থেকে তো বাঁধা আছে—"

"ছিনটু বুঝি ছাগলটার নাম ?"

অধিকলাল প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ। পরশু দিন ওটাকে হাট থেকে কিনে আনা হয়েছে, দুটো বাচ্চা সুদ্ধ। মা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তিন তিনবার দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে, তাই মা ওর নাম রেখেছে ছিনটু !"

তনু অকৃত্রিম আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

"মা বাচ্চা দুটোরও নাম দিয়েছে ঝিন্টা আর পিন্টা—"

আবার হাসি।

নখু বলিল—"চল আমরা একটা করে ডাল টেনে টেনে বাড়ি নিয়ে যাই। তার-পরে রামধনিয়া এসে বাকিগুলো নিয়ে যাবে—"

"আমিই সব পেঁছে দিচ্ছি—"

একটু দূরেই একটা জমিতে বড় বড় 'কসাল' ঘাস ছিল অনেক। অধিকলাল গিয়া একগোছা বড় বড় ঘাস লইয়া আসিল। তাহা দিয়া সব ডালপালাগুলোকে একত্রে বাঁধিয়া ফেলিল সে। তাহার নিজের বই ও খাতা সেই বোঝাটার উপর বাঁধিয়া একটা বুনো লতা জড়াইয়া মজবুত করিয়া ফেলিল বোঝাটাকে। খানিকটা লতা বাড়তি হইয়া একধারে ঝুলিতে লাগিল।

"চল এইবার—"

সেই লতাটা টানিতে টানিতে অধিকলাল নখু ও তনুর অনুসরণ করিল।

রংলাল তখন গোবিনলালের নবাগত পরিবারের ও 'বাবুয়া'র ফাইফরমাশ খাটিতেছিল আর সমুদ্দারি রামগোবিনের গোলায় বসিয়া ঝাড়িতেছিল কলাই। তাহাদের ছোট ছেলে আজবলাল লাট্টু ঘুরাইতেছিল। তাহার পড়াশোনায় মন ছিল না। প্রায়ই পাঠশালা হইতে পলাইয়া আসিত। তাহার ছোট বোন দুইটাও নিকটে বসিয়া ধুলামাটি লইয়া খেলা করিতেছিল। একটির নাম সুলিয়া (ভালো নাম সুলোচনা) আর একটির নাম তিলিয়া (ভালো নাম তিলোত্তমা)। এই দুইজনের নামকরণ লক্ষ্মীবাবুর স্ত্রী সুরেশ্বরী করিয়াছিলেন।

ইহারা কেহ বুঝিতেই পারিল না যে অধিকলাল তাহাদের ছাড়িয়া আর একটা নূতন জগতে চলিয়া গেল। তাহার নূতন জগৎ এবং পুরাতন জগতের মধ্যে একটা দোলাও দুলিয়াছিল। সেই দোলায় চড়িয়া নানারকম দোলও খাইতে হইয়াছিল অধিকলালকে।

এ কাহিনী সেই দোলের কাহিনী। যে পটভূমিকায় সেই দোলটা দুলিয়াছিল তাহারই ছবি আঁকিলাম এতক্ষণ।

॥ ২ ॥

সর্বাগ্রে তনু লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে নখু। নখুর পিছনে অধিকলাল পাতার বোঝাটাকে টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। তপনবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া কলে বাহির হইতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরিলেন।

তনু চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবা, তুমি নাম ঘোড়া থেকে। আমরা খুদরুকে ডেকে এনেছি। সে এখানে পড়বে—"

সত্যই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন তপনবাবু। তনু ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—"জান বাবা, খুদরুই ছিনুটুর জন্যে এইসব বটপাতা পেড়ে দিয়েছে। দেখলাম সে ওই বটগাছটার নীচে বসে পড়ছে। বলছে তার বাড়িতে পড়বার জায়গা নেই। আমি তাকে ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে আছে। সেইখানে ও পড়ুক না?"

"বেশ তো। এই ব্যাপার, না আর কিছু?

"আর কিছু নয়।"

তপনবাবু অধিকলালকে চিনিতেন। সে যে স্কুলে ভালো ছেলে এ খবরও শুনিয়াছিলেন তিনি। বলিলেন—"রংলালের ছেলে তুমি? এতো বড় হয়ে গেছ। বেশ তো আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসে পড়াশোনা কর—"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"আমাকে আপনি একটা কাজ দিন।"

"কি কাজ! তুমি স্কুলে পড়, তুমি আবার কি কাজ করবে। পড়াশোনা করাই তো এখন তোমার কাজ।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আমি কাজ করেও পড়াশোনা করতে পারব।"

তপনবাবু তাহার মুখভাবে কেমন যেন একটা জেদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি 'কল' থেকে ফিরে আসি। তারপর ভেবে দেখব তোমাকে কি কাজ দিতে পারি—"

হাসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতা পার হইয়া মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। খুদরুর কথা শুনিয়া তনু পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি কাজ করতে চাও? ভালোই তো, আমার কাজ কর না, অনেক কাজ দেব তোমাকে।"

"তোমার আবার কি কাজ!"

"ওমা! আমার আবার কাজ নেই!"

সমর্থনের জন্য নথুর দিকে সে ফিরিয়া চাহিল। নথু বলিল—"হ্যাঁ, যতো সব বাজে কাজ।"

"বাজে কাজ! দোলনা-টাঙানো বাজে কাজ। বেশ, যখন টাঙানো হবে তুমি উঠবে না তো!"

"উঠব না কেন, নিশ্চয় উঠব।"

"কেন উঠবে? কতদিন থেকে খোশামোদ করছি, টাঙাবার ব্যবস্থা তো করতে পার নি।"

অধিকলাল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার বলিল, "চল, আমি টাঙিয়ে দেব। কোথায় টাঙাবে?"

"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে যে আমগাছটা আছে সেইখানে।"

"শক্ত দড়ি আছে?"

"না। খালি দোলনাটা আছে—"

"আচ্ছা, চল দেখি। দড়ি বাজার থেকে কিনে আনলেই হবে।"

তাহারা সকলে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

তনু নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া একেবারে শোওয়ার ঘরের বারান্দার উপর উঠিয়া ডাক দিল—"দেখ মা, কাকে এনেছি। ছিনুটুর জন্যে খাবারও এনেছি অনেক—।"

তপনবাবুর স্ত্রী ভগবতী বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওমা এ কি কাণ্ড! এত বটপাতা খাবে কে! ছিনুটুকে বাইরের মাঠে বেঁধে দিয়ে এসেছে হরুরু। ও কে খুদরু না কি! রংলালের ছেলে! এস বাবা এস—"

অধিকলাল আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস। তোমার বাবা তো আজকাল পাঁড়েজির গোলায় কাজ করে?"

"হ্যাঁ—"

তনু বলিল—"ও এইবার আমাদের বাড়িতে থাকবে। পশ্চিমের খালি ঘরটায় পড়াশোনা করবে। আর আমার কাজ করবে।"

"ও তাই নাকি—।"

"হ্যাঁ, বাবাকে বলেছি। বাবা বলেছে, বেশ তো। আমার দোলনাটা এখনই টাঙিয়ে দে খুদর্।"

"দাঁড়াও আগে দড়ি যোগাড় করি।"

ভগবতী দেবী বলিলেন—"না বাবা দোলনা টাঙিয়ে দিও না। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।"

অধিকলাল বলিল—"না, আমি খুব নীচু করে টাঙিয়ে দেব। যদি পড়েও যায় বেশী লাগবে না।"

তনু নিকটে দাঁড়াইয়া অকারণে লাফাইতে লাগিল।

"বেশ তাই দিও তবে! যা দস্যি মেয়ে—"

"আগে কিছু দড়ি যোগাড় করি।"

"দড়ি দিচ্ছি তোমাকে। কুয়ো থেকে জল তোলবার জন্যে নারকেলের দড়ি আনানো হয়েছিল, কিন্তু হকরু বললে পাটের দড়ি চাই। নারকেলের দড়িতে তার নাকি হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে। অনেকখানি দড়ি আছে—"

ভগবতী দেবী চঞ্চলপদে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যেও একটা চঞ্চলা বালিকা সর্বদা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, সে বালিকা তাঁহার কন্যা তনুরই সমবয়সী। একগোছা দড়ি লইয়া চঞ্চলপদেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"এই নাও—। এতে হবে তো—"

"হবে। একটু ন্যাকড়াও দিন।"

"ন্যাকড়া কি হবে—"

"খুকু যেখানটা ধরবে সেখানটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে দেব। তাহলে হাতে আর লাগবে না। দড়িটা সত্যিই বড় খর-খরে। আমি ঠিক করে দেব সব।"

একটু পরে দেখা গেল আমগাছে দোলনা টাঙানো হইতেছে। সকলেই লাগিয়া পড়িয়াছে। নখু, তনু, খুদর্ এমন কি ভগবতীও। তিনি গাছের উপরও উঠিয়াছেন। মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

দোলনা যখন টাঙানো হইয়া গেল তখন তিনিই সর্বাগ্রে দোলনায় বসিয়া একবার দুলিয়া লইলেন।

অধিকলাল বলিল—"আমি এইবার একটু পড়তে বসব। অঙ্ক এখনও বাকি আছে কয়েকটা—"

পশ্চিম দিকের বারান্দাতেই বসিয়া পড়িল সে।

"তুমি বাড়িতে খেতে যাবে না?"

"আমি খেয়ে এসেছি—"

"কি খেয়েছ?"

"ছাতু—"

"দিনে আর কিছু খাবে না?"

"না। রাত্রে একেবারে ভাত খাব।"

একটু পরে সে দেখিল ভগবতী দেবী একটা রেকাবিতে খানিকটা মোহনভোগ এবং চারখানা মাছ ভাজা লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তনু।

"এ কি!" অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"ছেলেদের জন্যে করলুম। ডালাবাঁর থেকে একটা বড় রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে দিনু মহলদার। খাওয়াদাওয়া করতে দেরি হবে আজ। নথু বলছে ঘি-ভাত আর দমপোক্ত করতে। তুমিও এখানে খাবে আজ। কেমন? এখন এগুলো খেয়ে নাও।"

অধিকলাল কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। তনু তাহার পিঠের দিকে গিয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"কোন কথা বলছ না কেন?"

"কি বলব—"

"বল, আচ্ছা।"

"আচ্ছা।"

ভগবতী ধমক দিলেন।

"অসভ্য মেয়ে, নাব ওর কাঁধ থেকে—"

তাঁহার চোখ-মুখ হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেইদিন বেলা দুইটার সময় অধিকলাল যখন বারান্দার একধারে বসিয়া আহারে ব্যাপৃত ছিল তখন সুমন্দরি আসিয়া উপস্থিত। ছেকাছেনি ভাষায় বলিল—"এ কি তুই এখানে! আমি চারদিকে খুঁজে মরছি—"

ভগবতী বলিলেন, "আমরা ওকে আজ 'নেওতা' দিয়েছিলাম। তুই খাবি? অনেক রান্না হয়েছে।"

"নেই মাইজি। আমার সুলিয়া তিলিয়া আজুয়া কেউ খায়নি এখনও—"

"ওদের জন্যেও দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যা।"

তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। সমুন্দরি অধিকলালের খাওয়া দেখিতে লাগিল। ইহাতে আশংকার কিছু ছিল না, তবু একটা অজানা আশংকা তাহার মনে যেন ছায়াপাত করিল।

॥ ৩ ॥

অধিকলালের সহিত তপনবাবুর নিভৃতে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাতে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। অধিকলাল থামিয়া থামিয়া সসংকোচে যাহা বলিয়াছিল তাহার মর্ম এই—"আমি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসিয়া যদি লেখাপড়া করিবার সুবিধা পাই তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব। আমার বাড়িতে বা রামগোবিন্দজির গোলায় বসিয়া আমি পড়াশোনা করিতে পারি না। বাড়িতে স্থানাভাব, রামগোবিনের গোলায় তাহার পুত্র যোগীন্দ্রনাথ আসিয়াই যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা মর্মান্তিক। তাহার ও কথার পর আর ওখানে যাওয়া চলে না। তাই আমি ঠিক করিয়াছিলাম ওই বটগাছটার নীচে বসিয়াই পড়াশোনা করিব। কিন্তু নথু আর তনু আমাকে জোর করিয়া এখানে আনিয়াছে। বলিতেছে, পশ্চিম দিকের ঘরটায় তুমি লেখাপড়া কর। আপনিও সে কথা বলিয়াছেন, মায়েরও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার একটি কথা আছে। আপনার অনুগ্রহের আওতায় আমরা চিরকাল বাস করিয়াছি। সে আওতার বাহিরে যাইবার সাধ্য আমার নাই। তবু একটা কথা বলিবার

আছে। একেবারে কিছু না করিয়া কেবল আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আপনার বাড়িতে থাকিব ইহাতে আমার মন সরিতেছে না। ইহাতে আমি শান্তি পাইব না। আমি আপনার বাড়িতে থাকিব, কিন্তু আপনি আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোনও কাজই আমি পারিব। আপনার ঘোড়ার জন্য মাঠ হইতে রোজ ঘাস আনিতে পারি। আপনার বাগানের কাজও করিতে পারিব আমি। মাইজি যদি আমাকে দিয়া বাসন মাজাইয়া লন বা আমাকে যদি ঘর ঝাড়ু দিতে বলেন তাহাও আমি সানন্দে করিব। কিন্তু আপনার কোনও উপকারে না লাগিয়া আপনার বাড়ির একটি ঘর দখল করিয়া বসিয়া থাকিব ইহা আমার মোটেই ভালো লাগিতেছে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"যে সব কাজ তুমি করতে চাইছ তার জন্যে তো আমার লোক আছে। তাছাড়া ওসব কাজ করলে তুমি লেখা-পড়া করবে কখন।"

"রাত্রে—"

তপনবাবু অধিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তাহার সংকল্প অটল। বলিলেন, "তাহলে তুমি এক কাজ করো—"

"কি বলুন—"

"আমার লাইব্রেরিটার ভার নাও। তুমি বাংলা জানো তো?"

"জানি। স্কুলে বাংলাই তো পড়ি, হিন্দী পড়ি না। বাংলা আর ইংরেজি।"

"হিন্দীও শেখ। যত ভাষা শিখবে ততই লাভ হবে। তাছাড়া হিন্দী তোমার মাতৃভাষা ওটা শেখা চাইই।"

"হিন্দী বই আমি পড়তে পারি।"

"বেশ তাহলে তুমি আমার লাইব্রেরিটার দেখাশোনা কর। আমি প্রতিমাসেই কিছু কিছু বই কিনি। সব অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। যে পড়তে নিয়ে যায় সে আর ফেরত দেয় না। তুমি বইগুলোর একটা 'লিস্ট্' তৈরি করে ফেল আস্তে আস্তে। তারপর এক এক রকম বই এক জায়গায় রাখ—"

"বেশ। তাই করব।" খুব খুশী হইল অধিকলাল। তাহার মনের মতো কাজ। "কোথায় আপনার লাইব্রেরি?"

"ওই যে বাগানের ভিতর ছোট আর একটা বাড়ি আছে সেইখানেই। তাতে দুটো ঘর আছে। একটা বড় আর একটা ছোট। বাইরে থেকে কোনও অতিথি এলে ছোট ঘরটায় থাকেন। বড় ঘরটায় লাইব্রেরি আছে। আলমারি টেবিল সব আছে সেখানে—"

তপনবাবু টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা চাবি বাহির করিয়া দিলেন তাহাকে।

"এই নাও ওই বাড়ির চাবি। লাইব্রেরিতে বসেই তুমি পড়াশোনা করতে পার। পশ্চিম দিকের ঘরে থাকবার দরকার কি। ও ঘরটা আরও নির্জন—"

অধিকলাল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। একটু পরেই সে লাইব্রেরি ঘরটি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল অনেক বই। কুড়িটা আলমারিতে বই ঠাসা! ঘরে কিন্তু চতুর্দিকে ধুলা। ঘরের কোণে কোণে মাকড়শার জাল। সে তৎক্ষণাৎ একটা ঝাঁটা আনিয়া ঘরটা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। একটু পরেই তনু আর নখু আসিয়া হাজির। তনু কপালে চোখ তুলিয়া সভয়ে বলিল, "এখানে কি করছ খুদরু!"

নখু ধমক দিল।

"ফের খুদরু বলছিস ? মা খুদরুদা বলতে বলে দিয়েছে না ?"

তাহার পর খুদরুর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—"আমিও তোমাকে খুদরুদা বলব এখন থেকে। তুমি আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কিনা।"

তনু মাতৃআজ্ঞা অমান্য করিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভাবটা সামলাইয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"তুমি এ ঘরটা খুলে পরিষ্কার করছ কেন খুদরুদা ?"

"আমি এই ঘরেই থাকব। ডাক্তারবাবু বলেছেন। তিনি আমাকে লাইব্রেরিয়ান করে দিয়েছেন!"

"এই ঘরে থাকবে তুমি! এ ঘরে থেকো না। হুকরুকে বাবা এই ঘরে শুতে বলেছিল, সে বললে এখানে আমি কিছুতে শোব না। এখানে হাওয়া আছে।"

"হাওয়া তো সব জায়গায় আছে—"

"হুকরু যে হাওয়ার কথা বলেছে সে হাওয়া মানে ভুত। রাত্রে কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা কয় আর খিক খিক করে হাসে।"

নথু বলিল, "ও সব বাজে কথা খুদরুদা। হুকরুটা গাঁজা খায়। আর গাঁজার ঘোরে যা তা বলে। ও বলছিল সমস্ত গিধারা (শকুনরা) ভুত। দিনের বেলায় পাখী সেজে মড়া খায় আর রাত্তির বেলা জিন হয়ে জ্যান্ত মানুষ খায়। শকুন দেখলেই তাই ও রাম নাম করে—"

এমন সময় হাসিমুখে ভগবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কি হচ্ছে এখানে সব ?"

তনু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "খুদরুদা এখানে থাকবে বলছে, বাবা ওকে 'লাইবেলিয়ান' করে দিয়েছে। খুদরুদা এখানে বসেই পড়াশোনা করবে। রাত্রে এখানে শোবে। হুকরু বলেছিল এ বাড়িতে হাওয়া আছে—তাই না ?"

"তুই থাম!" এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিলেন ভগবতী।

তাহার পর অধিকলালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাঃ, তুমি তো ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলেছ দেখছি। তুমি এই ঘরেই দিনে পড়াশোনা কোরো। কিন্তু রাত্রে এখানে শোওয়া চলবে না। এই একটেরে বাগানের মধ্যে একা ছেলেমানুষ রাত্রে থাকবে কি করে ? ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই রাত্রে শুয়ো। এখানে রাত্রে ভয় করবে। ও ঘরে খাটিয়াও আছে—"

অধিকলাল শান্ত কণ্ঠে কহিল—"আমার ভয় করবে না।"

না বাপু দরকার নেই। আমার মনে স্বস্তি থাকবে না তুই এখানে শুয়ে থাকলে। তুই ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই শুবি। এখন সব খাবি চল। লুচি ভাজছি। খুদরু তুইও আয়—"

"আমি এখন খাব না। আমি একেবারে ছাতু খেয়ে স্কুলে যাব, রোজ যেমন যাই।"

"তবু দু'একখানা লুচি খাবি আয়।"

ভগবতী জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। রান্না-ঘরের বারান্দায় বসিয়া নথু ও তনুর সহিত সে আট-দশখানা গরম গরম সদ্যভাজা লুচি আলু চচ্চড়ি সহযোগে খাইয়া ফেলিল। খুব ভালো লাগিল। পেটও ভরিয়া গেল। লুচি খাইয়া সে আবার চলিয়া গেল লাইব্রেরি ঘরে। মেঝেতে এবং টেবিলের উপর অনেক ধুলো

পড়িয়াছিল। ঝাড়ু দিয়া সে সমস্ত পরিষ্কার করিল। তাহার পর চাবিটা লইয়া সে একটা আলমারি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল উপরের তাকে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই। একটা বই পড়িয়া খুলিতেই চোখে পড়িয়া গেল একটা লাইন—"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী। মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি।" যদিও ইহার পুরা অর্থ তাহার বোধগম্য হইল না, কিন্তু তাহার অন্তরতম সত্তা যেন বাজিয়া উঠিল। সেও যেন নীরব সঙ্গীতে বলিতে লাগিল "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তোমার বাঁশরী আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু কি করিয়া যাইব তোমার কাছে—"।

সমস্ত কবিতাটা পড়িয়া অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

"খুদরুবা—"

বাহিরে আসিয়া দেখিল সমুন্দরি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ময়লা কাপড়, তাহার মাথায় অপরিষ্কৃত চুলের বোঝা, তাহার চোখের কোণে পিঁচুটি, তাহার হলুদ রঙের দাঁত তাহার চোখ মুখের হিংস্র ভঙ্গী, তাহার ময়লা শতচ্ছিন্ন কুর্তার অন্তরালে তাহার দুগ্ধ-স্ফীত স্তনযুগলের অভব্য প্রকাশ হঠাৎ অধিকলালের চেতনায় এমন একটা আঘাত হানিল যে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুহ্যমান হইয়া গেল। এই তাহার মা! হাস্যময়ী সুন্দরী স্নেহপরায়ণা সভ্যভব্য ভগবতীর সহিত ইহার তুলনা চলে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে ভগবতী তাহার মা নয়, সমুন্দরিই তাহার মা।

"তুই খেতে গেলি না? স্কুলে যাবি না?"

"এখনি স্কুলে যাচ্ছি। এখন আর খাব না। মাইজি আমাকে লুচি খাইয়েছে—"

"লুচি! সেদিন পোলাও খেয়েছিস, আজ লুচি খাচ্ছিস, ব্যাপার কি! মাইজি তোকে 'দুল্হা' (জামাই) বানাবে না কি!"

অধিকলালের চোখের দৃষ্টি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিল না। তবু তাহার চোখে মুখে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহার অর্থ—মুখ সামলে কথা বল।

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল সমুন্দরি খোলা দ্বারটার দিকে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ময়লা আঁচলের আড়াল হইতে বাহির করিল ময়লা গামছায় বাঁধা একটা পুঁটুলি। সেই পুঁটুলিটা সজোরে সে ছুঁড়িয়া দিল ঘরের মধ্যে। তাহার পর দুম দুম করিয়া চলিয়া গেল। অধিকলাল ঘরের ভিতর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুঁটুলিতে কি আছে সে তাহা জানিত। তবু আগাইয়া গিয়া খুলিয়া দেখিল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহাই ছিল পুঁটুলির ভিতর। এক ডেলা বুটের ছাতু, তাহার ভিতর একটা কাঁচা লংকা গোঁজা। ছাতুর ডেলাটা হাতে করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। যদিও তাহার ক্ষুধা ছিল না, তবু সে সেটা খাইয়া ফেলিল। তাহার কেমন যেন মনে হইতে লাগিল না খাইলে অন্যায় হইবে।

॥ ৪ ॥

তপনবাবু অধিকলালকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যতই তাহাকে দেখিতেছিলেন ততই ভালো লাগিতেছিল। স্কুলে খবর লইয়া জানিয়াছিলেন যে সে প্রতি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। অথচ অন্য কাজ করিতেও কম পটু নয়। একদিন সহিস আসে নাই, সেদিন সে ঘোড়ার ঘাসও আনিয়া দিয়াছিল। লাইব্রেরিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গুছাইয়া ফেলিয়াছে। একদিন দেখিলেন বাগানে গাছের গোড়াগুলিও খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতেছে। হকরুরই ইহা করিবার কথা, কিন্তু সে প্রায়ই এ কাজে ফাঁকি দেয়। সকালে নখু এবং তনুরও পড়া বলিয়া দেয় অধিকলাল। তাহাদের লইয়া খুব সকালেই পড়িতে বসিয়া যায় সে। নিজের পড়া রাত্রে পড়ে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া। তাহার একটা জীর্ণ লণ্ঠন ছিল। কাচটা ফাটা, চিমনি ধোঁয়ায় কালো। তপনবাবু তাহাকে ভালো একটা আলো কিনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে আর একটা বাসনাও অংকুরিত হইয়াছে। মাইনার স্কুলের হেডমাস্টার হরিপদবাবু একদিন দুঃখ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অধিকলাল একটি জুয়েল। কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ ওর গুণরাশিকে মলিন করে দেবে। ওকে 'হাইয়ার এডুকেশন' দেবার ক্ষমতা তো রংলালের নেই। আমাদের দেশে সদাশয় লোকেরও অভাব। বিদ্যাসাগর একটাই জন্মেছিল এ দেশে—"

হরিপদবাবুর এসব কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নাই। তিনি বরাবরই স্বল্পভাষী লোক। কিন্তু তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে একটা সংকল্পের অংকুর দেখা দিয়াছিল। তাই রংলাল যখন একদিন তাঁহাকে বলিল—"খুদরু কয়েকদিন থেকে বাড়ি যাচ্ছে না, আপনার এখানেই আছে। আপনি কি ওকে কোনও কাজে বাহাল করেছেন ?"

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"হ্যাঁ। ও এখন এইখানেই থাকুক্।"

রংলাল ইহার উত্তরে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মুখ কাচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ তাহার পর মাথা চুলকাইয়া প্রশ্ন করিল—"ওর মা বলছিল ওর 'তলব' (মাইনে) যদি কিছু ঠিক করে থাকেন—"

"সেটা ঠিক করেছি। কিন্তু কাউকে বলিনি এখনও। বলবার দরকারও নেই আপাতত—"

রংলালের মুখ আরও কাচুমাচু হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও চলিয়া গেলেন নিজের ডিসপেন্সারিতে। ডিসপেন্সারি হইতে তিনি 'কলে' বাহির হইয়া গেলেন। সমুন্দরি আর সহজে তাঁহার নাগাল পাইল না। কিন্তু সে ছাড়িলও না। সে ভগবতীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"মাইজি আপনি খুদরুবাকে 'যতন' করে রেখেছেন এটা তো ওর 'বড়া ভাগ' (মহাভাগ্য), কিন্তু মাইজি, আমরা 'গরিবগুর্বা' 'দুখ-ধান্দা' করে দিন চালাই। ওকে দিয়ে আপনি যত খুশি কাজ করান, ও সব কাজ করতে পারবে, কিন্তু ওর একটা 'তলব' ঠিক করে দেন। বিনা তলবে ও আপনার বাড়িতে খাটবে কি করে ?"

ভগবতী একটু হাসিয়া ভদ্রভাবেই বলিলেন, "কিন্তু আমরা তো ওকে চাকর বাহাল করিনি। ও আমাদের এখানে এসেছে নিরিবিলিতে পড়বে বলে। ও বললে ঘরে ওর পড়বার জায়গা নেই। তাই আমরা ওকে এখানে থাকতে দিয়েছি। কাজকর্ম যা করে

তা ও নিজের খুশি মতো করে। আমাদের তো কাজ করবার চাকর আছেই। ও বাড়ির ছেলের মতো আছে এখানে।"

"সেদিন কে বললে ও আপনাদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস 'ছিলে' এনেছে। আপনার খোকাবাবু কি ঘোড়ার ঘাস গড়ে?"

"আমার খোকা তো কিছুই পারে না। পড়াশোনাতেও ও কি খুদরুর মতো? খুদরু লেখাপড়াতেও যেমন, কাজকর্মেও তেমন। ছেলে তোমার খুব ভালো। আমরা ওকে 'নোকর' করে বাহাল করিনি, ওর পড়াশোনার সুবিধে হবে বলে আমাদের লাইব্রেরিতে ওকে থাকতে দিয়েছি।"

"কিন্তু মাইজি, গরীবের ছেলের লেখাপড়া শিখে 'নাফা' কি?"

"অনেক 'নাফা'। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে অনেক উন্নতি হবে। বড় চাকরি হবে, সবাই খাতির করবে—"

"হামাদের মতো গরিবগুর্বাদের তা কি হবে? বড়লোকের ছেলেরাই হাকিম, তাকিম হয়। গরীবের ছেলেরা মেহনতী কাম করে। কুয়া থেকে জল তোলে, বরতন মলে, ঘোড়ার ঘাস 'গড়ে' কুলি মজুর হয় এই তো বরাবর দেখে আসছি মাইজি—"

"সে কাল আর নেই। এখন গরীবের ছেলেরাও লেখাপড়া শিখে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জজ, ব্যারিস্টার এমন কি মিনিস্টারও হচ্ছে। খুদরু খুব ভালো ছেলে, আমার বিশ্বাস ও যদি পড়বার সুযোগ পায় তাহলে ও অনেক উন্নতি করবে।"

"কিন্তু আমার 'মাইজি' ভয় করে। ছেদির ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিন্তু হাকিমও হয়নি 'হুকিমও' হয়নি। হয়েছে একটা বদমাশ লুচ্চা। 'না ঘাটকা, না ঘরকা'। ছেদির মতন বরতনও মলতে পারে না, কোথাও নোকরিও হয় না। গুণ্ডা হয়েছে একটা। তাড়ি খায়, বউকে মারে, আর 'চোরি ডাকাইতি' করে ফুটানি করে। পাঁড়েজির গোলাতে 'সিন' কেটে চোরি হয়েছিল, শুনেছি ছেদির ব্যাটা পর্মা নাকি সে দলে ছিল। কাল পুলিসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। লিখা-পড়া শিখার তো এই হালৎ।"

ভগবতী হেসে বললেন, "সবাই কি একরকম হয় নাকি। দুনিয়ায় যে এত চোর বদমাইশ তারা কি সবাই ম্যাট্রিক পাস? তোমার খুদরু খুব ভালো ছেলে হবে, দেখো—"

"না মাইজি। আমার ডর লাগে। গরীবের ছেলে গরীবের মতো মানুষ হওয়াই ভালো। তোমার এখানে পুরি হালুয়া খেয়ে ওর চাল বেড়ে যাবে, তখন ও আমাদের পুছবে না! আমি ওকে আজই বাড়ি নিয়ে যাই।"

তনু এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। এই কথায় সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"না, খুদরুদা যাবে না—"

সমুন্দরি এক মুখ হাসিয়া দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিল "আবো খোখি, আব—"

"তুমি খুদরুদাকে নিয়ে যাবে না—"

"আমি যে ওর মা। ও আমার কাছে থাকবে না!"

"না! ও আমাদের কাছে থাকবে। ও আমাকে খরগোশ এনে দেবে বলেছে—"

"খরগোশ আমিই এনে দিব। আজুয়া স্টেশন মাস্টারজির বাড়ি থেকে একটা মেঙে (চেয়ে) এনেছে। আমাকে বড় দিক করে। সেইটেই তোমাকে দেব আমি—"

"তা দিও। খুদরুদা কিন্তু যাবে না। আমি যে ওর কাছে পাড়—'

"কি পড়—"

"অ আ ক খ—"

ভগবতী বলিলেন, "ওদের পড়াবার জন্যে ভুতনাথবাবু আসেন। ওরা কিন্তু খুদরুর কাছে পড়তেই ভালোবাসে। দিনরাত তো ওর সঙ্গেই আছে—"

সমুদ্দারি অনুভব করিল এখানে আর অধিক সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাহাকে গোলাতে গিয়া এখন অনেক 'গহুম' ফটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হইবে। এ বিষয়ে বোঝা-পড়া করিতে হইলে অধিকলালের সহিতই কথাবার্তা বলা উচিত।

"খুদরুবা কোথা?"

"লাইব্রেরিতে আছে বোধহয়। আজ তো ছুটির দিন। ওইখানেই আছে—"

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুইটি চরণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিল সে।

ডাকে বার বার ডাকে
শোন রে, দুয়ারে দুয়ারে, আঁধারে আলোকে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু অর্থটা তো খুব সরল নয়। আঁধারে আলোকে, দুয়ারে দুয়ারে,—বার বার কে ডাকিতেছে? কেন ডাকিতেছে? সে ডাকের ভাষা কি? তাহা কি কান দিয়া শোনা যায়? কই সে তো শুনিতে পায় না। অথচ ইহাও সে অনুভব করে একটা অবিশ্রান্ত আহ্বান তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জরন করিয়া ফিরিতেছে। সে আহ্বান কাহার, কি করিয়া সে আহ্বানে সে সাড়া দিবে এই দুরূহ সমস্যায় সে যখন নিমগ্ন তখন আর একটা কবিতার দুইটা লাইন তাহার চোখে পড়িল:

আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

আরও সব গোলমাল হইয়া গেল যেন। আপন হ'তে বাহির হওয়া যায় নাকি! গেলেও বাহিরে দাঁড়ানো কি সম্ভব? এ সবের কোনও সদুত্তর তাহার মাথায় আসিতেছিল না। কিন্তু ইহাও সে অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না যে তাহার মনের নেপথ্যলোকে অস্পষ্টভাবে কি যেন একটা রূপ-পরিগ্রহ করিবার আকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। আরও একটা গান চোখে পড়িল—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

এ সবের অর্থ কি? অর্থ যে আছে তাহা তাহার অন্তর্যামী আভাসে অনুভব করিতেছে। কিন্তু—।

"খুদরু—।"

দ্বারপ্রান্তে সমুদ্দারি আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া অধিকলাল হতভম্ব হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

"খুদরুবা—"

গীতবিতান আলমারিতে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল অধিকলাল।

"কি বলছ—"

"তোমার ব্যাপার কি? তুমি দিনরাত এখানে পড়ে আছ কেন?"

"এখানে আমি নোকরি করি।"

"নোকরি কর? 'তলব' কত?"

"তলব টাকায় পাই না। কিন্তু এমন একটা ভালো ঘর পেয়েছি পড়াশোনা করবার জন্য। মাইজি খেতেও দেন। এটাই কি কম?"

"এতে আমাদের কি 'নাফা'। রামদাসের বেটা ভুট্টা রোজ জাহাজঘাটে কুলিগিরি করে মায়ের হাতে নগদ পয়সা এনে দেয় কোনদিন এক টাকা কোনদিন দেড় টাকা।"

"আমি সে সব পারব না। রামগোবিনের পায়ে তেল দিয়ে কুলিগিরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তুমি কি করবে তাহলে—"

"আমি পড়ব।"

"পড়বে? পড়ে তোমার কি 'পুছড়ি' (ল্যাজ) বেরুবে, না দশটা হাত গজাবে?"

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টিতে একটা কুৎসিত ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। অধিকলাল কোন উত্তর দিল না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। হিংস্র দৃষ্টিতে সমুন্দরি চাহিয়া রহিল সেই বন্ধ দ্বারের দিকে। তাহার পর আগাইয়া গিয়া কপাটে দুম দুম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

"কপাট খুলবি কি না—"

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কপাটে আরও কয়েকবার ধাক্কা মারিল সমুন্দরি। কিন্তু বন্ধদ্বার খুলিল না। যদি খুলিত সমুন্দরি দেখিতে পাইত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অধিকলাল কাঁদিতেছে।

॥ ৫ ॥

কয়েকদিন পরে রামগোবিন শাস্ত্রী আসিয়া তপনবাবুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রামগোবিন যখন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে চাকরি করিত তখন দরকার পড়িলে (অর্থাৎ হকরু অন্তর্ধান করিলে) তপনবাবুর বাড়িতেও তাহাকে চাকরের কাজ করিতে হইত। এখন ব্যবসায় করিয়া সে প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছে কিন্তু সে যে একদিন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ করিয়াছিল একথা সে ভোলে নাই। ইহাও সে মনে মনে সন্দেহ করিত যে তাহার এই ব্যবসায়ের ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত তাহা আর কেহ না জানুন ডাক্তারবাবু জানেন। তিনি এ অঞ্চলে অনেকদিন হইতে ডাক্তারি করিতেছেন, সকলের সহিতই তাহার পরিচয় আছে, এখানকার স্টেশন মাস্টার, দারোগা, পোস্টমাস্টর, জমিদারের আমলারা সকলেই তাঁহার পরিচিত। সুতরাং রামগোবিনের আঙুল ফুলিয়া কলা-গাছ-হওয়ার রহস্যটা নিশ্চয়ই তাহার অবিদিত নাই। তাছাড়া রামগোবিনও বহুভাবে তাঁহার নিকট উপকৃত। এখনও তিনি বিনা পয়সায় তাহার চিকিৎসা করেন। এই সব কারণে রামগোবিন যখনই তপনবাবুর নিকটে আসে তখনই তাহার চোখে-মুখে একটা ভিজা-বিড়াল গোছ ভাব ফুটিয়া ওঠে।

সে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তপনবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি শাস্ত্রীজি, খবর কি তোমার। ব্যবসাপত্তর ভালো চলছে তো?"

"হাঁ হুজুর। আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম।"

"অনেকদিন পরে এসেছ আজকে। কোনও দরকার আছে না কি?"

"জি হুজুর। ওই খুদরুবার ওয়াস্তে (জন্যে) এসেছি। ওর মা—রংলালের জেনানি সমুন্দরি—বড় হাল্লা মাচাচ্ছে—"

"কেন, কি ব্যাপার?"

"খুদরুবা খুব তেজ লেড়কা। ওর কাছে আমি অছ্ছর (অক্ষর) শিখেছি। ওকে আমি গুরুজি বলি। তাই আমি সমুন্দরিকে বলেছিলাম ও যদি আমার ছেলে যোগী-নাথকে পড়ায় তাহলে ওকেআমি মাসে পন্দ্রহ (পনের) রুপিয়া কোরে তলব দিব। সমুন্দরি তখন বললে ও আপনার ছেলেমেয়েকে নাকি পড়ায়—তখন আমি বললাম—তাহলে আমি ওর ভিতর পড়ব না—"

তপনবাবু বলিলেন, "না, খুদরু তো আমার ছেলেমেয়েকে পড়ায় না। ভুতনাথ-বাবু ওদের পড়ান। তিনি খুদরুকেও পড়িয়ে দেন—"

"তাহলে খুদরুকে আমি বহাল করতে পারি কি?"

"খুদরু যাবে না। সে পড়তে চায়—"

"আপনার বাড়িতে থাকে কেন?"

"একদিন এসে আমাকে বললে আমার পড়বার জায়গা নেই বাড়িতে, তাই আমি গাছতলায় বসে পড়ছিলাম, নখু আর তনু আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি তখন বললাম বেশ তুমি এখানেই থাক, আমার লাইব্রেরি ঘরটা খালি পড়ে থাকে সেইটেকেই তুমি তোমার পড়ার ঘর কর। সেই থেকেই ও আছে এখানে। নখুর মা ওকে খেতে টেতেও দেয় তাই আর বাড়ি যাওয়ার দরকার করে না ওর।"

রামগোবিন হাতজোড় করিয়া চোখ বুজিয়া শুনিল সব। তাহার পর বলিল—"আপনি হুজুর মহাত্মা লোক, বড়া আদমী। আমরা সব 'মুরুখ্' (মূর্খ)—তবু একঠো বাত আপনাকে বলছি। দুব্রি (দূর্বা) কখনও পিপর (বট) হবে না। খুদরু হচ্ছে দুব্রির জাত তাকে পিপর করবার চেষ্টা করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। দুব্রি দুব্রিই থাকবে কভি (কখনও) পিপর হোবে না। আপনি ওকে ছোড়িয়ে (ছেড়ে) দিন।"

তপনবাবু হাসিয়া বললেন,—"আমি তো ওকে জোর করে ধরে রাখিনি। ও নিজেই এসেছিল, আমি ওকে থাকতে দিয়েছি। এখন বলতে পারি না তুমি চলে যাও। ছেলেটি সব দিক থেকেই ভালো। ওর সঙ্গে অভদ্রতা করব কি করে? ও নিজে যদি চলে যায় আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দিতে পারব না আমি। দুব্রি আর পিপরের যে উপমাটা তুমি দিলে মানুষের বেলায় তা খাটে না। মানুষের বেলায় অনেক 'দুব্রি' 'পিপর' হয়েছে এ কথা অনেকেই জানে। তোমার কথাই ধর না, তুমিও তো দুব্রি ছিলে, এখন কত বড় হয়েছ। যদি লেখাপড়া জানতে আরও বড় হ'তে। আমার বিশ্বাস খুদরু অনেক বড় হবে—"

রামগোবিন হাত জোড় করিয়া নীরব রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"আর একটা 'বাত' আছে ডাক্তারবাবু। ও দিনরাত এখানে পড়ে থাকে, মা বাপের কাছে একবারও যায় না। ওর মায়ের বুকে বড় 'চোট্' লাগে এজন্য। হাজার হোক ছেলে তো—"

"আচ্ছা, আমি ওকে বলে দেব মায়ের কাছে রোজ যেন যায়। আসল কথা কি জান রামগোবিন, এসব জিনিস জোর জবরদস্তি করে হয় না, মায়ের কাছে ছেলে যাচ্ছে না, এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, কারণটা কি তা আমরা জানি না, অনেক সময় বাইরে থেকে সেটা বোঝাও যায় না, কিন্তু কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, আমি ওকে বলে দেব, মায়ের কাছে যেন ও যায়।"

রামগোবিন দেখিল ডাক্তারবাবু যাহা বলিতেছেন তাহা 'ওয়াজিব', সুতরাং যুক্তি দিয়া তাহা খণ্ডন করা যাইবে না। আর একটা কথা তাহার মনে হইল, সেইটাই বলিল সে।

"খুদরু লেখাপড়া শিখলে হয়তো বড় হবে। কিন্তু ওকে পড়াবে কে। কলেজের পাস না হলে তো 'উঁচা-দরজার কাম' পাবে না। কিন্তু ও রংলালের ছেলে, ওকে পড়াবে কে বলুন ?"

"ভালো ছেলেরা অনেক সময় 'জলপানি' পায়, অনেক সময় তাদের মাইনেও মাপ হয়ে যায়। এর উপর কেউ যদি সামান্য কিছু খরচ করে ওকে সাহায্য করে তাহলেই হ'য়ে যাবে—"

"কিন্তু কে করবে, সেই তো মুশকিল—"

"রংলাল তোমার বন্ধু, এখন তোমার গোলায় চাকরি করে, ভগবানের দয়ায় তোমার ব্যবসাও ভালো চলছে, তুমিই ইচ্ছে করলে ওকে সাহায্য করতে পার। এই ভালো কাজটি করলে ভগবান তোমার ভালো করবেন, খুদরুও চিরকাল তোমার গুণ গাইবে, সুযোগ পেলে তোমাকে সাহায্যও করবে—"

রামগোবিন যদিও বলিয়া উঠিল, "ই তো ঠিক বাত, ই তো ঠিক বাত"—কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একটু বেকায়দায় পড়িয়া গেল।

তপনবাবু বলিলেন—"দেখো রামগোবিন, ভগবান কাকে যে কখন কিভাবে সাহায্য করেন তা আমরা বলতে পারি না। তাই খুদরুকে পরে কে পড়াবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই এখন। ও এখান থেকে পরীক্ষাটা তো আগে পাস করুক, তারপর দেখা যাবে।"

রামগোবিনকে এ কথাতেও সায় দিতে হইল। ইহার পর কিন্তু সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। ডাক্তারবাবু আবার তাহাকে কি প্যাঁচে ফেলিয়া দিবেন কে জানে। রংলালের ব্যাটা খুদরুবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিতে হইলেই তো হইয়াছে! অথচ ইহাও সে মনে মনে জানে যে ডাক্তারবাবু যদি জিদ ধরিয়া বসেন তাহাকে দিতেই হইবে। ডাক্তারবাবুর কথা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার নাই।

ডাক্তারবাবুর কথায় খুদরু তাহার পর দিনই সকালে তাহার মায়ের সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল তাহার মা ছাতু পিষিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মা যে ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিল সে ভাষায় সে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত। এই তীক্ষ্ন ছেকা-ছিনি ভাষা গালাগালিতে শ্লেষে ব্যঙ্গে অতিশয় সমৃদ্ধ। সমুন্দরি অধিকলালের দিকে একনজর চাহিয়া দেখিল তাহার পর শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"কি রে বড়া আদমীর কুত্তা। এখানে এসেছিস কেন। 'লাত' (লাথি) মেরে তাড়িয়ে দিলে না কি—।"

যে সমাজে তাহার জন্ম সে সমাজে এই ধরনের ভাষাতেই সকলে কথা কয়।

অধিকলাল এ ধরনের ভাষা অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। আজ সে সহসা বিস্মিত হইল। আজ সে সহসা উপলব্ধি করিল তাহার এবং তাহার মায়ের মাঝখানে একটা দুস্তর নদী যেন বহিয়া চলিয়াছে। সে নদী পার হওয়া শক্ত, পার হইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। এই কয়দিনে শুধু তাহার বাহিরের চেহারা নয়, মনের চেহারাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ভগবতী তাহাকে আলাদা একটি সাবান দিয়াছেন, চিরুনিও দিয়াছেন। তাহাকে রোজ নিজের জামা-কাপড়ে সাবান দিতে হয়, মাথা আঁচড়াইয়া মাথা পরিষ্কার করিতে হয়। নিজেই তিনি একদিন তাহার মাথা আঁচড়াইয়া উকুন বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—দেখ, তোর মাথায় কত 'ঢিলা' (উকুন) আছে। রোজ যদি ভালো করে আঁচড়াস সব চলে যাবে। তাহাদের সকলের মাথাতেই 'ঢিলা' আছে এ কথা সে জানে, তাহার মা-ও জানে, কিন্তু তাহার মা ইহা লইয়া কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করে নাই। মাঝে মাঝে তাহার মা তাহার বোনদের এবং ছোট ভাইটাকে লইয়া পড়ে, তাহাদের মাথা হইতে 'ঢিলা' 'চুনিয়া' সেগুলি পুটপুট মারিয়া ফেলে। সে যখন ছোট ছিল তখন তাহারও মাথা হইতে সমুন্দরি ঢিলা বাছিয়াছে। কালুয়ার মায়ের সহিত পরনিন্দা এবং পরচর্চা করিতে করিতে এই ধরনের অবসর-বিনোদনের বহু চিত্র তাহার মনে আঁকা আছে। কিন্তু ইহার সহিত ভগবতী দেবীর স-স্নেহ সভ্য আচরণের তফাৎ যে কতটা—টুকটুকে লাল যে সরু চিরুনিটি তিনি তাহাকে দিয়াছেন তাহার পিছনে বর্ণবহুল যে সংস্কৃতির আভাস সে দেখিতে পাইয়াছে—তাহার মূল্য যে কি তাহা সে বুঝিতে ভুল করে নাই। কিন্তু তবু—। হ্যাঁ, তবু। ডাক্তারবাবুর কথাগুলি তাহার মনে পড়িল—'তবু ওই তোমার মা। ওর মনে কষ্ট দিলে তোমার পাপ হইবে। মায়ের আশীর্বাদ না পাইলে জীবনে বড় হইতে পারিবে না। মা-বাবাবে খুশী রাখিতে হইবে। আমার এখানে থাকিয়া তুমি লেখাপড়া কর। আমার এখানে খাওয়া-দাওয়াও কর। কিন্তু মা-বাবার মনে দুঃখ দিও না। তুমি রোজ সকালে গিয়া মা-বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিবে। মা যাহা খাইতে দিবে তাহা খাইবে। লোকে যেন না মনে করে আমি তোমার মা-বাবার নিকট হইতে তোমাকে ছিনাইয়া আনিয়াছি। তাহা করিবার মোটেই ইচ্ছা নাই আমার। সন্তানকে মা-বাবার নিকট হইতে কাড়িয়া আনিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না। তুমি বড় হও, কিন্তু মা-বাবার সহিত সংস্রব ছিন্ন করিও না।'

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

"ই কি ঢং ছে—।" (এ আবার কি ঢং।) সমুন্দরি অবাক হইয়া তাহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রংলাল জাহাজ-ঘাটে কুলি খাটাইতেছিল। সে-ও অবাক হইয়া গেল যখন অধিকলাল তাহাকে প্রণাম করিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। তাহার মনে হইল—এ কি ব্যাপার ! ছেলেটার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি।

॥ ৬ ॥

পৃথিবীতে সব অনিবার্য ঘটনাকে মানুষ শেষ পর্যন্ত মানিয়া লয়। ভূমিকম্প, ঝড় বা বন্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই ইহা সবাই জানে। গভীর শোকও মানুষ সহ্য করে। আমরা প্রথম প্রথম কষ্টে কাতর হই বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কষ্টের তীক্ষ্নতা কমিয়া আসে। অধিকলালের সহিত যখন তাহার মা-বাবার সম্বন্ধ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া আসিতে লাগিল, যখন তাহারা বুঝিল যে অধিকলাল কিছুতেই তাহাদের মতো আর জনমজুরি কামাইবে না, সে 'বাবুভেইয়া'দের দলে গিয়া মিশিয়াছে, 'অংরেজি' শিখিয়া হাকিম বনিবার ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আর এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর মতো লোক যখন তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন —তখন ব্যাপারটাকে তাহারা মানিয়াই লইল। রংলাল ভাবিল অধিকলাল যদি মরিয়াই যাইত, (ছোটনের অত বড় ছেলেটা তো মাঠে গরু চরাইতে গিয়া সাপের কামড়ে মারা গেল,) কিংবা যদি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত (বিশুর বড় ব্যাটা ঘিসু একটা আড়িকাঠির পাল্লায় পড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না)— এসব হইলে কি করিত সে ? কিছুই করিত না। এখন বরং অধিকলালকে সে চোখের সামনে দেখিতে পায়। প্রণাম করিবার জন্য কাছেও আসে একবার।

এই প্রণাম রহস্যটা সে সমাধান করিয়াছে। অবশেষে ডাক্তারবাবুর আদেশেই অধিকলাল রোজ প্রণাম করিতে আসে। ইহাতে ডাক্তারবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। সমুন্দরির মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ। সে দ্বিতীয় দিনই অধিকলালকে এক ধমকে ভাগাইয়া দিয়াছিল। ওসব ঢং তাহার ভালো লাগে না। নিজের ছেলে পর হইয়া গিয়া এখন 'পরনামের' ভড়ং করিতে আসিয়াছে। অধিকলাল কিন্তু অত সহজে ভাগে নাই। বরং সে একটা মজা পাইয়া গিয়াছিল যেন। সে রোজ উঠানে ঢুকিয়া দূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলে "পরনাম মাই—"। সঙ্গে সঙ্গে সমুন্দরি মুখে গালির তুবড়ি ছুটাইয়া তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে না। সে যখন নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় তখন সমুন্দরির মুখেও একটা হাসি ফোটে। এমন কি সে রোজ মনে মনে প্রতীক্ষাও করে খুদরুবা প্রণামের ঢং করিতে কখন আসিবে।

মোট কথা খুদরুবা যে তাহাদের ছাড়িয়া তপনবাবুর বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছে, তাহার চাল-চলন কথা-বার্তা 'রহন-সহন' এমন কি চেহারাটাও যে বাঙালীবাবুদের মতো হইয়া গিয়াছে এই সত্যটা সমুন্দরির কাছে প্রথমটা যত মর্মান্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল. এখন ততটা মর্মান্তিক আর নাই। রংলালের নিকট কোনদিনই ইহা ততটা দুঃখদায়ক ছিল না। সে সরল মানুষ। সে বুঝিয়া লইয়াছিল ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য করেন। খুদরুর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। ডাক্তারবাবুর মতো লোকের নজরে যখন সে পড়িয়াছে তখন ভালোই হইবে আশা করা যায়।

খুদরুবা নিশ্চিন্ত চিত্তে পড়াশোনায় মন দিল। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাহাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবসর পাইলেই সে রবীন্দ্রনাথের বই লইয়া বসিত। সেদিন সে তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল ঃ

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলাসরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ-হৃদয়-হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলুকুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মানিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।

সব কথার অর্থ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। কিন্তু ছন্দের সুরে সে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দায় ধুপধাপ শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তাহার সুর কাটিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলিয়া এবং তিলিয়া—তাহার দুই বোন—দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উঁকি দিল।

"তোরা কি করছিস এখানে—"

খুদরু বাহির হইয়া আসিল। দেখিল সুলিয়া আর তিলিয়া তনুর দুইটি পুরাতন ফ্রক গায়ে দিয়াছে। অদূরে আজুয়াও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার গায়ে নথুর একটি পুরাতন কামিজ। তিলিয়া একমুখ হাসিয়া তাহার ফ্রকটি দেখাইয়া বলিল—"মাইজি দেলকে।" একটু পরে সমুন্দরিও বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—"চল্, ঘর চল্।" খুদরুর কান দুইটি গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমুন্দরির দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি মাইজির কাছে ভিখ মাংতে এসেছিলে নাকি!" সমুন্দরি ছেকাছোনি ভাষায় যে জবাব দিল তাহা বেশ ঝাঁঝালো। তাহার মর্ম—'আমার সমর্থ ছেলে আমাদের দিকে ফিরে তাকায় না। বড়লোকের দেওয়া কাপড় জামা পরে, বড়লোকের বাড়িতে থেকে অংরেজি পড়ছে, নিজের আখের দেখছে, আমাদের দিকে, নিজের ভাই-বোনদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমার কপাল পোড়া, তাই আমাকে 'ভিখমাংনি' (ভিখারিনী) হতে হয়েছে—চল্, চল্—ঘর চল্—'

গরু ছাগলকে লোকে যেমন করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যায় সমুন্দরি তিলিয়া সুলিয়া এবং আজুয়াকে তেমনিভাবে তাড়াইয়া লইয়া গেল। যাইবার পূর্বে সে খুদরুর দিকে যে দৃষ্টি হানিয়া গেল তাহা অগ্নিগর্ভ। সে দৃষ্টির ভাষা কথায় অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু তাহা মর্মে গিয়া মর্মান্তিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা হইতেই সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছে—

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহু দূর দেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথ শেষে,
কোন দুঃখে কাঁদে প্রাণ? কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধ নেত্র মেলি? কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে?

* * *

মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দুধারে
গ্রহ-তারকার দীপ কাতারে কাতারে।

অদ্ভুত একটা আনন্দ পাইল সে। অদ্ভুত একটা বিস্ময়। সত্যই সে যেন পথের দুধারে গ্রহ-তারকার দীপালিকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

সেই বছরই অধিকলাল সসম্মানে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল সে। মাসিক চার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইল। তপনবাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন সে নাকি রেকর্ড মার্ক পাইয়াছে। তপনবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। তিনি এই উপলক্ষে স্কুলে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় গ্রামের গণ্যমান্য সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বিশেষ লোক সমাগম নাই। রামগোবিনের চাকর রংলালের পুত্র অধিকলালকে অভিনন্দিত করিতে কেহ ব্যগ্র নহে। যাহাদের আমরা ছোটলোক বলি তাহারাই আসিয়াছিল বেশী। অধিকলালের জাত-ভাইরাই পাড়া ঝাঁটাইয়া আসিয়াছিল এবং মাটির উপর আসিয়া বসিয়াছিল। চেয়ারগুলি সব প্রায় খালিই পড়িয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকগণ অবশ্য ছিলেন। তপনবাবু আশা করিয়াছিলেন রামগোবিন অন্ততঃ আসিবে। কিন্তু সেও আসে নাই। ডাক্তারবাবু অধিকলালকে কিছু বাংলা এবং কিছু ইংরেজি বই উপহার দিলেন। বাংলা বইগুলি সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের বই। অধিকলাল যে রবীন্দ্রনাথের বই পড়িতে ভালোবাসে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকরাও সকলে অধিকলালের খুব প্রশংসা করিলেন। ডাক্তারবাবু পরিশেষে যাহা বলিলেন তাহাতে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। তিনি গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমাদের অধিকলাল তোমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু সে গরীবের ছেলে, বেশী দূর পড়িবার সঙ্গতি তাহার নাই, গ্রামের লোকেদের উচিত তাহার পড়ার ব্যবস্থা করা। আপনারা সকলে যদি চাঁদা করিয়া তাহার নামে পোস্টাফিসে কিছু টাকা জমা করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভালো হয়। আমি নিজে একশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সকলেই উসখুস করিতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ দুই টাকা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তপনবাবু নিজের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া একটি মালাও গাঁথিয়া অধিকলালকে উপহার দিয়াছিলেন। মালাটি গাঁথিয়াছিল তনু। সেই মালাটি পরিয়া এবং বইগুলি লইয়া সভার একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল অধিকলাল। সে সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমুন্দরির কাছে চলিয়া গেল। সমুন্দরি পিছনে ভিড়ের মধ্যে মাটিতে বসিয়াছিল। অধিকলাল সেখানে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া গলার ফুলের মালা এবং বইগুলি তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—মা, এই লে। হমু আর নেহি পঢ়বো। হামরা ওয়াস্তে কাম খোজু। তাহার পর সভার ভিতর আসিয়া ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তা কেউ করেনি। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। তবে আমি একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি, ভিক্ষার টাকা দিয়ে আমি পড়ব না। আমি রোজগার করতে আরম্ভ করব, যদি কিছু জমাতে পারি,

তাহলেই পড়ব আবার। আমার মা বাবা যদি আমাকে পড়াতেন তাহলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাঁরা গরীব, তাঁরা—"

হঠাৎ অধিকলালের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না। টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

॥ ৭ ॥

খুদরু ভোরে সোজা জাহাজঘাটে গিয়া রামগোবিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি আর পড়ব না, আমাকে কোনও কাজ দিন।"

"আমি আগেই জানতাম পড়াশোনা করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। বেশ, তুমি যোগীনাথকে পড়াও। পনর টাকা মাইনে দেব—"

"ও কাজ আমি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন। আপনার কামতের কাজ—"

"কামতে অন্য লোক আছে। কুলির কাজ তুমি করতে পারবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থেকে তুমি 'বাবু' হয়ে গেছ। ভারি ভারি মাল বওয়া তোমার কর্ম নয়। অন্য কি কাজ দেব তোমাকে?"

জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িয়াছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল অনেক। খুদরু সেই দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সে একটি প্যাসেঞ্জারের স্যুটকেস ও বিছানা মাথায় লইয়া আসিতেছে। রামগোবিন পাগড়ি পরিয়া ট্রেনের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। খুদরুকে দেখিয়া সে হাত উলটাইয়া বলিল—"ই ছোকরাকা দিমাক (মাথা) খারাব হো গিয়া মালুম হোতা হ্যায়—রে খুদরুবা শুন শুন ইধর শুন—"

খুদরু কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। একজন প্যাসেঞ্জারের মাল ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আবার জাহাজের দিকে ছুটিল সে।

হঠাৎ রামগোবিনের নজরে পড়িল সমুন্দরি কিছু ছাতু এবং মুড়ির মোয়া লইয়া স্টেশনের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে—'সাত্তু সাত্তু বুটকা সাত্তু—লাড্ডু লাড্ডু মুড়িকে লাড্ডু'। সমুন্দরি মাঝে মাঝে স্টেশনের ধারে বসিয়া নিজের হাতে-পেষা ছাতু এবং নিজের হাতের তৈরী মোয়া বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা উপার্জন করে।

রামগোবিন তাহার দিকে আগাইয়া বলিল, "তোর ব্যাটার কাণ্ড দেখেছিস। কুলিগিরি করছে। ওই দেখ—"

সমুন্দরি দেখিল খুদরুবা প্রকাণ্ড একটা বিছানা ঘাড়ে বহিয়া আনিতেছে। হাতে একটা প্রকাণ্ড টিফিন কেরিয়ার। বিছানার ভারে ঘাড়টা বাঁকিয়া পড়িয়াছে বেচারার। কতই বা বয়স। মাত্র চোদ্দ বৎসর।

রামগোবিন টিপ্পনী কাটিল একটা। অন্য উপমা ব্যবহার করিল এবার। তপনবাবুকে 'দুবরি' এবং 'পিপর' গাছের কথা বলিয়াছিল সমুন্দরিকে বলিল, " 'শিয়ার' (শৃগাল) কভি 'সিং' (সিংহ) নেহি হোগা—ই তো হাম্ পহলেই কহা থা—।" (শৃগাল কখনও সিংহ হবে না, এ তো আমি আগেই বলেছিলাম—)।

সমুন্দরি এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সোজা খুদরুবার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘাড় হইতে বিছানাটা এক ঝটকায় নীচে ফেলিয়া দিল "ছোড় ই সব। ঘর যো—"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোক পিছনেই ছিলেন, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেই সমুন্দরি তাঁহাকেও এক ধমক দিল। "ছোটা বুতরুকা (বাচ্চার) শিরপর কোন আকিল সে এতনা বড়া বোঝা লাদ দিয়া বাবু!" তাহার পর নিজেই সে বিছানাটা কাঁধে করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। টিফিন কেরিয়ারটা লইয়া খুদরুবা গাড়িতে উঠিয়াছিল। সেটাও তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আবার বলিল—যো তু ঘর যো! খুদরুবা নামিয়া গেল। প্যাসেঞ্জারবাবুটি চার আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সমুন্দরি। চার আনা পয়সা! অত ভারি বোঝার জন্য মোটে চার আনা।

"ওর সঙ্গে তো চার আনাই কড়ার হয়েছিল—"

"ও তো বুতরু। ও কি জানে। ও লিখাপাড়ি জানে। ও কি কুলির কাম কোনও দিন করিয়েসে?"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে বাঙালী দেখিয়া সমুন্দরি বাংলা ভাষাতেই কথা বলা সংগত মনে করিল।

"ছ আনা পয়সা লাগবে বাবু। ওহি রেট—"

খুদরুবা নীচে হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল যে সে চার আনা পয়সাতেই রাজী হইয়াছিল।

"চুপ র—"

এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিল সমুন্দরি।

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে শেষে ছ আনাই দিতে হইল। পয়সাটি নিজের আঁচলে গিঁট দিয়া বাঁধিয়া সমুন্দরি ট্রেন হইতে নীচে নামিল। খুদরুবা তখনও ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

"কুছ খাইলো হে?"

(কিছু খেয়েছিস?)

খুদরুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল কিছু খায় নাই। বলিল সে খুব ভোরে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মাইজির তখনও ঘুম ভাঙে নাই। সমুন্দরি তখন দুইটি মুড়ির লাড়ু আনিয়া তাহার হাতে দিল।

"খো। অব ঘর যা—"

খুদরুবা কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, আর পড়িবে না, সে গরীব, পড়িতে হইলে যে পয়সা চাই সে পয়সা সে ভিক্ষা করিয়া আহরণ করিবে না। সুতরাং আজ হইতেই সে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। সমুন্দরির দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

"হাম কহৈছি, তু ঘর যো—"

(আমি বলছি তুই বাড়ি যা)

খুদরুবা তবু দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিবে না সে। তাহার লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে।

"কোন চিজ কে লাজ ?"

(কিসের জন্য লজ্জা ?)

খুদরুবা কোনও উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার চক্ষু দুইটি আবার সজল হইয়া আসিল। সমুন্দরি নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর গালে হাত দিয়া বলিল—"দেখো, তামাসা দেখো, কি ভেলে তোরা ?" (দেখ কাণ্ডখানা। কি হল তোর ?) খুদরুবা সহসা মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিল। দেখিতে দেখিতে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে হারাইয়া গেল সে। সমুন্দরি হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ছাতুর টুকরিটা মাথায় তুলিয়া সেও বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। আবার তাহার দেখা হইল রামগোবিনের সঙ্গে। রামগোবিন খুদরুবাকে ভিড়ের মধ্যে দ্রুতপদে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহার মনে হইয়াছিল ছোকরা রণে ভঙ্গ দিয়া বুঝি পলায়ন করিতেছে, হুঃ হুঃ কুলিগিরি করা অত সহজ নয়। সমুন্দরিকে দেখিয়া সে বলিল, "শিয়ারোয়া উধর ভাগলো। ফের আইতে। বন্‌কা গিদড় ভাগে কা কিধর—"

(শিয়ালটা ওই দিকে পালাল। ফের আসিবে। বনের শিয়াল যাবে কোথা)।

সমুন্দরির চক্ষু দুইটি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শিয়ার শিয়ার কাহে করৈছ। উ সিং হোতে, দেখিও।"

(শিয়াল শিয়াল করছ কেন। ও সিংহই হবে দেখো) সমুন্দরি হনহন করিয়া চলিয়া গেল। রামগোবিন থতমত খাইয়া গেল একটু। সে ধনী হইয়াছে বটে কিন্তু মজুরনী সমুন্দরিকে সে ভয় করে। মানুষ তো নয়, যেন একটা ইন্‌জিন্।

খুদরুবা জাহাজঘাট হইতে গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া পথে পথে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার খুব ইচ্ছা করিতেছিল আবার সে তাহার লাইব্রেরি ঘরটিতে ফিরিয়া যায়, আবার রবীন্দ্রনাথের একখানা বই খুলিয়া বসে, আবার তনুকে তাহার পড়া বলিয়া দেয়, কিন্তু—হ্যাঁ ওই কিন্তুটাই তাহাকে যাইতে দিতেছে না। তাহার বার বার মনে হইতেছিল ও বাড়িতে যাইবার অধিকার তাহার আছে কি? ওখানে সে বেমানান। হঠাৎ হকরুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আরে খুদরুবা, চল, মাইজি বোলাইছে—"

(আরে খুদরুবা, চল, মাইজি ডাকছে)

খুদরুবা বলিতে পারিল না, আমি যাইব না। নীরবে হকরুর অনুসরণ করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল দারিদ্র্যের জন্য লজ্জা কি? দারিদ্র্য তো পাপ নয়। হঠাৎ তাহার আব্রাহাম্ লিংকনের জীবনী মনে পড়িল। কয়েকদিন আগেই লিংকনের জীবনী পড়িয়াছে সে। কি গভীর দুঃখের জীবন ছিল তাহার। সে তুলনায় তো সে রাজার হালে আছে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিতেই তনু ছুটিয়া আসিল। সে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ।

"খুদরুদা তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমরা চারদিকে তোমাকে খুঁজছি তখন থেকে। জান, মা আজ 'চপ' ভেজেছে। চল খাবে চল। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়। আর জান খুদরুদা, লাইব্রেরি ঘরের বারান্দায় শালিক বোধহয় বাসা

তৈরি করছে। দুটো শালিক খড়কুটো মুখে নিয়ে ওই জানলার উপরে দেওয়ালে যে ফাঁকটা আছে সেইখানে ঢুকছে। বাচ্চা হলে বেশ মজা হবে, না? আমাকে একটা খাচা এনে দিও, কেমন?"

অধিকলাল কোনও উত্তর দিতেছিল না, তনুর ইচ্ছা করিতেছিল তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিতে। কিন্তু তাহার মা অধিকলালের গায়ে হাত দিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। এসব বিষয়ে ভগবতী দেবীর খুব কড়া নজর।

একটু পরে নখুও আসিয়া হাজির হইল। সে ঘরের ভিতর ছিল।

"খুদরুদা কোথায় ছিলে তুমি—"

খুদরু একটু মুচকি হাসিল কোন উত্তর দিল না।

"বল না, ভোরে উঠেই কোথা গিয়েছিলে?"

খুদরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল—"আমি জাহাজঘাটে গিয়েছিলাম কাজ খুঁজতে। আমার পড়া তো শেষ হয়ে গেল, আর পড়া তো হবে না। তোমাদের বাড়িতে থেকে কি হবে আর—তাই—"

"তোমার পড়া হবে না কে বললে। বাবা বলেছেন সে ব্যবস্থা করবেন। তুমি সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়বে বোর্ডিংয়ে থেকে—চল না তুমি বাড়ির ভিতর—"

তনু শোরগোল তুলিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া চলিয়া গেল—"মা, খুদরুদা এসেছে। তুমি ওকে বকে দাও— ও বলছে আর পড়বে না।"

তপনবাবু তখনও কলে বাহির হইয়া যান নাই। তিনি খুদরুকে দেখিয়া বলিলেন—"কোথায় ছিলে তুমি সকাল থেকে? তুমি আজ বিকেলের ট্রেনেই সাহেবগঞ্জে চলে গিয়ে সেখানকার স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ভর্তি হয়ে যাও। সেখানকার হেডমাস্টারমশাই আমার চেনা লোক, তাঁর নামে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব—"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—"কিন্তু আমি বোর্ডিংয়ের খরচ তো চালাতে পারব না।"

"সে জন্যে তোমার ভাবনা কি, তার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আজই বিকেলে চলে যাও—"

অধিকলাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনার টাকায় আমি পড়ব না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন—"

আবার চুপ করিয়া গেল। ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আগাইয়া আসিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তোর হয়েছে কি বল দেখি। তুই এতদিন আমাদের কাছে রইলি, এতদিনেও তুই আমাদের আপনার লোক হলি না? তুই যদি আমার বড় ছেলে হতিস তাহলে কি তোকে আমরা পড়াতাম না? পয়সার অভাবে তোর মতন ভালো ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এ কখনও হতে পারে! মাসে দশ টাকা করে দিলেই তোর বোর্ডিংয়ের খরচ চলে যাবে। সে দশ টাকা কেউ না দেয় আমি দেব—"

অধিকলাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবতী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"মাইজি—"

উঠানের একপ্রান্তে সমুন্দরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ভগবতী দেবী বাহির হইয়া দেখিলেন সম‍ুন্দরি একটা ট্রাংক মাথায় বহিয়া আনিয়াছে।

"কি সম‍ুন্দরি ও ট্রাংক কার ?"

"হামার।"

সম‍ুন্দরি অতিকষ্টে ট্রাংকটা বারান্দার উপর নামাইল। তাহার পর অধিকলালের দিকে একটা অগ্নিদ‍ৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"ওই ছোঁড়াপ‍ুতাটা (ছোঁড়াটা) আজ জাহাজ-ঘাটে কুলির কাজ করতে গিয়েছিল। কাল আপনারা দশজনকে ডেকে ওকে কত খাতির করলেন, আজ সকালে ওর এই ব‍ুদ্ধি। বলছে আমি ভিখ মেঙে (ভিক্ষে করে) পড়ব না; আমি কুলিগিরি করব। জানেন মাইজি, কুত্তার দ‍ুম‍ু (কুকুরের লেজ) কখনও সিধা (সোজা) হয় না। মগর (কিন্তু) আমি ওকে সিধা করব। তাই এই "পেটারি" (ট্রাংক) ঢুয়ে (বয়ে) নিয়ে এসেছি। হামার 'যমানি উমার'(যৌবন কাল) থেকে 'যেতো' (যত) 'জেবর' (গহনা) গড়িয়েছি সব ওই পেটারির ভিতর আছে। হাজার ভরির কম হবে না। সব চাঁদির (র‍ুপার) জেবর। তাছাড়া আছে পাঁচশ টাকা নগদ। আমি 'সোভই' (সবই) ওই ছোঁড়াপ‍ুতার হাতে দিয়ে দিচ্ছি, কারো কাছে তোকে ভিখ মাংতে হোবে না, তুই কত পঢ়বি পঢ়।"

এই কথাগ‍ুলি বলিয়া সম‍ুন্দরি স্পর্ধাভরে অধিকলালের দিকে চাহিতে লাগিল।

ভগবতী দেবী বলিলেন, "সম‍ুন্দরি তোর যে এতো উঁচু মন তাতো জানতাম না। খ‍ুদর‍ু অত ভালো ছেলে, ওর পড়া বন্ধ করলে কি চলে ? ওর পড়বার ব্যবস্থা আমরাই করব। ও আজ সাহেবগঞ্জে চলে যাক—স্কুলে আর বোর্ডিংএ নাম লিখিয়ে আসুক—"

"আর আমার 'জেবর'।"

তপনবাব‍ু বলিলেন—"ওগ‍ুলো বিক্রি করে যা টাকা হবে তা অধিকলালের নামে ব্যাংকে জমা করে দেব। সেই টাকা থেকে ওর লেখাপড়া চলবে—"

ভগবতী অধিকলালকে বলিলেন—"চল, এখন খাবি চল। চপগ‍ুলো গরম করে দিই। সম‍ুন্দরি তুইও নিয়ে যা খানকয়েক তোর ছেলেমেয়েদের জন্য।"

সকলে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সম‍ুন্দরি গেল না। সে তাহার জেবরের পেটারি আগলাইয়া বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

অধিকলাল যেদিন সাহেবগঞ্জে আসিয়া বোর্ডিংয়ে ভরতি হইল, সেদিন তাহার সহিত তাহার বাবা রংলালও আসিয়াছিল। অধিকলালকে ডাক্তারবাবু জামা জুতা কোট কাপড় সবই কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে রংলালের ছেলে। অধিকলালের বাক্স বিছানা সে-ই স্টেশন হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে সাধারণ কুলি বলিয়াই মনে হইতেছিল। সে-ই যে অধিকলালের বাবা বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। কিন্তু বোর্ডিংয়ে আসিয়া বৈরিয়া গ্রামের তেওয়ারিজির পুত্র ভুপেশ্বর তেওয়ারির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ভুপেশ্বর তেওয়ারির বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারি একজন বড় কন্ট্রাক্টর। তিনি যখন মনিহারি অঞ্চলে একটি রেলোয়ে ব্রীজ প্রস্তুত করাইতেছিলেন তখন রংলাল তাঁহার অধীনে কুলির কাজ করিত। তাঁহার বাসনও মাজিয়া দিত। ভুপেশ্বর স্কুলে পড়িত তখন। অধিকলালের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। সে যখন পাশ করিয়া চলিয়া আসে তখন অধিকলাল স্কুলে ভরতিও হয় নাই। ভুপেশ্বর ভালো ছেলে ছিল না। স্কুলে প্রতি ক্লাসেই অনেকবার ফেল করিয়া তবে সে প্রমোশন পাইয়াছে। এখন সে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে। গতবারেও সে টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই, এবারেও পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। তাহার বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারি ধনী লোক। তিনি চারজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিয়াছেন, ছেলেকে ম্যাট্রিকুলেশনটা তিনি পাশ করাইবেনই। তাহার পর তাহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবেন। অনেক লোক রূপেশ্বরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ছেলেকে যখন শেষ পর্যন্ত ব্যবসাতেই ঢুকাইতে হইবে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করাইয়া লাভ কি হইবে। রূপেশ্বর বলিয়াছিলেন—লাভ কিছু হইবে না, লোকসানই হইবে। কিন্তু আমি কন্ট্রাক্টর মানুষ, যে কন্ট্রাক্টে হাত দিই তাহাতে লাভ লোকসান যাহাই হউক সেটাকে শেষ না করিয়া ছাড়ি না। ভুপেশ্বর রংলালকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

"কি রংলাল নাকি। তুমি আজকাল এইখানে কুলিগিরি করছ?"

"না, বাবুয়া। আমি আমার ছেলেকে ভরতি করাতে এসেছি এখানে। আমার ছেলে খুদরু জিলার মধ্যে পহেলা হ'য়ে জলপানি পেয়েছে।"

"কই তোমার ছেলে?—"

"এই যে। খুদরু তেওয়ারজিকে গোড় লাগ—"

অধিকলাল ভুপেশ্বর তেওয়ারিকে প্রণাম করিল কিন্তু তেওয়ারি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। রংলাল দোসাদের ছেলে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে! ওই দোসাদের ছেলেটা এখন হইতে তাহাদের সহিত এই বোর্ডিংয়ে থাকিবে না কি!

অধিকলালের জিনিসপত্র (একটা বাক্স এবং বিছানা) তাহার নির্দিষ্ট ঘরটিতে

রাখিয়া রংলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে অধিকলালের কি সর্বনাশ যে করিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুপেশ্বর বোর্ডিংয়ে প্রচার করিয়া দিল যে অধিকলাল দোসাদের ছেলে। তাহার বাবা রংলাল তাহাদেরই বাড়িতে একদিন বাসন মাজিয়াছে।

অধিকলাল যে ঘরে 'সীট' পাইয়াছিল সেটি ফোর সীটেড রুম। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনটি বিছানায় তিন জন বসিয়া আছে—যোগেন সা, বিলটু ঝা এবং জ্ঞান বসাক। তিন জনেই তাহার সমবয়সী। ইহারাও বাহির হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত একই ক্লাসে পড়িবে। অধিকলালও নিজের বিছানাটি চৌকির উপর পাতিয়া লইল।

"তুমি কি নতুন ভরতি হলে না কি—"

"হ্যাঁ—"

"কি নাম তোমার ?"

"অধিকলাল পাসমান।"

যোগেন সা-ই প্রশ্ন করিতেছিল।

বিলটু ঝা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"পাসমান ? পাসমান তো দোসাদ। তুমি কোন জাত ?"

"আমিও দোসাদ।"

জ্ঞান বসাক বলিল—"তুমি কোন স্কুল থেকে এসেছ ?"

"মনিহারি স্কুল থেকে—"

"মনিহারি স্কুল তো এবার পূর্ণিয়া জেলায় ফার্স্ট হয়েছে। তুমি কি সেই ফার্স্ট বয় না কি ?"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেট মহিম সেন প্রবেশ করিলেন। তিনি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। বোর্ডিংয়েই থাকেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"অধিকলাল, তুমি তোমার 'সীট' পেয়েছ তো ? বাঃ। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় আমাকে গিয়ে বোলো, আমি নীচে কোণের ঘরটায় থাকি।"

তাহার পর অন্য ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"অধিকলাল পূর্ণিয়া জেলার ফার্স্ট বয়, আশা করি শুনেছ তোমরা। সবাই তোমরা মিলে মিশে ভালোভাবে পড়া-শোনা কর। আমি জানি আজকালকার ছেলেরা সবাই ভালো। বাঃ—"

'বাঃ' বলাটা মহিম সেনের একটি মুদ্রাদোষ। সকলে আড়ালে তাঁহাকে 'বাঃ-মাস্টার' বলে। মহিম সেন চলিয়া যাইবার পর জ্ঞান বসাক বলিল—"একটা অংক পারছি না ভাই। থার্ড মাস্টার হোম টাসক্ দিয়েছেন, অংক করে না নিয়ে গেলে মারবেন—অথচ এই অংকটা কিছুতেই হচ্ছে না—"

"দেখি —"

অধিকলাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অংকটা দেখিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"হ্যাঁ, হয়ে যাবে।"

পাটিগণিতের শক্ত অংকটা অধিকলাল দশ মিনিটের মধ্যেই করিয়া দিল।

বিলটু ঝা বলিল—"আমারও দুটো অংক করে দাও তাহলে। থার্ড মাস্টার বড় 'মারখুনডা'। অঙ্ক ঠিক না হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়।"

অধিকলাল তাহার অংক দুইটিও কষিয়া দিল। বিলটু ঝা-ও অবাক হইল। কিন্তু সে যাহা বলিল, তাহাতে বিস্ময়ের বা কৃতজ্ঞতার সুর ফুটিল না। বলিল, "ভাই অধিকলাল, তুমি আমাদের ঘরে এসেছ এতে আমাদের পড়াশোনার খুব সুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের 'জাত'টা মেরো না ভাই। আমাদের খাবার টাবার যেন ছুঁয়ে দিও না, গাঁয়ের লোকে যদি শোনে আমরা দোসাদের ছোঁয়া খেয়েছি তাহলে আমাদের জাতে ঠেলে দেবে।"

অধিকলাল গম্ভীরভাবেই বলিল—"না, তোমাদের খাবার আমি ছোঁব কেন। আমি দূরেই সরে থাকব।"

যোগেন সা দেওয়ালে ঠেস দিয়া নিজের বিছানায় পা দুইটি ছড়াইয়া বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল—"আমার অত জাতবিচার নেই। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে। আমাদের চাকরবাকর সব মুসলমান। মা তাদের হাতের ছোঁয়া জল নেন না, কিন্তু দুধ নেন। আমি গফুরের বাড়িতে লুকিয়ে মুরগিও খেয়েছি। আমার কোন অসুবিধা হবে না ভাই—"

যোগেন হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া অধিকলালকে জড়াইয়া ধরিল।

সেই দিনই খাইবার সময় একটা কাণ্ড হইল। বোর্ডিংয়ে নীচে একটা 'হল' মতন ছিল। তাহাতেই বোর্ডিংয়ের ছেলেরা পাশাপাশি বসিয়া খাইত। খাওয়ার ঘণ্টা যখন হইল তখন যোগেন বলিল, "চল, অধিকলাল নীচে গিয়ে খেতে হবে।" সকলে পাশাপাশি গিয়া বসিল। অধিকলালও গিয়া পঙক্তির একধারে বসিয়াছিল।

ভূপেশ্বর তেওয়ারি বসিয়াছিল আর এক প্রান্তে। ভূপেশ্বর তেওয়ারি আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—"তুম অলগ্ বৈঠো।"

(তুমি আলাদা বস)

"অলগ বসবে কেন ? ও কি মানুষ নয় ?"

প্রতিবাদ করিল যোগেন সা।

"ও দোসাদ—"

"না আমরা কেউ ওর সঙ্গে বসে খাব না।"

অধিকাংশ ছাত্রই দাঁড়াইয়া উঠিল।

রামচরণ ঠাকুর পরিবেশন করিবার জন্য ভাতের হাঁড়িটা লইয়া আসিয়া দেখিল সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"কা ভইল্ ?"

(কি হ'ল)

তখন তেওয়ারি বলিল—"আজ একটা দোসাদের ছেলে এখানে ভরতি হয়েছে। তার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে খাব কি ক'রে ?"

রামচরণ গম্ভীর হইয়া সমর্থন করিল এ কথা।

"ঠিক বাত—"

অধিকলাল বলিল—"আমি উঠোনে বসে খাব। ঠাকুরজী আমাকে ওইখানেই ভাত দাও।"

অধিকলাল নিজের থালা বাটি গেলাস লইয়া উঠোনে নামিয়া গেল। উঠোনের

একধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল বোর্ডিংয়ের চাকর—রণছোড়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"তুমি বাবুয়া এখানে আংনাতে (উঠোনে) বসছ কেন ?"

"আমার সঙ্গে ওরা একসঙ্গে বসে খেতে চাইছে না—"

রণছোড় বাসন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা রণছোড়ের। একটা দৈত্য যেন। সে চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেল।

অধিকলাল উঠানে বসিয়াই আহার সমাধা করিল এবং স্কুলে চলিয়া গেল। অপমানে তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিতেছিল ইহা লইয়া ঝগড়া করিলে সেটা আরও লজ্জার কারণ হইবে।

স্কুলে গিয়া সে ক্লাসের একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় ক্লাস লইতেছিলেন। শীর্ণকান্তি খর্ব লোক। নাকটি খুব টিকলো। চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। তিনি জ্যামিতি পড়াইবেন। ক্লাসের নবাগত ছেলেদের পরিচয় লইয়া তিনি ফেল-করা ছেলে নুটবিহারীকে বলিলেন—"নুটে তুই বোর্ডে গিয়ে একটা ত্রিভুজ আঁক তো।"

নুটবিহারী উঠিয়া গিয়া বোর্ডে একটা ত্রিভুজ আঁকিল।

"ত্রিভুজের ইংরিজি কি ?"

"ট্র্যাংগ্‌ল্‌ সার।"

"ঠিক হয়েছে। তুই লেখাপড়ায় মন দিয়েছিস তাহলে। আচ্ছা এবার ওটার একটা নাম দে। না, A B C না, P Q R দে—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের পড়াইবার ধরন ওইরূপই ছিল। তিনি ক্লাসের ভালো ছেলেদের প্রতি তেমন নজর দিতেন না, খারাপ ছেলেদের লইয়াই থাকিতেন। তাহাদের বিশেষ করিয়া পড়াইতেন।

"ট্র্যাংগেলের অ্যাংগেল তিনটেতে দাগ দে—ঠিক হয়েছে। এইবার অ্যাংগেল তিনটের নাম দে—"

এইভাবে পড়া চলিতেছিল, এমন সময় স্কুলের চাকর হরদেও আসিয়া বলিল, হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে আপিস ঘরে ডাকিতেছেন। অধিকলাল আপিস ঘরে গিয়া দেখিল বোর্ডিংয়ের চাকর রণছোড় দাঁড়াইয়া আছে।

হেডমাস্টার মহাশয় শান্ত ধীর গম্ভীর লোক। অধিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ খাওয়ার সময় কি কি হয়েছিল বল।"

"আমি জাতে দোসাদ। খাবার সময় সবাই এক সারিতে খেতে বসেছিলাম। কিন্তু তেওয়ারিজি আমাকে উঠে যেতে বললেন। আমি উঠে গেলাম। উঠোনেই আমি খেয়েছি—"

রণছোড়ের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। সে হিন্দী ভাষায় হেডমাস্টার মহাশয়কে যাহা বলিল তাহার মর্ম এই—"আপনি 'ইন্‌সাফ' (সুবিচার) করুন। অধিকলাল শুনলাম খুব ভালো ছেলে। শুধু 'দোসাদ' বলেই ওকে এ অপমান সহ্য করতে হবে ? 'দোসাদ' কি মানুষ নয় ? ওকে যদি ওই 'হলে' বসে খেতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমিও আর ওই বোর্ডিংয়ের বাসন মাজব না। আমিও জাতে 'দোসাদ'। দোসাদের এ অপমান আমি সহ্য করব না। মিউনিসিপালিটির

মেথররাও আমার দোস্ত। আমার অপমানে তারাও 'বদ্‌লা' (প্রতিশোধ) নেবে। বোর্ডিংয়ের পায়খানা তারা 'কামাবে' না (পরিষ্কার করবে না)।"

হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে বলিলেন, "যাও তুমি ক্লাসে যাও—"

অধিকলাল চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহিমবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, অধিকলাল একটা মহা মুশকিল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই আজ ভুপেশ্বর তেওয়ারিকে ডেকে বলে দিয়েছেন সে যেন এ স্কুল ছেড়ে চলে যায়, তাকে কালই তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। এটা হয়েছে তুমি ওদের সঙ্গে একসারে খেতে বসেছিলে বলে।"

এই বলিয়া তিনি অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অধিকলাল সবই জানিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাহার কি যে কর্তব্য থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলিল, "আমি তো সার উঠে গিয়ে উঠোনে বসেছিলাম। রণছোড় গিয়ে যে হেডমাস্টার মশাইকে বলবে তা তো আমি জানতাম না। জানলে বারণ করতাম। কিন্তু এখন আমি কি করব বলুন—"

"ভুপেশ্বর তেওয়ারি এ বছর ম্যাট্রিক দেবে। ওকে যদি স্কুল থেকে চলে যেতে হয় তাহলে ওর ক্ষতি হবে খুব—সে কথাটা ভেবে আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যদি এক কাজ কর, তাহলে—"

"কি বলুন—"

"তুমি হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে চলে যাও। গিয়ে বল তেওয়ারিকে চলে যেতে বলবেন না। আমি আলাদা বসেই খাব।"

"বেশ আমি এখনই যাচ্ছি—"

স্কুল কম্পাউণ্ডেই মাস্টার মহাশয়ের কোয়ার্টার ছিল। অধিকলাল সেইখানেই গেল। অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার পর হরদেওকে সে দেখিতে পাইল। তাহাকেই বলিল—মাস্টার সাহেবের সহিত সে একটু দেখা করিতে চায়। হেডমাস্টার মহাশয় ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন।

"কে?"

"আমি অধিকলাল—"

"কি চাও। ও—। তোমাকে আর বোর্ডিংএ কেউ অপমান করবে না আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

"আমি আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে। তেওয়ারিজিকে আপনি বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেবেন না, সার। ওঁর এ বছর পরীক্ষা দেবার কথা। আমি আলাদা বসে'ই খাব, ওতে আমার কোন অপমান হবে না। রণছোড়কে আমি আপনার কাছে আসতে বলিনি, ও নিজেই এসেছিল। ওকে আমি এখনি বলব গিয়ে ও যেন কোন গোলমাল না করে—"

হেডমাস্টার মহাশয় এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

"এতে তোমার অপমান হয়নি বলছ?"

"আমার সঙ্গে বসে কেউ যদি না খেতে চায় তাহলে তাকে দোষ দেব কি করে।

এই তো আমাদের দেশের নিয়ম। আমিও যে দোসাদ হয়ে জন্মেছি তাতেও আমার কোন দোষ নেই। তাই আমি অপমানিত হইনি। তেওয়ারিজি আমাকে অপমান করেন নি, তিনি দেশের যা নিয়ম তাই মেনে চলবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ নিয়ে তাঁর মনে কষ্টের কারণ হয়ে থাকতে চাই না। আপনি—"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

অধিকলাল চলিয়া গেল। হেডমাস্টার মহাশয় তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। সে যে লেখা-পড়ায় ভালো এ খবর তিনি তাহার পরীক্ষার ফল দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। এখন অনুভব করিলেন তাহার চরিত্রও অসাধারণ।

মহিম সেন, পণ্ডিতজি (জানকীনাথ ওঝা) এবং গণিতের শিক্ষক থার্ড মাস্টার (হাবুল বোস) তেওয়ারির চলিয়া যাইবার সম্ভাবনায় মর্মাহত হইয়াছিলেন। কারণ তেওয়ারি তাঁহাদের নিকট প্রাইভেটে পড়িত এবং প্রত্যেককে কুড়ি টাকা করিয়া বেতন দিত। তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া অধিকলালকে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মহিম সেন তাঁহাদেরই মুখপাত্র হইয়া অধিকলালকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া মহিমবাবুকে গিয়া বলিল—"হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে আমি সব বলেছি। বলেছি যে আমি আলাদা বসেই খাব, আপনি তেওয়ারিজিকে চলে যেতে বলবেন না—"

"বাঃ—। কিছু বললেন তোমাকে?"

"না—"

একটু পরেই কিন্তু হেডমাস্টার মহাশয় বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির হইলেন। মহিমবাবুর ঘরে গিয়া বলিলেন—"ভুপেশ্বর তেওয়ারিকে ডাকুন—"

ভুপেশ্বর তেওয়ারি আসিলে বলিলেন—"এখনি অধিকলাল আমার কাছে গিয়েছিল। সে বলছে তোমাকে যেন স্কুল থেকে তাড়ানো না হয়, সে আলাদা বসেই খাবে। তুমি স্কুলের ওঁছা ছেলে, প্রত্যেক ক্লাসে দু'তিনবার করে ফেল করেছ, আর অধিকলাল একটি রত্ন। পূর্ণিয়ার বোর্ড পরীক্ষায় সে সব বিষয়ে প্রথম হ'য়ে এই স্কুলে এসে ভরতি হয়েছে। সে দোসাদের ঘরে জন্মেছে বলে তাকে ছোট করবার অধিকার কারো নেই। তাই আমি ঠিক করেছি যে সে বোর্ডিংয়ে খাওয়ার 'হলে' বসেই খাবে। তবে সকলে যদি আপত্তি করে সামান্য একটু দূরে বসে খাবে। সে উঠোনে খাবে এ কখনই হতে পারে না। তোমার এতে আপত্তি আছে?"

তেওয়ারি বলিল—"না সার। আমি তো—"

"আচ্ছা যাও—"

অধিকলাল 'হলে'ই একটু তফাতে বসিয়া খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার মর্যাদা আরও যেন বাড়িয়া গেল!

॥ ২ ॥

অধিকলাল স্কুল লাইব্রেরিতে বই লইবার জন্য গিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টারই স্কুল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। তিনি প্রতি শনিবারে এক ঘণ্টা করিয়া লাইব্রেরিতে বসেন। অধিকলাল গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তুমি এর আগে বই নিয়েছ কি?"

"না—"

"তাহলে ওই প্রথম আলমারিটা থেকে শুরু কর। প্রথম তাকে প্রথম যে বইটা আছে, সেইটে নিয়ে এস।"

অধিকলাল ডিকেন্সের লেখা 'অলিভার টুইস্ট' বাহির করিয়া আনিল এবং সেইটাই বাড়ি লইয়া গেল। পড়িতে গিয়া কিন্তু দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা যাইতেছে না। অভিধান দেখিয়া সাতদিনে পাতা চারেক পড়িল সে। পরের শনিবার বইটি লইয়া সে আবার ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কাছে গেল।

"বড় শক্ত বই সার। ভালো বুঝতে পারছি না। ডিক্শনারি দেখে পড়তে হচ্ছে, সাতদিনে মাত্র চার পাতা পড়তে পেরেছি। আমাকে একটা সহজ বই দিন।"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "ওই বইটাই আবার নিয়ে যাও। ডিক্শনারি দেখে পড়তে হবে না, এমনি পড়ে ফেল।"

"কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না যে সার।"

"তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আগাগোড়া পড়ে ফেল সবটা। যখন কোন অচেনা শহরে যাও, তার সব কি বুঝতে পার? রাস্তায় রাস্তায় পার্কে ময়দানে হেঁটে বেড়ালেই যথেষ্ট মনে হয়। সবটা বোঝবার দরকার কি। তুমি পরে যদি ইংরেজি সাহিত্য পড় ও বই তোমাকে আবার পড়তে হবে, তখন ভালো করে পোড়ো। এখন এমনই পড়ে যাও—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের এই অদ্ভুত উপদেশ অনুসারে অধিকলাল দুই তিন মাসের মধ্যেই আলমারির সমস্ত ইংরেজি বইগুলি পড়িয়া ফেলিল—ডিকেন্স্, স্কট, জর্জ ইলিয়ট্, ফিলডিং বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যের যতগুলি নামজাদা ক্ল্যাসিক্যাল বই স্কুলে ছিল সবগুলিরই পাতা উল্টাইয়া গেল সে। অধিকাংশ বইয়েরই প্রকৃত অর্থ সে বুঝিল না বটে, কিন্তু দুই একটা কথা যাহা সে বুঝিল তাহারই সাহায্যে তাহার কল্পনা এক একটা নূতন নূতন গল্প সৃষ্টি করিল তাহার মনে। অনেক বইয়ে ছবিও থাকিত, ছবি থাকিলে অধিকলালের কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িত যেন। ইংরেজি বইয়ের আলমারি যখন শেষ হইয়া গেল তখন বাংলা বইয়ের আলমারি আরম্ভ হইল। তখন স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের সতী, বেহুলা, জড়ভরত, রামায়ণী কথা প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকলাল সেগুলি এক একদিনেই শেষ করিতে লাগিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় একদিন তাহাকে বলিলেন—"এক আলমারি ইংরেজি বই তো পড়ে ফেললে, এ বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ কর না। পারবে না?"

"পারব না কেন। করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমার তো অনেক ভুল হবে সার। সেগুলো ঠিক করে দেবে কে—"

ফোর্থ মাস্টার যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"আমি রোজ রাত্রে আটটার সময় খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটতে বেরুই। তুমি যদি অনুবাদ করে রাখ আমি রাত নটার সময় রোজ তোমার বোর্ডিংয়ে যাব। 'কমন রুমে' বসে সেগুলো দেখে দেব।"

"আচ্ছা সার, আমি করব—"

সেইদিন হইতে অধিকলাল প্রত্যহ অনুবাদ করিয়া রাখিত। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ও প্রতিদিন আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। অধিকলাল ম্যাট্রিকুলেশন না পাশ করা পর্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় অবিবাহিত লোক ছিলেন। দেশ হইতে একটা বুড়ো চাকর আনিয়াছিলেন, সে-ই তাঁহার সব করিত। ছোট একটি বাসা ভাড়া করিয়া আলাদা থাকিতেন তিনি। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক এবং সংস্কৃত খুব ভালো জানিতেন। প্রাইভেট ট্যুশানি করিতেন না। তেওয়ারি অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে পড়াইতে রাজি হন নাই।

॥ ৩ ॥

অধিকলালের স্কুলজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যে ঘটনাগুলিতে অধিকলাল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাই বলিব। এই ইস্কুলেও হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় অধিকলাল সব বিষয়ে প্রথম হইল। সাফল্যের এই দীপ্তিতে সে যে নীচজাতীয় দোসাদ এ কথাটা যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। হাবুল বোসের মতো দুর্ধর্ষ মাস্টারও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। হাবুল বোসের পড়াইবার কায়দা ছিল প্রত্যেক ছেলেকে প্রচুর 'হোম টাসক্' দিতেন, প্রত্যেককেই বাড়িতে কুড়ি পঁচিশটি অঙ্ক কষিতে হইত। যাহারা পারিত না, তাহারা হাবুল বোসের নিকট মার খাইত। হাবুল বোস ক্লাসেও খুব তাড়াতাড়ি পড়াইতেন। তখন ইংরেজিতেই পড়ানো হইত। হাবুল বোস জ্যামিতি অনেকটা সিনেমার কায়দায় পড়াইতেন। বোর্ডের কাছে গিয়া বলিতেন—আজ ফার্স্ট বুক থেকে শুরু করছি। আমি বোর্ডে এঁকে যাচ্ছি তোমরা বলে যাও আমার সঙ্গে। বোর্ডে একটি সরলরেখা আঁকিলেন এবং তাহার নাম দিলেন A B। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের বলিতে হইবে—Let A B be a straight line ঃ তাহার উপর আর একটি সরলরেখা দাঁড় করাইয়া দেন হাবুল বোস, তাহার নাম দেন C D ঃ সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের ছেলেদের বলিতে হইবে—Let the straight line C D stand upon it ঃ তাহার পর দুইটি সন্নিহিত কোণে দাগ দিবামাত্র ছেলেদের বলিতে হইবে—It is required to prove that the two adjacent angles are together equal to two right angles ঃ এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রথম থিয়োরেম পড়ানো হইয়া যাইত। তাহার পর আরম্ভ করিতেন দ্বিতীয় থিয়োরেম। এইভাবে একঘণ্টার মধ্যে তিনি ফার্স্ট-বুকটা শেষ করিয়া ফেলিতেন। কোন ছেলের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না, সমস্ত ছেলেকে 'নামতা ঘোষা'র মতো করিয়া বলিয়া যাইতে হইত। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হাবুল বোস সঙ্গে সঙ্গে তাহার চুল টানিয়া দিতেন, বার বার আবৃত্তি করিয়া ছেলেরা

জ্যামিতিটাকে মুখস্থ করিয়া ফেলিত। হাবুল বোস এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে গুড্ ওলড্ মেথড (Good old method) বলিতেন। ফোর্থ মাস্টারও সপ্তাহে দুইদিন 'রিভিশন ক্লাস' (revision class) লইতেন। তিনিও জ্যামিতি পড়াইতেন, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। তাঁহার লক্ষ্য থাকিত নুটে, ক্যাবলা, লখাই প্রভৃতি খারাপ ছেলেদের উপর। হাবুল বোস ছেলেদের বাড়ি হইতে 'extra' করিয়া আনিতে বলিতেন। অনেকেই পারিত না। হাবুল বোস দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতেন। তাহার পর অবশ্য কোনও ভালো ছেলেকে বলিতেন—তুমি বোর্ডে গিয়ে এটা বুঝিয়ে দাও। অধিকলালকে প্রায়ই বোর্ডে গিয়া 'একস্ট্রা' বুঝাইতে হইত। ক্লাসের সব ছেলেই হাবুল বোসের নিকট একবার না একবার (অনেকেই একাধিকবার) মার খাইয়াছে, কিন্তু অধিকলাল একদিনও মার খায় নাই। হাবুল বোস তাহাকে যে শুধু ভালোবাসেন তাহা নয়, শ্রদ্ধাও করেন মনে মনে। সব মাস্টারই ভালোবাসেন তাহাকে। এমন কি পণ্ডিতজিরও দোসাদ-বিরোধী শক্ত মনোভাব অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে এতো ভালো ছেলে তিনি একটিও পান নাই। তাছাড়া সে বিনয়ী, স্বল্পবাক, সত্যবাদী। একটিও মিথ্যাকথা কখনও বলে না। একদিন কিন্তু বলিয়াছিল, সেই ঘটনাটিই বলিব।

অধিকলাল বোর্ডিং-এ যে ঘরটিতে ছিল সে ঘরের অন্য তিনজনও যোগেন সা, বিলটু ঝা এবং জ্ঞান বসাক অধিকলালের সহপাঠি। দোসাদ বলিয়া অধিকলালের বিরুদ্ধে অহাদের মনে যে ক্ষোভ ছিল তাহার তীক্ষ্নতা কমিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অধিকলাল না থাকিলে হাবুল বোসের মারের চোটে তাহাদের পিঠের চামড়া হয়তো উঠিয়া যাইত। অধিকলালই সব অঙ্ক কষিত। তাহারা টুকিয়া লইত। সুতরাং অধিকলালের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞও ছিল তাহারা। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাফল ওয়ালের (baffle wall) আড়ালে সৈনিকরা যেমন আত্মরক্ষা করে অধিকলালের আড়ালে ইহারাও তেমনি নিজেদের কান এবং পিঠ বাঁচাইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটা মুশকিল হইল। ঘরে চুরি আরম্ভ হইয়া গেল। পয়সা চুরি। বিলটু ঝার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নয়। সে একদিন বলিল তাহার জামার পকেটে খুচরা টাকা ছিল। বেশী নয়, মাত্র তিনটি। কিন্তু তাহা চুরি হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান বসাক বালিশের তলায় পয়সা রাখিত। সে একদিন বলিল আট আনা পয়সা কে সরাইয়াছে। যোগেন সা বলিল তাহারও বাক্স হইতে টাকা চুরি গিয়াছে। বিলটু ঝা আড়ালে একদিন সকলকে বলিল—এ অধিকলালেরই কাজ। পড়াশোনায় হাজার ভালো হোক, ছোটলোকের ছেলে তো! কিন্তু একথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলা গেল না। তাহার পর আর এক কাণ্ড হইল। অধিকলাল একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিল তাহার তালাটিও ভাঙিয়া কে তাহার সযত্ন-সঞ্চিত দশ টাকার নোটটি লইয়া গিয়াছে। এই নোটটি তাহাকে ভগবতী দেবী আসিবার সময় দিয়াছিলেন। অধিকলাল ঠিক করিয়াছিল নিতান্ত বিপদে না পড়িলে সে এটি খরচ করিবে না। বাক্সের তালা খুব মজবুত ছিল না। সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিল সে। বিলটু ঝা এবং জ্ঞান বসাক বলিল যে সম্প্রতি তাহাদেরও টাকা-পয়সা চুরি গিয়াছে। তাহার পরদিন একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিল। যোগেন সা একটা এয়ার গান কিনিয়া আনিল। বলিল তাহার বাবা তাহাকে নাকি জন্মদিনে টাকা পাঠাইয়াছেন। সকলে অবাক হইয়া গেল। জ্ঞান বসাকের একটু হিংসাও হইল। সে

গরীব ছেলে। তাহারও একদা 'এয়ার গান' কিনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বাবা কিনিয়া দেন নাই, দিতে পারেন নাই। বিলট্ ঝা কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। দিন দশ পরে আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেদিন রবিবার। হঠাৎ দাড়িওলা গ্যাট্টাগোট্টা একটি লোক আসিয়া হাজির। পরনে খাকীর প্যান্ট ও শার্ট। হাতে একগাছা লক্‌লকে বেত।

"যোগেন কোন ঘরে থাকে—"

যোগেন বাহির হইয়া আসিল।

"তুমি এয়ার গান কিনেছ?"

যোগেন মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুমি এদের বলেছ যে আমি তোমার জন্মদিনে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছি?"

যোগেন মিথ্যা কথা বলিবার চেষ্টা করিল—"না, আমি—"

তিনি পকেট হইতে চিঠি বাহির করিলেন—"এই যে তোমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহিমবাবু আমাকে লিখেছেন—"

বিলট্ ঝা বাহির হইয়া বলিল—"আমাদের টাকা পয়সা প্রায় চুরি যাচ্ছে।"

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যোগেনের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে চাবকাইতে লাগিলেন।

"আমি দারোগা। অনেক চোরকে শায়েস্তা করেছি। আমার ঘরেই চোর জন্মেছে! আজ খুন করে ফেলব তোকে—"

শপাশপ্ বেত পড়িতে লাগিল। যোগেনের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরা নিজেদের ঘর হইতে বাহির হইয়া একটু দূরে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মজা দেখিতে লাগিল। মারের চোটে যোগেন পড়িয়া গেল; তবু তাহার বাবা তাহাকে মারিতে লাগিলেন।

অধিকলাল হঠাৎ আগাইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

"আর মারবেন না ওকে—"

"আগে আমি জানতে চাই এ বন্দুক কেনার টাকা কোথা থেকে পেল—"

"আমি দিয়েছি।"

"তুমি? তুমি কে—"

"আমি ওর সঙ্গে পড়ি। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমরা এক ঘরে থাকি—"

মহিমবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি যোগেনের বাবাকে নীচে লইয়া গেলেন। অধিকলাল যোগেনকে মাটি হইতে তুলিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। যোগেন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। বিলট্ ঝা প্রশ্ন করিল—"তুমি ওকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে? তবে তুমি যে বললে তোমার বাক্স ভেঙে কে দশ টাকা চুরি করেছে?"

সে কিছু বলিল না। স্বল্পবাক অধিকলাল বেশী কথা বলিত না। বিলট্ ঝা আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিল। কিন্তু অধিকলাল কোন উত্তর দিল না।

একটু পরে মহিমবাবু তাহাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অধিকলাল গিয়া দেখিল যোগেনের বাবাও বসিয়া আছেন।

"তুমিই যোগেনকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে ?"

"হাঁ, স্যর—"

"তুমি টাকা কোথা পেলে ? তোমার টাকা তো তপনবাবু ডাক্তার প্রতিমাসে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন—"

"আমি যখন এখানে আসি তখন মা আমাকে দশ টাকা দিয়েছিলেন।"

"তোমার মা ? তোমার মা তো শুনেছি—"

"আমার মা নয়, তপনবাবুর স্ত্রী। তাঁকেও আমি মা বলি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় চিঠি লিখে জানতে পারেন।"

"তুমি ও টাকা যোগেনকে দিতে গেলে কেন ?"

"দেখলাম ওর ওই বন্দুকটা কেনার খুব ইচ্ছে। তাই দিলাম।"

মহিমবাবু ও যোগেনের বাবা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। যোগেনের বাবা পরের ট্রেনেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ছেলে যে চোর নয় ইহার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছিল। অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যোগেন তেমনিভাবেই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতেছে। পরদিন যোগেন স্কুলে গেল না। স্কুল হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল যোগেন নাই। টেবিলের উপর এয়ারগানটি রহিয়াছে। আর একটি চিঠি।

ভাই অধিকলাল, আমি আর এ ইস্কুলে পড়িব না। বাড়ি যাইতেছি। বন্দুকটি তোমাকে দিয়ে গেলাম। ইতি যোগেন।

॥ ৪ ॥

অধিকলাল যেবার সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সেকেন্ড ক্লাসে উঠিল সে বছর তাহাকে একটি বড় সোনার মেডেল দেওয়া হইল। স্বর্গীয় জমিদার নিবারণ সিংহ বহুকাল পূর্বে এই মেডেলের টাকা দিয়াছিলেন। শর্ত ছিল—সব বিষয়ে যে ছেলে প্রথম হইবে তাকেই এই মেডেল দেওয়া হইবে। গত পনের বছর কোন ছেলে সব বিষয়ে প্রথম হয় নাই। অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় সোনার মেডেলই হইয়া গেল। মেডেলটি পাইবার পরই অধিকলাল বাড়ি চলিয়া গেল। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের কাছেই মেডেলটি রাখিল সে। সমুন্দরি একটা ঝংকার দিয়া পা সরাইয়া লইল।

"ই সব সোনা দানা লেকে হাম কি করব ? মাইজিকে পাস দে যা কে—"

(এ সব সোনা দানা নিয়ে আমি কি করব। মাইজিকে দে এসব—)

সমুন্দরি মুখে একথা বলিল বটে কিন্তু তাহার চোখে মুখে গর্বের একটা দীপ্তি ঝলমল করিতে লাগিল। মেডেলটা তুলিয়া উলটাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল সে।

"চল মাইজিকে পাস্।"

(চল মাইজির কাছে)

তপনবাবু রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা হইল না। তনু দূর হইতে অধিকলালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর খবর দিল—"মা খুদরা এসেছে—।"

আগে তনু আসিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এখন আর তাহা করে না। এখন সে বড় হইয়াছে, এখন আগেকার মতো চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জা করে। সে বাহিরের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং আনন্দে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

"নখু কোথা ?"

"সে লাইব্রেরি ঘরে আছে। সেই তো এখন লাইব্রেরিয়ান। ডেকে আনব ? পড়ার সময় বিরক্ত করলে সে রেগে যায়। জান ? ভারি রাগী হয়েছে আজকাল।"

"এবারই তার পরীক্ষা, না ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, থাক ডাকতে হবে না। আমিই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।"

সমুন্দরি বাড়ির ভিতর চলিয়া গিয়াছিল এবং ভগবতীকে মেডেলটি দিয়া বলিতেছিল—"ই তু, রাখ্ খি দে। হামরা হুঁয়া চোরি হো যাইবে। যোগিয়া এক নম্বর চোর ছে—"

(তোর কাছেই রেখে দে। আমার ওখানে চুরি হ'য়ে যাবে। যোগিয়া একের নম্বর চোর)

"যোগিয়া আবার কে ?"

"রামগোবিনোয়া কা বেটা—"

(রামগোবিনের ছেলে)

অধিকলাল গিয়া ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কি সুন্দর মেডেল পেয়েছিস তুই খুদরু। চমৎকার মেডেলটি। তোর মা বলছে তোর বৌয়ের গলায় পরিয়ে দেবে।"

তনু বলিয়া উঠিল—"তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে জান খুদরুদা। ভগতলালের মেয়ের সঙ্গে। অনেক দেবে-থোবে। তোমাকে সাইকেল দেবে, ঘড়ি দেবে—"

অধিকলাল ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহাদের সমাজে এই বয়সেই তো বিবাহ হয়। সে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক বই পড়িয়াছে। অনেক বাঙালী সাহিত্যিকই বাল্য-বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। তবু কিন্তু এ খবর শুনিয়া তাহার মন বিরূপ হইল না। ভালোই লাগিল বরং। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি
বাঁধা কূপ, তরুতল বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি

একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল মনে। ভগতলাল কোথায় থাকে, কি করে, কোন গ্রামে তাহার বাড়ি সে কিছুই জানে না, তবু মনে হইল রবীন্দ্রনাথ যাহা কল্পনা করিয়াছেন সেই পরিবেশেই বোধহয় তাহার বালিকা-বধূও মানুষ হইতেছে।

ভগবতী দেবী অধিকলালকে খাবার আনিয়া দিলেন। সমুন্দরিকে বলিলেন—"আজ মালপো করেছি। তোর আজবলাল আর সুগিয়া তিলিয়ার জন্যেও নিয়ে যাস। আজবলাল তো কখনও আসে না, সে পড়াশোনা করছে তো ?"

সমুন্দরি বলিল—"উ বদমাশ ছে মাইজি, খালি গুড্ডি আর কঁবাড্ডি—"

(ও দুষ্টু ছেলে মাইজি, খালি ঘুড়ি আর হাডুডু খেলা নিয়ে থাকে)

তনু বলিল—"ও সব ক্লাসেই ফেল করছে। মাইনার পাস করতে করতেই ওর গোঁফ উঠে যাবে।" বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তুই চুপ কর। নখুকে ডেকে আন—"

অধিকলাল বলিল, "নখু পড়ছে ওকে এখন বিরক্ত করার দরকার নেই। আমি যাবার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে যাব। নখুর রেজালট্ কেমন হচ্ছে ?"

"দাদাও ফাস্ট হয় ক্লাসে। তুমিই ওর আদর্শ—"

তনু আবার ফোড়ন কাটিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"ক'দিনের ছুটি ?"—ভগবতী দেবী প্রশ্ন করিলেন।

"আমি কালই চলে যাব। মাকে মেডেলটা দিতে এসেছিলাম।"

"খুব খুশী হয়েছি আমরা। এমনি করে দেশের দশের মুখোজ্জ্বল কর।"

অধিকলাল হঠাৎ প্রশ্ন করিল।

"আমার টাকা কি আপনারা পাঠান ?"

"তোমার মায়ের সব গয়না বিক্রি করে যে টাকা হয়েছে সে টাকা উনি ব্যাংক fixed deposit করে দিয়েছেন। তার থেকে যে সুদ আসে তা তোমাকে পাঠিয়ে দেন, উনিও কিছু দেন।"

সমুন্দরি গজগজ করিয়া উঠিল। ছেকাছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ ডাক্তারবাবুর কথায় সব গহনাগুলো বিক্রয় করিয়া ভুল করিয়াছে সে। এখন পুতহুকে (পুত্রবধূকে) সে কি দিবে। মেয়েদেরও বিবাহ দিতে হইবে।

ভগবতী আশ্বস্ত করিলেন তাহাকে।

"সে হবে এখন, তার জন্যে ভাবছিস কেন। অধিকলাল যদি দাঁড়িয়ে যায় ওই সব করবে।"

অধিকলাল আর সেখানে দাঁড়াইল না।

"চল, নখুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

তনু বাহিরে গিয়া চুপিচুপি বলিল—"খুদরুদা, তোমার বউকে আমি দেখেছি। এখানে একদিন বাবার কাছে দেখাতে এনেছিল, চোখের জন্যে। চোখটা একটু ট্যারা। বাবা বললে ও যেমন আছে থাক, লক্ষ্মী ট্যারা সুলক্ষণ। রং ফর্সা—"

"তোর পছন্দ হয়েছে ?"

"খুব যে একটা আহা-মরি তা নয়, তবে ভালোই। অনেক দেবে-থোবে। বাবার সঙ্গেই কথা হয়েছে সব।"

"তোমার বাবার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। রংলাল বললে ডাক্তারবাবু যা বলবেন তাই হবে। তাই বাবাকে কথা বলতে হল।"

তনু পাকা গিন্নীর মতো ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া তাহার বিবাহের নানারকম খবর তাহাকে দিতে লাগিল। ভগতলাল নাকি খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। চৌরিয়া গ্রামে বাড়ি। জমিজমা আছে। মহিষের বাথানও আছে।

"বাবা রংলালকে বললেন এখানে বিয়ে হ'লে শ্বশুর পরে তোমার পড়ার খরচও চালাতে পারবে।"

"শ্বশুরের কাছ থেকে আমি পড়ার খরচ নেব না।"

"নেবে না?"

"না—"

"নেবে না কেন, শ্বশুর তো আপন লোক।"

"তুই থাম।"

লাইব্রেরি ঘরের সামনে আসিয়া অধিকলাল ডাক দিল, "নথু—"

সঙ্গে সঙ্গে নথু বাহির হইয়া আসিল।

"কে খুদরুদা, এস এস।"

"পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?"

"হচ্ছে একরকম। তোমার খবর কি।"

তনু বলিল—"খুদরুদা সোনার মেডেল পেয়েছে। মাকে দিতে এসেছে—"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। কি সুন্দর দেখতে মেডেলটা, আর কত ভারি! এক ভরি হবে বোধহয়, না খুদরুদা?"

"জানি না—"

"মা বলেছে ওটা ওর বউকে দেবে। একটা সরু সোনার হারে লকেটের মতো করে দিলে সুন্দর মানাবে!"

নথু ধমকাইয়া উঠিল—"তুই চুপ কর। এতো ফাজিল হয়েছিস তুই—"

অধিকলালের দিকে তাকাইয়া তনু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বলিনি তোমাকে, দাদা আজকাল ভয়ানক তিরিক্ষি হয়েছে। কথায় কথায় রেগে ওঠে।"

লাইব্রেরির আলমারির একটা খুরায় সরু লোহার শিকল বাঁধা ছিল একটা। সেটা দেখাইয়া অধিকলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি, কুকুর পুষেছিলে নাকি?"

"ও সে কথা তো তোমাকে বলাই হয়নি। কুকুর নয়, নেউল বাচ্চা পুষেছিলাম একটা। লেধু গোয়ালা মাঠ থেকে এনে দিয়েছিল।"

তনু ঘটনাটা সোৎসাহে বর্ণনা করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

"কই সেটা—"

"ওরে বাবা। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি। তাও যেতে চায় না। প্রথম দিন এসেই তো আমাদের পাত থেকে মাছ তুলে নিয়ে গেল। মারলেও শোনে না। হকরু শেষকালে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে। ও কি দড়িতে বাঁধা থাকবার পাত্র! কুটুস করে কেটে দিলে দড়ি। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে কাঁচা মাছই নিয়ে এল একটা। মার মার ধর ধর—শোনে কি। শেষ কালে বাবা বললে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। আমাদের টম কুকুরের একটা শিকল ছিল, সেইটে খুঁজে হকরু যেই বাঁধতে গেছে—অমনি তার হাত কামড়ে দিলে। রক্তারক্তি কাণ্ড। তবু হকরু ছাড়েনি, গলায় শিকল বেঁধে এইখানে নিয়ে এল। তারপর আমি যেই দুধ দিতে গেছি—সে কি রাগ—গরগর গরগর করে আমাকে তেড়ে এল। আমি তো দে ছুট! আর একটু হলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মা বললে ওকে রাখতে হবে না। বিদেয় করে দে। লেধু বললে দু'চার দিন পরেই পোষ মেনে যাবে, বিল্লীর মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী

হল না। ছেড়ে দেওয়া হল। তবু যেতে চায় না। শেষে দেখ মার করতে পালাল। এখনও মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয় এসে !"

"ও, আচ্ছা—"

ইহার বেশী অধিকলাল কিছু বলিল না। তনু একটু দুঃখিত হইল ইহাতে। তাহার মনে হইল খুদরুদাও কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

অধিকলাল বলিল—"লাইব্রেরিটা ঠিক করে রেখেছ তো ?"

"হঁ্যা—"

"নতুন বই কি কি কেনা হয়েছে ?"

"পুরোনো মাসিক পত্রগুলো বাঁধিয়েছি। শরৎচন্দ্রের কিছু বই কেনা হয়েছে।"

"চল দেখি।"

অধিকলাল সেদিন যখন ফিরিয়া আসিল তখন একটি কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মনের আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাহার ভাবী বধু যে ঈষৎ ট্যারা এ সংবাদে সে বর্ণচ্ছটার মহিমা এতটুকু কমিল না।

তনু তাহার বাল্যসঙ্গিনী। সে সুন্দরী, তাহাকে সে ভালও বাসে কিন্তু তাহাকে সে তাহার প্রণয়িনী বা পত্নীরূপে একবারও কল্পনাও করিল না। এ সম্ভাবনা তাহার মাথাতেই আসিল না। তখনও সে অনাধুনিক ছিল। 'সব মানুষই সমান' এই মন্ত্রের মদিরা পান করিয়া তখনও সে সহস্রবাহু স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী হয় নাই। পশুদের সহজাত সংস্কারের মতো সেকেলে নীতি তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কোনদিনই সে একেলে আধুনিক হইতে পারে নাই, এইটাই বোধহয় তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি।

॥ ৫ ॥

অধিকলাল যেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠিল সেবার একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। রংলাল এবং সমুন্দরি বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির। সমুন্দরির মাথায় প্রকাণ্ড একটা কাপড় ঢাকা রঙীন ডালাতে প্রচুর 'ঠেকুয়া' এবং 'খাবুনি'। কয়েকদিন আগে 'ছট্ পরব' হইয়া গিয়াছিল। তাহারই 'পরসাদ' আনিয়াছে। অধিকলালের জন্যই সমুন্দরি নাকি মানত করিয়াছিল। এবারও অধিকলাল ফার্স্ট হইয়া প্রমোশন পাইয়াছে।

অধিকলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এত 'প্রসাদ' লইয়া সে কি করিবে। দোসাদের বাড়ির 'প্রসাদ' তো কেহ খাইবে না।

মাকে বলিল—"এত প্রসাদ খাবে কে ? তুই কি ভুলে গেছিস আমরা 'দোসাদ', আমাদের ছোঁয়া কেউ খাবে না ! এখানে সব 'উঁচা' জাতের ছেলেরা থাকে।"

রংলালও একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমার মাকে তো চেন, যা জিদ ধরবে ছাড়বে না।"

সমুন্দরির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইল। সে ছেকাছোনি ভাষায়

যাহা বলিল তাহার সরল বাংলা—দেবতার প্রসাদ লইয়া যাহারা জাত-বিচার করে তাহারা মানুষ নয়। দেবতার কাছে আবার 'উঁচা' জাত 'নীচা' জাত কি। সব জাতই সমান।

জ্ঞান বসাক আগাইয়া আসিয়া কহিল—"ঠিক বলেছিস মাই। আমার কোন জাত-বিচার নেই আমাকে প্রসাদ দে—"

সে হাত পাতিয়া প্রসাদ লইল এবং খাইয়া ফেলিল। বিলট্ ঝা ঘরের ভিতর বসিয়া পড়ার ভান করিতেছিল।

জ্ঞান বলিল—"বিলট্ তুমি খাবে নাকি, চমৎকার খাবুনি। খেয়ে ফেল, দেবতার প্রসাদে দোষ নেই—"

বিলট্ ঝা তবু 'গুম' হইয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান বলিল—"এক কাজ করি। পণ্ডিতজির ঘরে গঙ্গাজল আছে, সেই গঙ্গাজল এনে ছিটিয়ে দি ওগুলোর উপর, তাহলে শুদ্ধ হ'য়ে যাবে।"

সমুন্দরি বলিল, "না, বেটা। ভগবানের প্রসাদকে গঙ্গজল দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয় না, আমি তোমাদের জন্য এনেছি, যার খুশি হয় খাও, আমি কোন জবরদস্তি করছি না। এর বিচার ছট্ মাই করবেন, সুরুষ দেব (সূর্যদেব) করবেন। ও'দের 'দোয়াতে'ই (আশীর্বাদেই) আমার খুদরু প্রত্যেক ইন্‌তিহানে (পরীক্ষায়) ভালো করেছে। তাই আমি তোমাদের জন্যও এনেছি। তোমরা ভালো হও এই আমি চাই—।"

বিলট্ ঝা সেবার ইংরাজিতে ফেল করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একটু দ্বিধায় পড়িল। এমন সময় বোর্ডিংয়ের চাকর রণছোড় আসিয়া হাজির। বোর্ডিংএ সেই অধিকলালের গার্জেন ছিল। যখন তখন আসিয়া খবর লইত। সেই একমাত্র লোক যে তাহাকে বলিয়াছিল তোমার কোন ভয় নাই। কোন বিপদে পড়িলে আমি 'জি জান' (জীবন) দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। অধিকলাল স্কুলের নাম-করা ভালো ছেলে এবং সে জাতে 'দোসাদ', 'তাহারই জাত', এই অহংকারে সে মশগুল হইয়া থাকিত। অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে সে জানিত না। সে-ও অধিকলালের জন্য দুইটি 'ঠেকুয়া' শালপাতায় মুড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল। অধিকলালের বাব-মার পরিচয় পাইয়া এবং এক ডালা ঠেকুয়া খাবুনি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল সে। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—"মাই হাম ভি তোর বেটা ছি।"

খুব খুশী হইল সমুন্দরি। বলিল, "তাহলে এই প্রসাদগুলো তুই সকলের মধ্যে বেঁটে (ভাগ করে) দে।"

"জরুর।"

রণছোড় কয়েকখানা খাবুনি তুলিয়া অধিকলালের ঘরের ভিতরই প্রবেশ করিল।

"তোমরা সব খেয়েছ ?"

জ্ঞান বলিল—"বিলট্ ঝা খায়নি। ও দোসাদের ছোঁয়া খাবে না।"

"ই-স"

রণছোড় ফোঁস করিয়া উঠিল।

"চৌবাচ্চার যে জলে রোজ 'আস্নান' (স্নান) কর সে জল কে তোলে ? দোসাদ রণছোড়। যে বাসনে রোজ খাও সে বাসন কে মলে (মাজে) ? দোসাদ রণছোড়। দোসাদের ছোঁয়া ছটের 'পরসাদ' তুমি খাবে না ? লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হচ্ছে

তোমার ! 'মন্ যব চাংগা কঠৌতিমে গঙ্গা' (মন শুদ্ধ থাকিলে বাটির জলও গঙ্গাজল বলে মনে হয়) এ কথা কি তুমি জান না ?"

অধিকলাল হঠাৎ রুখিয়া দাঁড়াইল।

"ওর যখন প্রবৃত্তি হচ্ছে না তখন জোর করে ওকে খাওয়াবার দরকার কি। ওর টেবিলে একটা রেখে দাও ওর ইচ্ছে হলে খাবে না হলে খাবে না।"

বিলট্ ঝা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"দাও, দাও খাচ্ছি।"

বিলট্ ঝা একটা খাবুনি লইয়া গপগপ করিয়া খাইতে লাগিল।

সমুন্দরি বলিল মাস্টারবাবুদের বাড়িতে গিয়াও সে প্রসাদ দিয়া আসিবে।

অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে শুনিয়া বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিলেন। তাহাদের দেওয়া প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া তাহাদের সামনেই একটু ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন।

বলিলেন, "চমৎকার হয়েছে, সবটাই খেয়ে ফেলতুম। কিন্তু আমি পেটরোগা লোক।"

এক পণ্ডিতজি ছাড়া সব মাস্টারই পরমানন্দে ছটের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। পণ্ডিতজি একটি ঠেকুয়া মাথায় ঠেকাইয়া সেটি রণছোড়কেই দিয়া দিলেন—"তোহি খা যা" (তুইই খেয়ে ফেল)।

অধিকলাল মা ও বাবাকে লইয়া একটু যেন বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বরাবরই একটু মুখ-চোরা প্রকৃতির, এভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া সে যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"বেকার ঠেকুয়া লে করি কে কি সব হাল্লা মাচাইছি।"

(ঠেকুয়া নিয়ে কি সব বাজে হইচই করছিস)

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টি রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে উত্তর দিল— "হামরা খুশি।"

রংলাল মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে-ও একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু কিছু বলে নাই। এইবার বলিল—"আব তো সব ভে গেল। আব ঘর চ—"

"তু চুপ র। অব্ চল হেডমাস্টার বাবুকা পাস। খুদরু তু চল হামারা সাথ।"

(তুই চুপ কর। এবার চল হেডমাস্টার বাবুর কাছে। খুদরু তুই সঙ্গে চল—)

অধিকলাল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"নেই হাম্ নেই যাইবো।"

(না, আমি যাব না)।

"কাহে ? তো কো যানেই পড়তে।"

(কেন ? তোকে যেতেই হবে)

অধিকলাল ইতস্তত করিতেছিল কিন্তু সমুন্দরি তাহাকে হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। হেডমাস্টার মহাশয় বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সমুন্দরি ও রংলালকে খুব খাতির করিলেন। চেয়ারে বসিতে দিলেন। চেয়ারের সামনে ছোট একটি টেবিল দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা আনাইয়া চিনেমাটির প্লেটে খাইতে দিলেন। জল দিলেন কাচের গ্লাসে। সমুন্দরি এতটা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করে নাই। সে

অভিভূত হইয়া পড়িল। রংলাল প্রথমে চেয়ারে বসিতে চাহে নাই। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে বসিতে হইল। হেডমাস্টার মহাশয় ভালো হিন্দী জানিতেন না। তিনি সমুন্দরিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"আপ রত্নগর্ভা হে"। অধিকলাল খুব ভালো ছেলে হ্যায়।"

সমুন্দরি উত্তরেবলিল—"বড়া ভিতরগুমুমা (ভিতর-বুঝে) ছে, মাস্টার সাহেব।"

হেডমাস্টার 'ভিতরগুমুমা' বুঝিলেন না। সহাস্যবদনে বলিলেন—"সব ঠিক হয়ে যাবে। উন্নতি করবে ও জীবনে।"

অধিকলালকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা বাবাকে ভক্তি কোরো। ও'দের মনে কোনও কষ্ট দিও না।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার মাকে সহসা সে যেন নূতন রূপে আবিষ্কার করিল। যে মা রামগোবিনের গোলায় গহুম ফাটকায়, সেই ব্যক্তি আর এই ব্যক্তি এক ? কেমন স্বচ্ছন্দে গর্বিতভাবে হেডমাস্টার মহাশয়ের সামনে চেয়ারে বসিয়া আছে। মায়ের দিকে চাহিয়া সত্যই সে বিস্মিত হইয়া গেল।

॥ ৬ ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পরই অধিকলালের বিবাহ হইয়া গেল। যদিও ডাক্তারবাবু বেশী খরচ করিতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুন্দরি তাঁহার মানা শোনে নাই। বেশ ধুমধাম করিয়াই প্রথম পুত্রের বিবাহ দিল সে। তখন লাউডস্পীকারের প্রচলন হয় নাই। তবু ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি এবং রামশিঙা বাজাইয়া চতুর্দিক সচকিত করিয়া তুলিল সমুন্দরি। অনেক 'গোতিয়া' (আত্মীয়) আসিয়া পুরি (লুচি), তরকারি, দহি (দই), বুনিয়া (বোঁদে) এবং 'লাড্ডুর' (মণ্ডার) ভোজ খাইল। দোসাদ সমাজে একটা ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সমুন্দরি যে এতটা করিতে পারিবে তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই। শুধু ইহাই নয়, সে ভগবতী দেবীর জন্য একটি ভালো শাড়ী, ডাক্তারবাবুর জন্য ভালো ধুতি-চাদর, তনুর জন্য একটি রঙীন শাড়ী এবং নখুর জন্যও একটি ধুতি কিনিয়া আনিয়া এক ডালিয়া খাবার সহ মাইজিকে 'পরণাম' (প্রণাম) করিতে গেল। গিয়া খুব বকুনি খাইল। ডাক্তারবাবু তখন বাড়িতে ছিলেম। সমুন্দরির এইসব বাহাদুরি দেখিয়া তিনি খুব রাগারাগি করিতে লাগিলেন। সমুন্দরিকে প্রশ্ন করিলেন টাকা লইয়া এমনভাবে ছিনিমিনি খেলার মানে কি। সমুন্দরি সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হামার খুশি বাবু। গালি নেহি দে, দোয়া মাঙেই ছি।"

(আমার খুশি বাবু। গাল দিও না, আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি)

সমুন্দরির মলিন বসন দেখিয়া ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—"তুই নিজে তো ভালো কাপড় পরিস নি—"

"না মাইজি। পয়সা ওরাই গেলে। খুদরুয়াকো বাপ রো বাস্তে, লাল পাগড়ি—"

বলিয়াই সে ঘাড় ফিরাইয়া মুখে কাপড় ঢাকা দিল। হঠাৎ লজ্জা হইল তাহার। রংলালের জন্য সে একটি লাল পাগড়ির কাপড় কিনিয়াছিল, এ কথাটা বলিতে পারিল না সে। রংলাল যে সেই লাল পাগড়ি পরিতে চাহিতেছে না এ কথাও সে বলিতে পারিল না।

"তুই এত টাকা পেলি কোথা ?"

"কর্জা করলি।"

(ধার করেছি)

"কর্জা করে করেছিস, কর্জা শুধবে কে ?"

"খুদরুবা, আর কে। উ যব হাকিম বনতে তব শোধ করতে।"

(খুদরুবা, আর কে। ও যখন হাকিম হবে তখন শোধ করবে)

"ও যে হাকিম হবে তা তোকে কে বললে ?"

"হাম জানৈছি।"

(আমি জানি)

"হাকিম হওয়া কি মুখের কথা ! সেই ভরসায় তুই কর্জা করছিস ?"

"জরুর।"

ডাক্তারবাবু সমুন্দরির দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মনে মনে কৌতুকবোধ করিলেন। কিছু না বলিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন তিনি।

ভগবতী দেবী বলিলেন—"তোকে আমি একটা নতুন শাড়ী দিচ্ছি। এটা তুই পরবি। তোর বউয়ের শাড়ী তো পাঠিয়ে দিয়েছি। পছন্দ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ বড়া বঁঢ়িয়া। রেশম ছে—"

(হ্যাঁ, খুব সুন্দর। রেশম তো)

"তোর বউয়ের নাম কি ?"

"ফুলেশ্বরী।"

"বাঃ, বেশ বাহারের নাম তো। বউ পছন্দ হয়েছে ?"

"জিদ্দি মালুম হৈ ছে—"

(মনে হচ্ছে জিদ্দি)

"কি করে বুঝলি ?"

সমুন্দরি বলিল, রাত্রে পুরি দিলাম। বউ বলিল, পুরি আমি খাইব না। কিছুতেই খাইল না। ভাত চাই। অত রাত্রে শেষে ভাত রাঁধিয়া দিতে হইল। ওইটুকু মেয়ে, তার জেদ দেখ ! ওকে টিট্ করিতে সময় লাগিবে।

অধিকলালের কিন্তু ফুলেশ্বরীকে ভালোই লাগিল। কতই বা বয়স। বারো তেরোর বেশী নয়। কিন্তু সকলেই তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—ফুলের মালাগাছি, বিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে করে না স্নেহ। তনু ঠিক খবরই দিয়াছিল। ডান চোখটা সামান্য টেরা। কিন্তু তাহাতে খুব খারাপ দেখাইতেছে না তো, তাহার তো বেশ ভালোই লাগিল। সুলিয়া তিলিয়া দুইজনেই বলিল বউ নাকি বেশ রাগী। তাহারও সে কথা মনে হইয়াছে। বিছানায় বাঁকিয়া শুইয়াছিল। সে যখন বলিল 'সিধা হোক হটকে শুতো' (সোজা হয়ে সরে শোও) তখন সে সরিয়া শুইল না। তাহার পর অধিকলাল যখন তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল তখন সে বলিয়া উঠিল—'ভক্' (যাঃ—)। একটু রাগীই। কিন্তু অধিকলালের তবু খারাপ লাগে নাই। ভালোই লাগিয়াছিল। বিবাহান্তে সে যখন কলেজে গিয়া ভরতি হইল তখনও মাঝে মাঝে ফুলেশ্বরীর স্বপ্নটা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িত।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।

মনে হইত :—

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হোক।

কিছুদিন পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইল। অধিকলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। দুইটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মেডেলও পাইয়াছে সে। সংস্কৃতে এবং বাংলায় 'লেটার'। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তপনবাবু তাহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন। ভরতি করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সে ইডেন হিন্দু হোস্টেলেও ভরতি হইতে পারিত। কিন্তু সে মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি ছোট মেসে গিয়া উঠিল। সেই মেসে তাহার বন্ধু জ্ঞান বসাকও ছিল। সে ভরতি হইয়াছিল বঙ্গবাসী কলেজে। থার্ড ডিভিসনে কোনরকমে পাশ করিয়াছিল সে। পাঁচ ছয়টি গরীব ছেলে মেসের একতলায় তিনটি ঘরে থাকিত। বাড়িওলা থাকিতেন দ্বিতলে। হঠাৎ একদিন বাড়িওয়ালার সহিত দেখা হইয়া গেল অধিকলালের।

"অধিকলাল তুমি এখানে ? চিনতে পারছ আমাকে ?"

অধিকলাল চিনিতে পারে নাই। জ্ঞান বসাক পারিল।

"আরে যোগেন যে। তুমি এখানে !"

"এটা তো আমারই বাড়ি। আমি দোতালায় থাকি। দেশে গিয়েছিলাম আজ ফিরেছি। নীচের তলার মেসটা অনেকদিন থেকে আছে, বাবার আমোল থেকে। তোরা এই মেসে জুটে যাবি তা ভাবতেই পারিনি—"

অধিকলাল সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—"তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

"তিনি মারা গেছেন !"

"ও। তুমি কোথায় পড়ছ ?"

"আমি আর পড়ছি না। ব্যবসা করি। ওপরে থাকি, আর দোকানে যাই।"

"কিসের দোকান—"

"কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান করেছি একটা। তুমি ?"

"আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েছি এবার !"

"ইডেনে জায়গা পেলে না বুঝি—"

"পেয়েছিলাম কিন্তু ওখানে বড্ড বেশী খরচ। আমি চালাতে পারব না। তারপর জ্ঞানের সঙ্গে দেখা হল—এই মেসেই চলে এলাম।"

হঠাৎ যোগেন অধিকলালের দুই হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"তোমার কথা আমি ভুলিনি ভাই। তুমি আমার বাড়িতে এসেছ এতে আমি কি যে খুশী হয়েছি তা তোমাকে কি বলব। নীচের ঘরে তোমার কষ্ট হয় তুমি আমার উপরের ঘরে এসে থাক। আমি ওপরে একা থাকি—বিয়ে থা করিনি—"

অধিকলাল মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন!"

যোগেন আরও বার কয়েক তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু অধিকলাল উপরের ঘরে গিয়া যোগেনের স্বাচ্ছন্দ্যে ভাগ বসায় নাই।

[এইখানে খানিকটা উইপোকায় নষ্ট করিয়াছে। এইটুকু মাত্র পড়া যায়]

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধিকলাল একটি অদ্ভুত জীবরূপে গণ্য হইয়াছে। রসিক বাঙালী সহপাঠীরা নানা রকম নামকরণ করিয়াছে তাহার। অনেকেই আড়ালে তাহাকে 'জন্তু' বলিয়া ডাকে। 'ধিক ধিক' নামকরণও করিয়াছে কেহ কেহ। তাছাড়া সে যে ছাতুখোর ইহা লইয়াও তাহাদের মধ্যে রসিকতার অন্ত নাই। 'রুফু' 'আমব্রেলু' 'যবচূর্ণ' প্রভৃতি নানা নামে ডাকে তাহারা তাহাকে। অধিকলাল যদি রাগারাগি করিত তাহা হইলে তাহারা জো পাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকলাল রাগিত না, হাসিত। একদিন একটি ছেলেকে কেবল বলিয়াছিল, এসো আমরা দু'জনে ভাব করি—আমি সাতু তুমি ভাতু। চমৎকার মিল আছে।

[ইহারও পরে খানিকটা নাই·········]

একদিন একটি ছেলে তাহার টিকি কাটিয়া লইয়াছিল। অধিকলাল নাকি হাসিয়া বলিয়াছিল, "টিকি আবার গজাবে। কিন্তু তুমি আর গজাতে পারবে কি? নিজেকেও তুমি কেটে ফেলেছ যে—"

[যে যে অংশ নাই তাহা কেবল ··· এই চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করিলাম]

··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অধিকলাল এবার ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার সহিত ব্র্যাকেটে আর একটি ছাত্রও এ সম্মান পাইয়াছে। তাহার নাম জ্যোতির্ময় রাহা। গুজব রটিয়াছে যে জ্যোতির্ময় জনৈক নামজাদা প্রফেসারের পুত্র বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া অধিকলালের পাশে বসানো হইয়াছে। আসলে ছেলেটি নাকি তত ভালো নয়। অন্যান্য বিষয়ে মোটেই ভালো নম্বর পায় নাই। তবে এটা গুজবও হইতে পারে। কারণ অধিকলাল নিজে বলিল, জ্যোতির্ময় ইংরেজিতে সত্যই খুব ভালো ছেলে। সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইয়াছে, এবং বউ লইয়া খুব মাতামাতি করিয়াছে, তাই পরীক্ষায় খুব ভালো ফল হয় নাই। পরীক্ষার আগেও বই ছোঁয় নাই। বউকে দৈনিক দু'খানা করিয়া চিঠি লেখে নাকি। একটা গদ্যে, আর একটা পদ্যে। তাহার স্ত্রীর চিঠিও জ্যোতির্ময় তাহাকে দেখাইয়াছে। গোলাপী কাগজের উপর সবুজ কালিতে লেখা। চমৎকার চিঠি। ফুলের মতো যেন—এই উপমাটাই অধিকলালের মনে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিজের বউ ফুলেশ্বরীকেও মনে পড়িয়াছিল তাহার। মনে হইয়াছিল, এখন নিশ্চয় আরও বড় হইয়াছে। এখনও তো 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। এ কথাও তাহার মনে হইয়াছিল নাম যদিও

ফুলেশ্বরী কিন্তু অমন ফুলের মতো চিঠি লিখিতে পারিবে? চিঠি যদি নাও লেখে··· ··· ··· ···

অধিকলালের প্রকৃত বন্ধু ছিল দুইজন। একজন বাংলাদেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আর একজন আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন্। যখনই তাহার জীবনে কোনও সমস্যার উদ্ভব হইত তখনই সে ভাবিবার চেষ্টা করিত এ অবস্থায় পড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বা আব্রাহাম লিংকন্ কি করিতেন। আর সে ভক্তি করিত রবীন্দ্রনাথকে। রোজ সকালে উঠিয়া সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করিয়া পড়াশোনা আরম্ভ করিত।

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এই কবিতাটি তাহার প্রিয়তম কবিতা। এটি সে আবৃত্তি করিত প্রত্যহ সকালে। ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···ছাতু খাইয়া আজকাল থাকে সে। মেসে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি প্রাইভেট ট্যুশনিও লইয়াছে। তাহার ভাই আজবলালকে পড়াইবার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে হয়। সেদিন মায়ের জন্য একটি শাড়ি কিনিয়া পাঠাইয়াছে, বাবার জন্যে একটি কামিজ। এজন্য যোগেনের নিকট কিছু ধার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরের মাসেই সে ধার শোধ করিয়া দিয়াছে। যোগেন টাকা ফেরৎ লইতে চাহে নাই, কিন্তু অধিকলাল না-ছোড়।

··· ··· ··· ··· ···

সেদিন একজন প্রফেসর নাকি তাহাকে বলিয়াছেন তোমার 'অধিকলাল' নামটা বদলাইয়া ফেল। ও নামের কোনও অর্থ হয় না, শুনিলে হাসি পায়। তোমার রং কুচকুচে কালো, তোমার নাম অধিকলাল মানায় কি? অধিকলাল সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিল আমার বাবার রাখা নাম আমি কি বদলাইতে পারি? নামের সহিত লোকের জীবনের মিল হয় না সব সময়ে। আপনার নাম যজ্ঞেশ্বর, আপনি কি—। যজ্ঞেশ্বরবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—ঠিক বলেছ, আমার নাম হওয়া উচিত ছিল কীটাণুকীট। তাঁহার পেপারে অধিকলাল পরের বার কিন্তু খুব কম নম্বর পাইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবু বিদ্বান লোক, প্রফেসারও ভালো, কিন্তু উদার নন। অধিকলাল কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। সে একদিন যোগেনকে বলিয়াছিল— 'আমি ওঁকে ভক্তি করতে চাই, কিন্তু পারি না। সেটা আমারই অক্ষমতা। হিমালয় পাহাড়ে কি সবাই উঠতে পারে? আমি··· ··· ··· ···

অধিকলাল কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার বাবা রংলাল আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রংলালের চেহারা সামান্য কুলির মতো। কাঁচা-পাকা গোঁফ। মাথার চুলও কাঁচা-পাকা। যোগেন তাহাকে প্রথমে আমল দেয় নাই। সে যখন বলিল অধিকলালের বাবা সে, তখনও কথাটা বিশ্বাস করে নাই। জ্ঞান কিন্তু অধিকলালের বাবাকে চিনিতে পারিয়াছিল। সমুন্দারি আর রংলাল যখন গ্লাবুনি লইয়া বোর্ডিংয়ে গিয়াছিল তখন জ্ঞান ছিল, যোগেন ছিল না। রংলালের চেহারায় এই কয় বৎসরে

বয়সের ছাপ পড়িয়াছে। মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তাহার মুখের সেই অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত হাসিটা কিন্তু ঠিক আছে। এই হাসিটি দেখিয়াই জ্ঞান তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। রংলাল অধিকলালের কাছে একটি বৈষয়িক প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিলিয়া এবং সুলিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। একটি সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের দুইটি ছেলেকে সমুন্দরি পছন্দ করিয়াছে। পাত্র-পক্ষও আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে তিলিয়া সুলিয়াকে। খবর পাঠাইয়াছে যে তাহারা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছে যদি রংলাল তাহার দুই মেয়েকে এক এক হাজার টাকার জেবর (গহনা) দেয়। ইহা ছাড়া পাত্র দুইটিকেও সোনার হাতঘড়ি, সাইকেল, ভালো রেশমের জামা ও মূল্যবান জুতা দিতে হইবে। এসব ছাড়াও শাশুড়ী-জাতীয়া প্রণম্যাদের জন্য কাপড় আছে, গোতিয়াদের (কুটুম্বদের) ভোজ আছে, বাজা-বাজনা আছে (সমুন্দরির খুব ইচ্ছা বিবাহে লাউড-স্পীকার সহযোগে গান বাজানো হয়)—কিন্তু এ সবের জন্য টাকা দরকার। অন্তত-পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা। রামগোবিন টাকা দিবে বলিয়াছে। কিন্তু সে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া তবে টাকা দিবে। অধিকলালের বিবাহেও দুই হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সে টাকাও রামগোবিন দিয়াছিল। সে টাকার জন্যও হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে। রামগোবিন বলিয়াছে অধিকলালকেই হ্যাণ্ডনোটে সই করিতে হইবে। তাছাড়া রংলালকে দিতে হইবে টিপসই। রংলাল হ্যাণ্ডনোটটি লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। অধিকলালের সই চাই। রামগোবিন রংলালের উপর কিঞ্চিৎ কৃপাও যে করে নাই তাহা নহে। সে বলিয়াছে যে যেহেতু রংলাল তাহার পুরাতন 'দোস্ত' সেহেতু সে তাহার নিকট হইতে সুদ লইবে না। অধিকলাল নীরবে সব শুনিল, তাহার পর হ্যাণ্ডনোটখানা পড়িল। বলিল, "আমি তো এখনও কিছু রোজগার করতে পারি না, পরে কত রোজগার করতে পারব তাও জানি না, ধার যদি শোধ না করতে পারি তাহলে কি হবে ?" রংলাল অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর বলিল—"রামগোবিনই আমাকে কিছুদিন আগে তার জমির পাশে পাঁচ বিঘে জমি কিনে দিয়েছিল। আমি প্রতি মাসে খেটে খেটে সে জমির দাম উসুল করেছি। এখন আমিই সে জমির মালিক, টাকা যদি শোধ না হয় সেই জমিই রামগোবিনকে দিয়ে দেব। এর জন্যে আর একটা বন্ধকী দলিলও করতে হবে। তুমি এখন এই কাগজটায় সই করে দিলেই রামগোবিন টাকা দিয়ে দেবে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হ'য়ে যাক তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। সবই ভগবানের হাত।"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল তাহার পর সই করিয়া দিল।

তাহার পর বলিল—"বাবু, চল তোমাকে ভালো শরবত খাওয়াই। কাছেই খুব ভালো একটা শরবতের দোকান আছে।"

যোগেন বলিল, "চল না একটা ভালো হোটেলে যাওয়া যাক—।"

অধিকলাল হাসিয়া উত্তর দিল, "বাবু মাছ মাংস খান না। হোটেলে গিয়ে কি হবে। তার চেয়ে বরং কোনও দোকান থেকে ভালো মালপোয়া কিনে"··· ···

একদিন মেসে হইহই পড়িয়া গেল। অধিকলাল বাংলায় কবিতা লিখিয়াছে একটা। চমৎকার কবিতা। সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল। কলেজের একজন অধ্যাপকও বলিলেন—"চমৎকার হয়েছে কবিতাটা। এটা কোনও ভালো মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দাও।" তিনি সেকালের একটা নামজাদা মাসিক পত্রিকার নাম করিলেন। অধিকলাল যোগেনকে

বলিল, "আমার ভাই কোনও পত্রিকায় পাঠাতে লজ্জা করে।" যোগেন খুব বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল। সে বলিল, "তোমাকে পাঠাতে হবে না, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। ও পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। তুমি দাও আমাকে কবিতাটা।" তাহার পর দিন যোগেন মহানন্দে আসিয়া খবর দিল—কবিতা ওঁদের খুব ভালো লেগেছে। পরের মাসেই প্রকাশিত হবে। তুমি আরও কবিতা লেখ। ওঁরা ছাপাবেন বলেছেন। তুমি সাহিত্য-জগতে যদি নাম করতে পার, তাহলে তোমার জীবনের রং বদলে যাবে। কথাটা শুনিয়া অধিকলালের মনেও বোধহয় একটা স্বপ্ন জাগিয়াছিল। সে কল্পনা করিয়াছিল হয়তো তাহার ছবি কাগজে বাহির হইবে, হয়তো তাহার বই ছাপিবার জন্য প্রকাশকেরা তাহার কাছে ভিড় করিবে, হয়তো তাহার নিকট বাণী লইবার জন্য কলেজের ছেলে-মেয়েরা ভীড় করিবে, হয়তো নানা সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ আসিবে তাহার নিকট, তাহার বাণী তাহার বক্তৃতা তাহার কবিতা হয়তো দেশকে নূতন পথ দেখাইবে, নূতন প্রেরণা দিবে, নূতন যুগের কবি হিসাবে তাহার নাম হয়তো আগামী যুগের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে—এই ধরনের বহু বর্ণবহুল 'হয়তো' বোধহয় তাহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলে নাই। পরের মাসে সেই বিখ্যাত মাসিকপত্রে কবিতাটি প্রকাশিত হইল না। তাহার পরের মাসেও না। তাহার পরের মাসে যাহা ঘটিল তাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। অন্য একটি কাগজে কবিতাটি প্রকাশিত হইল ভিন্ন নামে। কবির নাম অধিকলাল নয়, অমিত সিংহ। যোগেন বিখ্যাত কাগজের আপিসে গিয়া খবর লইয়া জানিল জনৈক যুবক একদিন আপিসে গিয়া কবিতাটি নাকি লইয়া আসিয়াছে, বলিয়াছে সেই নাকি কবিতাটির রচয়িতা, তাহার ইচ্ছা কবিতাটি অন্য কাগজে দিবে বলিয়া সে ঠিক করিয়াছে। তাহার বন্ধু সহকারী সম্পাদক বলিলেন, 'সুতরাং তাঁকে কবিতাটি দিয়ে দিয়েছি। তারপর তা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা জানি না। ও সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বও আমাদের নেই।' ক্রুদ্ধ যোগেন আসিয়া একজন উকিলের পরামর্শ লইয়াছিল, উকিল উকিল-সুলভ পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আদালতে যদি প্রমাণ করা যায় লেখাটি আপনার বন্ধুর তাহলে খেসারত আদায় করা যেতে পারে। এর জন্যে সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, দরকার হলে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করতে হবে। ওই অমিত সিংহ নিশ্চই বলবে কবিতাটি তারই লেখা অধিকলালই সেটি চুরি করে টুকে নিয়ে ছাপতে দিয়েছিল অন্য কাগজে। সেও ছাড়বে না, সেও সাক্ষী তৈরী করবে। সুতরাং আদালতে না গেলে বোঝা যাবে না কেস আমরা জিতব কিনা।' অধিকলাল যোগেনকে আদালতে যাইতে দেয় নাই। সাহিত্যিক হইবার স্বপ্নও তাহার নিবিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে সাহিত্যের হাটেও চোর, বাটপাড়, পকেটমার আছে, সাহিত্যের ফসলও ঠিক ন্যায়ের বাটখারায় মাপা হয় না সাহিত্যের হাটে। সেখানেও অসাধুদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়···না, সে ওসব করিবে না, করিবার প্রবৃত্তি নাই।··· ······

অনেকদিন পর যোগেনকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহাতে যে খবরটি আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। অধিকলালের মতো ছেলেও কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে নাই। কামনার পঙ্ক তাহার মনেও লাগিয়াছিল। সে লিখিতেছে—'ভাই যোগেন; তুমি বিপথে গেছ বলে অনুতাপ করেছ অনেক এবং

আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করে যা যা লিখেছ তাতে আমার গর্ব অনুভব করা উচিত। কিন্তু ভাই, যদিও বিপথে যাওয়া যাকে বলে তা আমার জীবনে ঘটেনি, কিন্তু সত্যি কথা যদি বলি তাহলে স্বীকার করতেই হবে ও পাপ আমার মনকেও একদিন স্পর্শ করেছিল। জীবু, বরেন, রহিম এরা আমার সহপাঠী ছিল। এদের কাছ থেকে আমি পর্ণোগ্রাফির অনেক বই পেতাম এবং লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। বলতে যদিও লজ্জা করছে তবু বলব পড়তে ভালোই লাগত। নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করেছিলাম। পুরুষের সদ্যজাগ্রত কামনা নিয়ে বিচরণ করতাম সে জগতে। দেহের শিরা-উপশিরা উত্তেজনায় দপ দপ করত। আমাদের ক্লাসের কালো সুঁটকো মেয়েটাকেও মনে হত অপ্সরী। ইচ্ছে করত তার সঙ্গে ভাব করি। মনে হত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে বলি—

ফেল গো বসন ফেল ঘুচাও অঞ্চল
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন-আবরণ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই শেষে আমাকে রক্ষা করলেন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম এই কাম-লোকে আমি শাশ্বত ভারতের সন্ধান পাব না, যে ভারতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সতীত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' বইটিতে 'সতী' নামে যে কবিতাটি আছে সেটি পড়েছ কি ? তার প্রথম দু'লাইন হচ্ছে—

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরানে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা

এই কবিতায় তিনি বলেছেন সতীদের মধ্যে কলঙ্কিনীরাও আছে। কারণ অন্তর্যামীই সতীত্বকাহিনীর মর্মকথা জানেন। সে মর্মকথা আর যাই হোক তা কাম নয়। তা প্রেম। হঠাৎ আমার স্ত্রী ফুলেশ্বরী এসে যেন আমার সেই গোপন লোকে প্রবেশ করল। হাসিমুখে চাইল আমার দিকে একবার তারপর, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিল সব। আমার ঘোর কেটে গেল। আমার বিশ্বাস তোমারও যাবে ··· ··· ···
··· ··· ··· ··· ···

অধিকলাল সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরীক্ষার সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সে খুব ভালো পরীক্ষা দিতে পারে নাই। অসুস্থ না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে তাহার নাম থাকিত। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই একটা মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটিল। তাহার বাবা রংলাল হঠাৎ মারা গেল। অধিকলাল যে বি. এ. পাশ করিয়াছে এ খবর সে শুনিয়া যাইতে পারে নাই। তিলিয়া সুলিয়ার বিবাহের পর অধিক উপার্জনের আশায় সে রামগোবিনের চাকরি ছাড়িয়া কাটিহারে একটি মিলে কাজ লইয়াছিল। মিলের চাকায় কাপড় আটকাইয়া গিয়া অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। খবর পাইয়া অধিকলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে তাহার বাবাকে দেখিতে পায় নাই।

মিলের মালিকরা নাকি রংলালের পরিবারকে হাজার দুই টাকা খেসারতস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরি পাইয়াছে টাকাটা। রামগোবিন বলিয়াছিল টাকাটা আমাকে দাও আমি ঋণের দলিলে উসুল করিয়া লইব। সমুন্দরি দেয় নাই। বলিয়াছিল, ঋণ যথাকালে খুদরুবা শোধ করিবে। যদি না করে তখন আদালত আছে, সেখানে গিয়া যাহা খুশি করিও, এ টাকা আমি দিব না। অধিকলাল সব শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিল সে। রণছোড় আসিয়া রামগোবিনের

গোলায় চাকরি করিতেছে। সকরিগলিতে তাহার বাড়ি ছিল। কলেরায় তাহার বউ ছেলে-মেয়ে সব নাকি মরিয়া গিয়াছে। বেশী দিন কামাই করার জন্য সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংয়ের চাকরিটিও আর নাই। সুতরাং রংলালের বাড়ির পাশেই সে ছোট একটু ঝোপড়ি (কুঁড়ে) বানাইয়া লইয়াছে। সমুন্দরিই দুই বেলা তাহাকে খাইতে দেয়, অবশ্য বিনা পয়সায় নয়, এজন্য তাহাকে মাসে পনেরো টাকা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে রণছোড়ের সুবিধাই হইয়াছে। সে রামগোবিনের কুলি কণ্ট্রাক্টেও কাজ করে, গোলাতেও করে। তাহার মহিষের মতো স্বাস্থ্য, মহিষের মতো খাটিতে পারে সে। সবসুদ্ধ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা পোস্টাপিসে জমায়। অধিকলালকে দেখিয়া সে খুব আনন্দিত হইল। অধিকলাল বি. এ. পাশ করিয়াছে শুনিয়া প্রশ্ন করিল—'আব কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জকা স্কুল মে যো হেডমাস্টার ছেলৈ—উ ভি বি. এ. পাশ—তু হেডমাস্টার বনি যা —"

["এখন কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টারও বি. এ. পাশ ছিল, তুই হেডমাস্টার হ'য়ে যা—"]

সমুন্দরি সেখানে ছিল। সে সগর্বে বলিল—"মাস্টার কাহে, উ হাকিম বনতে!"

[মাস্টার কেন, ও হাকিম হবে]

তাহার পরই অধিকলালের 'গওনা'র (দ্বিরাগমনের) প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল।

অধিকলাল বলিল, "না আমি রোজগার না করা পর্যন্ত বউকে আনিব না। তাহাকে খাওয়াইব কি?"

সমুন্দরি উত্তর দিল—"হাম্ খিলাইব। বহুকো দু মুঠ্ঠি ভাত দেনে কো তাগদ হামরা ছে।

[আমি খাওয়াব। বউকে দুমুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা আমার আছে]

অধিকলাল গিয়া দেখিল আজবলাল একটি অকাল কুষ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ঘাড় চাঁছা, লম্বা জুলফি, চবর চবর করিয়া পান চিবাইতেছে, পরনে শৌখিন ধুতি এবং চপ্পল। এবারও পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে।

অধিকলাল মাকে বলিল—"এক্‌রা পঢ়াকে কী নাফা হোতে? কোই কাম মে লাগা দে —"

[একে পড়িয়ে লাভ কি! কোনও কাজে লাগিয়ে দে]

সমুন্দরি ছেকা-ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম—"সবার বুদ্ধি কি একরকম হয়? এবার ফেল করিয়াছে, আগামী বার পাশ করিবে। ও কি এখন আর মজুরের কাজ করিতে পারিবে? লেখাপড়া শিখিয়া উহাকে বাবু বনিতে হইবে। হাকিম হইতে না পারে, কিন্তু হাকিমের কেরানীও কি হইতে পারিবে না?"

ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও গেল অধিকলাল। তাহাকে দেখিয়া সেখানে সবাই মহা খুশী। নখু ছিল না, সে-ও কলেজে পড়িতেছে। কলিকাতায় তাহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা হয় তাহার। তনুকে দেখিয়া সে কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কি সুন্দর হইয়াছে সে। একটা পুষ্পিতা লতা যেন। অধিকলালকে দেখিয়া তাহার চোখ মুখ যদিও আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল কিন্তু কোনও প্রগলভতা প্রকাশ করিল না সে। আগে সে অধিকলালের হাত ধরিয়া টানাটানি করিত এখন দূরে সরিয়া রহিল।

"খুদেরুদা, আশা করেছিলাম এবারও তুমি কম্‌পীট করবে—"

"অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম ভাই। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করেছি এই যথেষ্ট—"

তপনবাবু কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া অধিকলাল আশ্চর্য হইয়া গেল। তাঁহার মাথার সামনের দিকের খানিকটা চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। সেই শাদার মধ্যে সিঁদুরের শোভা যেন আরও মহিমাময় মনে হইল অধিকলালের। অনেক দিন আগে সে একবার শাদা স্তর-মেঘের মধ্যে সূর্যোদয় দেখিয়াছিল। সেই ছবিটা মনে পড়িল তাহার। ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কপালে চুম্বন দিলেন।

"তুই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিস খুদরু। আহা, রংলালের জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে। সে বেচারা চিরকাল কষ্ট করেই গেল, সুখের মুখ আর দেখতে পেলে না বেচারা। কি খাবি ? মাংস রেঁধেছি আজ। চারটি মাংস ভাত খেয়ে যা না এখানে দুপুরে—"

"এখন যে অশৌচ, মাংস খাব কি করে—"

"ও ঠিক তো। তবে একটু ক্ষীর খাবি আয়।"

ক্ষীর এবং মুড়ি খাইতে খাইতে অধিকলাল প্রশ্ন করিল—"তনুর পড়াশোনা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। শ্বশুর খুব বড়লোক, জামাই বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।"

"বাঃ খুব আনন্দের কথা। বিয়ের সময় আমি আসব।"

"তোর বউ কবে আসবে ? এতদিনে বড়সড় হয়েছে নিশ্চয়।"

"বউ এনে রাখবো কোথায় কাকীমা ? আমি আগে রোজগার করি—"

"সমুন্দরি কিন্তু ওসব কথা শুনবে না। সে বলছিল সবাই নাকি নিন্দে করছে, সে বউকে এখানেই আনবে।"

"আপনারা মাকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। এখন বউকে নিয়ে এসে লাভ কি—"

"তোমার মা কি কারো কথা শুনবে ? যা খাণ্ডারণী, ও নিজের মতে চলবে।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। অসহায় বোধ করিতে লাগিল একটু। কিন্তু ও বিষয়ে আর কিছু বলিল না।·········

···তপনবাবু রংলালের 'কিরিয়া'তে (শ্রাদ্ধে) পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিল রামগোবিনও কিছু দিবে। কিন্তু সে নাকি কিছুই দেয় নাই। সমুন্দরি তাহার গোলার কাজ ছাড়িয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী হরিবোল সার গোলায় কাজ লইয়াছিল। সে গতর খাটাইয়া খায়, কাহারও পরোয়া করে না। যখন তখন যেখানে সেখানে রামগোবিনকে 'চোট্টা বাভনা' বলিয়া উল্লেখ করিতেও ইতস্তত করে না সে। খুব ভোরে উঠিয়া এক গৃহস্থের বাড়িতে সে ঢেঁকিতে ধান, চাল, চিঁড়া প্রভৃতি কুটিয়া দেয়। ইহাতেও তাহার রোজগার হয় বেশ। কোন কোন দিন নিজের বাড়ির উঠানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে রংলালের জন্য কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে রংলাল তাহার মানা না শুনিয়া কাটিহারের মিলে গিয়া চাকরি লইয়াছিল। টাকার জন্যই সে প্রাণটা দিল ! ওই 'চোট্টা বাভ্‌না'র দলিলই তাহাকে

'বাউলা' (পাগল) করিয়া তুলিয়াছিল, এক মুহূর্ত তাহার 'চেইন্' (শান্তি) ছিল না। রণছোড় তাহাকে সান্ত্বনা দিত।.........

অধিকলাল আই. এ. এস. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পাশ করিল। ট্রেনিং লইবার জন্য দিল্লী যাইতে হইল তাহাকে। সমুন্দরির স্বপ্ন সফল হইল শেষ পর্যন্ত। এ সময় সে বেশ একটু অর্থকষ্টের মধ্যে ছিল। কারণ তপনবাবু লিখিলেন যে তাহার মায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা তিনি ব্যাংকে fixed deposit করিয়াছিলেন তাহা সমুন্দরি তুলিয়া লইয়াছে। আজবলাল সেই টাকা দিয়া একটি মনিহারী দোকান করিয়াছে বাজারে। পড়াশোনা ত্যাগ করিয়াছে। একজন স্কুলের মাস্টারকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া স্কুল হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। তপনবাবুই তাহাকে একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন তনু টাকাটা পাঠাইতেছে। বিবাহের সময় সে অনেক টাকা পাইয়াছিল। সেই টাকা হইতে সে তোমাকে টাকাটা উপহার দিতেছে। তুমি যেন আবার আত্মসম্মানের আধিক্যবশতঃ টাকাটা ফেরত দিও না। সে বড় দুঃখ পাইবে। তনুর স্বামীর দিল্লীরই কোনও কলেজে অধ্যাপক হইয়া যাইবার কথা। ঠিকানা এখনও জানি না, পাইলে তোমাকে জানাইব। তুমি যখন ম্যাজিস্ট্রেট হইবে তখন যদি পূর্ণিয়াতে আস আমরা খুবই গর্ব অনুভব করিব। ইচ্ছা আছে গ্রামে একটা সভা করিয়া তোমাকে অভিনন্দন জানাইব। নখুও আগামী বৎসর অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিসের পরীক্ষা দিবে, অবশ্য যদি বি. এ. পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। আমার শরীরটা সম্প্রতি ভালো যাইতেছে না। হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগিতেছি। বিশ্রাম লওয়া উচিত, কিন্তু......

বছর দুই পরে অধিকলাল যখন পূর্ণিয়া জেলাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেল তখন ডাক্তার তপনকান্তি মারা গিয়াছেন। ভগবতী দেবী জব্বলপুরে তাহার বাপের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িটা শূন্য পড়িয়া আছে। নখু কলিকাতায়, তনু শ্বশুরবাড়িতে। নখুর ইচ্ছা বাড়িটা বিক্রয় করিয়া সেই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দেওয়া হোক। তপনবাবু 'খরচে' লোক ছিলেন, ব্যাংকে নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অঞ্চলে অনেকের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচুর শ্রদ্ধা জমা হইয়া আছে, কিন্তু তাহা দিয়া সংসার খরচ চলে না। প্রায় দশবিঘা জমির উপর তপনকান্তিবাবুর বাড়ি। বিক্রয় করিলে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দিলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি থাকিতে পারিবেন। নখুর ইহাই মত।

রামগোবিন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া বাড়িটা কিনিতেও প্রস্তুত আছে। তনু কিন্তু ইহাতে মত দিতেছে না। তনুর মতের মূল্য আছে, কারণ তপনবাবু কোন উইল করিয়া যান নাই। সুতরাং সেও ওই বাড়ির একজন উত্তরাধিকারিণীরূপে গণ্য হইবে। তনু বলিয়াছে যে ওই বাড়িতে তপনকান্তির নামে একটি হাসপাতাল করা হোক। তনুর স্বামীর একজন বন্ধু বিলাত-ফেরত ডাক্তার। সে গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস

করিতে চায়। সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক সে। বিবাহ করে নাই, করিবেও না। সে বলিয়াছে তপনবাবুর নামে যদি হাসপাতাল করা হয় তাহা হইলে সে গিয়া হাসপাতালের ভার লইবে। নখু এবং তনু দুইজনেই অধিকলালের পরামর্শ চাহিয়া তাহাকে পত্র দিয়াছিল। অধিকলাল উত্তর দিয়াছিল, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আমাকে জড়াইও না। তোমরা নিজেরাই পরামর্শ করিয়া যাহা ঠিক করিবার কর। যদি হাসপাতাল হয় আমি খুব সুখী হইব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে গভর্ণমেণ্টও এ ব্যাপারে কিছু আর্থিক সাহায্য করে। গ্রামে ভালো হাসপাতাল করা গভর্ণমেন্টেরও অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে। জানি না কতদূর কি করিতে পারিব। নখু যাহা লিখিয়াছে, তাহাও অবশ্য উড়াইয়া দিবার মতো নহে। মায়ের নামে কিছু টাকা থাকিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন। নখু ভালো ছেলে, সেও ভালো চাকরি পাইবে, তখন মায়ের কোনও ভাবনা থাকিবে না। আমি নিজের তরফ হইতে এটুকু বলিতে পারি আমি যতদিন রোজগার করিব মাকে টাকার অভাবে কষ্ট পাইতে দিব না। আমি যতটা পারি তাঁহাকে সাহায্য করিব। তিনি শুধু তোমাদের মা নন, আমারও মা·········

অধিকলালের কোয়ার্টারে ফুলেশ্বরী আসিয়াছে, সমুন্দরিও আসিয়াছে। অধিকলাল বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ফুলেশ্বরী বিদ্যায় গো-মূর্খ, কিন্তু তাহার চালচলন ঠাট্ঠমক মেমসাহেবের মতো। বগল-কাটা লো-নেক্ (low neck) জামা পরিয়াছে, পায়ে দিয়াছে হাই-হিল জুতা, ঠোঁটে লিপ্স্টিক্, মুখময় চুনকাম, চোখে বিলাতী কাজল। অধিকলালের মনে হইতে লাগিল যে একটা 'সং' ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুই-একটা ইংরেজি বকুনিও শিখিয়া নিজেকে আরও হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে সে। চাকরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'বুই' 'বুই' (Boy) বলিয়া ডাকিতেছে। অধিকলাল বলিয়াছিল, "তুমি তো মেমসাহেব নও। এ সব করিতেছ কেন ? তুমি বিহারী, তুমি তোমার স্বাভাবিক পোশাকে থাক, মাতৃভাষায় কথা বল, তাহা হইলে তোমাকে আরও ভালো দেখাইবে।"

ফুলেশ্বরী কিন্তু এ সদুপদেশ শোনে নাই--এবং বিহারী সুরে টান দিয়া বলিয়াছিল—এঃ। যাহার বাংলা অর্থ—ইস্। সমুন্দরিও ফুলেশ্বরীর দিকে। সে বলিতেছে—"হাকিম কা জনানী কি মজুরনী কা এইসা রহিতে ? জরুর উ ইন্সান্ বন্তে। হাকিম কা জনানী, খেলোড় ছে কি !"

[হাকিমের বউ মজুরনীর মতো থাকবে নাকি। ওকে ভদ্রলোকের মতো থাকতেই হবে। হাকিমের বউ, খেলা নাকি !]

সমুন্দরি কিন্তু হাকিমের মা সাজিতে চায় না। সে বাহিরের দিকে একটা ঘরে জাঁতা বসাইয়াছে। ডাল প্রস্তুত করে, ছাতু ও আটাও পেষে। যে ময়লা কাপড় সে আগে পরিত সেই ময়লা কাপড় এখনও পরে। মাথায় তেল দেয় না। খসখস করিয়া দুই হাত দিয়া মাঝে মাঝে মাথাটা চুলকায়—অর্থাৎ মাথায় যে অনেক উকুন আছে তাহা বেশ বোঝা যায়। সমুন্দরি লুকাইবারও চেষ্টা করে না। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। বাহিরের ঘরেই বেশীর ভাগ থাকে সে। ওই ঘরে বসিয়াই 'হুক্কা' খায়। পচ্ পচ্ করিয়া থুতুও ফেলে যেখানে সেখানে। চাকরবাকর খানসামা-বেয়ারাদের সঙ্গেই

তাহার ভাব বেশী। তাহাদের সঙ্গেই আড্ডা দেয়। মাঝে মাঝে ঝগড়াও করে। শাসায় তাহাদের —ফের যদি এমন করিস তোদের চাকরি খেয়ে দেব।

সমুন্দরির এই সব আচরণে অধিকলালের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। একদিন কমিশনার সাহেব তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বাড়ির দাইটাকে সামনের ঘরে থাকিতে দিয়াছ কেন। পিছনের দিকে তো উহাদের থাকিবার জন্য আলাদা ঘর আছে।" অধিকলাল খুব লজ্জিত হইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল সে। বলিল, "উনি আমার মা। উনি ওইভাবেই থাকিতে চান। কি করিব বলুন—"

কমিশনার সাহেব বাঙালী, সেকালের আই. সি এস.। একথা শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া বলিলেন—"ওহ্ আই সি! তোমার মা! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মাইজি. নমস্তে।" সমুন্দরিও দুই হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিল বটে, কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল না। রোদে পিঠ দিয়া হুঁকা-হাতে যেমন রোদ পোহাইতেছিল তেমনি পোহাইতে লাগিল। কমিশনার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "মাইজি আপনি বাইরের দিকে এমন ভাবে বসে থাকেন কেন। ভিতরের দিকেও তো অনেক ঘর আছে।" ইহার উত্তরে সমুন্দরি সেই কথাগুলিই বলিল যাহা সে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেককে বলিয়াছে...

"হামারা খুশি—"

কমিশনার সাহেব মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের কাণ্ড দেখিয়া অধিকলালের কিন্তু লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কমিশনার সাহেবের হাস্যদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে যে ঝলকটা সে দেখিয়াছিল তাহা ব্যঙ্গের ঝলক। তিনি সুসভ্য বাঙালী-কুল-তিলক, বাহিরের ভব্যতা নিখুঁত, অনেক দিন বিলাতে ছিলেন। কিন্তু ওই ঝলক দেখিয়া মনে হয় মুখে তিনি যাহাই বলুন মনে মনে ভাবিতেছেন— মেড়োদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। অধিকলালের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। মায়ের উপর একটু রাগও হইল। কিন্তু সেদিন সে কিছু বলিল না।

... ...

আকর্ণ দন্ত বিকশিত করিয়া রামগোবিন আসিয়া হাজির হইল একদিন। সঙ্গে প্রচুর 'ভেট' আনিয়াছিল সে। ভালো দই, ভালো চিঁড়া, মর্তমান কলা এক কাঁদি, দুইটা বড় বড় তরমুজ। অধিকলাল বলিল—এ সব ভেট আমি লইব না।

সমুন্দরি রুখিয়া উঠিল। ছেকা-ছেনি ভাষায় বলিল—নিবি না কেন? সব হাকিমই তো ভেট নেয়, তুই নিবি না কেন! অধিকলাল কিন্তু কিছুতেই লইতে রাজী হইল না। রামগোবিন ইহা প্রত্যাশা করে নাই। ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গেল।

আপিস হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল তাহার মায়ের ঘরে রামগোবিনের 'ভেট' সাজানো রহিয়াছে। বড় বড় তরমুজ দুইটাই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"এ কি এগুলো রেখেছ কেন!"

"হামারা খুশি!"

তাহার পর ছেকা-ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম এই যে ওই 'চোট্টা বাভ্না' আমাদের বরাবর ঠকাইয়াছে। রংলালকে পুরা মজুরি কখনও দেয় নাই, আমি যখন মজুরির পরিবর্তে 'দানা' লইতাম তখন ওজনে কম দিত। রংলালকে ও যদি দলিলের

নাগপাশে না বাঁধিত তাহা হইলে সে মিলে চাকরি করিতে ছুটিত না। এখন যখন উহাকে বাগে পাইয়াছি ছাড়িয়া দিব কেন, যতটা পারি উসুল করিয়া লই। হাকিমকে সকলেই তো খোশামোদ করে, কোন হাকিম তো খোশামোদ লইতে আপত্তি করে না। তুমিই বা এই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করিতেছ কেন।

অধিকলাল চিরকালই স্বল্পবাক। সমুন্দরির ভাষায় 'ভিতরগুমুমো'। সে চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সে চাপরাসীকে আদেশ দিল ওই তরমুজ, চিঁড়া প্রভৃতি যেন বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসিল কোথায় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। অধিকলালকে জিপে করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইল। · সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল সমুন্দরিও চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, আর সে এখানে আসিবে না……।

বমাল সুদ্ধ রামগোবিন ধরা পড়িয়াছে। এ অঞ্চলে সম্প্রতি খুব ডাকাতি হইতেছিল। কাজিগ্রামে এক জমিদারের বাড়িতে দুইটি খুন হইয়াছে, গহনাপত্র এবং নগদ টাকাতে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকার জিনিস লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে ডাকাতেরা। সেই সব জিনিস পাওয়া গিয়াছে রামগোবিনের গুদামে। এমন আরও অনেক জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহে চোরাই মাল। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, এ অঞ্চলে যত চুরি হয় তাহা রামগোবিনের সহায়তাতেই হয়, চোরাই মালগুলি সে-ই রাখে, সুবিধা মতো বিক্রয় করে এবং চোর-ডাকাতরা তাহার বখরা লয়। রামগোবিনকে হাতকড়ি দিয়া গ্রেফতার করিয়া আনিয়াছেন এস-পি যোগীন্দর সিং। তাহাকে জামিনে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে।

যোগীন্দর সিং করিৎকর্মা লোক। তিনি আসিয়া অধিকলালকে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "রামগোবিন শাঁসালো মাল। একটু চাপ দিলেই হাজার কয়েক টাকা গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

যোগীন্দর সিং একথা অবশ্য বলিলেন না যে টাকাটা আমরা দুজনে অনায়াসে ভাগ করিয়া লইব। কিন্তু তাঁহার ভাব-ভঙ্গী হইতে সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল, উহাকে জামিন দিব না। কয়েকদিন পরে অধিকলালের কোর্টেই উহার বিচার হইল। বিচারের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় রামগোবিনের 'মুনিমজি' (manager) অধিকলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। একটি খাম তাহার হাতে দিয়া বলিল—মালিক বলিয়াছেন এটা আপনাকে ফিরাইয়া দিতে। অধিকলাল খাম খুলিয়া দেখিল—এটা সেই হ্যাণ্ডনোটটা যাহাতে সে ছাত্রজীবনে সই করিয়াছিল। অধিকলাল বলিল—"এটা ফেরত নেব কেন ? টাকা দিয়ে তবে নেব।"

"মালিক বলেছেন ও টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না।"

"তোমার মালিকের দান আমি নেব কেন ? এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে—"

মুনিমজি হ্যাণ্ডনোটটি লইয়া ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। বিচারে রামগোবিনকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া অধিকলাল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। রামগোবিন তাহার বাবার বন্ধু ছিল, ছেলেবেলাকার নানা ছবি মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য আইনের অমোঘ নিয়মকে সে কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে বিচারকের আসনে বসিয়া।

……মাস ছয়েক পরেই কিন্তু রামগোবিন ছাড়া পাইয়া গেল। সে আপীল করিয়াছিল। আপীলে নাকি অধিকলালের রায় টেকে নাই। আর একটা খবরও অধিকলালের কানে আসিল। এস-পি যোগীন্দর সিং এবং একজন এস-ডি-ও নাকি রামগোবিনের জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক তদ্বির করিয়াছিলেন। তাহাদের হাত দিয়াই নাকি রামগোবিন প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। রামগোবিন ছাড়া পাইবার কিছুদিন পরেই অধিকলাল একটি উকিলের চিঠি পাইল।

রামগোবিন লিখিয়াছে এক মাসের মধ্যে হ্যাণ্ডনোটের টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে। অধিকলাল গভর্ণমেণ্ট প্লীডারকে চিঠিটি দেখাইল। তিনি সব শুনিয়া যে উত্তর লিখিয়া দিলেন তাহার মর্ম এই যে আমার মক্কেল অধিকলাল মণ্ডল, যখন ওই হ্যাণ্ডনোটে সই করিয়াছিল তখন সে নাবালক। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়াছিল মাত্র। সুতরাং আইনের চক্ষে তাহাকে এজন্য দায়ী করা যাইবে না। ঋণটা স্বর্গীয় রংলাল করিয়াছিল এবং তাহার বিষয় হইতেই এ ঋণ উসুল করা উচিত। …কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাশ্রুনয়নে রামগোবিন আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া বলিল—বাবুজি, আমি ওই টাকার জন্য তোমার নামে কি মোকদ্দমা করিতে পারি? আমার মুনিমজি আমাকে না জানাইয়া উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া ওই চিঠি তোমাকে পাঠাইয়াছে। আমি আজ হঠাৎ টের পাইলাম। ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া। অধিকলাল তাহাকে যে জেলে পাঠাইয়াছিল এবং টাকার জোরে সে যে আবার জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এ কথার উল্লেখমাত্র সে করিল না। অধিকলাল বলিল—আমার হাতে টাকা নাই এখন। পরে আমি বাবার ঋণ শোধ করিয়া দিব। কিংবা বাবার যে পাঁচবিঘা জমি আছে শুনিয়াছি, সেটা আপনি বিক্রয় করিয়া আপনার ধার শোধ করিয়া লইতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাতে। রামগোবিন বলিল—সে জমিতে সমুন্দরি গিয়া বাস করিতেছে। রণছোড়ও সেখানে জুটিয়াছে। সে জমির ত্রিসীমানায় যাইবার সাধ্য আমার নাই ….। জেনানীর সহিত কাজিয়া (ঝগড়া) লড়াই করিয়া……।

এস-পি যোগীন্দর সিংকে লইয়া অধিকলাল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরা অবিবাহিত, সুরূপ, অসমসাহসী এবং নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত। বড়লোকের ছেলে। নিজের একটা ভালো মোটরকার আছে। সেটাকে লইয়া সর্বত্র দাবড়াইয়া বেড়ায়। উচ্চপদস্থ অফিসার, সুতরাং সে প্রায় অপ্রতিহতগতি। লোকে তাহার নানাবিধ কুকীর্তি সম্বন্ধে উদাসীন নহে, তবুও তাহাকে সকলে সেলাম করে। অধিকলাল পপুলার নহে, কিন্তু যোগীন্দর সিং পপুলার। এই যোগীন্দর সিং অধিকলালের বাড়িতে যখন তখন আসিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় অধিকলালের অনুপস্থিতিতেও। ফুলেশ্বরী একমুখ হাসিয়া তাহাকে সম্বর্ধনা করিত। কারণও ছিল ইহার। অধিকলাল সরকারী কাজ ছাড়া আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিত না। ফুলেশ্বরীর ইচ্ছা গাড়ি লইয়া বাজারে বাজারে ঘোরে, সিনেমায় যায়, অন্যান্য অফিসারদের বাড়িতে গিয়া আত্মআস্ফালন করে। কিন্তু অধিকলাল আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিতে দেয় না। বলে—যাইতে চাও রিকশায় যাও। ফুলেশ্বরী উত্তর দেয়—কালেকটার সাহেবের বউ আমি রিকশায় যাইব কি। আমার কি মানসম্ভ্রম নাই?

অধিকলাল কোনও উত্তর দেয় না। কিন্তু গাড়িও দেয় না। সিনেমা হাউসের মালিকরা 'পাস' পাঠায়, কিন্তু অধিকলাল সে 'পাস' ব্যবহার করে না। বলে—যদি সিনেমা দেখিতে চাও পয়সা খরচ করিয়া যাও। এইরকম যখন অবস্থা তখন যোগীন্দর সিং রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন তাঁহার সদ্য-কেনা চকচকে মোটরখানা লইয়া। ফুলেশ্বরীকে একদিন আড়ালে বলিলেন, আমাদের কালেক্টার সাহেব একটু ছিট্‌গ্রস্ত লোক, অনেস্টির (honesty) বাতিক তাঁহাকে 'বাউরা'র (পাগলের) পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। যাই হোক, আপনি কিছু ভাবিবেন না। আমার মোটর আপনি যখনই চাহিবেন পাঠাইয়া দিব। আমার আপিসে 'ফোন' করিলেই হইবে। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর লইয়া ফুলেশ্বরী রোজই প্রায় বাহির হইয়া যাইত। অধিকলাল বাধা দিত না কারণ সে অনুভব করিত বাধা দিলে যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে তাহাতে তাহার সংসারই পুড়িয়া যাইবে হয়তো। সে আশা করিয়া রহিল একদিন ফুলেশ্বরীর আত্মসম্মানবোধ স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠিবে তখন সে নিজেই সামলাইয়া লইবে নিজেকে। একদিন কিন্তু বাধা দিতেই হইল। কয়েকটি দোকান হইতে 'বিল' (Bill) লইয়া জনকয়েক দোকানদার একদিন সসঙ্কোচে অধিকলালের সহিত দেখা করিলেন। সকলেই প্রায় এক কথাই বলিলেন। কোনও দোকান হইতে মেমসাহেব কিছু শাড়ি ধারে লইয়া আসিয়াছেন, কোনও দোকান হইতে এসেন্স, পমেড জাতীয় প্রসাধন দ্রব্য, একটা দোকান হইতে ঝুটা পাথর-বসানো একটা গিল্টির হার। অধিকলাল প্রশ্ন করিল, আপনাদের কোনও ক্রেডিট মেমোতে কি উনি সই করিয়া লইয়া আসিয়াছেন ? সকলেই বলিল, না, তাহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, দাম পাঠাইয়া দিব। কিন্তু এখনও পাঠাইয়া দেন নাই। হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন। এখনই টাকাটা দিবার দরকার নাই পরে কোনও সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমরা শুধু—।

অধিকলাল তাহাদের থামাইয়া দিল। হিসাব করিয়া দেখিল দেড়শ টাকার বিল। হাতে টাকা ছিল, তখনই সব শোধ করিয়া দিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাদের বলিয়া দেয়—আর ধারে কোনও জিনিসপত্র মেমসাহেবকে দিও না। কিন্তু একথা সে বলিতে পারিল না। তাহার আত্মসম্মানে বাধিল। ফুলেশ্বরীকে গিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি বাজার হইতে এইসব জিনিস ধারে কিনিয়া আনিয়াছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"আমার হাতে নগদ পয়সা ছিল না, তুমি তো নগদ পয়সা কিছু দাও না, সুতরাং ধার করিয়াই কিনিতে হইয়াছে।"

"ধার করিয়া আর কিছু কিনিও না। কিনিলে শোধ করিতে পারিব না। আমার মাহিনার অর্ধেক আমি জমা করিতেছি আমাদের ঋণ শোধ করিবার জন্য। সেজন্য কিছুকাল কষ্ট করিয়াই থাকিতে হইবে।"

"ওই জন্যই কি দিনে কেবল ছাতু খাইয়া থাক ?"

"ছাতু সস্তা, ছাতুর জন্য ডাল তরকারি প্রয়োজন নাই। তাছাড়া ছাতু আমার ভালোও লাগে। আর একটা কথা। তুমি যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে চড়িয়া বেড়াও কেন ?"

"যোগীন্দর সিং আমাদের বন্ধুলোক। চড়িলে ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি কি তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।"

[উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সম্ভবতঃ হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। অধিকলালের মুখেই এগুলি যোগেন শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই সে শুদ্ধ ভাষায় ব্যবহার করিয়াছে। মাঝে মাঝে এরূপ শুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন আরও আছে]

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল ফুলেশ্বরী ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর রোজ আসিত, ফুলেশ্বরী সাজিয়া গুজিয়া রোজ বাহির হইয়া যাইত। একদিন হঠাৎ অধিকলালের নজরে পড়িল একটা দামী শাড়ি পরিয়া ফুলেশ্বরী বাহির হইয়া যাইতেছে।

"আবার শাড়ি কিনিলে নাকি ?"

"কিনি নাই। এ শাড়িটা আমাকে উপহার দিয়েছে—"

ইহার পর অধিকলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সহসা তাহার মনে হইল ফুলেশ্বরী কখনও মা হইতে পারে নাই। তাহার জননীত্ব লাভের আশাও নাই। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহার ইনফ্যানটাইল ইউটেরাস্ (infantile uterus)—সন্তান লাভ করিলে হয়তো তাহার চরিত্রে পরিবর্তন আসিত। সন্তানের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাও আছে। চাপরাসীর ছোট ছেলেটাকে লইয়া প্রায়ই সে আদর করে। সহসা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তাহার মনে পড়িল—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ফুলেশ্বরীর মনেও ইচ্ছা আছে। কিন্তু হায় তাহা পূর্ণ হইবে না। তাই সে যখন শাড়িতে জরির ঝলক বিচ্ছুরিত করিয়া গটগট করিয়া যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে গিয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা হইল অধিকলালের। রাগ হইল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটাই তাহার মনের মধ্যে গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল—এ দুর্বলতা তো ভালো নয়। শাসন করা দরকার। আবার রবীন্দ্রনাথই তাহার কানে কানে বলিলেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

কিন্তু তবু সে ফুলেশ্বরীকে শাসন করিতে পারিল না। ফুলেশ্বরীকে সত্যই সে ভালোবাসিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ মেয়েটার একদিন মোহ-ভঙ্গ হইবে, সে নিজেই একদিন 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মতো তাহার কাছে অনুতপ্তচিত্তে ফিরিয়া আসিবে এই আশাই সে মনে মনে করিতে লাগিল। মুখে কিছুই বলিল না, মুখে সে

কোনদিনই কিছু বলিতে পারে না, সে প্রাণপণে কেবল নিজের আদর্শটাকেই আঁকড়াইয়া রহিল·········

সামান্য একটা কেরানী নিয়োগের ব্যাপারে যে এতটা অপমানিত হইতে হইবে অধিকলাল তাহা কল্পনা করে নাই। রাজপুত ভুঁইহার, কায়স্থ, মৈথীল, মুসলমান, বাঙালী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রার্থী ছিল। হরিজনও ছিল দুইজন। অধিকলাল নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মার্কশীট দেখিয়া এবং ইণ্টারভিউ লইয়া বাঙালী প্রার্থীটিকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাহারই নাম উপরে 'রেকমেণ্ড' করিয়া পাঠাইল সে। উপরওলা মিনিস্টারই নিয়োগ করিবার মালিক। অধিকলাল যাহাকে রেকমেণ্ড করিয়া পাঠাইয়াছিল মিনিস্টার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন না। নিযুক্ত করিলেন একজন জাতভাইকে। অধিকলাল ছাড়িল না, খোঁজ করিল কেন উপযুক্ত প্রার্থীকে চাকুরি দেওয়া হইল না। খবর পাইল বাঙালী ছোকরাটির সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্ট নাকি ভালো নয়। আর একটা খবরও পাইল সে। যে লোকটি চাকরি পাইয়াছে সে নাকি হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছে। কাহার হাতে দিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইল না। বাঙালী ছোকরাটি প্রথম শ্রেণীর এম-এ। সে বিবর্ণমুখে একদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি করব সার। আমি গরীব, ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। থাকলেও দিতাম না, অন প্রিন্সিপল্ দিতাম না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এখন কি করি। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টেও যদি সুবিচার না হয়, তাহলে বাঁচব কি ক'রে আমরা'।

অধিকলাল তাহার কথার জবাব দিতে পারিল না। সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার······

আজবলাল একটি গুণ্ডায় পরিণত হইয়াছে। তাহার দাদা ম্যাজিস্ট্রেট এই হুমকি দেখাইয়া সে নাকি অনেক লোকের কাছে অনেক অন্যায় সুবিধা আদায় করিতেছে। তাহার দলে ও-অঞ্চলের যত 'লোফার' এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোক জুটিয়াছে। আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাতে আজবলালের সুবিধা হইয়া গিয়াছে। রামগোবিনের একমাত্র পুত্র যোগীনাথ এক পতিতার বাড়িতে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিছুদিন পূর্বে। রামগোবিনের আর পুত্র হয় নাই। সবই কন্যা। আজবলালই নাকি যোগীনাথের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়াছে আজকাল। রামগোবিনের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছে সে। আজবলালের একটা সুনামও হইয়াছে ও অঞ্চলে। সে গুণ্ডা বটে কিন্তু 'রবিনহুড' জাতীয় গুণ্ডা। বড়লোকের ধনসম্পত্তি সে লুট করে কিন্তু লুটের টাকা নিজে সবটা আত্মসাৎ করে না। গরীবদেরও দান করে। এজন্য সে ও অঞ্চলে খুব 'পপুলার' হইয়াছে। মদ খায়, চরিত্রহীন, তবু পপুলার, কারণ গরীবদের সে 'মা বাপ'। ও অঞ্চলে সে নাকি একটা ডাকাতের দলই গঠন করিয়াছে। তাহারা ডাকাতি করিয়া যাহা কিছু রোজগার করে তাহার কিছুটা আজবলাল গরীবদের দেয়, বাকিটা দেয় রামগোবিনকে। আজবলালের চর অনুচরদের সহায়তায় সে সব চোরাই মাল রামগোবিন নাকি বড় বড় শহরে পাচার করিয়া দেয়। সে আর নিজের গুদামে চোরাই মাল রাখিতে সাহস করে না। একটা রাজনৈতিক দলেও নাকি আজবলাল পাণ্ডা হইয়াছে। রামগোবিনকে সে বুঝাইয়াছে আজকাল রাজনীতির যুগ, টাকা খরচ করিয়া

একটা রাজনৈতিক দলকে যদি নিজেদের হাতে রাখা যায় তাহা হইলে সুবিধা হইবে। রামগোবিনও সেটা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই টাকা খরচ করিতে সে আপত্তি করিতেছে না। ভ্রাম্যমাণ একজন মিনিস্টারকে সে নাকি খুব খাতির করিয়া ভোজ খাওয়াইয়াছে, দশ সের খাঁটি ঘৃতও নাকি উপহারস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরির সহিত আজবলালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে নাকি একদিন মদ খাইয়া বাড়িতে মাতলামি করিতেছিল, সমুন্দরি তাহাকে 'ঝাড়ু' মারিয়া বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। অধিকলাল আজবলালকে চিঠি লিখিয়াছিল, তুমি সৎপথে থাকিয়া ভদ্র জীবন যাপন কর। আবার যদি পড়িতে চাও পড়, আমি তোমাকে টাকা পাঠাইব। আজবলাল এ চিঠির জবাব দেয় নাই, নিজের স্বভাবও বদলায় নাই।……

আর একটি নিদারুণ সংবাদ বিচলিত করিয়াছে অধিকলালকে। সমুন্দরি নাকি রণছোড়কে চুমানা করিয়াছে। কেন করিয়াছে তাহার জবাব সমুন্দরি নিজেই দিয়াছে তাহার গোতিয়াদের (কুটুম্বদের)। বলিয়াছে, লোকেদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এ কাজ করিয়াছে সে। তাহাকে গতর খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। অতি ভোরে উঠিয়া সে ঢেঁকি কোটে। তাহার পর প্রায় মাইল দুই দূরে নিজের জমিতে গিয়া কাজ করে। তাহার পর ফিরিয়া আসে আবার বাজারে। সেখানে গোলায় আসিয়া 'দানা' (শস্য) ফাটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হয়। সন্ধ্যার সময় তাহার পা দুইটা খুব ব্যথা করে। 'পুতহু' (পুত্রবধূ) বা মেয়ে কাছে থাকিলে তাহাদের কাহাকে দিয়া সে পায়ে একটু গরম তেল লাগাইয়া পা টিপাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহারা কেহ তো কাছে নাই। নিজেই সে নিজের পায়ে তেল লাগাইয়া টিপিত। একদিন রণছোড় বলিল—আমি যদি টিপিয়া দিই তুমি আপত্তি করিবে কি।

ইহাতে সে আপত্তি করে নাই। কিন্তু সে 'কিরিয়া' খাইয়া (দিব্যি গালিয়া) এ কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে তাহার মনে কোন পাপ ছিল না। রণছোড়ের মনেও ছিল না। তাহার কোনও বদচাল সে কোনদিন দেখে নাই। সে প্রত্যহ নিজের আংনার (উঠানে) হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া বসিত, রণছোড় তেল গরম করিয়া তাহার পা মলিয়া (টিপিয়া) দিত। এই সামান্য ঘটনাতেই অনেকের রসনা 'ছনছন' (চনমন) করিয়া উঠিল। সকলে নানা রকম কুৎসা রটাইতে শুরু করিল। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই রণছোড়কে সে 'চুমানা' করিয়াছে। করিবেই বা না কেন ? ছেলে মেয়ে কেউ তাহার কাছে থাকে না, তাহাকে কাছে লইয়া যাইবারও উৎসাহ বা আগ্রহ কাহারও নাই। আজবলাল বিবাহ করে নাই, সে দারু (মদ) খাইয়া রান্ডির (বেশ্যার) বাড়িতে পড়িয়া থাকে। তাহাকে দেখিবে কে ? স্ত্রীলোকমাত্রেরই কি উচিত নয় একজন শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষের আশ্রয়ে থাকা ? তাহার ভয়ও করে মাঝে মাঝে। এখানকার নূতন দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি সে দেখিয়াছে, লোকটা প্রৌঢ়, তাহার বাড়ির চারিদিকে সে মাঝে মাঝে আসিয়া ঘোরাফেরা করে। তাহার চাল-চলন ভালো লাগে না সমুন্দরির। এই সব কারণে সমুন্দরি চুমানা করিয়াছে। তাহার খুশি হইয়াছে তাই করিয়াছে, সে কি কাহারও খায়, না, কাহারো পরোয়া করে।…

সমুন্দরির বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি জাগাইবার ঐশ্বর্য তাহার দেহে তখনও ছিল।

অধিকলাল সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। বলিবেই বা কি? ঘুমানো করা তো বে-আইনী কাজ নয়। হঠাৎ তাহার মনে হইল এত লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ হইয়াছে! কাহার কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিয়াছে সে। তাহার চাপরাসী লাট্টু, লেখাপড়া শেখে নাই। সে তাহার মা বউ ছেলে মেয়ে লইয়া সুখেই আছে। তাহারই কম্পাউণ্ডে থাকে তাহারা। তাহাদের মধ্যে আদর্শের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাত নাই। উহারা নিখুঁত নয়, মূর্খ, উহাদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু উহারা সুখী। অন্ততঃ আমার চেয়ে সুখী।

... ...

অধিকলাল যেন ঘরে-বাহিরে মার খাইতে লাগিল। একদিন দেখিল একটি মরা ছেলে লইয়া একদল লোক তাহার বাংলোর সামনে বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপার? একটি লোক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—হুজুর, আমার ছেলে। হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলাম. বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। হাসপাতালের নার্স ঔষধের একটি ফর্দ লিখিয়া দিয়াছিল কেবল। বাজারে গিয়া দেখিলাম সে ঔষধের মূল্য কুড়ি টাকা। আমার কিনিবার সামর্থ্য নাই। হাসপাতালে একফোঁটা ঔষধ দেয় নাই ছেলেটাকে। যখন ইংরেজ বাহাদুর এদেশে ছিল তখন হাসপাতালে বিনা পয়সায় দাবাই (ঔষধ) মিলিত, বিনা পয়সায় রোগীকে পথ্য দেওয়া হইত। এখন সে সব কিছুই নাই। এখন নগদ 'রুপিয়া' (টাকা) না ফেলিলে ডাক্তারবাবুরা 'নবজ্' (নাড়ী) পর্যন্ত দেখেন না।......অধিকলাল অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিল ব্যাপারটা সত্যই। হাসপাতালে গরীব রোগীরা ঔষধপথ্য পায় না। হাসপাতাল কয়েকজন সরকারী ডাক্তার ও নার্সের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের শিকার-ক্ষেত্র হইয়াছে। উহা হাসপাতাল নয়, ফাঁদ। ওখানে গরীব অসহায় রোগীদের ফাঁদে ফেলিয়া শোষণ করা হয়, দোহন করা হয়। অধিকলাল এ বিষয়ে সিভিল সার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন সব রোগীকে বিনা মূল্যে ঔষধপথ্য দিবার মতো অর্থ হাসপাতালের তহবিলে নাই। অধিকলাল কিন্তু খবর পাইল যে হাসপাতাল হইতে বাহিরের কোন কোন দোকানদার ঔষধ কম মূল্যে কিনিয়া বেশী মূল্যে বিক্রয় করেন। যে বড় ঔষধ বিক্রেতাটি প্রতি মাসে হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকেন, তিনি নাকি ঔষধই পাঠান না, শুধু 'বিল' পাঠান এবং সে 'বিল' 'পাস' হইয়া যায়। হাসপাতালের খাতায় ঔষধগুলি মিথ্যা করিয়া জমা করা হয় এবং মিথ্যা করিয়াই খরচ দেখানো হয়। আসলে ঔষধ হাসপাতালে আসেই না। এইসব খবর সংগ্রহ করিয়া অধিকলাল উপরে একটি কনফিডেনশাল (confidential) রিপোর্ট পাঠাইল যাহাতে এইসব অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করা হয়। কিন্তু উপরের দপ্তর-অরণ্যে তাহা কোথায় যে হারাইয়া গেল তাহার সন্ধান অনেকদিন মিলিল না। খবরটা চাপা থাকে নাই। অধিকলালের আপিস হইতেই হাসপাতালের ডাক্তাররা এবং সিভিল সার্জন খবরটা পাইয়া গেলেন। তদ্বির করিবার জন্য উপরে লোক ছুটিল। ডাক্তারদের চটাইয়া অধিকলালই বিপদে পড়িয়া গেল। ফুলেশ্বরীর তলপেটে একদিন খুব ব্যথা। সিভিল সার্জনকে 'কল' দিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন একটা জরুরী অপারেশনে ব্যস্ত আছেন, এখন যাইতে পারিবেন না। হাসপাতালের একজন তরুণ অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন একটু পরে মুচকি হাসিতে হাসিতে আসিলেন এবং সব

শুনিয়া বলিলেন—লেডি ডাক্তারকে দিয়া ভিতরটা একবার দেখান দরকার। লেডি ডাক্তারও জরুরী অপারেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে পারিলেন না। অধিকলাল শহরের একজন প্রাইভেট প্রাকটিশনারকে ডাকিয়া ফুলেশ্বরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। হাসপাতালের গরীব রোগীদের দুঃখ-দুর্দশা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও কিছুমাত্র লাঘব করিতে প্রারিল না। সে কেবল উপরে রিপোর্ট করিল—আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার নাই … … … … … …

…মিউনিসিপ্যালিটির একটি রাস্তাও মেরামত হয় নাই। সব রাস্তাই হাড় পাঁজরা-বাহির করা, চারিদিকে গর্ত, খানাখন্দ। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স পেয়াররা (tax payer) একদিন অধিকলালের কাছে আসিয়া হাজির হইল এবং ইহার প্রতিকার করিতে বলিল। ফোন করিতেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সসম্ভ্রমে বলিলেন—আমি চেষ্টা করিতেছি। ফাণ্ডে তেমন টাকা নাই। অধিকলালের সহসা মনে হইল ফাণ্ডে টাকা নাই কেন। ট্যাক্‌স তো আদায় হইতেছে,—তবে? মনে পড়িল সিভিল সার্জনও বলিয়াছিলেন ঔষধ কিনিবার টাকা নাই। সেদিন এক মাড়োয়ারী পেট্রল-বিক্রেতা গভর্ণমেণ্টের মোটরগুলিতে ধারে তেল দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বলিয়াছে—নগদ দাম দিয়া তেল কিনিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টকে ধারে তেল দিলে সহজে তাঁহারা প্রাপ্য টাকা দেন না। অনেক দিনের অনেক ধার জমিয়া আছে। গভর্ণমেণ্টের হাতেও নগদ টাকা নাই। সেজন্য অনেক মোটর তৈলহীন অবস্থায় অচল পড়িয়া আছে। টাকা নাই কেন? এত টাকা যে আদায় হয়, এত টাকা যে বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া আনা হইতেছে—সে সব কোন বাবদে কোথায় খরচ হয়? কে খরচ করে? মন্ত্রীরা প্লেনে করিয়া উড়িয়া বেড়ান, হোমরাচোমরা অফিসাররা ক্রমাগত নানা 'মিশনে' বিদেশে যাইতেছেন, দেশের ওজন বাটখারা 'সের'কে 'কিলো'তে পরিবর্তন করিবার জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয়িতও হইতেছে, বিদেশ হইতে আগত অতিথিবৃন্দকে সমারোহে সম্বর্ধনা করিবার আগ্রহ আমাদের কিছুতেই যেন কমিতেছে না…অথচ দেশে চাল নাই, গম নাই, চিনি নাই…শিক্ষা দিবার নামে কতকগুলো স্কুল কলেজ আছে বটে কিন্তু সেখানে শিক্ষা হয় না…শিক্ষকেরা পর্যাপ্ত বেতন পান না, ছাত্ররা উচ্ছৃংখল… গ্রাম হইতে একজন 'বি. ডি. ও'র (B. D. O.) বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে তিনি নাকি 'দো-হাত্‌তা' ঘুষ লইতেছেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটি দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এ ধরনের দরখাস্ত প্রায় আসে কিন্তু আপিসে ধামাচাপা পড়িয়া থাকে। এবার কমিশনার সাহেব অধিকলালকে পাঠাইলেন ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য। তদন্ত করিয়া ঘুষের কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু একটি বিষয়ে অধিকলাল নিঃসন্দেহ হইল। সেকালের নায়কেরা যে দাপটে ও যে আরামে গ্রামে বাস করিতেন এই বি. ডি. ও'-ও সেই দাপটে ও আরামে আছেন। গভর্ণমেণ্ট পুরাতন জমিদারি-প্রথা লোপ করিয়া নূতন ধরনের জমিদারি-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। … … … . … …

অধিকলাল দিন দিন ক্রমশঃ যেন বিমর্ষ হইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল সবই বৃথা, সবই বৃথা। এ শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে বটে কিন্তু একটি লোকও কি দেশকে আপন বলিয়া মনে করে? সবাই তো নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মত্ত। ট্রেনের কামরা হইতে আয়না, গদি প্রত্যহই চুরি

যাইতেছে। ইলেকট্রিক তার প্রায়ই অন্তর্ধান করিতেছে। বড় বড় অফিসাররাও ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন না। সকলেই নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিতে ব্যস্ত—দেশের কথা কেহ কি ভাবে? কেহ কি অনুভব করে? বক্তৃতায় যাহা বলে কাজে তো তাহা করে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িয়া গেল তাহার—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।
... ...

ফুলেশ্বরী এখনও বদলায় নাই। অধিকলাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে ... ...
... ...

...সেদিন অধিকলাল টুর হইতে ফিরিতেছিল। ট্রেনে একটি মাত্র ফার্স্ট ক্লাস 'বগী' ছিল। কিন্তু সেটিও পরিপূর্ণ। অধিকলালের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাহার চাপরাসী ও ক্লার্ক অন্য কামরায় চড়িয়াছিল। সুতরাং সে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাহা কেহ চিনিতে পারিল না। অধিকলাল চিরকালই আত্মপ্রচার-বিমুখ, সুতরাং সে সসঙ্কোচেই ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই একজন টিকিট কালেকটার আসিল এবং গাড়িতে উঁকি দিয়াই চলিয়া গেল। কাহারও কাছে টিকিট চাহিল না। অধিকলাল প্ল্যাটফর্মে নামিয়া তাহাকে নিজের টিকিট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি অন্য প্যাসেঞ্জারদের টিকিট চাহিলেন না কেন?"

"উহারা সব স্কুল-কলেজের ছেলে। সব উইদাউট টিকিটে যাতায়াত করে।"

"আপনারা টিকিট চানও না?"

"না। চাহিতে গেলে উহারা আমার প্রাণসংশয় করিবে।"

"পুলিশ নাই?"

"পুলিশ কিছু বলিবে না। তাহারা দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে কেবল।"

টিকিট কালেকটার হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অধিকলাল গিয়া ট্রেনে চড়িল। বসিবার জায়গা পাইল না, একধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের স্টেশনে নামিয়া গেল অনেক ছেলে। জন দুই মাত্র রহিল। তাহারাও ছাত্র। আরও দুই স্টেশন পরে নামিবে। অধিকলাল তাহাদের পাশেই বসিল এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। হিন্দীতেই আলাপ হইল।

"আপনারাও ছাত্র?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ করিবেন না তো?"

"না, না, কি বলুন—"

"আপনারা সব নাকি উইদাউট টিকিটে যান—"

ছাত্রটি আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিল—"যাই!" দ্বিতীয় ছাত্রটি একটু রুখিয়া বলিয়া উঠিল—"যাইব না কেন ? সবাই তো লুটেরা (ডাকাত), কোন ন্যায্য ব্যাপারটা হয় বলুন। বাজারে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, কালোবাজারীরা সেখানে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছে। আমাদের কলেজে প্রতি মাসে বেতন লওয়া হয়, কিন্তু পড়ানো হয় না, মাস্টাররা ঘুষ খাইয়া খারাপ ছেলেকে ভালো নম্বর দেন, ভালো ছেলেরা পাত্তা পায় না, এ বাজারে যাহার টাকা, যাহার লাঠির জোর তাহারই জয়জয়কার। দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া এ স্বাধীনতা লইবার কি দরকার ছিল ? কি লাভ হইয়াছে ? উদ্বাস্তুতে দেশ ছাইয়া গেল। পাকিস্তানের কাছে আমরা শান্তির জন্য সর্বদা হাতজোড় করিয়া আছি—কি লাভ হইয়াছে এ স্বাধীনতায় ? সবাই লুটেরা হইয়া গিয়াছে, আমরাও হইয়াছি—"

"আরে ভাই, ছাড়ো ওসব কথা। আপনি কি করেন সাহেব ?"

"আমি সরকারী চাকরি করি। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার খুব কষ্ট হয়। বিশেষতঃ ছাত্রদের এইসব বিক্ষোভ, আন্দোলন, উচ্ছৃংখল আচরণে আমি বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ি। আপনারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—"

"ভাবিবেন না। আমরাই আবার দেশকে ঠিক করিয়া তুলিব। আগে আবর্জনা পরিষ্কার করা দরকার। বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে যাহারা বোমা পিস্তল বন্দুক লইয়া অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অভিযান চালাইয়াছিল, তখন তাহাদেরও অনেকে ডাকু, গুণ্ডা, খুনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, তাজা 'খুন' বহাইয়া দিয়াছিলেন, আজ আমরা বুঝিতেছি তাঁহারা মহৎ শহীদ ছিলেন, ডাকু বা খুনী ছিলেন না—"

দ্বিতীয় ছাত্রটি বলিলেন—"কে জানে হয়তো তাহারাই আবার এ যুগে জন্মিয়াছে, এই ভুয়ো-স্বাধীনতার মিথ্যা মুখোশটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য আবার তাহারাই হয়তো প্রাণপণ করিতেছে। এ যুগের ছাত্রদের অত ছোট করিয়া দেখিবেন না, তাহারাও আদর্শবাদী। তাহারা কিন্তু কোথাও আদর্শের স্বরূপ দেখিতে পাইতেছে না। কোথাও কোনও আশা নাই, সব অন্ধকার। ঘরে, বাহিরে, স্কুলে, কলেজে, হাটে বাজারে, ইলেকশনে, শাসন পরিষদে, এমন কি সাহিত্যিকদের লেখাতেও তাহারা আশা বা আদর্শের আলো পাইতেছে না। তাই তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা 'ভুখা', তাহারা পিপাসিত। ছাত্রদের মধ্যে সবাই যে ভালো তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চই বলিব সকলে খারাপও নয়—অনেক ভালো আছে—" এই ধরনের অনেক কথা হইল। ছাত্র দুইটি নামিয়া গেল। অধিকলাল ··· ··· ··· ···

টুরে বাহির হইয়া নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করে সে। একবার স্টেশনের একটা ওয়েটিংরুমে পরবর্তী ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, একটি ভিখারী আসিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা, চুল রুক্ষ, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুইটা কিন্তু অদ্ভুত। শাণিত ব্যঙ্গ দৃষ্টি চকমক করিতেছে চোখের দৃষ্টিতে। অধিকলাল প্রথমে ভাবিয়াছিল সাধারণ মূর্খ ভিখারী বুঝি। কিন্তু কথা কহিয়া বুঝিল লোকটি সাধারণ তো নহেই, মূর্খও নহে, যদিও সে নিজের পরিচয় কিছুতেই দিল না। লোকটি বাঙালী, বাংলাতেই কথা হইল।

"ভিক্ষে চাইছ কেন ? লজ্জা করে না ?"

"লজ্জা কিসের ? এ দেশের সব বড় বড় লোকই তো ভিক্ষুক। বুদ্ধদেব ভিক্ষা করতেন না ? আমাদের গভর্ণমেণ্টই তো ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! দুচারটে লোক ছাড়া এদেশের সমস্ত লোকই তো হয় ভিখারী, না হয় চোর, না হয় ভিখারী প্লাস চোর। আমি শুধু ভিখারী, আমাকে কিছু দিন দয়া করে, দুদিন খাইনি—"

"তুমি নিজেকে ভিখারী মনে করছ কেন ? তুমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক একজন—"

লোকটি হাসিমুখে অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"স্বাধীনতা ?" বলিয়া চটাস্ করিয়া একটা তুড়ি দিয়া আবার চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"ম্যাজিকের মতো এলো আবার উড়ে গেল। কিছু দেবেন তো দিন, আর না দেন তো আর কারো কাছে যাই—"

"দিচ্ছি তোমাকে কিছু। কিন্তু পরিশ্রম করে রোজগার করাই উচিত—"

"ভিক্ষে করতেও তো পরিশ্রম করতে হয় মশাই। সারাদিন টো টো করে হাঁটছি, এতে পরিশ্রম হয় না ভেবেছেন ? পরিশ্রম করে অনেক পরীক্ষা পাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু লাভ হয় নি, ভিক্ষে করে বরং কিছু কিছু পাই রোজ—"

আট আনা পয়সা পাইয়া লোকটি হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

"আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন ?"

"সে সব কথা থাক—"

হঠাৎ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

... ...

"তুমি যে রোজ এমন সেজেগুজে যোগীশ্বরের সংগে বেরোও এতে তোমার লজ্জা হয় না ?"

"লজ্জা কিসের ? আমি কালেকটার সাহেবের বউ, আমার আবার লজ্জা কি। সবাই তো আমাকে খাতিরই করে দেখি। সাজগোজ না করিয়া গেলেই বরং বেমানান হইত। যে সমাজে আমরা মিশি, সেখানে কেহই 'ন্যাংটা' নয়—"

"কিন্তু চাকর-বাকররা তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে ? তাহারা চাকর হইলেও সব বুঝিতে পারে।"

"তাহারা কি মনে করে না করে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাইতে চাই না।"

"উহাদের চোখের দৃষ্টি যাহা বলে তাহা অত্যন্ত অসম্মানজনক। উহারা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিয়া বাহিরে সেলাম করে, কিন্তু আসলে উহাদের চোখে আমি একটি 'বুদ্ধু' মাত্র। তোমার চালচলন মোটেই ভদ্র নয়।"

সাপের মতো ফোঁস করিয়া উঠিল ফুলেশ্বরী।

"আমার চালচলন ঠিকই আছে। তাহা লইয়া তোমার মাথা না ঘামাইলেই ভালো হয়।"

নখুও ভালো চাকরি পাইয়াছে। সে আই. এ. এস হইতে পারে নাই। বি. সি. এস পরীক্ষাটা ভালোভাবে পাশ করিয়াছে। কিছুদিন চাকরি করার পর অধিকলালকে সে যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহা এই :

খুদরু দা,

আমাদের বাড়িটা তনু কিছুতে বিক্রয় করিতে দিল না। অগত্যা তাই আমরা একজন কেয়ারটেকার রাখিয়া দিয়াছি। পরে যাহা হয় করা যাইবে। তনুর ছেলের বয়স পাঁচ বৎসর হইল। তনু তাহার ছেলে ও স্বামীকে লইয়া আমাদের বাড়িতে গিয়াছিল। দিন দশেক ছিলও। মা-ও বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছেন তাঁহারও ইচ্ছা নয় যে বাড়িটা অপরের হাতে চলিয়া যায়। বিশেষতঃ রামগোবিনের হাতে যাক মা এটা চান না। ওখানকার স্কুলের নূতন হেডমাস্টার শ্যামশঙ্করবাবুই বাড়িটিতে বাহিরের দিকে থাকেন। আমরা যে কেয়ারটেকার চাকরটি রাখিয়াছি, তাহারই সহায়তায় তিনি বাড়িটিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বাড়ির সামনের বাগানটি এখনও তেমনি চমৎকার আছে। শ্যামশঙ্করবাবুর বাড়ি দেওঘরের কাছে। তিনি চমৎকার কতকগুলি গোলাপ গাছ আনাইয়া নাকি লাগাইয়াছেন। আমি ছুটি পাই নাই বলিয়া যাইতে পারি নাই, তনু আমাকে অনেক করিয়া যাইতে লিখিয়াছিল। ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। যদি পাই তাহা হইলে যাইব এবার। তুমিও যদি আসিতে পার খুব আনন্দের হইবে। তনু লিখিয়াছে তুমি যদি আস সেও আবার আসিবে। তুমিও খুদরুদা ছুটির দরখাস্ত কর। তুমি আসিবে শুনিলে মাও হয়তো আবার আসিতে পারেন। একটি সুসংবাদ দিতেছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় তো তুমি আসিতে পারো নাই। ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় কিন্তু আসিতে হইবে। আমি চেষ্টা করিতেছি পূর্ণিয়াতেই বদলি হইবার জন্য। তুমি যদি তখন থাকো তোমার নিকটেই কিছু কাজ শিখিব। হ্যাঁ আর একটা কথা। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। চিঠিতে তাঁহার নামটা আর করিব না। তিনি বলিলেন—অধিকলাল কাজে কর্মে খুব ভালো। সে যদি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার দ্রুত উন্নতি হইত। কিন্তু তাহার মাথায় ছিট আছে—অনেস্টির (honesty) ছিট। এজন্য কাহারও সহিত সে মানাইয়া চলিতে পারে না। সকলকেই সে চটাইয়াছে। এমনকি জনৈক হোমরা-চোমরা অফিসার নাকি নেহেরুজির কাছে গিয়াও তোমার নামে নালিশ করিয়াছেন। নেহেরুজি সব শুনিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্রলোকটি। নেহেরুজি নাকি বলিয়াছেন—ওই রকম লোকই তো চাই। ওকে পাগলা বলিতেছেন কেন, হি ইজ অনেস্ট। এ খবর যদি সত্য হয় তাহা হইলে নেহেরুজি তোমাকে হয়তো দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারেন। তবে খুদরুদা— একটা কথা বলিব ? রাগ করিবে না তো। যখন চাকরি করিতেই হইবে তখন ওপর-ওয়ালাদের চটাইয়া কোন লাভ নাই। ·····

একবার 'টুর' উপলক্ষেই অধিকলাল স্বগ্রামে গিয়াছিল। উঠিয়াছিল সরকারী ডাক্‌বাংলোয়। অনেকেই তাহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য আসিয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা পুরাতন কৃতী ছাত্র হিসাবে স্কুলে একটি বিশেষ অভিনন্দন সভার আয়োজনও করিয়াছিলেন। সে সভায় কিন্তু সে যায় নাই। সে স্কুল ফাণ্ডে একশত টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিল। সমস্তদিন সরকারী ডাকবাংলোয় বসিয়া সরকারী কাজই করিল সে। যে রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা হিসাবে আজবলাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিল সেই রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ছোকরাকে লইয়া স্বয়ং রামগোবিন

আসিয়া হাজির। তাহার 'আর্জি' অধিকলাল যদি উক্ত রাজনৈতিক দলের আপিসে গিয়া একবার পদার্পণ করে তাহা হইলে আজবলাল কৃতার্থ হইয়া যাইবে। সে 'লেহাজসে' (লজ্জায়) নিজে আসিতে পারে নাই। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল—সে এখানে সরকারী কাজে আসিয়াছে, সভা-সমিতি বা অন্য কোন স্থানে সে যাইবে না। তবু সে দুই জায়গায় গিয়াছিল। কাজ যখন শেষ হইল তখন সে গিয়াছিল তপনকান্তিবাবুর বাড়িটাতে। স্কুলের শিক্ষক শ্যামশঙ্করবাবু তখন ওখানে ছিলেন না। বাড়ির 'কেয়ারটেকার' চাকরটাকে লইয়া সে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরিয়া দেখিল। যে লাইব্রেরি ঘরটায় বসিয়া সে পড়াশুনা করিত সেই লাইব্রেরির বারান্দায় গিয়া খানিকক্ষণ বসিল। সেই গাছটা এখনও বাঁচিয়া আছে যে গাছে সে তনুর জন্য দোলনা টাঙাইয়া দিয়াছিল। সেই গাছটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। সেই সেকালের ছোট তনুই যেন তাহার আশে-পাশে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।.........

তাহার পর গেল সে তাহার মায়ের কাছে। গিয়া দেখিল মা বাড়িতে নাই, মাঠে গিয়াছে। রণছোড়ও গিয়াছে। কুঁড়ে ঘরটার দিকে চাহিয়া রহিল সে। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তাহার উপর বড় বড় তালপাতাও রহিয়াছে কয়েকটা। আশেপাশে কয়েকটা ছাগল চরিতেছে। অধিকলাল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাঠের দিকেই অগ্রসর হইল সে। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। গোধূলি আসন্ন। গরুর দল ধূলো উড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছে। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড এক-বোঝা ঘাস মাথায় করিরা সমুন্দরি আসিতেছে। তাহার পিছনে রণছোড়। তাহার মাথাতেও একবোঝা ঘাস। অধিকলাল প্রথমে তাহার মাকে চিনিতেই পারে নাই। ঘাসের প্রকাণ্ড বোঝায় তাহার মুখটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার হনহন করিয়া চলার ধরন দেখিয়াই অধিকলাল চিনিতে পারিল মাকে।

"মা"—

দাঁড়াইয়া পড়িল সমুন্দরি। তাহার পর ধপাস্ করিয়া ঘাসের বোঝাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অধিকলাল দেখিল তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

"কে খুদরু ?"

"হ্যাঁ—"

অধিকলাল খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া মায়ের এই হাঁপানি দেখিল। রণছোড়ও পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"কে বাবুয়া—?" হাসিমুখে আগাইয়া আসিল সে। অধিকলাল তখন বলিল—মা তুমি এই বয়সে এত কষ্ট কেন করিতেছ ? তুমি আমার কাছে চল। তোমরা দুইজনেই চল।

সমুন্দরির চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিল—না, বেটা আমি মজুরণী। হাকিমের বাড়িতে আমি থাকিতে পারিব না। যে কয়দিন বাঁচিব 'দুখধান্দা' (দুঃখকষ্ট) করিয়া কাটাইয়া দিব। আমার তেমন দুঃখও নাই, কষ্টও নাই, গতর খাটাইয়া খাই, কাহারও দুয়ারে হাতও পাতি না, কাহারও তোয়াক্কাও করি না। আমি কোথাও যাইব না, যেমন আছি তেমনি থাকিব। আমি ভালোই আছি।

তাহার পর সে বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লইয়া আবার হাঁটিতে লাগিল। নির্বাক

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অধিকলাল। সহসা দেখিল সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্ত-লগ্ন একখণ্ড মেঘ যেন রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।·········

তাহার প্রেসিডেন্সী কলেজের এক বন্ধু তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার খানিকটা টুকিয়া দিতেছি। এ ছেলেটি কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়াছিল। পসার এখনও জমে নাই বলিয়া মন দিয়াছিল রাজনীতির দিকে। অধিকলালকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করিত। সে লিখিয়াছে—

"তোমার মতো আদর্শবাদী গভর্ণমেন্টের চাকুরি করিতেছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বর্তমানে শাসনের নামে যাহা চলিতেছে তাহার সমর্থন কোনও আদর্শবাদী লোক করিতে পারিবে বলিয়া আমি মনে করি না। ডেমোক্র্যাসির (democracy) নামে এ এক অদ্ভুত ধরনের ডিক্‌টেটারশিপ্ (dictatorship)। টাকার dictatorship। টাকা থাকিলে সব হয় এদেশে। শুধু পাকিস্তান হিন্দুস্তান নয়, আমাদের দেশ আরও বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া আশংকা করি। প্রাদেশিকতা ও কম্যুনালিজমের বিষে আমরা জর্জরিত হইয়া আছি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরাজিকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্থানে হিন্দীকে বসাইবার চেষ্টা—হিন্দী ইম্পিরিয়ালিজ্‌মেরই নামান্তর একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছে। এ দেশের হোমরা-চোমরা বড়লোকরা কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ইংরাজি পড়াইতেছে। দেশে নূতন নূতন অনেক মার্কিন স্কুল স্থাপিত হইতেছে, যে সব স্কুলের বেতন গরীবদের নাগালের বাহিরে। যাহারা আরও বড়লোক তাহারা নিজেদের ছেলেদের বিলাতে পড়াইতেছে। অর্থাৎ বড়লোকের ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, গরীবের ছেলেরা হিন্দী পড়িয়া চিরকাল তাহাদের চাকর হইয়া থাকিবে—এই ধরনের একটা মতলবও যেন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে আমার কাছে। তুমি বিহারী এ বিষয়ে তোমার সত্য অভিমত কি জানিতে ইচ্ছা হয়। তোমার মত আমার নিকট মূল্যবান, কারণ তোমাকে আমি একজন পক্ষপাতহীন খাঁটি লোক বলিয়া মনে করি। সকলকেই যদি আইন করিয়া ইংরেজি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহার একটা মানে বুঝিতে পারি কিন্তু কতকগুলি লোক টাকার জোরে ইংরেজি শিখিবে আর বাকিরা শিখিতে পারিবে না এ ব্যবস্থাকে ন্যায়সংগত মনে করিতে পারি না। আমরা ইংরেজদের পোষাক-পরিচ্ছদ খানা-পিনা কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের লোকসভা প্রভৃতিও উহাদেরই নকলে, আমাদের স্বাধীনতাও উহাদের দান—আমরা বহুভাবে উহাদের কাছে ঋণী, এমন কি হাত পাতিয়া অর্থসাহায্যও আমরা উহাদের নিকট লইতে দ্বিধা করিতেছি না। সবই লইতেছি কেবল উহাদের ভাষা ও সাহিত্য—যাহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য—তাহাকেই 'বয়কট' করিব কেন—ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছি না। হিন্দীওয়ালারা নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশটাকে আবার সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে ঠেলিয়া দিবে নাকি? ইংরেজ আসিবার পরই আমাদের উন্নতি হইয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? ইংরেজ আমাদের শোষণ করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে,—সবই সত্য। কিন্তু তাহারাই আমাদের মানুষ করিয়া গিয়াছে তাহারাই যে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে একসূত্রে বাঁধিয়া অখণ্ডতা দান করিয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? কার্জন সাহেবের সবুট লাথিই আমাদের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়াছে। সেই

লাথিই ধূমন্ত বাঙালীকে জাগাইয়াছে। সেই জাগ্রত বাঙালী মনীষাই দেশে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনশঙ্খ বাজাইয়াছে এ সব তো ঐতিহাসিক সত্য……বর্তমানের শাসনকর্তারা যেন এসব সত্যকে আমোলে আনিতে চান না। তাঁহারা কতকগুলি half truth সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের যে বিকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তুমি দেখিয়াছ কি? তাহা পড়িলে মনে হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর অহিংস দলই যেন একমাত্র সেনানী। বাংলাদেশের শহীদদের দেশের জন্য প্রাণ-বিসর্জন যেন হিংসাত্মক হীন প্রচেষ্টা…এইসব সত্যকে চাপা দিবার প্রয়াস উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের ম্লান করিবার এই সব হাস্যকর স্পর্ধা দেখিয়া…সম্মুখে নূতন 'ইলেকশন'…তুমি…।

[চিঠিখানা সব পড়িতে পারা যায় নাই]

ইহার উত্তরে অধিকলাল লিখিয়াছিল—

ভাই তোমার চিঠি পাইলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে একটি ছোট কবিতায় দিয়া গিয়াছেন। সেইটিই উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেছি।

হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই
কবি কহে তার গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরই পিছু পিছু।

…হ্যাঁ ইলেকশন আসন্ন। আগামী ইলেকশনে একটা হইচই হইবে বলিয়া আশংকা করিতেছি। আমাকে অন্যত্র বদলি করিবে শুনিতেছি। ঠিকই লিখিয়াছ, আমি চাকুরি করি বলিয়া সব সময় বিবেক-নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারি না। তবু চেষ্টা করি। কিন্তু সে চেষ্টাও সব সময়ে ফলবতী হয় না। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই দুইটি অবশ্যকর্তব্য পালন করা ক্রমশঃই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। দেশের ভদ্রলোকেরা, ভালো লোকেরা সত্যই বিপন্ন এবং মুমূর্ষু। যে ধর্ম দেশকে সৎপথে চালিত করে সে ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত। সে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমূল পরিবর্তন দরকার। দরকার এক আদর্শবাদী নির্ভীক সমাজ যে সমাজের লোকরা সত্য-শিব-সুন্দরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। সেই সমাজ, আগামী যুগের সেই যুগন্ধরদের নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাতেই লাগিয়া পড়………

……যেখানে অধিকলাল বদলী হইয়া গেল সেখানে ধূমে ধূলায় এবং উত্তাপে রাজনৈতিক গগন বেশ সমাচ্ছন্ন। যাঁহারা শাসন-বিভাগে মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন তাহাদের আসন নাকি টলমল। ইলেকশনের সময় খুব গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা।… আর একটা ব্যাপারও কাক-তালীয়বৎ ঘটিয়াছে। অধিকলালের সহিত যোগীন্দরও বদলী হইয়া আসিয়াছে। ফুলেশ্বরী ভারী খুশী হইয়াছে ইহাতে। অধিকলাল খুশী হয় নাই, কিন্তু অখুশী ভাবটা প্রকাশ করে নাই। প্রকাশ করাটা অশোভন তো বটেই, নিষ্ফলও। আর একটা অস্বস্তিজনক ব্যাপারের মধ্যে গভর্ণমেন্ট তাহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এজন্য একজন পূর্বপরিচিত এবং বন্ধু-স্থানীয় এস-পি আসাতে অধিকলাল একটু নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টাও করিতেছে। কারণ এসব ব্যাপারে পুলিশের আন্তরিক এবং অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা শক্ত হইয়া

উঠে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে পোলিং অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। দুইটি পরাক্রান্ত ব্যক্তি ভোটদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। তাহার মধ্যে একজন আবার মন্ত্রী—তাহার মনিব-স্থানীয়। তিনি নিজে অবশ্য তাহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুগত চরেরা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। বলিয়াছে এবার যদি অমুক বাবু পুনরায় নির্বাচিত হন তাহা হইলে আবার তিনি নিঃসন্দেহে মন্ত্রী হইবেন। যদি মন্ত্রী হন তাহা হইলে অধিকলালের প্রভুত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ এই মন্ত্রী মহাশয় অধিকলালের প্রতিভা এবং সততায় মুগ্ধ। কিন্তু ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি জেতে তাহা হইলে অধিকলালের সমূহ বিপদ। অর্থাৎ···অধিকলাল সবই বুঝিল। মুখে বলিল—আমি যথাসাধ্য আমার কর্তব্য পালন করিব। দেখিব যাহাতে ভোটাররা ঠিকমতো নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। দেখিব যাহাতে ভোটগণনার সময় কোনরূপ কারচুপি না হয়। ইহার বেশী আর কি করিতে পারি। মন্ত্রী মহাশয় অনুভব করিলেন এ ছোকরাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া বিপথে চালিত করা সম্ভব নয়। এ গোঁয়ার ছোকরার নিজের সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞান একেবারে নাই।।···

······যোগীন্দরজির মোটরে চড়িয়া এখানেও ফুলেশ্বরী ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা লইয়া অনেকে গোপনে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, অধিকলালকেও এই কুৎসার উত্তাপ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে ইহা লইয়া কখনও কোন উচ্চবাচ্য করে না, বরং মনে হয় সেও যেন যোগীন্দরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।···কিছুদিন হইতে যোগীন্দরজি ফুলেশ্বরীকে রিভলভার ছোঁড়া শিখাইতেছে। তাহাকে একটা ভালো রিভলভার উপহারও দিয়াছে। যোগীন্দরজি প্রায়ই বক্তৃতা দেয় যে প্রত্যেক ভারতীয় রমণীই বীরাংগনা, সুযোগ পাইলে সকলেই সুভদ্রা, দ্রৌপদী, রানী দুর্গাবাঈ, পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতি ওয়াদ্দেদার হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক রমণীরই উচিত কোন না কোন একটা শস্ত্র-শিক্ষা করা। সুযোগ এবং সুবিধা যখন আছে তখন ফুলেশ্বরী রিভলভার ছোঁড়া শিখিবে না কেন? এই উপলক্ষে প্রায়ই তাহারা মাঠে চলিয়া যায় এবং সেখানে রিভলবার লইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করে ·····

ইলেকশনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। টেলিগ্রাম করিয়া অধিকলালকে অন্য জিলায় বদলি করা হইল। তাহার স্থানে আসিলেন একজন খয়ের খাঁ ধুরন্ধর অফিসার যিনি দিনকে রাত এবং 'হয়কে 'নয়' করিতে ওস্তাদ। অধিকলাল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইল 'আমাকে এখান হইতে বদলি করা হইয়াছে, সুতরাং আমার উপর ইলেকশনের যে ভার দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিরূপে চালাইব নির্দেশ দিবেন'। উপর হইতে হুকুম হইল, "তুমি কলেকটারশিপের চার্জটা দিয়া দাও নূতন লোককে, কিন্তু ইলেকশনের ব্যাপারটা তোমাকেই শেষ করিয়া আসিতে হইবে"। ····

ভোট দেওয়া যখন শেষ হইয়া গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দিন সকাল হইতে ভোট গণনা করিবার কথা, তাহাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকলালকে একজন গোপনে খবর দিয়া গেল যে সব বাক্সে ব্যালট পেপারগুলি আছে সেগুলি যদি সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি চুরি হইয়া যাইবে, তালা ভাঙিয়া নূতন ব্যালট পেপার তাহার ভিতর পুরিয়া দিবে। অধিকলাল ঠিক করিল রাত্রেই সে সমস্ত ভোট গণনা শেষ করিয়া ফেলিবে। মিলিটারি পাহারার সাহায্যে

লইয়া চারিদিকে অনেক আলো জ্বালাইয়া। সে নিজের সামনে সমস্ত ভোটগুলি গণনা করাইল। এজন্য সে সমস্ত রাত্রি রিভলভার হাতে লইয়া বসিয়া রহিল পোলিং বুথে। দেখা গেল পরাক্রান্ত মন্ত্রী মহাশয় অনেক ভোটে হারিয়া গিয়াছেন। ভোট গণনা যখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন সে নিদারুণ খবরটা পাইল। যোগীশ্বরজি (এম পি) নাকি রিভলভারের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। গুলিটা তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি এখন হাসপাতালে। ঘটনাটা ঘটিয়াছে নাকি অধিকলালের বাড়িতেই। অধিকলাল তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়া যাহা দেখিল তাহা আরও ভয়ানক। ফুলেশ্বরী গলায় দড়ি দিয়াছে। টেবিলের উপর যে ছোট চিঠিটা হিন্দীতে লেখা রহিয়াছে তাহার বাংলা এই—

"আমি চলিলাম। পরজন্মে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য অপেক্ষা করিও"......

...আজবলালও ভোটযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছিল। সেও অনেক ভোটে জিতিয়াছে ...নূতন ক্যাবিনেটে একজন মন্ত্রীও হইয়াছে সে...

অধিকলাল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে তাহার মায়ের কাছে গিয়াছিল। ছেকা-ছেনি ভাষায় তাহাদের যে কথা হইয়াছিল তাহা এই।

"কি হাকিম সাহেব, কি খবর—"

"আমি আর হাকিম নই। আমি তোমার ছেলে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। তোমার কাছেই থাকব, তোমার সঙ্গেই মাঠে গিয়া চাষবাসের কাজ করব।"

"ও কাজ তুমি পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারব—"

"ঢের হয়েছে। ওসব মজুরের কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমি তোমাকে দুবেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারব। চাকরি ছাড়লে কেন?"

"চাকরি করতে পারলাম না।"

সমুন্দরি অধিকলালকে কোনদিন মাঠে যাইতে দেয় নাই। শেষে অধিকলাল গ্রামেরই কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া একটা পাঠশালার মতো খুলিয়াছিল। বিনা পয়সায় সকলকে পড়াইত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া পাঠশালার 'পণ্ডিতজি' হইয়াছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। অনেক ছেলেমেয়ে জুটিতে লাগিল। রামগোবিন আসিয়া হাজির হইল একদিন। বলিল—তুমি যে মহাত্মা লোক তাহা আমি অনেকদিন আগেই বুঝিয়াছিলাম। এখন বল কিভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি? পাঠশালার জন্য একটা পাকা ঘর বানাইয়া দিব? অধিকলাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"না এখন সে সব দরকার নাই। এখন আমার পাঠশালা গাছতলাতেই বসুক—"

এইভাবেই কোনক্রমে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাও চলিল না। সমুন্দরি একদিন মাঠ হইতে ফিরিল না। একটা ডুলিতে করিয়া তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া আনিল মাঠের চাষারা। রণছোড় বলিল প্রকাণ্ড একটা ঘাসের বোঝা

মাথায় লইয়া সমুদ্দারি বাড়ির দিকেই আসিতেছিল—হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না। হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল রণছোড়।

... ...

[ইহার পর অনেকটা অংশ নাই। নখুকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল সেইটি শুধু আছে]

ভাই নখু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। বেশ, তোমাদের বাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার মা যে আমার কাছে এসে থাকতে চেয়েছেন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি আর কল্পনা করতে পারি না। তোমার ও তনুর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার আমি নিশ্চয়ই নিব। বনিয়াদটা ভালো করে দেব, তারপর তাদের বড় স্কুলে কলেজে পড়িও। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদেরও আমি পড়াব তোমার বাড়িতে। আমাদের দেশ পুণ্যভূমি। আমাদের দেশে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মানুষ করতে হবে। এখন শিক্ষার দোষে তারা জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমাদেরই লজ্জা, আমাদেরই অক্ষমতা। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভালোবাসা মহৎ প্রেরণা দিয়ে তাদের গড়তে হবে। তাদের জন্য সব দিতে হবে, নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে, তবেই তারা মানুষ হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ছে—

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী ॥
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে।

আমি সব দিতে প্রস্তুত আছি ভাই। আমার ভালোবাসা নাও। মাকে প্রণাম দিও।

ইতি
খুদরুদা

গোপালদেবের স্বপ্ন

উৎসর্গ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গঙ্গার তীর। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। একটা শুষ্ক গাছের উচ্চ শাখে বসিয়া তীক্ষ্ন মিহি সুরে একটা চিল তাহার সঙ্গিনীকে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকে ছোট বড় বালুর স্তূপ। শীর্ণ-ধারা গঙ্গা একটা সংকীর্ণ খাতে বহিতেছে। খাতের দুই পাশে নানারকম সবুজ। দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝাউ-গাছ। এখানে—এই বালুর চরে—সবই যেন অবাধ। এখানে যেন সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। কোন প্রহরী নাই। নাম-না-জানা কয়েকটা পাখী নদীর উপরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ফড়িং প্রজাপতিও দেখা যাইতেছে, একটা ছাগলের পিঠের উপরে ফিঙে বসিয়া আছে একটি। এই বিরাট চরে—এই আলো-বাতাস-আকাশের রাজত্বে—দৃষ্টি দিগন্তরেখায় গিয়ে ঠেকে। কোথাও কোন বাধা নাই।

এই চরে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কার্তিক আসিয়া হাজির হইল। আর তাহার পিছনে পিছনে আসিল একটা ল্যাবরাডর কুকুর। কার্তিকের হাতে একটি ময়লা থলি। থলিটি নামাইয়া বসিল সে। বসিয়া নিজের পা-টা দেখিল। পা-টা মচকাইয়া গিয়াছিল। কুকুরটা তাড়া করিয়া গেল ছাগলটাকে। উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল ছাগলটা।

লর্ড ফিরিয়া আসিল। তাহার চোখে স-প্রশ্ন দৃষ্টি।

"পরের ছাগল ধরতে যেও না। ও ছাগল আমরা হজম করতে পারব না। পারো তো মুর্গি-টুর্গি ধর একটা—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। কার্তিক বাঁ পায়ের পাতাটাকে নাড়াইয়া দেখিল খানিকক্ষণ। তাহার পর কুকুরটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, লর্ড, তুমি আমার পিছু পিছু বাড়ি থেকে চলে এলে কেন। আমি তো একটা ভ্যাগাবণ্ড, আর তুমি তো একটি রাক্কোস। আমার নিজের খাবার যোগাড় করাই মুশকিল, তোমার খাবার পাব কোথায়—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। তাহার পর থাবা গাড়িয়া বসিয়া থাবার উপর মুখটি রাখিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বিস্কুট নেই, লেড়ুয়াও নেই, একটি পয়সা পকেটে নেই। কি খাবি এখন? বোকা ভূত কোথাকার, কেন চলে এলি আমার সঙ্গে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। লর্ড অভিজাতবংশীয় কুকুর। তাহার কুচকুচে কালো রং রেশমের মতো চকচকে। চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, দুষ্টু দুষ্টু। মুখটি সুশ্রী, কান দুটি ছোট ছোট, মখমলের মতো নরম। কপালটি চওড়া। বুকটাও চওড়া। কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া সে ক্রমাগত ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

কাছেই একটা বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। কার্তিক উঠিয়া গিয়া তাহারই গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। খানিকক্ষণ সে সবিস্ময়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। শিকড় নয় যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ, প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর থলিটা উপুড় করিল সে। থলি হইতে বাহির হইল একটা ছেতো-ধরা রুটির আধখানা, অনেক তরিতরকারি এবং ফলের খানিকটা খোসা, বিবর্ণ লাল শাক, একটা লোহার ছোট কড়াই এবং খুন্তি, আর কয়েকটা ছোট ছোট টিন। প্রত্যেকটি

টিনের ঢাকনা খুলিয়া খুলিয়া দেখিল সে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। গুঁড়ো মশলা একেবারে নিঃশেষ হয়- নাই। এসব ছাড়াও বাহির হইল একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া জাবদা গোছের খাতা। খাতাটা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল সে।

কার্তিককে দেখিলেই মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। কয়েকদিনের অনাহারে, অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে তাহার মুখে কিন্তু একটা ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে। বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখের কোলে কালী, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ের পাঞ্জাবী সিল্কের, কিন্তু ময়লা হইয়া গিয়াছে। পায়জামাটার অবস্থাও ভদ্র নহে। পায়ে জুতা নাই।

লর্ড হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল। গঙ্গার শীর্ণ জলধারার আশেপাশে গোটা তিনেক বাটান চরিতেছিল। উড়িয়া গেল।

"ছি, ছি, লর্ড উড়িয়ে দিলে। আগে দেখতে পেলে আমি গুলতি বার করতুম।"

পকেট হইতে সে একটা গুলতি এবং কয়েকটি মাটির গুলিও বাহির করিল।

আবার লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল, কার্তিক দেখিল সেই বামনটা আসিতেছে। তাহার হাতেও একটা থলি। সার্কাস-পলাতক এই বামনটার সহিত রাস্তায় আলাপ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে লোকটা আর সঙ্গ ছাড়িতেছে না। কার্তিক চাহিয়া রহিল তাহার দিকে কয়েক মুহূর্ত। প্রকাণ্ড মাথা, হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিতেছে। লর্ডের সহিত কয়দিনেই খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। লর্ড তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল।

বামন মুখে আঙুল ঢুকাইয়া জোরে সিটি দিল একটা। তাহার পর মুখ সুচালো করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল—হুই—হুই—হুই—

তাহার পর আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্ত। আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। কাছে আসিয়া বলিল—"আমি গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিলাম। তুমি বললে, গঙ্গার ঘাটে যাবো—সেখানে গিয়ে দেখি মেলা লোক চান করছে। অনেক খুঁজলাম তোমাকে। ওদিক পানে গেলাম—গিয়ে দেখি শ্মশান। তারপর এই দিকে এলাম হাঁটতে হাঁটতে—"

"তুমি চরের ওপারে বড় গঙ্গায় গিয়েছিলে?"

"হিঁ"। অনেক হেঁটেছি। কোথাও পাই না তোমাকে। কিন্তু আমি বেঁটে বীর আনটারাম, ছাড়বার পাত্র নই। ঠিক করলুম খুঁজে বার করবই। করলামও। হুই—হুই—হুই—"

বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। লর্ডও ঘেউ ঘেউ করিয়া লাফাইতে লাগিল তাহার চতুর্দিকে।

"তুমি হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেলে কোথা। তোমাকে বললাম, চল গঙ্গার ধারে যাই, তার আগে কিছু খাবারও জোগাড় করতে হবে, তারপর গঙ্গার ধারে গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ব—"

আনটারাম আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিল—"ভীড়ের মধ্যে ঢুকেছিলাম রোজগারের চেষ্টায়। কিছু রোজগার করলামও। নানারকম খেলা দেখালাম। মাথা মাটিতে রেখে পা দুটো আকাশপানে তুলে বনবন করে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। চড় চড় চড় করে হাততালি পড়ল। বললাম—হাততালিতে পেট ভরবে না দাদা। পয়সা চাই।

আরও একটা খেলা দেখাচ্ছি। নাচ দেখাব একটা। ভীল সর্দারের ওয়ার ডান্সটা দেখালাম। তরোয়াল ছিল না, কিন্তু একটা বাখারি দিয়েই মাত্ করে দিলাম। অনেক পয়সা পড়ল। তিন টাকা বারো আনা। এই থলিটা কিনলাম। কিছু কুঁচো চিংড়ি আর আধখানা লাউ কিনলাম। কাঁচা লংকাও কিনেছি—তুমি কোনও খাবার যোগাড় করতে পেরেছ—? সন্দেশ কিনব ভাবলাম, কিন্তু বড্ড দাম—"

"আমার পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে। সেদিন তুমি চপ কাটলেট খেতে চাইলে, তাইতেই সব পয়সা ফুরিয়ে গেল আমার—"

"খাসা ছিল কিন্তু চপ কাটলেটগুলো। আমাকে মোহিনী মাঝে মাঝে খাওয়াত কিনা, তাই লোভ হয়ে গেছে—"

"মোহিনী কে?"

"সার্কাসের একটা মেয়ে। ওস্তাদ মেয়ে। ছাতা নিয়ে তারের উপর গটগট করে চলে যায়। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে টপ্ করে চড়ে আবার টপ করে নাবে। আর সাইকেল যা চালায়—এক চাকায়, দু'চাকায়, দুমড়ে, মুচড়ে সে এক কাণ্ড—!"

"সার্কাস থেকে পালালে কেন?"

"ওই যে বললাম, সবাই আমাকে ক্ষেপাত। আমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না কেউ। চাকরবাকরগুলোও আমাকে ডাকত—এরে বামুনা, এরে নাটা। মোহিনীকে একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলাম—তোকে আমি ভালোবাসি মোহিনী। বললে—জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদা বেঁটে কোথাকার। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাস—"

তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল সে।

"অথচ আমি কোন বংশের ছেলে তা যদি জানত হারামজাদি—"

কার্তিক ও প্রসঙ্গে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করিল না। সে থলি হইতে যে জিনিসগুলা বাহির করিয়াছিল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ওগুলো কি খাওয়া উচিত?"

"কি ওগুলো, কোথায় পেলে?"

"একটা ডাস্টবিন হাঁটকে বার করেছি। তার মধ্যে এই খাতাটাও ছিল। একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—"

"যাবে না কেন? পাঁউরুটির ছেতোগুলো ধুয়ে ফেলি। শাক আর খোসাগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। তার সঙ্গে লাউ আর কুঁচোচিংড়ি, আর কাঁচা লংকা দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলি এস। নুন-টুন আছে তো?"

"আছে। গোলমরিচের গুঁড়ো পেঁয়াজ আর হলুদের গুঁড়োও আছে। একটু তেল পেলে ভালো হতো। মাছগুলো লাল করে ভেজে নিলে—"

"তেল নিয়ে আসছি। কাছেই একটা মুদির দোকান আছে। এখনও আমার পয়সা আছে কিছু—"

আনটারাম আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া পায়ের উপর পা-টা তুলিয়া দিল। দশদিন হইল শ্বশুরবাড়ি হইতে অপমানিত হইয়া শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়াছে সে।

বড় শালা তাহাকে জুতো ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। মারিবেই তো, বেকার ঘরজামাইকে সেকালে লোকে পুষিত, একালে পুষিতে পারে না। সহসা তাহার মনে হইল সেকালের লোকও কি পুষিত ? 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' কথাটা তো সেকালেরই। না, বেকার লোককে কোনকালেই কেহ প্রশ্রয় দেয় না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার তুলিয়া লইল সে। উপন্যাস পড়িতে বরাবরই ভালোবাসে। কলেজে যখন পড়িত তখন পাঠ্যপুস্তকের দিকে তত আগ্রহ ছিল না। লাইব্রেরি হইতে উপন্যাস প্রচুর পড়িয়াছিল। বি-এতে থার্ড ক্লাস অনার্স পাইয়াছিল ইতিহাসে। চাকুরি জুটে নাই। বাবা মা কেহ নাই। ভাই বোনও না। মামার বাড়িতে মানুষ। চেহারাটা ভালো ছিল বলিয়া এক বড়লোক জমিদার সাধিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিয়াছিলেন। একটি ছোট শালা উকিল হইয়াছেন। তিনি অনেকদিন হইতেই বলিতেছিলেন এইবার তুমি চরিয়া খাও, আর আমি তোমার ভরণপোষণ করিতে পারিব না। কার্তিক কথাটায় এতদিন কান দেয় নাই। কারণ সে জানে চরিয়া খাইবার মতো মাঠ নাই দেশে। কিন্তু পাদুকা-প্রহারের পর আর সেখানে থাকা গেল না। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়, তাহার বড় শালার সিল্কের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া সে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগেও গিয়াছে। সেইদিনই লোকটা হঠাৎ মারমুখী হইয়া উঠিল। স্ত্রী নিমুর রোগা মুখটা মনে পড়িল তাহার। ভাসা-ভাসা অশ্রুভরা চক্ষু দুইটি আবার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে বলিয়া আসিয়াছে দেশে হুগলী জেলায় তাহার যে পৈতৃক ভিটা আছে সেইখানে সে যাইতেছে। গ্রামটার নাম সিংরা। কখনও সেখানে যায় নাই। সেই অচেনা গ্রামে গিয়া সে সংসার পাতিবে। কুঁড়েঘরে শাকান্ন খাইয়া নিমুকে লইয়া সুখে থাকিবে। এই তাহার আশা। এই আলেয়ার পিছনে সে এখন ছুটিতেছে। হাতে পয়সা নাই। জুতা জোড়া একটা মুচিকে বিক্রয় করিয়াছে। বিক্রয় করিবার মতো আর কিছু নাই। হাতে পয়সা থাকিলে ট্রেনে হুগলি যাইত। সেখানে গিয়া সিংরা গ্রামের সন্ধান করিত। কিন্তু পয়সা নাই। হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। মুঙ্গের হইতে হুগলি কতদূর ? কে জানে। কাল অন্ধকারে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা খানার ভিতর পড়িয়া গিয়া পা-টা মচকাইয়া গিয়াছে। ভাগ্যে আনটা ছিল, সে তাহাকে টানিয়া তুলিল ; কিছুদূর কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিল। অসম্ভব জোর ছোঁড়াটার গায়ে। পথের বন্ধু। ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন। নিজের পরিচয় বলিতে চায় না। বলে—সার্কাস হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আর কিছু বলিতে চায় না। আজ হঠাৎ মোহিনীর কথা বলিল। হঠাৎ যেন তাহার মন খুলিয়া গেল। জুতো জোড়া বিক্রয় করিয়া সে পাঁচসিকে মাত্র পাইয়াছিল। রাস্তার পাশের একটা দোকানে বসিয়া চা আর লেড়ুয়া খাইতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, আনটা তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কার্তিক লর্ডকেও খান দুই লেড়ুয়া দিয়াছিল। লর্ডের মুখ হইতে কয়েকটুকরা লেড়ুয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। কার্তিক দেখিল আনটা সেই টুকরাগুলির উপরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তাহাকে বলিতেই হইল—"আপনি চা খাবেন ?" সঙ্গে সঙ্গে আনটা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিয়াছিল—"হিঁ"—"। সে 'হাঁ'কে 'হিঁ' বলে। খাওয়া শেষ করিয়া সে যখন আবার চলিতে শুরু করিল দেখিল আনটাও তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। সে যখন মোড় ফিরিল আনটাও ফিরিল। তখন তাহাকে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনি কোথা যাবেন—"

"তোমার সঙ্গে। বন্ধু হ'য়ে গেলাম—"

'আপনি' না বলিয়া সে একেবারেই 'তুমি' বলিল।

মুচকি হাসিয়া কার্তিককে হাতটা বাড়াইয়া দিতে বলিল।

"বেশ চল। কিন্তু জেনে রাখ, আমি বেকার।"

"আমিও তাই। কাজ জুটিয়ে নেব কোথাও না কোথাও। দু'খানা হাত দু'খানা পা আছে তো—অ্যাঁ কি বল!"

"তা তো বটেই। লেখাপড়া কতদূর?"

"সেদিকে অষ্টরম্ভা, ম্যাট্রিক ফেল! সার্কাসে ঢুকেছিলাম! থাকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম। দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে—"

লর্ডকে কার্তিকই পুষিয়াছিল। একজন বড়লোকের ছেলে তাহাকে বাচ্চাটা দিয়াছিল। এজন্য তাহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে শালার কাছে। বলিত—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শংকরাকে ডাকে। লর্ড তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এ লোকটাও জুটিল। আজ কিন্তু সে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছে—এ তো একটা অ্যাসেট্ (assel)—টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। উঠিয়া পড়িল। নদীর ধারে গিয়া ছেতোধরা পাঁউরুটি, শাক আর খোসাগুলো সে ধুইয়া ফেলিল। কড়া আর খুন্তিটাও মাজিল। এ দুইটা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। ঠিক নিজস্ব নয়, শালার পয়সাতেই কেনা। বাড়িতে মাঝে মাঝে রান্না করিত সে। শৌখীন নূতন রকমের রান্না কচু, আলু সিদ্ধ করিয়া তাহাতে প্রচুর আদার রস দিয়া (এবং ঘি দিয়া) কচবালবাদা প্রস্তুত করিয়াছিল একবার। বড় শালাও খাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অনেক মাছের ছানা জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গামছা থাকিলে ছাঁকিয়া তুলিতে পারিত। লুব্ধ দৃষ্টিতে মাছের ছানাগুলোর দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইঁট জোগাড় করিল গোটা চার। শুকনা ডালপালা জোগাড় করিল কিছু। উনুন চাই। কিন্তু উনুন খুঁড়িবে কি করিয়া? না খুঁড়িলে কি উনুন ধরিবে? একটু গর্ত মতো হওয়া দরকার।

"লর্ড—লর্ড—"

কোথায় গেল কুকুরটা। গাছের পিছনে যে ঝোপঝাড় ছিল সেখান হইতে লর্ড সাড়া দিল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। কার্তিক গিয়া দেখে লর্ড সেখানে গর্ত খুঁড়িতেছে। সম্ভবত ইঁদুর বা ছুঁচোর সন্ধান পাইয়াছে। অন্য সময় হইলে কার্তিক তাহাকে বকিত। এখন কিছু বলিল না। খুঁড়ুক খানিকটা। লর্ড বেশ খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর তাহার ভিতর মুখ ঢুকাইয়া দিল। নাকে মুখে মাটি লাগিয়া গেল। আবার খুঁড়িল খানিকটা। কোথায় ইঁদুর, কোথায় ছুঁচা, কিছুই নাই।

"সর দেখি—"

কার্তিক আশ পাশের জঙ্গল ছিঁড়িয়া গর্তটার চারিদিক পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর হাত দিয়া মাটিগুলো সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে লাগিল গর্তটা কত বড় হইয়াছে। লর্ড ঘাড় বাঁকাইয়া কান খাড়া করিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে চাহিয়া রহিল গর্তটার দিকে। যদি কিছু বাহির হইয়া পড়ে।

"হুই—হুই—হুই—"

তাহার পরই একটা শিস। আন্‌টা আসিতেছে বোঝা গেল। কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আন্‌টা বেশ দ্রুতপদে আসিতেছে।

"এই শিশিটাও কিনে নিলাম। তেল না হলে রাখব কিসে? রোজই তো তেল লাগবে।"

"বেশ করেছো—"

"আর এই ছুরিটাও। লাউ কুটতে হবে তো—"

"সব খরচ করে' ফেললে?"

"না, আনা চারেক আছে এখনও। বাঃ, তুমি তো খাসা উনুন বানিয়েছ দেখছি।"

"লর্ড বানিয়েছে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল এবং অকারণে চীৎকার করিল—কাপ্‌ কাপ্‌ কাপ্‌। লর্ডের গলা দিয়া নানারকম ডাক বাহির হয়।

আন্‌টা নদীর শীর্ণধারার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতে কি চান করা চলবে?"

"বোধহয় না—"

"আরে আরে আরে!"

"কি—"

"হুই দেখ—বগমামা। তোমার গুলতিটা কোথা গেল। লর্ডের খাবারটাও যোগাড় করে ফেলি!"

গুলতি লইয়া আন্‌টা বকটার দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া বসিল। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। লর্ড হামাগুড়ি দিয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। দেখা গেল আন্‌টার লক্ষ্য অব্যর্থ। বকটা ঝটপট করিয়া কিছুদূর উড়িল, কিন্তু পড়িয়া গেল শেষ পর্যন্ত। লর্ড বনবন করিয়া ছুটিয়া গিয়া মুখে করিয়া লইয়া আসিল সেটাকে।

"ওটা তুইই খা। দাঁড়া পালকগুলো ছাড়িয়ে দিই—"

লর্ড প্রথমে কিছুতেই দিতে চায় না। অনেক ছুটাছুটি করিয়া তাহার মুখ হইতে আন্‌টা বকটা কাড়িয়া লইল। কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"কুঁচো চিংড়ি কি করে কুটব?"

"এদিকে এস। একটা ইটও আন। ওরই উপর একটু রগড়ে নাও না। তারপর লাল করে ভাজ—"

ঘণ্টা দুই পরে।

আন্‌টা হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বকের পালক চারিদিকে ছড়ানো। উনুনটার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। কার্তিকের চোখে ঘুম নাই। অশ্বত্থ গাছের জটিল গুঁড়িটার উপর ঠেস দিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। রোদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল রোদটা যেন একটা বাঘ। রোজ ভোরে আসে আর পৃথিবীর বুক হইতে রস শোষণ করিয়া লয়। তাহার পর অসংলগ্ন-ভাবে মনে হইল নিমু কি এখন ছাতে বসিয়া বড়ি দিতেছে? চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল। মনে পড়িল, নিমু তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল। বলিয়াছিল, "চলে যেও না। দাদা রাগী মানুষ, রাগের মাথায় একটা কাজ করে

ফেলেছে, আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি দাদার পাঞ্জাবী আর পোরো না। থাকো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব? ভগবান একটা ছেলেপিলেও তো দেন নি—"। নিমু চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়াছিল। এই ছবিটা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সে তখন নিমুকে বলিয়াছিল—কেঁদো না, আমি সিংরায় পেঁছে তোমাকে নিয়ে যাব। এরকম গলগ্রহ হ'য়ে পশু-জীবন যাপন করতে আর বোলো না আমাকে। নিমু তবু কাঁদিয়াছিল। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। পাণ্ডুলিপির পাতাটা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। পাণ্ডুলিপিটা তুলিয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল আন্টা। তাহার ঘুম খুব সতর্ক।

"কি হ'ল কুকুরটার আবার।"

"কিছু দেখেছে বোধহয়।"

আন্টা উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বোকাটা! গাছের উপর চড়াই পাখী দেখে লাফালাফি করে মরছে। যেন ধরতে পারবে—"

আন্টা শুইল আবার।

"আবার ঘুমুবে না কি।"

"না, আর ঘুম হবে না। একবার ঘুম ভাঙলো তো নিশ্চিন্দি। আর দু'পাতা এক হবে না—"

"তাহলে এইটে শোন—"

"কি ওটা—"

"পড়ছি শোন না।"

"পড়। ছেলেবেলায় রামায়ণ শুনতে খুব ভালো লাগত—পড়, পড়—আমি শুয়ে শুয়ে শুনি—"

কার্তিক পড়িতে শুরু করিল। আন্টা তাহার পাশে শুইয়া পড়িল।

"সূত্রধার প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে চম্পকের মালা। ললাটে রক্ততিলক। কেশদামে মেঘমহিমা। দৃষ্টি স্বপ্নময়। পরিধানের কাষায় বস্ত্রে স্বর্ণ-দ্যুতি! শুভ্র উত্তরীয়টা বন্ধুর মতো কণ্ঠ-লগ্ন। উত্তরীয়ের ফাঁকে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ দেখা যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা। সূত্রধার করজোড়ে নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সম্ভবত মহাকালকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অনন্ত-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটক বারবার অভিনীত হয়েছে, বারবার অভিনীত হবে, বিস্মৃতির পলিমাটিতে যা বারবার আচ্ছাদিত হয়, আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে নবরূপে নবীন দীপ্তিতে, যার বাণী দিবসে সূর্যের মতো, রাত্রিতে নক্ষত্রময়, যার তেজ নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুরে অমর—তারই কথা আমি প্রথমে বলব একটি রূপকের আকারে। তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে থাকিয়া তিনি গোপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোপালবাবু, এবার হয়তো আপনার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে। তখন আপনি দেখবেন দুঃসাধ্য সাধনই মানুষের ব্রত, অসম্ভবকে সম্ভব করেই তার কীর্তি কালজয়ী হয়েছে। তার আগে অনলস আর অরূপের রূপকথাটি শুনুন। এই রূপ-কথাই কাব্যে মণ্ডিত হয়ে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে নানারূপে।

কখনও রক্তসমুদ্র সন্তরণ করে, কখনও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রার পুরোভাগে। যে শক্তি চিরচঞ্চল, সেই অনলস। তাকে আমি পুরুষরূপে কল্পনা করেছি। আর যার বিশেষ কোন রূপ নেই, কিন্তু যা নানারূপে বিকশিত হবার জন্যে সদা উন্মুখ, সেই অরূপ। এদের কথোপকথন শ্রবণ করুন।

অনলস বলছিলেন—"আমি তো এক মুহূর্ত থামতে পারি না। অনন্তের অন্ত দেখবার অসম্ভব আশা আমাকে পাগল করে তুলেছে। জানি না সে আশা পূর্ণ হবে কিনা—"

অরূপ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

"অনন্তের অন্ত পেতে মিথ্যা কেন চেষ্টা ভাই
অন্ত যার স্পষ্ট তার সবটা তুমি দেখতে পাও ?
দেখতে পেলে দেখতে তুমি সান্তই যে অনন্ত
পরমাণুর আকাশেতেই মহাকাশ বিলম্বন।
ছোট্ট ফুল ছোট্ট নয়, সত্যি অতি মস্ত সে
তারই তরে সূর্য ওঠে পবন হয় প্রমত্ত
তারই তরে আকাশব্যাপী ষড়ঋতুর রহস্য
অন্তহীন লীলা তাদের টের পাও কি বয়স্য ?"

অনলসের ভ্রূকুঞ্চিত হল। তারপর তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, "না পাই না। কাজের ডাক ছাড়া আর কোনও ডাক শুনতে পাই না আমি। কাজের পর কাজ, তারপর আরও কাজ, একটার পর একটা কাজের মধ্যেই হারিয়ে ফেলতে চাই নিজেকে। কিন্তু পারছি না। তুমি তোমার কাব্যের সেতারে যে মীড় টেনে বার করতে পার আমি তাও পারি না। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব ?"

"বল—"

"আমার মনে হয় তুমি সময় নষ্ট করছ। সুরের মীড় টেনে যে স্বপ্ন দেখছ তা অবাস্তব—"

আবার অরূপ হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

অবাস্তব নয় স্বপ্ন :
বিষ-মগ্ন
ধূর্জটির চোখে পড়েছে স্বপ্নের ছায়া।
পার্বতীর কায়া
স্বপ্ন-বিনির্মিতা ;
কর্মের হল-মুখে উঠেছিল স্বপ্ন-সীতা।
শূন্যের নীল আঁখি
থাকি থাকি
বর্ণের আভাস পায় স্বপ্ন থেকে
সন্ধ্যা ঊষা রামধনু এঁকে যায় যাহা সব
স্বপ্ন তাহা—নয় অবাস্তব।

অনলস একটু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অরূপের মুখের দিকে। তারপর বললেন—"আমি স্বপ্ন দেখতে পারি না বলেই হয়তো এত খেটেও ঠিকমতো কিছু

করে উঠতে পারি না। আমি জানি কাজের চাকায় জগৎ চলছে, আমি সেই চাকা হ'তে চাই, তোমার স্বপ্ন কি সে চাকায় তেল জোগাতে পারবে ? তোমার স্বপ্ন তো কোনও কাজে মূর্ত হচ্ছে না। একটা রঙীন ধোঁয়ার মধ্যে বাস করছ তুমি। কি করবে তুমি এই অকেজো স্বপ্ন নিয়ে—"

"কিছুই করব না। কিছু করাটা তো আমার লক্ষ্য নয়, যদি কিছু হ'য়ে ওঠে আপনি হবে, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমি কেবল দেখে মুগ্ধ হই। আমার লক্ষ্য আনন্দ, এবং পেলে সেটা আঁকড়ে ধরে রাখা। কিন্তু রাখা যায় না, মুশকিল ওইখানে। দেখতে দেখতে লাল নীল হয়ে যায়, নীল রূপান্তরিত হয় সবুজে। মদমত্ত মাতঙ্গ প্রজাপতি হয়, দৈত্য দেখতে দেখতে হ'য়ে যায় পরী। তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা আর করি না। আমি স্বপ্ন-বিলাসী। এতে তোমার রাগ কেন—"

"রাগ তোমার নাগাল পাই না বলে। কে যেন আমার মনের ভিতর বসে অনবরত বলছে তোমাকে পেলেই আমার কাজের গোছ হ'য়ে যাবে। তুমিই আমার কাজের প্রেরণা। কিন্তু তুমি আমার নাগালের বাইরে কখন কোন স্বপ্নের আকাশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছ তার ঠিক পাই না। মন খারাপ হয়ে যায়।"

অরূপ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"আমারও মনের ভিতর কে যেন বলে অনলসের নাগাল না পেলে তুমি সার্থক হবে না। তবু আমি এখনও স্বপ্নের আমেজেই আছি। স্বপ্ন কেন দেখি জান ? স্বপ্ন চোখে আটকে থাকে না। আগে আমার আটকে রাখার প্রবৃত্তি ছিল, তাই দুঃখ পেতাম। এখন বুঝেছি চলে যাওয়াটাও সুন্দর। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের শোভাযাত্রা দেখি আজকাল। কি ভালোই যে লাগে। —তুমি কাজ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছ সেটাও খারাপ লাগে না। মেঘ দৌড়য়, হাওয়া দৌড়য়, এমন কি গাছের অঙ্কুররাও স্থির হয়ে বসে নেই। নিখিল বিশ্বে সবাই ছুটেছে, তুমিও তার সঙ্গে ছুটছ এটা আমার বেশ লাগে, কিন্তু আমার মনে হয় নিখিল বিশ্বের ছোটার যে ছন্দ তার সঙ্গে তোমার ছোটার ছন্দ ঠিক যেন মিলছে না। বললে বিশ্বাস করবে না, আমিও মনে মনে দৌড়াই তোমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারলে হয়তো আনন্দই পেতাম। কিন্তু পারি না। তোমার কর্ম বড় স্থূল। দড়ির মতো জড়িয়ে যায় হাতে। ও স্বপ্নের মতো চলে যায় না, স্থূল অস্তিত্ব নিয়ে অনড় হয়ে থাকে, আর ফাঁপিয়ে তোলে মিথ্যা অহমিকাকে—"

অনলস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"তুমি গীতা পড়নি ?"

"পড়েছি"—উত্তর দিলেন অরূপ—"কিন্তু গীতা পড়লেই গীতার উপদেশ পালন করবার শক্তি হয় না। আসক্তি ত্যাগ কর বললেই কি তা ত্যাগ করা যায় ? তুমি আসক্তি ত্যাগ করতে পেরেছ ? সত্যি করে বলতো।"

"কাজ যতক্ষণ করি ততক্ষণ তার প্রতি আসক্তি থাকে বই কি। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে'গেলেই তার কথা ভুলে যাই আমি—"

"পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি যে স্বপ্নের মিছিল দেখি তা ভুলে যাব একথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগে।"

হঠাৎ অনলস সানুনয়ে বললেন—"তুমি এস আমার সঙ্গে অরূপ। এস আমরা দু'জনে মিলে যাই।"

"তা কি করে সম্ভব—"

"শুনেছি সম্ভব। ওই যে দূরে দিগন্তে নীল পাহাড়ের উপর শ্বেতচন্দনতিলকের মতো মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে—ওটি কার মন্দির জান ?"

"সবাই বলে সরস্বতীর মন্দির। শুনে বিস্মিত হয়েছি। সরস্বতী কি কোন মন্দিরে আবদ্ধ থাকতে পারেন ?"

"ও মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। সুর আছে কেবল। অদ্ভুত সে সুর, সেই সুরে বহু এক হয়। বেসুরা সুরের সন্ধান পায়। ও মন্দিরের ছাত নেই। শুনেছি মাঝে মাঝে আকাশ থেকে স্বয়ং হংসবাহিনী আবির্ভূতা হন ওই মন্দিরে। তিনি স্বপ্নকে বাস্তব করেন, বাস্তবকে স্বপ্ন করে দেন অনায়াসে। অনেকে বলেন ওই মন্দিরে যে বিচিত্র সুর অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে তাই মাঝে সর্বশুক্লা তন্বী তরুণী মোহিনীর রূপ ধারণ করে। তখন তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পাবার আশায় আকাশ থেকে ছুটে আসে রাজহংস, তাঁর চতুর্দিকে মূর্ত হয় নীল সরোবর আর তাতে ফুটে ওঠে অসংখ্য শ্বেত-পদ্ম। অসম্ভবকে সম্ভব করবার ক্ষমতা আছে ওই যাদুকরীর। চল আমরা যাই ওখানে—"

"আমার কল্পনা চলে গেছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সুর সেখানে রঙের শোভায় মূর্ত। ভৈরবীর গৈরিকের সঙ্গে ভৈরবের রক্তরাগ, তোড়ির কনক কান্তির সঙ্গে পূরবীর সন্ধ্যাচ্ছটা মিশেছে সেখানে। কল্পনায় আমি সেখানে চলে গেছি অনলস।"

"কল্পনায় গেলে চলবে না। সশরীরে যেতে হবে। পথ অতি দুর্গম।"

"দুর্গমকে ভয় পাই না। চল এখনই বেরিয়ে পড়ি—"

অরূপ আর অনলস যাত্রা করলেন পর্বতের উদ্দেশ্যে। নভশ্চক্র-রেখালগ্ন বনানীতে একটা মৃদু গুরু গুরু শব্দ জাগল, আসন্ন কোনও আবির্ভাবের আশায় উন্মুখ হ'য়ে উঠল সমস্ত প্রকৃতি।

"আমি এখন চললাম। আবার আসব।" সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

পাগলা-গারদে বন্দী গোপালচন্দ্র দেব বিস্ফারিত নয়নে বসিয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার নিকট অলীক মনে হইল না। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"এ মায়া নয়, স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, রূপকও নয়, এ সত্য।"

নাক-ডাকার শব্দে কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বামনটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লর্ডও তাহার পাশে ঘুমাইতেছে। একটা ঘুঘুর করুণ সুর কখন যে রুক্ষ বালুচরকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা সে টেরও পায় নাই। সে-ও অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল ঘুঘুর ওই করুণ সুরে যেন তাহারই মর্মের বাণী রূপ পাইয়াছে। আবার পড়িতে আরম্ভ করিল সে। এবার মনে মনে।

"গোপালচন্দ্র দেব সেকালের লোক। একালে হঠাৎ তিনি যেন বেমানান হইয়া গিয়াছেন। তিনি কাঁসার প্রশস্ত বগি থালায় পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খাইতেছিলেন, হঠাৎ কে যেন সে থালাটা তুলিয়া লইয়া শালপাতার উপর কয়েক মুঠা ছাই দিয়া গেল। বলিল—ইহাই খাও। ইহাই এ যুগের খাদ্য। স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন গোপালচন্দ্র দেব। তিনি বড়লোকের ছেলে। অর্থোপার্জনের জন্য তাঁহাকে কখনও চাকুরি বা ব্যবসার নোংরামির মধ্যে যাইতে হয় নাই। লেখাপড়া লইয়া তেতলার

ঘরটাতেই তিনি প্রায় একা একা সারাজীবন কাটাইয়াছেন। পিতার আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন, একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছে। তিনি কিন্তু সংসারী হইতে পারেন নাই। ছাত্রজীবনে স্কুল কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গেও তিনি তেমন মিশিতে পারিতেন না। তাঁহার একটিমাত্র বন্ধু ছিল। সে এখন এখানকার সিভিল সার্জন। গোপালচন্দ্র দেব যে বিরাট পণ্ডিত একথা বিদগ্ধ সমাজে অবশ্য অবিদিত নাই। এদেশের এবং বিদেশের অনেক নামজাদা পত্রিকায় তাঁহার নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশীরা কেহ তাঁহাকে চেনেন না। সকলের ধারণা তিনি ধনী লোক এবং অহংকারী। সত্যিই তিনি কাহারও সহিত মেশেন না। তাঁহার স্ত্রী দময়ন্তী সংসার চালান। দেব মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মুখটাও ঈষৎ লম্বাটে ধরনের, ভারী চিবুক, পাতলা ঠোঁট, প্রদীপ্ত চোখ। যদিও তিনি পণ্ডিত মানুষ, লেখা-পড়া লইয়াই সারা-জীবন কাটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চেহারাটা ক্ষত্রিয় সৈনিকের মতো। তাঁহার পেশল সুগঠিত দেহে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। স্কুল-জীবন হইতে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করিতে তাঁহার বাবাই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। সে অভ্যাস এখনও তাঁহার আছে। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া ডাম্বেল ভাঁজেন। নিজেকে লইয়াই থাকেন তিনি সমস্ত দিন। যে জগতে বাস করেন, তাহা বাস্তব জগত নহে, কল্পলোক। নিজের ছেলেমেয়েকেও তিনি চেনেন না। তাহারা তাঁহার তেতলার ঘরে আসিতে ভয় পায়। তাহাদের দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার যে ধারণা হইত তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। বাঙালীর ছেলে সাহেবী পোষাকে সাজিয়া ট্যাঁসের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাঙালীর মেয়ে সালোয়ার পাঞ্জাবী পরিয়া সিনেমা অভিনেত্রীর নকল করিতেছে—এসব তাঁহার স্কুল বা কলেজজীবনে তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার নিজের ছেলেমেয়েই এখন ওই সব বিদেশী পোষাক পরিতেছে। তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। মানে, গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—ছেলেমেয়েদের এ কি অদ্ভুত সাজে সাজাচ্ছ। গৃহিণী উত্তর দিয়াছিলেন, আজকাল স্কুল কলেজে সব ছেলেমেয়েরাই ওই ধরনের পোষাক পরে। ওই আজকাল ফ্যাশান। তোমাদের যুগে তোমরা যা করেছিলে তা এ যুগে চলবে না। ওরা যদি আলাদা রকম কিছু করতে যায় লোকে ওদের টিট্‌কারি দেবে। গুরুদেবকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনিও বললেন দোলের সময় সবার গায়েই রং লাগে, সে রং বেশীদিন থাকে না। দোল ফুরুলে রং-ও চলে যায়। যুগের ফ্যাশান যুগের সঙ্গেই চলে যাবে, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাঁহার প্রবীণা গৃহিণী কিছুদিন হইতে একটি ছোকরা বাবাজীকে গুরু-পদে বরণ করিয়াছেন এবং পেটকাটা কোমর-বাহির-করা ব্লাউজ পরিয়া তাঁহার মেদবহুল কুৎসিত কোমরটাকে সকলের সমক্ষে প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। অথচ এই মহিলাই একদিন একগলা ঘোমটা দিতেন। আজকাল ঘোমটা উঠিয়া গিয়াছে। এককালে যিনি অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন তিনি আজকাল মুখে ক্রীম পাউডার ঘসিয়া ডগমগে শাড়ি পরিয়া মহিলা সমিতিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যান। সেখানে ওই গুরুদেবই প্রধান বক্তা। শিষ্য-শিষ্যাদের কলুষিত আত্মাকে পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যহ নাকি আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দেন। গোপালদেব মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেন

কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না। তাঁহার ত্রিতল মহলটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি তিনটি বড় ঘর আছে। একটি ঘরে তাঁহার লাইব্রেরী, আর একটি তাঁহার শয়নঘর। তৃতীয় ঘরটির ভিতর তাঁহার স্নান বাথরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা। এখানে তিনি প্রত্যহ ব্যায়ামও করেন। তিনটি ঘরের সামনে প্রকাণ্ড ছাদ। খুব অস্বস্তি বোধ করিলে ছাদের উপর পায়চারি করেন—পৃষ্ঠে নিবদ্ধ হস্তের অঙ্গুলিগুলির সঞ্চালন হইতে তাঁহার মনের ভাব খানিকটা হয়তো বোঝা যায়। তিনি আর একটি কাজও করেন। তাঁহার লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে একটি কোষবদ্ধ তরবারি টাঙানো আছে। মাঝে মাঝে সেটি কোষমুক্ত করিয়া সেটির ধার পরীক্ষা করেন। শিরিষ কাগজ ঘসিয়া সেটিকে পরিষ্কারও করেন মাঝে মাঝে। ঝকঝকে শাণিত তরোয়াল। এটি তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন দেবের অস্ত্র। তিনি একজন নিপুণ তরবারি চালক ছিলেন। এই তরবারির সাহায্যে তিনি বাঘ মারিয়াছিলেন। কথিত আছে এই তরবারির সাহায্যেই তিনি একাই একদা এক ডাকাতের দলকেও নাকি হটাইয়া দিয়াছিলেন। দস্যুসর্দারের ছিন্ন মুণ্ডটি বর্শাফলকে গাঁথিয়া সেটি উপহার দিয়াছিলেন তদানীন্তন এক ইংরেজ রাজপুরুষকে। ইংরেজ রাজপুরুষটি সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি খুশী হইয়া জীমূতবাহনকে রাঘবরাও উপাধি দেন। রাঘবরাওয়ের তরবারিটি বহুকাল দেব-পরিবারের গুদাম-ঘরে পড়িয়াছিল। গোপালদেব সেটি বাহির করিয়া তাহাতে শান দেওয়াইয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। সেকালের খাঁটি স্টীল মরিচা-মুক্ত হইয়া পুনরায় নব-দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য একটি নূতন সুদৃশ্য খাপও করিয়াছেন গোপালদেব। এই তরবারিটি তাঁহার লাইব্রেরির দেওয়ালে টাঙানো থাকে। তরবারিটি মাঝে মাঝে খুলিয়া তিনি কখনও চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখেন, কখনও মাথার উপর ঘোরান। তাঁহার মনে তখন অদ্ভুত একটা প্রেরণার সঞ্চার হয়। তিনি অনুভব করেন তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন যেন তাঁহার মনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। যদিও তিনি ত্রিতল হইতে নীচে নামেন না—তাঁহার খাবারও ঠাকুর চাকরে ত্রিতলের ঘরেই দিয়া যায়—যদিও সমাজের সহিত এমন কি নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ের সহিতও তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম,—কিন্তু দেশের মধ্যে পাপের আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে একথা তাঁহার অবিদিত নাই। কারণ প্রত্যহ তিনি বাংলা ইংরেজি অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে স্বাধীনতার নামে অরাজকতাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মনে পড়িত ঐতিহাসিক গোপালদেবের কথা। মনে পড়িত তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে দেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। বড়রা ছোটকে গিলিয়া খাইত। মনে পড়িত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাংলাদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা তারানাথ এই যুগের বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। ফলে লোকের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে দুর্বলের

উপর অত্যাচার করে…”—এইসব কথা স্মরণ করিয়া মনে মনেই তিনি উত্তেজিত হইতেন। ভাবিতেন, আমার নামও তো গোপালদেব—আমি কি—। তরবারিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে এইসব কথা তাঁহার মনে হইত। প্রায়ই মনে হইত।

এইখানে, গল্পের মধ্যেই আমি একটা কথা উল্লেখ করিতে চাই। উল্লিখিত কাহিনীর গোপালদেব একটি কাল্পনিক ব্যক্তি। আমিই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই এই গ্রন্থের গ্রন্থকার। আমার নাম ফকিরচাঁদ সামন্ত। আমি ইতিহাসের ছাত্র। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল ইতিহাসে তো কত বীরপুরুষের নাম পড়িয়াছি তাহাদের কীর্তিকলাপ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? কোনক্রমে একটা সাধারণ মার্চেন্ট আপিসে কেরানী মাত্র হইয়াছি। একজন বড়লোকের ছেলেকে ইতিহাস পড়াই, বিনিময়ে তাহার বাড়িতে থাকিতে পাই। তাহাদের আস্তাবলের পাশে একটা ঘর আছে, সেইটাই আমার বাসস্থান। বড়লোকটি খুবই ধনী। ঘোড়া রাখিয়াছেন রেস খেলিবার জন্য। মাঝে মাঝে পোলোও খেলেন। ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধ, হ্রেষাধ্বনি, সহিসদের দলাইমলাইয়ের শব্দ, সবই আমার সহিয়া গিয়াছে। বড়লোকের ছেলেটির যখন সময় হয় তখন সে আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। আমি পোষা কুকুরের মতো যাই এবং ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি—আজ কি পড়বে? ছেলেটি সিগারেট টানিতে টানিতে উত্তর দেয়—আজ কয়েকটা ইমপর্টান্ট কোশ্চেনের 'আনসার' লিখে দিন। এবার শুনছি আওরাংজীব থেকে কোশ্চেন দেবে। ইহাই আমার কাজ। হঠাৎ একদিন মনে হইল এই হীনতাপঙ্ক হইতে কি উদ্ধার নাই? যে গোপালদেব, ধর্মপাল, দেবপাল, শশাঙ্ক, শিবাজী, রাণা প্রতাপ সিংহের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি তাঁহাদের মহিমা তাঁহাদের শৌর্যবীর্য কি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না? শার্লামেন, নেপোলিয়ন, আলেকজান্ডার দি গ্রেট—এলোমেলো অনেকের কথাই মনে হইতে লাগিল। ইহাদের কথা পড়িয়াছিলাম শুধু কি পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য, কেরানীগিরি করিবার জন্য? ওই বড়লোকের ছেলেটার নিকট জুজু হইয়া থাকিবার জন্য? মনে ধিক্কার জাগিত, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতাম না। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পথ মিলিয়া গেল। পথের ধারেই ধুলার উপর গুরুর দেখা পাইলাম। তাহাকে 'গুরু' বলিতেছি বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র গুরুত্ব ছিল না। শ্যামবর্ণের কিশোর বালক একটি। পথের ধারে আপন মনে লাট্টু ঘুরাইতেছিল। আমি আপিস যাইতেছিলাম, কিন্তু ছেলেটিকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। অমন কমনীয়কান্তি প্রাণরসে টলমল কিশোর মূর্তি আমি আগে কখনও দেখি নাই। মনে হইল শহরের রাস্তার ধারে একটি সতেজ শিশু শালগাছ যেন কিশোর বালকের রূপ ধরিয়াছে। বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, ছেলেটির কথায় আমার চমক ভাঙিল।

"কি দেখছেন—"

"তোমাকেই দেখছি। তোমার বাড়ি কোথা।"

"ওসব বৃত্তান্ত জেনে লাভ কি। আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। স্যানডার্স সাহেবের ধমকানির ভয় নেই?"

শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমার আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যানডার্স

তাহা এ জানিল কি করিয়া। আমি যে চাকরি করি তাহাও তো ইহার জানিবার কথা নয়।

"আমি যে আপিস যাচ্ছি তা জানলে কি করে।"

"তোমাকে দেখেই। কেরানী ছাড়া ওরকম কুকুর-মার্কা চেহারা আর তো কারো হয় না।"

ছেলেটি লাট্টু ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

"শোন। তুমি আমাকে অপমান করলে কেন!"

"কুকুরকে কুকুর বললে কি অপমান করা হয়?"

"কানাকে কানা বলা কি ভদ্রতা?"

"তুমি কানাও, তোমাকে কিন্তু সে কথা বলিনি।"

ক্রমশই অবাক হইতেছিলাম। কে এই ছোকরা। অথচ ইহার উপর রাগও তো হইতেছে না। চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ, সর্বাঙ্গে নবীনতার আভাস, একটা প্রাণবন্ত চঞ্চলতা যেন মূর্তি ধরিয়াছে। এ কে? কোথা হইতে আসিল?

"আমাদের আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যানডার্স তা তুমি জানলে কি করে?"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল ছোকরা।

"তোমার বাবার নাম বলব? হরিপদ সামন্ত। মায়ের নাম জগদ্ধাত্রী। আর একটা কথা বলব? তোমার কপালে রাজতিলক আছে। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হতে পারবে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুমি।"

"রাজা হতে পারব?"

"পারবে। রাজা মানে হাতী-ঘোড়া, মোটর-এরোপ্লেন, জমিদারি, ব্যাঙ্কের টাকা, এসব নয়—রাজা মানে সত্যিকারের রাজা!"

"সত্যিকারের রাজা, মানে?"

"পরের ভালো করাই যার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যে তন্ময় হয়ে নিজেকে যে ভুলে থাকে এবং সেই জন্যেই যে সবার উপরে উঠে যায়, কোন অভাব বোধ থাকে না—সেই রাজা। মাথায় উষ্ণীষ পরে দামী পোষাক পরিচ্ছদ পরে তাঞ্জামে চড়ে যারা বেড়ায় তারা রাজা নয়, দাস। দাসানুদাস। রাজা হতে হলে তপস্যা করতে হবে। এদেশে সন্ন্যাসীদের নামই মহারাজ। ইচ্ছে করলে তুমি রাজা হতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার আগ্রহ থাকা চাই, তার জন্যে অহোরাত্র তপস্যা করা চাই। তা কি তুমি পারবে? পারবে না। বাঙালীর ছেলেরা তপস্যা করতে ভুলে গেছে—"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল—"আমি এবার যাই—"

"শোনো—"

"না, এখন তুমি আপিস যাও। সন্ধের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে মাঠে বসে আমি আজ বাঁশী বাজাব। যদি আলাপ করতে চাও, সেইখানে এসো—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপিস যাওয়ার মুখে আলাপ জমবে না। চললুম—"

"শোন, কোথায় থাক তুমি—!"

আবার মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি আকাশে বিশ্বাস করবে ?"

আমাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া হঠাৎ সে পাশের গলিটার মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

সেদিন আপিস হইতে যখন বাহির হইলাম তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। যে চায়ের দোকানটায় রোজ বসিয়া চা খাই, সেইখানেই ঢুকিলাম। খান দুই টোস্ট এবং এক কাপ চা খাইয়া যখন বাহির হইলাম তখনও অন্ধকার হয় নাই। অন্য দিন হইলে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু সেদিন গেলাম না। গড়ের মাঠে ঢুকিয়া পড়িলাম। গড়ের মাঠ আমার আপিসের কাছেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে অনেকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করিলাম। কোথায় সে ছোকরা ? বাঁশীর শব্দও শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম শেষে। একটা খালি বেঞ্চ পাইয়া তাহার উপরই বসিয়া পড়িলাম। চমৎকার দখিনা হাওয়া বহিতেছিল। সম্ভবত বসিয়া বসিয়াই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিল তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বাঁশী শুনিতে পাইলাম। উঠিয়া পড়িলাম। সুর লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু বংশীবাদককে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিতে পাইলাম। নজরে পড়িল একটা গাছের তলায় সবুজ আলোকপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতেছে, ভাবিলাম জোনাকীর দল নাকি, —আগাইয়া গেলাম সেইদিকে। দেখি সেই ছোকরা বসিয়া আছে। আমি যাইবামাত্র সবুজ আলো নিবিয়া গেল।

"ও তুমি এসে গেছ ? বস।"

"এইখানে একটা সবুজ আলো দেখলাম যেন।"

"ও কিছু নয়, বস।"

হঠাৎ মনে হইল ছোকরা আমার চেয়ে তো বয়সে অনেক ছোট কিন্তু অসংকোচে আমাকে তুমি বলিতেছে। একটু বিরক্ত হইলাম।

"তুমি ভাবছ আমি বুঝি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট তা নয়। আমার অনেক বয়স।"

একটু অবাক হইয়া গেলাম। আবার আমার মনের কথা টের পাইল কি করিয়া !

"কত বয়স তোমার—!"

"অনেক। গাছ পাথর নেই। আমি বুধ—"

"বুধ ? তার মানে ?"

"আমি বুধ গ্রহ। যার স্তোত্র তোমরা পাঠ কর এই শ্লোকটি পড়ে—প্রিয়ঙ্গু-কলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। প্রিয়ঙ্গু মানে জান ?"

কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

"প্রিয়ঙ্গু মানে জান ?"

"না।"

"প্রিয়ঙ্গু মানে শ্যামালতা। প্রিয়ঙ্গুকলিকার মতো সবুজ রং বুধের। বুধ চিরকিশোর। চিরশ্যাম। উন্মুখ যৌবনের প্রতীক সে। সামাজিক জীবনে আমার নাম ছিল ফেলারাম। যখন বুড়ো হয়ে গেলাম শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ল—স্ত্রী পুত্র

কন্যারা সব মরে গেল—তখন একদিন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। মানে, মরব বলেই বেরুলাম। হরিদ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ পেলাম এক মহাপুরুষের। তিনি বললেন—মরবে কেন! তুমি বুধের আরাধনা কর, যৌবন ফিরে পাবে। তোমার তপস্যা যদি নিশ্ছিদ্র হয় স্বয়ং বুধই এসে হাজির হবেন তোমার শরীরে। আমি অনেকদিন হিমালয়ে কাটিয়েছি বুধের আরাধনা করে। অনেক দিন। প্রিয়ংগুকলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। এই মন্ত্র জপ করেছি দিবারাত্রি। এক আধদিন নয়—অনেকদিন। অনেকদিন পরে হঠাৎ গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হিমালয়ের একটা অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সেদিন। কাছেপিঠে কেউ ছিল না। আমি গুহায় শুয়ে শুয়ে বুধেরই ধ্যান করছিলাম, শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, ধ্যান কিন্তু অবিচলিত ছিল। বস্তুত আমার দুঃখের অসীম সমুদ্রে ওইটেকেই ভেলা করে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম। সেই গুহায় হঠাৎ সেদিন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কিন্তু অজ্ঞান হয়েও আমি ধ্যানের সূত্রটি ছাড়িনি—এক চিরকিশোর শ্যামকান্তি দেবতা আমার চোখের সম্মুখে অহরহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তবু মনে হয় আমি অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম, হিমালয়ের শীত বা নিদারুণ ক্ষুধা আর আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। আমার দেহটা যেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ জ্ঞান হল। দেখলাম আমার জীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহটা গুহার একধারে পড়ে আছে। আমি তাহলে কে? যে আমি আমার শবদেহটাকে দেখছি সে কি অন্য লোক? আমার বিস্ময় কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। অপরিসীম আনন্দে সমস্ত মন ভরে গেল পরমুহূর্তে, সদ্যজাগ্রত যৌবনের মহিমা অনুভব করলাম সর্বদেহ দিয়ে। তারপরই লক্ষ্য করলাম আমার দেহ থেকে সবুজাভ আলো বেরুচ্ছে একটা। ভয় পেয়ে গেলাম প্রথমে। তারপর লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গুহা থেকে। দেখলাম অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। ঊষার নবারুণ কিরণের আভাস দেখা যাচ্ছে পূর্বদিগন্তে। কাছেই একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। সেইটের ধারে গিয়ে সেই ঝরণায় নিজের চেহারা দেখলাম। দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম—অবিকল বুধের চেহারা—প্রিয়ংগুকলিকাশ্যাম সেই সৌম্য কিশোরের হাসিমাখা মুখখানা আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সেই কলস্বরা স্বচ্ছ জলের ভিতর থেকে। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উপলব্ধি করলাম চন্দ্র এবং বৃহস্পতি-পত্নী তারার প্রণয়সঞ্জাত যে শিশু চির-নবীনের প্রতীক হ'য়ে গ্রহমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে, যার পত্নী ইলা—সহসা মনে হল ইলা কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও আছে সে। তার পুত্র পুরূরবা আর পুত্রবধূ উর্বশীর কথা মনে আছে কি এখনও? উর্বশীকে তো রোজ ঊষা-সন্ধ্যায় আকাশে দেখতে পায়, পুরূরবা কোথায়—। তখনই উঠে পড়লাম ঝরণার পাশ থেকে, ইলা আর পুরূরবাকে খোঁজবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে কোন মোহ নেই, শুধু কৌতুক, শুধু কৌতূহল। শত শত জন্মের আবর্তে পুরূরবা কোথায় তলিয়ে গিয়ে কোনরূপে এখন অবস্থান করছে তাই দেখার জন্য আমি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আজ কলকাতা শহরের রাস্তায় তোমাকে দেখে চিনলুম—তুমিই সেই হতভাগ্য পুরূরবা যে একটা নারীর প্রেমের মোহে নিজের পৌরুষকে বারবার অবনত করেছো। এখনও করছ। এখনও মালিনী নামে যে মেয়েটার স্বপ্নে তোমার দৃষ্টি

আছেন, তাকে তুমি পাবে না। সে বড়লোকের মেয়ে, পুরুরবার সঙ্গে যেমন সর্বদা দুটো ভেড়া থাকত, এর সঙ্গে সর্বদা তেমনি দুটো দারোয়ান আছে। উর্বশীর নানারকম শর্ত ছিল এরও নানারকম শর্ত আছে যা পালন করবার সামর্থ্য তোমার নেই। তবে তোমার ললাটে একটা অদৃশ্য রাজতিলক দেখেছি। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হ'তে পারবে। কোন রাজাকে তোমার পছন্দ সবচেয়ে বেশী—"

আমি যাহা শুনিতেছিলাম তাহা অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস করিতে হইতেছিল, কারণ প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বিস্ময়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

"কোন্ রাজাকে তোমার বেশী পছন্দ ?"

"অষ্টম শতাব্দীর রাজা গোপালদেবকে—যিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।"

"বেশ, তাঁরই তপস্যা কর—"

"তপস্যা কি করে করতে হয় আমি জানি না।"

"নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করার নামই তপস্যা—"

"চাকরি করতে করতে তা কি করা সম্ভব ?"

"খুব সম্ভব। চাকরি তো করে বাইরের মন। ভিতরের মন অন্তরতম সত্তা—সেই করে তপস্যা। তোমার নিষ্ঠা যদি খাঁটি হয়, আগ্রহ যদি প্রবল হয় তাহলে সে মনকে কেউ বিচলিত করতে পারবে না—"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা সে প্রশ্ন করিল—"তুমি বই লিখতে পারবে ?"

"ছেলেবেলায় লেখার অভ্যাস ছিল। কবিতা-গল্প ছাত্রজীবনে লিখেছি। ছাপাও হয়েছে দু'একটা কাগজে—"

"গোপালদেবকে নিয়ে বইই লেখ তুমি তাহলে একটা। বই লিখতে বসলে তার দিকে একাগ্র হবে তোমার মন, সর্বদা ভাবতে হবে তার কথা—সেইটেই হবে তোমার তপস্যার শুরু। তারপর ক্রমশ গোপালদেব তোমার মধ্যেই আবির্ভূত হবেন।"

"কিন্তু গোপালদেবের ইতিহাস তো তেমন কিছু জানা নেই—"

"ইতিহাস নিয়ে কি হবে। তুমি তাকে সৃষ্টি কর। তোমার সৃষ্টিতেই জীবন্ত হয়ে উঠবেন তিনি। ভগবানের কোন ইতিহাস আছে ? কিন্তু কোটি কোটি লোক কোটি কোটি রূপে সৃষ্টি করেছে তাঁকে—আর সব সৃষ্টিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের স্রষ্টার চোখে। বুদ্ধকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু ওই একটি শ্লোক অবলম্বন করে আমি মনে মনে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। তাই তিনি মূর্ত হয়েছেন আমার দেহে মনে। গোপালদেবকে তপস্যার আগ্রহ দিয়ে তুমিও যদি সৃষ্টি করতে পার তাহলে তিনিও জীবন্ত হয়ে উঠবেন তোমার মধ্যে—"

"আমি পারব ?"

"সে কথা নিজেকেই জিজ্ঞেস কর তুমি। স্থবির ফেলারাম কানুনগো যদি প্রিয়ঙ্গুকলিকা-শ্যাম বুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে ফকিরচাঁদই বা গোপালদেব হতে পারবে না কেন যদি তার আগ্রহ একনিষ্ঠ হয়। এবার আমি উঠি—"

"কোথা যাবে—"

"ইলাকে খুঁজে পাইনি এখনও। তাকে খুঁজে বার করতে হবে—"

"ইলা ?—"

"হ্যাঁ, যে ইলা এককালে তোমার মা ছিল। জানি না এখন সে কোথা—"

হঠাৎ অন্তর্ধান করিল।

আমি গড়ের-মাঠে একা বসিয়া রহিলাম। চারিদিকে নানারঙের আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু সেই সবুজাভ প্রাণ-দীপ্ত আলোটি আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জানি এ গল্প অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতাও একটা বিশেষ ক্ষমতা যাহা এ যুগে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা এখন টাকা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করি না। অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আজকাল আমাদের মর্মে মর্মে শিকড় গাড়িয়াছে। অন্য কোন প্রকার ক্ষমতাকে—বিশেষত আধ্যাত্মিক বা দৈবিক ক্ষমতাকে বুজরুকি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার বুদ্ধি আমরা তথা-কথিত বিজ্ঞানের কাছে লাভ করিয়াছি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয় ওই অলৌকিক ঘটনাটা বোধহয় উন্মাদের কল্পনা। হয়তো আমি দিনকয়েকের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলাম। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "এরকম সাময়িক পাগলামি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেই পাগলামির ঝোঁকে অনেক রকম আজগুবি 'ভিশন'ও অনেকে দেখেন। আপনি হয়তো তাই দেখেছেন। আপনার অবদমিত কল্পনা হয়তো ছাড়া পেয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য।"

অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি পাগল নহি। যাহা দেখিয়াছিলাম যাহা শুনিয়াছিলাম সব সত্য, উন্মাদের স্বপ্ন নহে। তাই বুধের আদেশ অমান্য করি নাই। গোপালদেবকে লইয়া উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছি। আমার গল্পের নায়ক যে গোপালদেব, তিনি প্রৌঢ়, বিদ্বান, তথাকথিত আধুনিকতার অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন। তাঁহারই কল্পনায় ইতিহাসের গোপালদেব জীবন্ত হইবেন, এই আমার আশা।

"গোপালদেবের ত্রিতল মহলে তাঁহার একমাত্র বন্ধু তাঁহার পুরাতন ভৃত্য মহাদেব। গোপালদেব তাহাকে মহান বলিয়া ডাকেন। তাহার প্রধান গুণ সে নীরব। কখন আসে কখন নীরবে সমস্ত কাজ পরিপাটি করিয়া নিষ্পন্ন করে গোপালদেব জানিতেও পারে না। মহাদেব প্রত্যহ পোস্টাফিসে গিয়া গোপালদেবের ডাকও লইয়া আসে। খামগুলির ধার নিপুণভাবে কাঁচি দিয়া কাটিয়া চিঠিগুলি প্রত্যহ তাঁহাকে আনিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যায়। গোপালবাবুকে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিতে হয় না। তাঁহার অনেক চিঠি আসে রোজ। দেশের এবং বিদেশের অনেক বিদ্বান লোকেরা তাঁহাকে চিঠি লেখেন। এই চিঠির জগৎও তাঁহার আলাদা একটা নিজের জগৎ। সে জগতে বাহিরের কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। নিজেও তিনি সে জগতের অনেককে চেনেন না। পত্রের মাধ্যমেই আলাপ। কোন কোন ক্ষেত্রে সে আলাপ গভীর আত্মীয়তাতেও পরিণত হইয়াছে। মহান যখন তাঁহার পাশে ডাক রাখিয়া যায় তখন মনে মনে তিনি একটু চঞ্চল হইয়া ওঠেন। কিন্তু বাহিরে সে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না।

বরং তিনি এমন একটা ভাব দেখান যেন চিঠিগুলো তিনি দেখিতে পান নাই। মহানও কোন কথা না বলিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

তাঁহার এই ত্রিতল সীমাবন্ধ-জীবনে এই ডাক সত্যই বাহিরের ডাক। ইহাই একমাত্র ডাক যাহার জন্য তিনি মনে মনে আকুল হইয়া বসিয়া থাকেন। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার বিশেষ খবর লয় না। প্রয়োজন হইলে তাহারা গৃহিণীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। গৃহিণী তাঁহার নিকট দুই একবার আসিয়া তাঁহারই আত্মীয়স্বজনের হইয়া দরবার করিয়াছেন। কখনও কাহারও ওঁছা ছেলেকে কলেজে ভরতি করাইবার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট চিঠি লিখিবার অনুরোধ করিয়াছেন, কখনও কোনও ফেল-করা ছেলেকে কোন আপিসে ঢুকাইয়া দিবার জন্য সুপারিশ পত্র লইয়াছেন, কাহারও কালো মূর্খ মেয়েকে কোন বিদ্বান সৎ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে (পাত্রের পিতা) প্রভাবিত করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁহার এই ধরনেরই সম্পর্ক। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার বা সাহিত্যিক প্রতিভার খবর তাহারা কেহ রাখে না। তবে বিনা পয়সায় দুই-একখানা বই পাইলে সেগুলি বগলদাবা করিয়া লইয়া যাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। লইয়া গিয়া সেগুলি সত্যই তাহারা যদি পড়িত তিনি খুশী হইতেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয় হইয়াছেন বই তাহারা পড়ে না। তাহারা যে বই পাইয়াছে এইটা সকলের কাছে আস্ফালন করিয়াই তাহাদের সুখ। সুতরাং প্রত্যহ ডাকের জন্যই তিনি মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকেন। কারণ, এ ডাক সেই বহির্জগতের ডাক, যেখানে তাঁহার সমানধর্মা নর-নারীরা বাস করেন, যেখানে তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার নিরপেক্ষ আলোচনা কৃতবিদ্য রসিক চিত্তের কষ্টি-পাথরে নির্ধারিত হয়—এক কথায় যেখানে তাঁহার মনের মানুষরা বাস্তব-অথচ-অবাস্তব রূপকথালোক সৃজন করিয়াছেন—সেই অজানা বহির্জগতের সংস্পর্শ লাভ করিবার জন্য মনে মনে তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন প্রত্যহ। তাঁহার মনে এই উন্মুখতার সহিত একটা অস্বস্তির ধারাও অবশ্য নিত্য বহমান। অস্বস্তির কারণ তিনি বুঝিয়াছেন, বর্তমানের সহিত তিনি বেমানান। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যে স্রোতে মহানন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে সে পঙ্কিল স্রোতে তিনি নামিতে পারিতেছেন না। তীরে দাঁড়াইয়া তিনি কেবল অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন। স্রোতটা কতটা পঙ্কিল তাহাও তাঁহার জানা নাই। এইটুকু শুধু জানেন তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে যাহা দেখিতেছেন মোটেই তাহা স্বচ্ছ-ধারা নহে। এ অবস্থায় কি করিবেন তাহাও তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না, তিনি মনে মনে কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া কেবল যন্ত্রণাভোগই করিতেছিলেন।

এই সময় একদিন বিপর্যয়টি ঘটিল। মহান সেদিনকার ডাক দিয়া গিয়াছিল। গোপালদেব একে একে সেগুলি খুলিয়া পড়িতেছিলেন। একটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিঠি পাইয়া আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনি। পত্রটি লিখিয়াছিলেন একজন অশ্বব্যবসায়ী। যদিও তিনি অশ্বব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহার চিঠির প্যাডে তাঁহার ছাপা নামের শেষে যে ডিগ্রীগুলি ছিল সেগুলি অক্সফোর্ডের এবং হার্ভার্ডের। কিছুকাল পূর্বে গোপালদেব হিস্টোরিক্যাল হর্সেস (Historical Horses) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমেরিকার কোনও কাগজে। প্রবন্ধটিতে অনেক ঐতিহাসিক ঘোড়ার নাম ও বিবরণ ছিল। যে সব ঘোড়ার নাম

ইতিহাসে পাইয়াছিলেন তাহাদের নাম তো ছিলই, আরও ছিল নানা যুগের নানারকম ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ঘোড়ার সম্বন্ধের মনোরম বিবরণ। অশ্ব-ব্যবসায়ী ওই ইরাণী ভদ্রলোক প্রবন্ধটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গোপালদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিজ্ঞাপন-পত্রিকা 'দি ইকোয়েস্ট্রিয়ান' (The Equestrian) কাগজে যদি উক্ত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দেন তাহা হইলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন। ইহার জন্য তিনি দক্ষিণাও দিতে প্রস্তুত। গোপালদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিলেন—'আপনি প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় ছাপাইতে পারেন আমার আপত্তি নাই। দক্ষিণা কিছু দিতে হইবে না। যৌবনকালে আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল। ঘোড়াও ছিল একটা। খুব ভালোবাসিতাম তাহাকে। হঠাৎ একদিন সেটা একটা মোটরের সহিত ধাক্কা খাইয়া মারা গেল। সহিস সেটাকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল। তাহার পর আর ঘোড়া কিনি নাই। মনে হইয়াছিল মোটরের যুগে ঘোড়া অচল। কিন্তু এখনও আমার ঘোড়ার জন্য মন কেমন করে। এখনও যদি ঘোড়া পাই, চড়িয়া বেড়াইতে পারি। কিন্তু ঘোড়ার বাজার কাছে-পিঠে কোথাও নাই, আগে শোনপুর মেলায় যাইতাম, সেখান হইতেই ওই ঘোড়াটা কিনি। এখন লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকি, কোথাও আর যাওয়া হয় না। আপনি যদি আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিতে পারেন, কিনিতে পারি। আমার পুরানো আস্তাবলটা এখনও আছে ......'। উচ্ছ্বসিত আনন্দে লম্বা চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন একটা। তাহার পর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিঠি পড়িয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। তাহার পর চিঠিটা এবং উত্তরটা বারবার পড়েন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি উপভোগ করেন প্রত্যেকটি চিঠি।

দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠির প্রথম লাইনটার দিকেই কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন তিনি। 'মাই ডিয়ার ফাদার—'। তাঁহার পুত্র প্রবাল তাঁহাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখিয়াছে। একই বাড়িতে থাকিয়া ইংরেজিতে চিঠি লিখিবার কি এমন দরকার পড়িল। ইংরেজিতেই বা লিখিয়াছে কেন! বাঙালী পুত্র তাহার বাবাকে বাংলাতে পত্র লিখিবে এইটাই তো প্রত্যাশিত। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বানান ভুলে এবং ভাষার ভুলে পরিপূর্ণ চিঠিখানি। প্রবাল উপর্যুপরি তিনবার বি-এ ফেল করিয়াছে। এখন কোন একটা হোটেলে চাকরি করিতেছে। গৃহিণী তাঁহাকে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি তিনি বিলাতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে হয়তো সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার সিঁড়ি পাইবে, কারণ এদেশের স্কুল কলেজে ভালো পড়া হয় না, এখানকার মাস্টাররাও হিংসুটে, গোপালদেব সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব ঈর্ষা-কাতর, সেই জন্য তাঁহার ছেলেকে তাহারা পাশ করিতে দিবে না। বলা বাহুল্য, গোপালদেব গৃহিণীকে আমোল দেন নাই। বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের যাঁহারা গৌরব, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিলাত যান নাই। আমাদের পুত্রটি অপদার্থ, তাহার জন্য বিলাপ কর, তাহার পিছনে আর অর্থব্যয় করিও না। পত্রটি পড়িতে পড়িতে গোপালদেবের মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে লাগিল। প্রবাল যাহা লিখিয়াছে তাহা বাংলায় অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায়—

আমার প্রিয় পিতা,

আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। দূর থেকে শুধু এইটুকু জেনেছি আপনি বিদ্বান এবং যশস্বী লোক। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি, আপনার ধনের খ্যাতি, সকলেই জানে, আমিও জানি। এ-ও স্বীকার করব আমি অর্থাভাবে কোন দিন কষ্ট পাইনি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না। আপনি আপনার মহিমা নিয়ে এমনি সু-উচ্চে বাস করেন যে আমি আপনার নাগাল পাই না। আপনিও আমাকে চেনেন কি? আপনি জানেন আমি একটা বখাটে ছেলে, কু-সঙ্গে পড়ে' উচ্ছন্নে গেছি। এ কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই আমি খারাপ ছেলে। এমন সব কাজ করি যা আপনাদের নীতির মাপকাঠিতে গর্হিত কাজ। সিগারেট খাই, মদও খাই। বিলাসিতার দিকে লোভ আছে, বিলাসিতার উপকরণও সংগ্রহ করেছি অনেক। সবই অবশ্য হয়েছে আপনার টাকায়। মায়ের কাছেই পেয়েছি সে টাকা। আমি যে আপনার পুত্র নামের অযোগ্য তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার যারা সঙ্গী-সঙ্গিনী তারাও আপনার ওই নীতির মাপকাঠিতে সবাই খারাপ। তারা পড়াশোনা করে না, হই-হাল্লা করে কলেজ পোড়ায়, মাস্টার ঠ্যাঙায়, সভা করে, শোভাযাত্রা করে, পুলিশের ব্যাটন খায় আর কাঁদুনে গ্যাসে চোখের জল ফেলে সকলের নিন্দাভাজন হয়। আমিও ওদের দলে। আপনি আশা করি শুনেছেন আমি এখন একটা বড় হোটেলে কেরানীর কাজ করি। মাইনে দু'শ টাকা। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আপনার খাতিরেই ওই হোটেলে আমার চাকরিটা হয়েছে। হোটেলের মালিক আপনার একজন ভক্ত। তিনিও বেশ বিদ্বান লোক। আমি আপনার ছেলে শুনেই আমাকে বাহাল করে নিলেন। আমার দৈনন্দিন নিত্য খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা রোজ রোজ মায়ের কাছে চাইতে আমার লজ্জা করত। তাই একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম, দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে আমার আর্থিক সমস্যা অনেকটা মিটেছে বটে কিন্তু আর একটি সমস্যায় আমি জড়িয়ে পড়েছি। এই হোটেলেই আলতা নামে একটি মেয়ে টাইপিস্টের কাজ করে। মেয়েটি শিডিউলড কাস্টের মেয়ে। শিডিউলড কাস্ট বললে একটু ভালো শোনায়, কিন্তু আসলে মেয়েটি বাগ্দীর মেয়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়েস্থের ঘরেও অমন সুশ্রী মেয়ে দুর্লভ। তাকে আমি দিন সাতেক আগে রেজেষ্ট্রি করে আইনত বিয়ে করেছি। মেয়েটির গুণ-বর্ণনা আমি করব না, কারণ সেটা আমার মুখে শোভা পাবে না। তাকে ভালো লেগেছে বলেই তাকে বিয়ে করেছি। মাকে জানিয়ে বিয়ে করেছি। তিনি প্রথমে মত দেন নি, কিন্তু তাঁর গুরুদেব যখন বললেন, মানুষের গুণ আর কর্ম দিয়েই তার জাত-বিচার হয়, কুল আর বংশ দিয়ে নয়—(তাঁর মতে আমি আর আলতা এক জাতের) তখন মা মত দিলেন। আপনার কাছে অনুমতি চাইবার সাহস হয়নি আমার। তবু আপনাকে পত্র লিখছি আর একটি কারণে। দিনচারেক পরে আমাদের বিবাহ উপলক্ষে হোটেলে একটি ভোজ হবে। আড়াইশো লোক খাবে। খরচ পড়বে আড়াই হাজার টাকা। মায়ের কাছে টাকাটা চাইলাম। তাঁর কাছে টাকা চেয়ে কখনও বিফলমনোরথ হই নি। কিন্তু মা এবার বললেন—দিতে পারবে না। নীলার বিয়েতে যৌতুক দেবেন বলে একটা হীরের হার করতে দিয়েছেন, তাইতেই তাঁর সঞ্চিত সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, কিছু ধারও হয়েছে নাকি। আগামী মাসে মগনলাল নামে আপনার একটি ছাত্রের

সঙ্গে নীলার বিয়ে হবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এ খবর আপনি সম্ভবত জানেন না। না জানাই স্বাভাবিক। আপনি এত ঊর্ধ্বে বাস করেন যে কেউ আপনার নাগালই পায় না। আপনি মাসের প্রথমেই একটা চেক লিখে মহানের হাত দিয়ে সেটা মাকে পাঠিয়ে দেন সংসার খরচের জন্য। সংসারের আর কোনও দায়িত্ব নেবার অবসর নেই আপনার। আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-চর্চা করবার সুযোগও আমরা দিয়েছি, কেউ কখনও আপনার ধারে কাছেও যাইনি। অনেকদিন আগে, যখন আমি ছোট ছিলাম, যখন আপনি ঘোড়া চড়তেন, যখন আমাকেও আপনার সামনে ঘোড়ায় চড়িয়ে মাঠে নিয়ে যেতেন—সেই সময়ের কথা মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হয়। তখন আপনার এত খ্যাতি হয় নি, তখন আপনি আমাদের বাবা ছিলেন। তারপর খ্যাতির যে দেওয়াল আপনার চারদিকে আকাশ-চুম্বী হয়ে উঠল তা ডিঙিয়ে আপনার কাছে যাওয়ার আর সামর্থ্য রইল না আমাদের। আপনার টাকার সহায়তায় আমরা নিজেদের মতে নিজেদের স্রোতে ভাসতে লাগলাম। আপনাকে বিরক্ত করবার সাহস হয় নি কোনদিন। আজও হয়তো হত না। আজ কিন্তু একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। মা টাকা দেবে এই আশায় ভোজের আয়োজন করেছি, নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, আপনার ছেলে হিসাবে হোটেলে আমার একটা 'প্রেস্টিজ'ও আছে—এখন যদি টাকার অভাবে ভোজটা বন্ধ করে দিতে হয় তাহলে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আলতার কাছেও আমি খেলো হয়ে যাব। আমি কয়েক জায়গায় টাকাটা ধার করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোথাও পাইনি। তাই শেষে আপনার কাছে এসেছি। আপনার পক্ষে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া কিছু শক্ত নয়। আপনি যদি সম্বন্ধ করে আমার বিয়ে দিতেন তাহলে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আপনার খরচ হয়ে যেত। প্রসঙ্গত; আর একটা কথাও বলছি। আপনার ওই টাকা আমাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত টাকা। তাতে কি আমার একটুও দাবী নেই? তাঁরা বংশপরম্পরায় জমিদার ছিলেন। আপনিও অনেক দিন জমিদার ছিলেন। কিছুদিন আগেই জমিদারিপ্রথা লোপ পেয়েছে। তাতেও শুনেছি কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছেন আপনি। আমি আপনাদের বংশের একমাত্র বংশধর। আমার বিয়েতে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ভোজ দেওয়াটা কি খুবই অসঙ্গত? শুনেছি আপনার বিয়েতে নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। আমার দাবী মাত্র আড়াই হাজার টাকা। সেটা কি আপনি দেবেন না? আমার দাবী যদি না মানতে চান, টাকাটা ঋণস্বরূপই আমাকে দিন। আমি ক্রমশ ওটা শোধ করে দেব। আপনি কাল দুপুরে এই চিঠি পাবেন। কালই বেলা তিনটে নাগাদ আমি আপনার কাছে যাব। আশা করি টাকাটা আমাকে দিয়ে আপনি আমার ও নিজের মান রক্ষা করবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

প্রণত প্রবাল।

চিঠিটা পড়িয়াই গোপালদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে মুখে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অন্য চিঠিগুলি না পড়িয়া তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিজের লাইব্রেরি ঘরে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দুইটি কথাই তাঁহার মনে তপ্ত শলাকার ন্যায় বিঁধিতেছিল। বাঁদীর মেয়ে—আর দাবী—। সহসা তিনি তরবারিটা দেওয়াল হইতে নামাইয়া কোষমুক্ত করিলেন। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইতেই চোখ

তুলিয়া দেখিলেন—আড়াইটা বাজিল। জীমূতবাহন দেবের তরবারিটা চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর মাথার উপরে সেটা ঘুরাইলেন কয়েকবার। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, রগের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষুর দৃষ্টি হইতে বিচ্ছুরিত হইল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

তিনটা বাজিল। দ্বারপ্রান্তে দময়ন্তী দেখা দিলেন। তাঁহার পিছনে প্রবাল। প্রবালের পরিধানে চোং প্যান্ট, গায়ে চকরা-বকরা ছিটের শার্ট। মুখে সুচালো দাড়ি এবং এক জোড়া উদ্ধত গোঁফ। চোখে একটা রঙীন চশমা। গোপালদেবের মনে হইল একটা স্প্যানিশ দস্যু যেন। গোপালদেব প্রবালকে এত সামনাসামনি অনেকদিন দেখেন নাই। এই তাঁহার পুত্র! সুপ্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত দেব বংশের বংশধর—বান্দীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া হোটেলে উৎসব করিবার জন্য টাকা দাবী করিতে আসিয়াছে! তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল এখনই বুঝি মাথা ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির লাভার মতো রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইবে।

দময়ন্তী আবদার-মাখা নাকিসুরে বলিলেন—"প্রবাল এসেছে। ওর চিঠি বোধহয় পেয়েছ। কি যে ক্ষ্যাপা ছেলে—কি কাণ্ড যে করে। বিপদে যখন পড়ে গেছে তখন আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে—"

"চিরকালের মতো উদ্ধার করে দিচ্ছি—"

গোপালদেব তরবারি তুলিয়া তাড়া করিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। প্রবালকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তলোয়ারটা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী দুই হাত বাড়াইয়া পুত্রকে রক্ষা করিলেন। কোপটা তাঁহারই কাঁধে পড়িল। তিনি পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপালদেবও জ্ঞান হারাইলেন।

গোপালদেবের যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন তিনি যে ঘরে আছেন তাহা তাঁহার লাইব্রেরী নহে। সম্ভবত হাসপাতাল। তাঁহার পাশে নার্স-বেশে সজ্জিতা যে মেয়েটি বসিয়াছিল সে তাঁহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। গোপালদেব অনুভব করিলেন তিনি যাহা করিবেন বলিয়া তরবারি তুলিয়াছিলেন তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে খুন করিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়া পড়িবেন। এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেছিলেন তাহার অবসান হইয়া যাইবে। তাঁহার মেয়ে নীলার চেহারাটা মনে পড়িল। ঠিক যেন একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নয়, অভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাহার পেট-কাটা জামা, উন্মুক্ত বগল, ঠোঁটের এবং গালের অতি উগ্র প্রসাধন, তাহার অভব্য পোষাক পরিচ্ছদ, স্তনযুগলের চোখে-খোঁচা-দেওয়া উদ্ধত ভঙ্গী, তাহার গণিকা-সুলভ চাহনি এবং গমনভঙ্গী বহুদিন হইতেই তাঁহার আদর্শের মুখে লাথি মারিতেছিল। তিনি সকলকে নিঃশেষ করিয়া মরণের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুভব করিলেন, তাহা পারেন নাই।

একটু পরেই সিভিল সার্জন আসিলেন। তিনি পাশের ঘরেই ছিলেন। সিভিল সার্জন সুরেশ মৌলিক গোপালদেবের বাল্যবন্ধু।

"গোপাল, এখন কেমন আছ।"

"আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন।"

"চিকিৎসার জন্যে। কথা বোলো না। একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি, ঘুমোও খানিকক্ষণ।"

নার্স ইনজেকশন ঠিক করিয়াই আনিয়াছিল। সিভিল সার্জন সেটা দিয়া বলিলেন —"এইবার ঘুমোও।"

"আমার কি হয়েছে।"

"টেমেপোরারি ইনস্যানিটি (temporary insanity), খানিকক্ষণের জন্য মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোমার। আর কথা নয়। ঘুমোও এবার—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। নানারকম স্বপ্ন, নানারকম চিন্তা, নানারূপ ছায়ামূর্তি আসিয়া তাঁহার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। সকালেই উঠিয়া চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলেন— বাড়ি ফিরিয়া যাইব।

সিভিল সার্জন তাঁহাকে নিজের মোটরে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,"চল।" সোজা তাঁহাকে লইয়া যেখানে তুলিলেন সেটা গোপালদেবের বাড়ি নয়—পাগলা গারদ।

হঠাৎ লর্ড খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর তাড়া করিয়া গেল। এক ঝাঁক ছোট পাখী একটু দূরে চরিতেছিল। লর্ডের তাড়ায় তাহারা উড়িয়া গেল। কার্তিকের মনে হইল, সম্ভবত মুনিয়ার ঝাঁক। আনটা তখনও ঘুমাইতেছিল। কার্তিক খাতাটা বন্ধ করিয়া দূরে দিগন্তে চাহিয়া রহিল। সূর্য অস্তাচলগামী। মুনিয়ার ঝাঁক দেখিয়া তাহার একটা কথা মনে পড়িল। বহুদিন আগেকার কথা। ছেলেবেলায় মুনিয়া নামে তাহার একটি সঙ্গিনী ছিল। মুনিয়া পাখীর মতই সে বনে জঙ্গলে বাগানে বাগানে নদীর তীরে পুকুরের পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত রকম জিনিস যে সংগ্রহ করিত সে। ঘেঁটু ফুল, মাকাল ফল, আলকুশি লতা, কুকুরশোঁকা গাছ, শ্বেত বেড়েলা, পুনর্ণবা, ঘলঘসে ফুল, ওসব মুনিয়াই তাহাকে চিনাইয়াছিল। তাহার পিঠে বিনুনি ঝুলিত একটা। ফিতা দিয়া বাঁধা নয়, কাপড়ের পাড় দিয়া বাঁধা। তাহার নামও ছিল মুনিয়া, মুখখানিতেও একটা পাখী-পাখী ভাব ছিল। ছোট্ট মুখ, ছোট্ট চোখ দুইটি। ছোট্ট নাকটি, মনে হইত যেন পাখীর ঠোঁট। চোখের দৃষ্টিও ছিল কৌতূহলী, সদা-চঞ্চল। ঠিক পাখীর মতো। খুব ভোরে আসিয়া তাহার মামার বাড়ির সামনের রাস্তাটায় ঘুরঘুর করিত আর মাঝে মাঝে ডান হাতটা মাথার উপর তুলিয়া টুসকি দিতে দিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত আর মুখে শব্দ করিত টুক টুক টুক। ঠিক পাখীর মত ছিল সে। মাতৃহীন কার্তিকের ছেলেবেলাটা মামার বাড়িতে কাটিয়াছিল। মুনিয়ারই সমবয়সী সে। মুনিয়াকে দেখিলেই সে বাহিরে চলিয়া আসিত। কেহ মানা করিত না। মামার বাড়িতেও সে ছিল গলগ্রহ। সে বাহিরে চলিয়া গেলেই যেন তাহার মামী স্বস্তি বোধ করিতেন। তাহার প্রাপ্য জলখাবারটা তিনি তখন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। বলিতেন, ও যখন মুনিয়ার সঙ্গে জুটেছে তখন বাগানে বাগানে ঘুরে ফলটা পাকড়টা খেয়ে নেবে। মুনিয়া সত্যই তাহাকে নানারকম ফল খাওয়াইত। কুল, পেয়ারা, আম, সাপাটু

(মল্লিকদের বাগানে সাপাটু গাছ ছিল), গোলাপ জাম, লিচু, কালোজাম—নানারকম ফল সংগ্রহ করিতে পারিত সে। সবই পরের বাগান হইতে চুরি করা। ঢিল ছুঁড়িয়া পাড়িত, হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। মুনিয়ার সঙ্গ কিন্তু বেশী দিন সে পায় নাই। মল্লিকদের বাগানেই একটা বিষধর গোক্ষুর তাহাকে নাকি দংশন করে। তখন তাহার সঙ্গে কার্তিক ছিল না। মুনিয়া বাড়ি ফিরিতে পারে নাই। বাগানেই মরিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে বাগানের মালীর ছেলেটা তাহাদের বাড়িতে খবর দেয়, সে নাকি সাপটাকে কামড়াইতে দেখিয়াছিল। মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায়। মুনিয়ার মা ছিল না। সৎমা ছিল। তাহার বাবা পাশের গ্রামে ধান-কলে কাজ করিত। খবর পাইয়াও সৎমা যায় নাই। বলিয়াছিল, তাহার নাকি বড় ভয় করিতেছে। পাড়ার ছেলেরা অনেকক্ষণ পরে মুনিয়ার শবটা যখন বহন করিয়া আনিল তখন দেখা গেল, কাকে তাহার একটা চোখ ঠুকরাইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে। কার্তিক মুনিয়ার শোকে কাঁদিয়াছিল, দুই দিন খায় নাই। তাহার পর বাবা তাহাকে কলিকাতায় একটা বোর্ডিংয়ে ভরতি করিয়া দিলেন। সেইসব কথা এখন মনে পড়িতে লাগিল। আর একটা ছবি মনে পড়িল। মুনিয়ার সেই মুখ-টেপা হাসিটা। কাক তাহার চোখটা নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু হাসিটা নষ্ট করিতে পারে নাই। মৃত মুনিয়ার মুখেও সেই হাসিটুকু ছিল। মুনিয়ার কথাই নানভাবে ভাবিতে লাগিল সে। মুনিয়া যদি বাঁচিয়া থাকিত···বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোথাও না কোথাও বিবাহ হইত তখন সুরংকে সে কি চিনিতে পারিত। কার্তিকের ডাক নাম সুরং। কার্তিক নামটা পোষাকী নাম, স্কুলে ভরতি করিবার সময় মামা এ নামকরণ করিয়াছিলেন, কার্তিকের মায়ের নাম ছিল দুর্গা, সেইজন্যই এই নাম তাঁহার মনে হইয়াছিল সম্ভবত। সুরং ভাবিতে লাগিল এই বিপন্ন অবস্থায় সে যদি মুনিয়ার শ্বশুরবাড়িতে গিয়া বলিত—মুনিয়া বড় বিপদে পড়ে এসেছি, আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমাকে একটু আশ্রয় দিবি ? সে কি আশ্রয় দিতে পারিত ? আবার মনে হইল নিমুর সহিত বিবাহ না হইয়া তাহার যদি মুনিয়ার সহিতই বিবাহ হইত (হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ মুনিয়া তাহাদের পালটি ঘরের মেয়ে) তাহা হইলে কেমন হইত ? কিন্তু নিমুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই একথা ভাবিতেও খারাপ লাগিল তাহার। তাহার পর হঠাৎ দেখিতে পাইল আকাশ দিয়া তিনটা বক উড়িয়া যাইতেছে। মনে হইল নিশ্চয়ই একটা পুরুষ, আর দুইটি তাহার সঙ্গিনী। হয়তো একজন মুনিয়া আর একজন নিমু। কল্পনার আকাশে খানিকক্ষণ সে বক হইয়া নিমু আর মুনিয়া দুইজনকে লইয়া উড়িতে লাগিল। তাহার পর সহসা তাহার মনে পড়িল উপন্যাসটার কথা। গোপালদেব ? কেমন ছিল সে ? মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলে ওই লোকটিকেই শাসকরূপে নির্বাচন করিয়াছিল কেন ? তখন নির্বাচন কি এখনকার মতো ছিল ? গোপালদেব কি কোনরকম ছল-চাতুরী-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল ? সে কি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিল গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এখনকার নেতারা যেমন করে ? সে কি বড়লোক ছিল, না গরীব ? ইতিহাসে বলে সে ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে। কেন ? এইসব নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার পর একটা বড় অদ্ভুত কথা তাহার মনে জাগিল। এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। আজকালও তো বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া খাইতেছে—এখন কি আবার কোন

গোপালদেবের আবির্ভাব সম্ভব ? কেন নয়। আমিই বা গোপালদেবের ভূমিকায় কেন অবতীর্ণ হইতে পারি না। হঠাৎ এই চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল সে। গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে-ও কি কার্যত বৌদ্ধ নয় ? সে তো যাগ-যজ্ঞ মানে না, তেত্রিশকোটি দেবতার উপর তো তাহার বিশ্বাস নাই, আত্মা-পরমাত্মার রহস্য লইয়াও সে কোনওদিন মাথা ঘামায় নাই। ভগবান আছেন কিনা, কি উপায়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় এ ভাবনাও তাহার মনে আসে নাই কোনদিন। বরং নিজের অজ্ঞাতসারে যে নীতিগুলিকে সে এখনও আঁকড়াইয়া আছে তাহা বুদ্ধদেবেরই পঞ্চশীল—হিংসা করিও না, মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না, পরস্ত্রীগমন করিও না, মদ খাইও না। এই সবকেই সেও তো ধর্ম বলিয়া মনে করে। তবে ? এ 'তবে'র উত্তর সহসা তাহার মাথায় আসিল না। সে পঞ্চশীল পালন করে বলিয়াই কি তাহার গোপালদেব হইবার যোগ্যতা আছে ? সে যুগে অনেক লোকই তো 'পঞ্চশীল' পালন করিত, অনেক লোকই তো ত্রিশরণ লইয়া ভিক্ষু-বেশে সংঘে গমন করিত, কিন্তু সকলে তো গোপালদেব হয় নাই। কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিলেন ? এই প্রশ্ন কিছুক্ষণ তাহার মনে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর মনে হইল স্বয়ং বুদ্ধও তো গোপালদেব হইতে পারেন নাই, বুদ্ধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, গোপালদেব মাৎস্যন্যায়ের হিংস্রতাকে শান্ত করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন নূতন রাজ্য। দুইজনের জীবন-নীতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সুতরাং বুদ্ধত্ব আর গোপাল-দেবত্ব এক বস্তু নহে। আবার মনে হইল আমার নাম যেমন কার্তিক অথচ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র সহিত আমার যেমন কিছুমাত্র সাদৃশ নাই—এ-ও অনেকটা তেমনি। তখন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার অধঃপতন ও অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সবসময়ে পঞ্চশীল অনুসরণ করিত না। এদেশের অনেক এমন জাতি বৌদ্ধ হইয়াছিল যাহারা প্রাণী-হিংসা করিয়াই জীবনযাপন করে—জেলে, মালো, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ—এরকম অনেক নাম তাহার মনে পড়িল। চীন জাপানও বৌদ্ধ, কিন্তু তাহারাও 'হিংসা করিও না' এ নীতি অনুসরণ করে না। তাহারা সব রকম মাছ মাংস খায়, অস্ত্র লইয়া রণাঙ্গণে রক্তপাত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকটা এই কান্ড হইয়াছে। হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের সহিত ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত একমত হইতে না পারিয়া অনেকে 'ব্রাহ্ম' হইয়াছিলেন। উপনিষদের ধর্মের সহিত নবাগত বিদেশী আচার-ব্যবহারের 'পাঞ্চ' করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল, অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াও ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন এরূপ লোক সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। 'কমিউনিজ্‌ম্‌'ও অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। অনেকেই 'কমিউনিস্ট', কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদীর লক্ষণ কয়জনের জীবনচরিত্রে রূপায়িত ? সেইজন্য মনে হয়, গোপালদেব বোধহয় নামেই বুদ্ধ ছিলেন। প্রয়োজন হইলে ক্ষত্রিয়ের মতো তরবারি নিষ্কাশন করিয়া শত্রুর রক্তপাত করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। কার্তিক কল্পনা করিল, তিনি নিশ্চয় আমিষাশী ছিলেন। হয়তো শিকারীও ছিলেন। একটা ছবি সহসা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল—একটা বিরাট বন্যবরাহকে অনুসরণ করিয়া একজন শিকারী ভল্ল হস্তে বনজঙ্গল ভাঙিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষাত্র পৌরুষের একটা বলিষ্ঠ আবির্ভাব তাহার কল্পনায়

মূর্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল যে বাঙালীরা আজ কেরানীগিরি লাভ করিবার জন্য নানাভাবে নিজেদের অবনত করিতেছে এই সমর্থ পুরুষের সহিত কি তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে? কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল সে। তাহার পর মনে হইল সম্পর্ক আছে বই কি। কিন্তু যুগের প্রভাবে মানুষ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার নিজের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়িল। তিনি প্রত্যহ সাত আট ক্রোশ হাঁটিয়া বেড়াইতেন, এক চুমুকে দুই সের দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন, স্বপাক রাঁধিয়া একবেলা খাইতেন, জুতা পরিতেন না, ছাতা মাথায় দিতেন না, জামাও পরিতেন না। তিনি আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন, অথচ তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র মিল নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া গোপালদেবের কথাটাই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন? বুদ্ধদেবের কোন বিশেষ বিভূতি তাঁহার চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল কি? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' কবিতাটা মনে পড়িল। তাহাতে একটা কথা আছে 'করুণাঘন'। এই 'করুণা' গভীর ভালবাসারই নামান্তর। মহৎ লোকেরা সকলকেই করুণা করেন। এ করুণা ইংরেজি 'পিটি' (pity) নহে, ইহা উচ্চ বেদীতে দাঁড়াইয়া অনুগ্রহবর্ষণ নহে, ইহা সহানুভূতি, সহমর্মিতা, দুঃখীর বেদনা নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জন করা। শুধু তাহাই নহে, কি করিলে সে কষ্ট দূর হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন। হয়তো গোপালদেবও ওই পথের পথিক হইয়াই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন্। বুদ্ধত্বের ওই মহৎ গুণটিই হয়তো তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি সকলকেই ভালোবাসিয়াছিলেন। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়ের জন্যই বেদনাবোধ করিয়াছিলেন তিনি। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই, সকলেরই মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সকলেরই সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কি তাহা পারিব না? সঙ্গে সঙ্গেই দুইটা মুখ তাহার মনে পড়িল—তাহার শালা কালীকিংকরের এবং মিস্টার ভড়ের। মিস্টার ভড়ের পক্ষপাতিত্বের জনাই সে কেরানীগিরির চাকুরিটি পায় নাই। ভড় মহাশয় তাঁহার আই-এ পাশ পুত্রটিকে আপিসে বাহাল করিয়া বলিয়াছিলেন—ও সব বি-এ অনার্স-ফনার্সের মুরোদ কতদূরে তা আমার জানা আছে। ওরা আপিসে নাক উঁচু করে থাকবে খালি, আর অন্য কোথাও একটু বেশী মাইনে পেলেই ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। চাকরিতে অবশ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হইয়াছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কার্তিকের খুব আশা ছিল সে যখন বি-এ অনার্স তখন নিশ্চয়ই চাকরিটা পাইবে। মিস্টার ভড়ের ঘটির মতো মুখটা মনে পড়িল, মাথায় টাক, ঘন ভুরু, নাকের নীচে 'টুথ ব্রাশ' গোঁফ। চক্ষুর দৃষ্টি ব্যঙ্গতুর। তাহার শালা (বৈমাত্র শালা, তাহার শ্বশুরের প্রথম পক্ষের পুত্র) কালীকিংকরের মুখটাও মনোরম নহে। অনেকটা কোদালের মতো, চতুষ্কোণ এবং নিষ্ঠুর। নামটা গাঁইতির মতো। ইহাদের কি সে ভালবাসিতে পারিবে? ইহাদের জন্য কি তাহার মনে করুণা জাগিতে পারে? যে সুদখোর মহাজনটা তাহার পিতাকে চক্রবৃদ্ধি সুদের বেড়া-আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল তাহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখার মতো উদারতা কি তাহার আছে? স্বীকার করিতে হইল, নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন বলিল—এসব লোক কি ক্ষমার যোগ্য? ইহাদের ক্ষমা করা তো কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। নিজের বীর্যবলে ইহাদের যদি স্ববশে আনিয়া তাহার পর ক্ষমা করিতে

পারি তাহা হইলেই সে ক্ষমা ক্ষমা নামের যোগ্য। গোপালদেব যদি আমার মতো অবস্থায় পড়িতেন তাহা হইলে ওই কালীকিংকরকে, ওই মিস্টার ভড়কে, ওই সুদখোর রাহুল মিত্রকে কি ক্ষমা করিতেন? কখনই না। তিনি নিশ্চয়ই প্রথমে উহাদের শক্তিবলে জয় করিয়া তাহার পর তাহাদের ক্ষমা করিতেন।

"চল হে এবার ওঠা যাক। তালুকপুরে একটা মেলা বসেছে শুনেছি। সেইখানে যাই চল। কিছু রোজকার তো করতে হবে।"

"কে রোজকার করবে? তুমি?"

"হি"। তুমিও করবে। চল বাজার থেকে কিছু আবির আর কিছু কালো রং কিনে নিই। তোমার মুখে মাখিয়ে দিলে খাশা দেখাবে। আমি আমার কাপড়টা খুলে ঘাগরার মতো করে পরব। গামছাটা মাথায় দিয়ে ঘোমটার মতোও করে নেব একটু। তারপর কোমরে হাত দিয়ে লাচব। আর তুমি মুখে রং মেখে আমার সংগে ফষ্টিনষ্টি করবে। খুব জমে যাবে। লোকে লাচ দেখতে বড় ভালোবাসে। হিন্দী সিনেমাগুলো চলছে খালি লাচের জোরে। আমি অনেক হিন্দী সিনেমা দেখেছি, প্রায় সবগুলোতেই ডবকা ছুঁড়িদের লাচ। সার্কাস তো একটা কাটখোট্টা ব্যাপার, সেখানেও লাচ দিতে হয়। সার্কাসে আমি আর মোহিনী লাচতাম। মোহিনী লাচত আর আমি মুখে কালি ভুষো আর আবির মেখে তার সংগে ইয়ার্কি করতাম। খুব জমে যেত—কি হাততালির ধুম। আমার পার্টটা আজ তোমাকে করতে হবে। চল আর দেরি করা নয়। মেলায় একটা দালাল জোগাড় করতে হবে—পাব কি না জানি না, পেলে ভালো হয়—"

"দালাল? দালাল কি করবে!"

"আমাদের হ'য়ে দালালি করবে। কিছু পয়সা নেবে অবশ্য, কিন্তু তাতে বেশী পয়সা রোজকার হবে।"

"তাই না কি।"

"হি"। চলই না দেখা যাক কি হয়—। ওই! কুকুরটা আবার মাটি খুঁড়ছে কেন—!"

"ছুঁচোর সন্ধান করছে—"

"যদি আজ ভাল রোজকার হয়, ওকে একটু দুধ খাওয়াব। কি বল?"

কার্তিক একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। মুখে লাল কালো রং মাখিয়া কি ধরনের ফষ্টিনষ্টি করিলে লোকেরা খুশী হইয়া পয়সা দিবে তাহাই সে ভাবিতেছিল বোধহয়।

"চল ওঠা যাক। সন্ধে তো হয়ে গেল। হাঁটতেও হবে খানিকটা—"

"তালুকপুরের খবর কে দিলে তোমায়—"

"বাজারে যেখানে আমি খেলা দেখাচ্ছিলাম তারাই বললে তালুকপুরে প্রতি পূর্ণিমায় মেলা বসে। খুব লোকজন আসে। সেখানে রোজকার বেশী হবে। চল যাওয়া যাক—কুকুরটাকে ডাক, ও যে খুঁড়েই চলেছে—"

"লর্ড—লর্ড—"

লর্ডের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া কান খাড়া করিয়া তাকাইল মাত্র, আবার খুঁড়িতে লাগিল।

"ভারি অবাধ্য কুকুরটা। চল আমরা এগিয়ে যাই। ও আপনিই আসবে—"

আনটো একবার কোমর বাঁকাইয়া নাচিয়া লইল। তাহার পর বার দুই লাফ খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই, হুই, হুই। পরিশেষে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া সিটি দিল বার দুই।

"আমার মনে জোয়ার এসে গেছে, চল।"

জিনিসপত্র দুইটি থলিতে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহারা। যখন কিছুদূর গিয়াছে লর্ড তখন মুখ তুলিয়া দেখিল তাহারা চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁই বাঁই করিয়া ছুটিল সে তাহাদের পিছনে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের পার হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া লাফালাফি করিতে লাগিল। মুখে একটা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি-হাসি ভাব। একটা কান উল্টাইয়া গিয়াছে!

তালুকপুরের মেলায় একজন দালাল পাওয়া গেল। একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়াইয়াছিল লোকটা। মুখময় বসন্তের দাগ। আনটার কাছে সমস্ত শুনিয়া সে বলিল, "ঠিক আছে। তোমরা আমার এই তাঁবুটায় ঢোক। ঢুকে সাজগোজ করে নাও। আমি ততক্ষণ ক্যানেস্তারা পিটে লোক জোগাড় করে ফেলছি। রাত্রি দশটার পর কিন্তু তাঁবু ছেড়ে দিতে হবে।"

"কেন?"

"আর একজন আসবে, খেজুরি বিবি। তার কারবার রাত দশটার পর।"

তাহার হতে একটা রিস্ট-ওয়াচ ছিল, সেটার দিকে এক নজর চাহিয়া বলিল—"প্রায় সাতটা বাজে, তোমরা যদি দশটা পর্যন্ত থাকো, তাঁবুর ভাড়া ঘন্টা পিছু চার আনা লাগবে। তিন ঘন্টায় বারো আনা। আর আমি যে ক্যানেস্তারা পিটে লোক জড় করব তার জন্যে এক টাকা চাই।"

আনটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"অত পারব না ভাই। বখরা কর। টাকায় দু'আনা নিও। যত পয়সা পড়বে তা আমি কুড়ুব। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বখরা দিয়ে দেব। এতে রাজি?"

লোকটা কানে আঙুল ঢুকাইয়া কানটা একবার চুলকাইয়া লইল। তাহার পর বলিল—"তুমি বামন অবতার, তোমার নাচ দেখতে লোক জুটবে। ইনি কি করবেন?" আমাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিল।

"ইনি হবেন আমার লাগর। আমি লাচব আর ওঁকে লাচাব—"

"তাই না কি—"

"হিঁ গো। দেখো না কেমন জমাই—। রাজি তো?"

"বেশ। ঢুকে পড় তাহলে তাঁবুর ভিতর—আমি ক্যানেস্তারা পিটি—আর এ কুকুরটাও তোমাদের না কি।"

"হিঁ। ওটাও লাচবে—"

তিনজনে তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে ক্যানেস্তারা পিটাইয়া লোকটা তারস্বরে বলিতে লাগিল—আসুন, আসুন। এখনি বামন অবতার মাগী সেজে নাচ দেখাবে তার নাগরের সঙ্গে। আর তাদের সঙ্গে নাচবে একটা কুকুরও। দশ নয়া করে দর্শনী লাগবে। দয়া করে কেউ ফাঁকি দেবেন না। ফাঁকি দিলে বামন অবতারের শাপ লাগবে—ঢং ঢং ঢং ঢং।"

ক্যানেস্তারার বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আনটো কার্তিককে চুপি চুপি বলিল, "তুমি গানের এই লাইনটা মনে রেখো। আমাদের সার্কাসের সাঁওতালী সহিসের কাছে শিখেছিলাম এটা। 'ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখারে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে—'। এইটেই সুর করে গাইবে আর আমি লাচব। আর কুকুরটা আমাদের ঘিরে হুটোপুটি করবে—"

"লর্ড পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতেও পারে—"

"বাঃ, তাহলে তো খাশা হবে। ওর সামনের পা দুটো ধরে ওকে লাচিও, তাহলে আরও জমে যাবে—। বস, তোমার মুখে রং মাখাই, বাজারে খুব ভালো রং পেয়েছি। নাকটা আর চোখের পাশগুলো লাল করব। থুতনিটাও। আর বাকীটা কালো। তুমি হাত পা তুলে যেমন খুশি লেচো তবে ওই গানটা গাইতে হবে—ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখা রে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে। লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে। মনে থাকবে তো?"

"থাকবে—"

কার্তিকের মুখে হাতে রং মাখাইয়া আনটো নিজের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিল। কার্তিকের সামনেই উলঙ্গ হইয়া পড়িল সে। এতটুকু লজ্জা করিল না তাহার। কাপড়টা কোঁচ দিয়া শাড়ির মতো করিয়া পরিল। তাহার পর তাঁবুর কোণের দিকে তাকাইয়া সে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—"এ লাগ লাগ, এ লাগ লাগ, লেগে গেছে, মিলে গেছে!"

তাঁবুর কোণের দিকে ছোট ছোট দুইটা ইঁটের টুকরো আর একটু শণের দড়ি পড়িয়াছিল। আনটো ছুটিয়া গিয়া সেগুলি লইয়া আসিল।

"এই ইঁট দুটো দড়ি দিয়ে আমার বুকের দু'পাশে বেঁধে দাও তার উপর আমার রাঙা গামছাখানা। বুকের কাছটা একটু উঁচু না হলে মুংলিকে মানাবে কেন!—"

ভাগ্যিস্ দড়ি একটু বেশী ছিল—যে মজুররা তাঁবু খাটাইয়াছিল তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছিল বোধহয়। বেশী দড়ি না থাকিলে ওই ইঁটের টুকরা দুইটা বুকে বাঁধা যাইত না। কার্তিক ইঁটের টুকরা দুইটাকে বুকের দুই পাশে রাখিয়া দড়ির বহু পাক দিয়া সেগুলিকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। একটা ছেঁড়া খবরের কাগজও পড়িয়াছিল তাঁবুর ভিতর। আনটো আদেশ করিল, "ওটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে গুজে দাও। নিটোল হবে তাহলে।" নিজের বুকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিতে লাগিল—"বাঃ ই তো খাশা হয়েছে। মোহিনীর মতো আমার মুখটা যদি হ'ত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম লাচ কাকে বলে—!"

ভীড় প্রচুর হইয়াছিল। সমস্ত মেলাটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল যেন। আনটোর নৃত্য-শিল্প হয়তো উচ্চাঙ্গের ছিল না, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রাচুর্য এত প্রচুর, তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ এত সাবলীল যে তাহাতেই জমিয়া গেল। কার্তিকও মুখে রং মাখিয়া 'লাগরের' পার্টে মন্দ অভিনয় করিল না। সে বিশেষ কিছু করে নাই।—হাত পা নাড়িয়া ওই গানের কলিটা মুখভঙ্গী করিয়া গাহিতে লাগিল কেবল—ওরে আমার মুংলি সোনা লাচ দেখা রে। আনটোও নাচিতে নাচিতে ইহার

উত্তরে আরও খানিকটা গাহিল—লাচব ক্যানে ? বাউটি দিবি ? প'ইছা দিবি ? কাঁকন দিবি ? ও মুখ পোড়া, মার্কাড়ি দিবি ? লত দিবি ? গোট দিবি ? না দিস তো—লাচব ক্যানে, লাচব ক্যানে—? এই বলিয়া সে থুতনিতে আঙুল দিয়া কোমর বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া যে নাচ নাচিল তাহাতে হৈ হৈ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। লর্ডও ইহাদের ঘিরিয়া ঘিরিয়া আনন্দে উদ্দাম নৃত্যে জুড়িয়া দিল। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিকের সঙ্গেও খানিকক্ষণ নাচিল সে। মনে হইতে লাগিল তাহার স্ফূর্তিই যেন সবচেয়ে বেশী।

পয়সা অনেক পড়িয়াছিল। তাঁবুর সামনেই একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। লণ্ঠনটা না কি খেজুরি বিবির। তাহারই একজন চাকর সন্ধ্যা হইতে সেটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সম্ভবত খেজুরি বিবির আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য। সেই লণ্ঠনের আলোতেই আনটার নাচেরও সুবিধা হইয়া গেল। সেই আলোতেই সে পয়সাও কুড়াইল। সব সমেত আট টাকা কুড়াইয়া পাইল সে। অনেকে আধুলিও দিয়াছিল। তাঁবুর মালিককে সে একটাকা দিল, খেজুরি বিবির চাকরকেও আট আনা দিয়া সে বলিল—"ভাগ্যিস আলোটা এনেছিলে ভাই, তাই আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। তোমার নাম কি—?"

চাকরটা হাঁ করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিল, তাহার পড় বুড়ো আঙুল নাড়িতে লাগিল। বোঝা গেল, সে বোবা। আনটা মুখ সুচালো করিয়া বলিল—'হুই, কি কাণ্ড।' কার্তিক তাঁবুর ও পাশটায় অন্ধকারে গিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল গোপালদেব কি এরকম পরিস্থিতিতে পড়িয়াছিলেন কখনও ?

"হুই কার্তিক কোথা গেলে হে—"

আনটার ডাক শুনিয়া কার্তিক বাহির হইয়া আসিল।

"চল ওদিকে একটা পুকুর আছে শুনেছি। চান করে আসি।"

"আমি পায়জামা ভিজুব না। দ্বিতীয় কাপড় আমার নেই—"

"দ্বিতীয় কাপড়ের কি দরকার। দিগম্বর হয়ে চানটা করে লাও—পুকুর পাড়ে গাছগাছালি আছে নিশ্চয়—তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে।"

"না সে আমি পারব না। তোমার কাপড় আছে ?"

আনটার হাসিও আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল। বলিল—"হ্যাংলা বলে ন্যাংটাকে, মাণিক আমায় কাপড় দে—। আমার কাপড় কোথা ? একটা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট আছে খালি,—আর এই গামছাখানা, যেটা বুকে বেঁধেছি। ইটা খোলো তো ইঁট দুটোও খোল, খোঁচা মারছে বুকে। গামছাটা পরে চান করতে পার—তাই চল—চল পুকুরটা বার করি আগে—"

কিছু দূরেই একটি রিক্‌শা দাঁড়াইয়াছিল। সেই রিকশা হইতে একটি ডগমগে-লাল-শাড়ি-পরা মেয়ে নামিল। তাহার পায়ে হাই-হিল জুতা, চোখে চশমা, গালে ঠোঁটে রং, পিছনে সর্পাকৃতি একটি বেণীর অগ্রভাগে জরির ফুল। তাহার উপর পেট্রোম্যাক্সের আলোটা পড়িতেই মনে হইল যেন একটা আবির্ভাব। মেয়েটি সোজা কার্তিকের দিকে আগাইয়া আসিল এবং বিস্মিত কার্তিক কিছু বলিবার পূর্বেই বলিল—"সুরৎ আমাকে চিনতে পারছ ?"

সুরৎ পারিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কেবল।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি চপলা—"

চপলা! চপলাদি! একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকা যেন বিস্মৃতির পরদাটাকে চিরিয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন পরদার ভিতর দিয়া সে সহসা ভৈরব-কিংকর প্রাইমারি গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা মিস চপলা চক্রবর্তীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বহুকাল আগে কালীকিংকরের প্রপিতামহ ভৈরবকিংকরের নামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে কালীকিংকর যাহাকে শিক্ষিকা পদে বাহাল করেন তিনি কালীকিংকরেরই দূরসম্পর্কীয়া শালী ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ চপলা চক্রবর্তী—সুরংয়ের চপলাদি। চপলা কালীকিংকরের বাড়িতেই থাকিত, নিমুকে এবং জ্যোৎস্না বউদিকে (কালীকিংকরের স্ত্রী) ইংরেজি, বাংলা এবং অংক পড়াইত, ইতিহাসেও প্রচুর দখল ছিল তাহার। নাটক নভেল পড়িত না, ইতিহাসের বই পড়িত। তাহার পর হঠাৎ একদিন সে অন্তর্ধান করিল। নিমু বলিল—কুলে কালী দিয়া গিয়াছে। কালীকিংকর কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—যাকে ফুলের মালা মনে হয়েছিল সে যে আসলে কালভুজঙ্গিনী তা কে জানত। ইহার পর ভৈরবকিংকর বালিকা বিদ্যালয় (ইংরেজিতে নাম ছিল বি. কে. গার্লস স্কুল) উঠিয়া গেল। ইহার পর আর কোনও শিক্ষিকাই পাওয়া গেল না। জ্যোৎস্না বউদি কোনও শিক্ষিকাকে বাড়িতে স্থান দিতে রাজি হইলেন না। গ্রামের কোনও সম্পন্ন গৃহস্থই হইল না। উপরে সিমেন্ট-অক্ষরে চিহ্নিত বি. কে. গার্লস স্কুলটির পাকা একতালা ভবনটি এখনও আছে। তাহা কালীকিংকর ধান-চালের গুদাম-রূপে ব্যবহার করেন। কতদিন আগেকার কথা? বছর পাঁচেক হইবে। ইহার মধ্যেই চপলা—তাহার চপলাদি—বিস্মৃতির আড়ালে হারাইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য তো। সত্যই আশ্চর্য মানুষের মন। অনেকদিন আগে এক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে সে আকাশের নক্ষত্র চিনিতে শিখিয়াছিল! সপ্তর্ষিমণ্ডলীর 'কর কারোলি' (Cor Caroli) নামক ছোট একটা নক্ষত্র সে অনেক কষ্টে চিনিয়াছিল। সে নক্ষত্রটা এখন কোথায় আছে? চিনিয়া বাহির করিতে পারিবে কি? সে হঠাৎ যদি তারার ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া বলে—সুরং আমাকে চিনতে পারছ? সে পারিত না। চপলার আবির্ভাবও যেন অনেকটা সেই ধরনের।

"চপলাদি! তুমি এখানে—?"

"এসে পড়লুম। তুমি মুখে রং মেখে সং সেজেছ, কিন্তু তবু তোমাকে চিনেছি আমি। চল, সব বলছি—"

যে বোবা চাকরটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনের কাছে বসিয়াছিল চপলা তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তাঁবুর ভিতর বিছানাটিছানা পেতেছিস?"

সে ঘাড় নাড়িয়া উদ্ভাসিত চক্ষে জানাইল পাতিয়াছে। কার্তিক বলিল—তাঁবুটা শুনেছি খেজুরি বিবি ভাড়া করেছেন।"

"আমিই খেজুরি বিবি। ভিতরে এস—"

আরও বিস্মিত হইল কার্তিক। আরও ঘাবড়াইয়া গেল সে।

আনটা বলিল—"আমি তাহলে চানটা সেরে আসি। ঘেমে একেবারে আচার হয়ে গেছি। তুমি আলাপ কর ওনার সঙ্গে। লর্ড আয়, তোকে একটু খাবার খাওয়াই, অনেক নেচেছিস—আঃ, আঃ—হুই হুই—হুই—"

লর্ডকে লইয়া আনটা চলিয়া গেল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল কার্তিক। সেখানে একটা বড় চাদরের উপর রং-ওঠা পুরোনো একটা কার্পেট পাতা, গোটা দুই তাকিয়া, একটু দূরে পাশে একটা দড়ির খাটিয়া, এক বালতি জল আর চকচকে কাঁসার ঘটি। আর এক কোণে একটি কুঁজোর মুখে ঢাকাদেওয়া একটি কাচের গ্লাস। তাহার পাশে তিন চারটি বোতল—বোধহয় মদের বোতল।

"তুমি খেজুরি বিবি! চপলাদি, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না—"

"চপলাদি অনেকদিন আগে মরে গেছে। তোমার শালা কালীকিংকরই মেরে ফেলেছে তাকে। যাক সে কথা। তুমি এখানে রং মেখে সং সেজে কি করছ। আমি এতক্ষণ বসে বসে অবাক হয়ে তোমার কাণ্ড দেখছিলাম—! মদ খেয়েছ না কি।"

"না—"

"মদ না খেয়েই মাতালের অভিনয় করছিলে?"

"পেটের দায়ে করছিলাম—"

"কি রকম।"

"কালীকিংকর আমাকেও জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—"

"তাই না কি। নিমুকেও?"

"নিমুকে এখনও তাড়ায়নি। ওকে সহজে তাড়াবে না, কারণ ও যে বিনা মাইনের রাঁধুনী—চাকরানী।"

খেজুরি বিবি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

"তারপর?"

"তারপর আর কি। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি একটা ঝুলি নিয়ে, জুতোটা বিক্রি করে দিন দুই চলেছে। তারপর জুটেছে ওই আনটা—সার্কাস-পালানো ওই বামনটা—ওরই সাহায্যে চলছে এখন—ও নানারকম খেলা জানে—ও যা বলছে তাই করছি—কোন রকমে কিছু রোজকার করতে হবে তো।"

"কি রকম রোজকার করছ?"

"কোন রকমে খাওয়া চলছে। আজ গোটা ছয়েক টাকা হয়েছে—"

"ও কুকুরটা কি তোমার?"

"হ্যাঁ। ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। কিছুদূর এসে দেখি পিছু পিছু আসছে। নবীন দিয়েছিল আমাকে বাচ্চাটা। বড় ভালো কুকুর—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—"

"তুমি কি করবে ঠিক করেছ কিছু? সারাজীবন রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াবে?"

"সিংরা বলে একটা গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে পড়ে আছে, সেইখানে যাব ঠিক করেছি—"

"জায়গাটা কোথা—"

"হুগলী জেলায় শুনেছি।"

"হুগলী জেলায় সিঙুর বলে একটা জায়গা আছে জানি। সিংরায় তুমি গেছ কখনও?"

"না—"

"তোমার ভিটে কোনটা তাহলে চিনবে কি করে? কোনও কাগজপত্তর আছে?"

"না—"

খেজুরি বিবি হাসিয়া ফেলিল।

"কোন ভরসায় যাচ্ছ তাহলে!"

কার্তিকেরও মনে হইল সত্যই তো নির্ভরযোগ্য কিছুই নাই। গ্রামের নামটাও হয়তো সে ঠিক জানে না। হয়তো সিঙুরকেই সিংরা ভাবিয়াছে সে।

খেজুরি বিবি বলিল—"তুমি এখনও ঠিক তেমনি আছ—"

"তেমনি মানে?"

"সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কিচ্ছু বোঝ না।"

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কার্তিকের রাগ হইল হঠাৎ। নাকটা ফুলিয়া উঠিল।

"তার মানে ভদ্রভাবে বোকা বলছ আমাকে। আমি অবশ্য বোকাই। তার উপর অদৃষ্ট খারাপ, পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল, তা না হলে কেউ ঘরজামাই হয়—"

খেজুরি বিবি ভ্রূলতা উত্তোলন করিয়া বলিল—"কথার অমন বেঁকিয়ে মানে করছ কেন! সরল মানে বোকা নয়। সরল মানে যার মন শুদ্ধ, নিষ্পাপ, যে সবাইকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে, যার মহৎ আদর্শে আস্থা আছে—সেই সরল। সরলতায় পৃথিবী জয় করা যায়। সরল লোক বিরল। রাগ করছ কেন তুমি—! আচ্ছা, স্মরং তোমার মনে কোনও স্বপ্ন নেই?"

স্মরং খেজুরি বিবির মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"আছে বই কি। আমার মন স্বপ্নের বাগান। নানারকম স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে ফুলের মতো ফুটেছে আর ঝরে গেছে। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল বড় স্কলার হব একজন, আশু মুখুজ্যের মতো। ম্যাট্রিকুলেশন আই-এ-তে ভালো রেজাল্টও করেছিলাম। বাবা ছেলেবেলা থেকে আমাকে কলকাতার ভালো স্কুলে ভালো কলেজে পড়িয়েছিলেন, ভালো লাইব্রেরি থেকে অনেক বই পড়েছিলুম, অনেক বই কিনেওছিলুম—বাবা সব টাকা জোগাতেন ধার করে করে। সেই ধারের আগুনেই শেষে সব পুড়ে গেল। বাবার পক্ষাঘাত হল, মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, আমাকেই বাবার সব সেবা করতে হত। সেবার আমার বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার বছর, পরীক্ষা দিলুম, কিন্তু থার্ড ক্লাস অনার্স পেলুম। বাবাও মারা গেলেন। আমাদের যাকিছু ছিল তা সুদখোর মহাজন দখল করে নিলে। স্বপ্নটা ঝরে গেল।"

কার্তিক চুপ করিল।

"তারপর—?"

ম্লান হাসিয়া কার্তিক উত্তর দিল—"কি হবে আমার মতো হতভাগার কথা শুনে—"

"নিজেকে অত ছোট ভেবো না স্মরং। ছোট ভাবতে ভাবতে আরও ছোট হয়ে যাবে। বল, আর কি কি স্বপ্ন জেগেছিল তোমার মনে—"

কার্তিক চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর তাহার চোখে মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল একটা।

"পরের স্বপ্নটা অবশ্য নিমুকে ঘিরে। সেটা এখনও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। তারপরেও আর একটা স্বপ্ন জেগেছিল—"

একটু ইতস্তত করিয়া আবার থামিয়া গেল কার্তিক।

"কি সেটা শুনি—"

"সেটা তোমাকে ঘিরে। তখন আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো আর একবার করে পড়ছিলাম। তখন তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি শ্রী। যদিও কিছু মিল ছিল না, তবু মনে হয়েছিল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অনেক অমিল থাকে, কিন্তু মিলও থাকে আবার। তোমার সঙ্গে সেই মিলটা ছিল—সেটা কি অবশ্য তা বলতে পারব না। আমার কেবলই মনে হত কোনও অদৃশ্য সীতারামের জন্য তুমি যেন প্রস্তুত করছ নিজেকে।······"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল খেজুরি বিবি।

"তোমার কল্পনার দৌড় তো কম নয়! আসল কথাটা কি বলব? আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল। যাকে ভালো লাগে তাকে নিয়ে অনেক কবিত্ব জাগে মনে। তার মুখকে মনে হয় চাঁদ, চোখকে মনে হয় চকোর, হাতকে মনে হয় বাহুলতা। এ স্বপ্ন কি এখনও বেঁচে আছে তোমার মনে ?"

"না—। তোমাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনের উপর একটা যবনিকা পড়ে গিয়েছিল। সেই যবনিকার সামনে বসে আমি এতদিন জগু ভট্চাজের সঙ্গে দাবা খেলেছি, কোনান্ ডয়েলের উপন্যাস পড়েছি, ঘোষেদের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করেছি, চণ্ডীমণ্ডপে বসে পর-চর্চায় যোগ দিয়েছি—অর্থাৎ টিপিকাল ঘরজামাইয়ের যা যা করা উচিত তাই করেছি, তোমার কথা একবারও ভাবিনি। রাস্তায় বেরিয়ে আবার নতুন স্বপ্নের একটা কুঁড়ি দেখা দিয়েছে আমার মনের বাগানে। তার আবির্ভাব দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

"কি রকম সেটা— ?"

"শুনলে তুমি হয়তো হাসবে। আমার মুখের রং-টং দেখে এমনিতেই তোমার সন্দেহ হয়েছে যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কথা শুনলে আর সন্দেহ থাকবে না।"

"বলই না শুনি—"

"রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই জুতো জোড়া বেচে দিলাম একটা মুচিকে। তাতে দিন দুই চলল। তৃতীয় দিনে কি করি ভাবছি—এমন সময় একটা বড় ডাস্টবিন্ চোখে পড়ল। ডাস্টবিনে অনেক সময় খাবারের টুকরো পাওয়া যায়। হাঁটরাতে লাগলাম ডাস্টবিনটা। খাবার তেমন পেলাম না। পেলাম একটা জাবদা পাণ্ডুলিপি। রাজা গোপালদেবকে নিয়ে লেখা—"

"যিনি অষ্টম শতাব্দীতে গণতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সেটা তিনি করেছিলেন, যে যুগে সবাই খেয়ো-খেয়ি করছে, সেই যুগে সবাই তাঁকে নেতা বলে মেনেছিল। কেন মেনেছিল ? শুধু যে সাময়িকভাবে মেনেছিল তা নয়, গোপালদেব পাল বংশ স্থাপন করেছিলেন, যে পাল বংশ বাংলার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়—"

খেজুরি বিবির চোখে আলো চকচক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না, হাসি মুখে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক বলিতে লাগিল—"এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগে কোনও গোপালদেব হওয়া কি সম্ভব নয় ?"

"তোমার স্বপ্নটা কি তাই শুনি না—"

কার্তিক একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে-ই যে গোপালদেব হইতে চায় এত বড় হাস্যকর কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল সে।

"ধর আমিই যদি গোপালদেব হবার চেষ্টা করি। সেটা কি হাস্যকর হবে খুব ?"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল খেজুরি বিবি। তাহার পর বলিল—"হাস্যকর কেন হবে। ইতিহাসে এ রকম ঘটনা তো ঘটেছে। সামান্য একটা ক্রীতদাস স্লেভ ডাইনাস্টি স্থাপন করেছিল। স্বয়ং গোপালদেবও তো সাধারণ লোক ছিলেন। তাছাড়া আজকাল কি হচ্ছে—যত সব হোমরাচোমরা মিনিস্টার, প্রেসিডেণ্ট, এরা সবাই তো সাধারণ পর্যায়ের লোক। পৃথিবীর বৃহত্তম যে বিদ্রোহ ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে মূর্ত হয়েছিল তা করেছিল তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ। রাশিয়াতেও তাই—"

কার্তিক অবাক হইয়া গেল।

"তুমি এখনও ইতিহাসের বই পড় চপলাদি ?"

"ওই তো আমার একটি মাত্র নেশা। আমার লাইব্রেরিটা তোমাকে দেখাতে পারলে তুমি খুশি হ'তে—"

"কোথায় সেটা ?"

"পাশের গাঁয়ে খেজুরেতে। ওইখানেই খান দুই ঘর নিয়ে থাকি আমি—"

"সেই জন্যেই বুঝি তোমায় খেজুরি বিবি বলে সবাই ?"

চপলা মুচকি হাসিল। হঠাৎ কার্তিক সেই জিনিসটা দেখিতে পাইল যাহা এতক্ষণ তাহার দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল এবং যাহা পূর্বে সে বহুবার দেখিয়াছে। পুনরাবিষ্কার করিল যেন ওটাকে। চপলার গালে টোল পড়ে।

"তাহলে তোমার মতে আমার গোপালদেব হওয়ার স্বপ্নটা হাস্যকর নয় ?"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে। যদি নিখুঁত হতে চাও তাহলে গোপালদেব হতে চেও না। কারণ গোপালদেব হতে হলে জনতার কৃপা-ভিক্ষা করতে হবে, নিখুঁত লোকেরা কারও কাছে কখনও ভিক্ষা করে না কিছু। এই জন্যে তারা প্রায় অজ্ঞাত অখ্যাত থেকে যায়। জনতার হাতে পুরস্কার পেতে হলে তদ্বির করতে হয়, তোষামোদ করতে হয়, অনেক সময় ঘুষ দিতে হয়, মুখোশ পরতে হয়—নিখুঁত লোকেরা তা পারে না। পৃথিবীর বড় বড় জননায়কদের ইতিহাস যদি পড় তাহলে তুমিও সেটা বুঝতে পারবে। তা বলে জননায়কেরা যে খেলো লোক তা বলছি না—রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান অভিনেতাদের মতো ও'রা মানুষের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে যুগকে যুগান্তরে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে নিখুঁত লোকেরা নমস্য। ম্যারাট (Marat), ড্যান্টন (Danton), নেপোলিয়ন, হিটলারের চেয়ে নির্দোষ নিখুঁত মানুষ সুরং আমার কাছে ঢের বড়। এখন বল তুমি কি হবে ?"

এমনভাবে খেজুরি কথাগুলি বলিল যেন কার্তিকের ভবিষ্যৎ তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবে তাহাকে।

কার্তিক বলিল—"আমি নিখুঁতও থাকতে চাই গোপালদেবও হতে চাই।"

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই বোবা চাকরটা উঁকি দিয়া হাততালি দিল।

"সুরং, তুমি ওঠ এবার। আমার খদ্দের এসেছে—"

"কিসের খদ্দের !"

"ব্যবসার, আবার কিসের ?"

"কি ব্যবসা কর তুমি—"

যদিও সে ইহা আন্দাজ করিয়াছিল তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু খেজুরি বিবি ইহার উত্তর দিল না। বলিল, "কাছেই আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি সেখানেই তুমি যাও এই পিছনের দরজাটা দিয়ে। এদিকেও একটা দরজা আছে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে, শোওয়ার ব্যবস্থাও আছে। রাখাল—"

একটি বিরাটকায় লোক পিছনের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

"রাখাল এই বাবুকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ইঁনি আর ওঁর এক বন্ধু ওখানে থাকবেন রাত্রে। সব ব্যবস্থা করে দিও। ওঁদের একটা কুকুরও আছে—"

"আসুন।"

রাখাল কার্তিকের রং-মাখা মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কার্তিক কিন্তু নড়িল না। রাখালকে বলিল, "তুমি বাইরে দাঁড়াও একটু, যাচ্ছি—"

রাখাল চলিয়া যাইতেই কার্তিক প্রশ্ন করিল আবার।

"তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাওনি। কিসের ব্যবসা কর তুমি—"

"দেহ বিক্রি করি—"

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া হাসিল আবার। আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"ঘেন্না হচ্ছে ?- "

নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

"ঘেন্না হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ক'টা লোক সংস্কারমুক্ত। যারা প্রতিভা বিক্রি করে, যারা কর্মদক্ষতা বিক্রি করে, যারা অভিনয়-কৌশল বিক্রি করে, যারা গলার গান বিক্রি করে তাদের তোমরা সম্মান কর। কিন্তু যারা দেহ বিক্রি করে, এমন কি ওই শ্রমিকরা যারা নিজেদের দেহের পেশী নিংড়ে দিয়ে তোমাদের কামনার খোরাক সরবরাহ করে তাদের তোমরা ঘৃণা কর। এইটেই রেওয়াজ। সংসারে সবাই কামোন্মত্ত, অথচ যারা কামের উপকরণ—তারা তোমাদের কাছে অস্পৃশ্য। এটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু এই রেওয়াজ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—আমাকে যদি ঘৃণ্য মনে কর, জোর করে তোমাকে কাছে টানতে চাই না—"

বোবাটা দ্বারপ্রান্তে ঘন ঘন আবার হাততালি দিতে লাগিল। কার্তিক পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া ভাবিল খেজুরি বিবির বাসায় আর যাইবে না। রূঢ় সত্যটা শুনিয়া তাহার কেমন যেন গা-ঘিন-ঘিন করিতেছিল। কেনা-বেচা লইয়াই সংসারের হাটে নানা ব্যবসায় নানারূপে জমিয়া উঠিয়াছে তাহা ঠিক, কসাইয়ের দোকান বা মেছুনীর দোকান আমাদের জীবনযাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহাও ঠিক—তবু একটা কসাই বা মেছুনীর সহিত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করিতে মন কেন বিমুখ হইয়া ওঠে এই চুলচেরা তর্ক করিতেও তাহার যেন প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—কেবলই মনে হইতেছিল—মস্ত বড় একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। যেন একটা বহুমূল্য রত্ন পাঁকের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে—যেন

একটা চমৎকার ছবির গায়ে কে কালি ছিটাইয়া দিয়াছে—যেন একটা চমৎকার ফুলকে— ।

"ওদিকে নয়, বাবু এদিকে—"

রাখালের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কার্তিক অবাস্তব স্বপ্নলোক হইতে রূঢ় বাস্তব লোকে নামিয়া আসিল।

"আমি ওখানে আর যাব না ভাবছি। আমাকে অন্য কোনও একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পার যেখানে রাতটা কাটাতে পারি ?"

"এখন তাতো আর হয় না বাবু। মাকে সে কথা বললেই পারতেন। এখন আপনি ওই বাসাতেই চলুন। তিনি যে হুকুম আমাকে দিলেন তা আমাকে তামিল করতেই হবে। আসুন, আমার সঙ্গে—"

"আমি যদি না যাই কি করবে তুমি—"

"পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব। একটা চীৎকার চেঁচামেচি হাঙ্গামা হবে। তা হোক, রাখাল তাতে ভয় পাবে না—"

রাখালের বিরাট বলিষ্ঠ চেহারার দিকে চাহিয়া এবং তাহার স্থির গম্ভীর উত্তেজনাহীন কথাগুলি শুনিয়া কার্তিক অনুভব করিল তাহাকে যাইতেই হইবে। এই মেলার মাঝখানে এই অসুরের সহিত ধস্তাধস্তি করাটা নিষ্ফল। অশোভনও বটে।

"বেশ চল তাহলে— । কিন্তু আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যখন জেদ করছ, চল।"

রাখাল এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কার্তিক তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে লাগিল তাহার। ক্ষোভে ধিক্কারে সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্বিতল বাসাটিতে রাখাল যে ঘরে তাহাকে লইয়া গেল সেটি সুসজ্জিত। খাট বিছানা কাপড়ের আলনা আয়না গামছা তোয়ালে সব আছে।

"পাশেই চানের ঘর। টবে জল ভরা আছে।"

"আমার বন্ধু আনটা পুকুরে স্নান করতে গেছে, তার সঙ্গে আমার কুকুরটাও আছে—"

"দেখছি তাদের। আপনি চান টান সেরে পরিষ্কার হয়ে নিন। খাবারও আনছি।"

রাখাল চলিয়া গেল।

কার্তিক স্নানাহারের পর বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আনটা এবং লর্ডও নীচের একটা ঘরে ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কার্তিকের ঘুম ভাঙিয়া গেল হঠাৎ। বিছানায় উঠিয়া বসিল সে। দেখিল মাথার শিয়রে টেবিলের উপর একটা বাতি কমানো আছে। চপলা ফিরিয়াছে কি ? কাহারও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাইতেছে না। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। একটা জানলার পরদা সেই স্বল্পান্ধকারে ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল একটা প্রেত যেন। তাহারই অতীত জীবনের প্রেত। অনেকক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল সেদিকে। তাহার পর টেবিলের আলোটা বাড়াইয়া দিল। প্রেত একটা রঙীন ছিটে রূপান্তরিত হইল। আবার একবার শুইয়া পড়িল সে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। ঘুম কিন্তু আর

আসিল না। চোখের সম্মুখে চপলার মুখটাই বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চপলাদি মেছুনীদের দলে? হঠাৎ ডিকেন্সের 'এ টেল অব্ টু সিটিজ্' (A tale of Two Cities) পুস্তকের মাদাম ডিফারজ্ (Madam Defarge) চরিত্রটি তাহার মনে পড়িল। সে-ও মেছুনী ছিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িল ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া পাওয়া সেই উপন্যাসটার কথা। উঠিয়া ঝুলি হইতে সেটা বাহির করিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

॥ ২ ॥

"পাগলা-গারদে বন্দী গোপালদেব দিবা-স্বপ্নে মগ্ন হইয়াছিলেন। বস্তুত এই স্বপ্নলোকেই যেন মুক্তি পাইয়াছিলেন তিনি।

সূত্রধার পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ওই দেখুন সেই পাহাড়টি, ওই দেখুন সেই বাণীমন্দির যার উদ্দেশ্যে অনলস আর অরূপ যাত্রা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্যে নিত্যকালের অনলস আর অরূপরা যাত্রা করেছেন যুগ যুগ ধরে, যেখান থেকে বারংবার নানারূপে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা সত্য-শিব-সুন্দরের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ওই আকাশপটেই তাঁহার স্বপ্ন মূর্ত হইয়া ওঠে। ইতিহাসের স্বপ্ন, তাঁহার বিক্ষত মর্মের স্বপ্ন।

সেই পাহাড়টি আবার দেখা গেল। সেই শুভ্র বাণীমন্দিরটিও। দেখিলেন সেই মন্দির হইতে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ বাহির হইলেন, আর তাঁহার পিছু পিছু একটি তন্বী সুন্দরী যুবতী নারী। যুবতীর মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি। তাহাতে যেন একটু অপ্রতিভ ভাবও ফুটিয়াছে, একটু কৌতুকও।

পুরুষটির দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"মহারাণীর ইচ্ছায় অরূপ হ'য়ে গেল মোহিনী নারী, আর তুমি অনলস হ'য়ে গেলে অমিতবীর্য ক্ষত্রিয় রাজকুমার। হয়তো স্বপ্নের সঙ্গে কর্মের মিলন এবার অনিবার্য হ'য়ে উঠল। তুমি যদি ঝড়ের মতো ছুটে যেতে চাও আমি হব সে ঝড়ের বেগ।"

পুরুষ-বেশী অনলস হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তাই তো আমার কামনা। তবে একটা ভয় জাগছে মনে। তোমার মতো রূপসী মোহের মোহন শৃঙ্খলেও আমাকে বেঁধে ফেলতে পারে। অনুরোধ করছি, তা যেন কখনও কোরো না।"

"মোহ সব সময়ে শৃঙ্খল হয় না। মোহও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। যশের মোহ, সাফল্যের মোহ, অসম্ভবকে সম্ভব করবার মোহ—এ সবও মোহ, কিন্তু এসব মোহ অনেক সময় কল্যাণকর। যে মোহ কল্যাণকর নয় তা দগ্ধ করবার ক্ষমতা মহারাণী আমাকে দিয়েছেন।…"

সহসা সেই তন্বী রূপসী অগ্নিশিখাবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরে বাজিয়া উঠিল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ঢোল। পাহাড় এবং মন্দির অন্তর্হিত হইল। দেখা গেল

একটা বিরাট পথ বিসর্পিত রেখায় প্রান্তর ভেদ করিয়া দূরবর্তী একটা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথ ধরিয়া শোভাযাত্রা চলিয়াছে একটা। নানাবর্ণের পতাকায় সে শোভাযাত্রা সুশোভিত। প্রতি পতাকায় ফুলের মালা দুলিতেছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন বিরাটকায় ব্যক্তি একটি বিশাল তাম্রকলস মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাম্রকলসের মুখে আম্রপল্লব। পাশাপাশি দুইটি তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ ও সেই তন্বী সুন্দরী মন্থরগতিতে চলিয়াছেন। দিব্যকান্তি পুরুষের মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, পরিধানে রাজোচিত বসন ভূষণ। কোমর হইতে কোষনিবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, বাম স্কন্ধ হইতে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে একটি তুরী। তিনি বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছেন, দক্ষিণ হস্তে শোভা পাইতেছে গণ্ডার-চর্মনির্মিত পিত্তল-কারুকার্যময় একটি ঢাল। তাঁহার দৃষ্টি দূরে অরণ্যে নিবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গিনীও রণসজ্জায় সজ্জিতা। তাঁহারও কোমর হইতে একটি কোষনিবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, পৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে শরপূর্ণ তূণ ও ধনু। মুখে অবগুণ্ঠন নাই। অঙ্গবস্ত্রেও কোন শিথিলতা নাই, রক্তবর্ণ অঙ্গচ্ছদ যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। তাঁহারও দৃষ্টি দূরে অরণ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু সে দৃষ্টি স্বপ্নময়।

সূত্রধার প্রবেশ করিলেন।

নমস্কারান্তে বলিলেন—"সৃষ্টির চিরন্তন প্রেরণা বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অনলস আর অরূপ যুগল মূর্তির অনবদ্য মহিমা বিকিরণ করে। ওই অরণ্য তাঁদের কর্মভূমি। ওই অরণ্য কেটে আদর্শ নগর বসাবেন তাঁরা। অরণ্যের প্রান্তভূমিতে যজ্ঞ হবে। মহাকাল স্বয়ং ওই তাম্রকলসে যজ্ঞের হবিঃ বহন করছেন। ওই অরণ্যে নর-রাক্ষসেরা বাস করে, আর বাস করে তাদের বাধ্য হিংস্র পশুর দল। ওদের অত্যাচারে সন্নিহিত সভ্য জনপদবাসীরা সন্ত্রস্ত, জর্জরিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন কর্মঠ বীরপুরুষ অনলস আর তাঁকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন নারী-রূপিণী অরূপ। তিনিই অনলসের শক্তির উৎস। ইতিহাসে কি তাঁদের নাম আছে? জানি না। ইতিহাসের কথা ইতিহাসের কাছেই শুনুন।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন। অরণ্যও দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। শোভাযাত্রাও নিশ্চিহ্ন হইল। দেখা গেল এক প্রস্তর মঞ্চের উপর একজন সৌম্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে এক গোছা ভূর্জপত্র। ভূর্জপত্র হইতে তিনি পড়িতে লাগিলেন—

"সব দেশের অতীত ইতিহাসের মতো বাংলা দেশের অতীত ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অরণ্যের সহিত ইহার তুলনা করা চলে, হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু মানুষের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। অতি প্রাচীন প্রগৈতিহাসিক যুগেও বাংলাদেশে মনুষ্যদেরই বসবাস ছিল। তখন এদেশে যে মনুষ্যরা বাস করিত তাহাদের মধ্যে হয়তো পশু-প্রকৃতির অত্যাচারী লোকের অসম্ভাব ছিল না, কিন্তু অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আমরা প্রমাণ পাই সে যুগে সভ্য মানুষও বাস করিত। সম্ভবত নানা দেশের সভ্যতার সংঘর্ষে নানাদেশের মানুষের সংস্পর্শে অতি প্রাচীন বাংলা দেশেও একটা সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে সভ্যতার যাহারা ধারক ও বাহক ছিল তাহারা অবশ্য আর্য নহে। আর্যরা বহুদিন পরে বহু কষ্টে বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এখন

যাহাদের আমরা অন্ত্যজ জাতি বলি—কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, বাগদী, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি—ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বাংলা দেশের আদিবাসী। বৈজ্ঞানিকগণ এই মানবগোষ্ঠিকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক আখ্যা দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাদের নিষাদ জাতিও বলিয়াছেন। এই নিষাদেরা প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। তাহারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক। কিন্তু তাহারা তাম্র ও লৌহের ব্যবহার জানিত। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে তাহারা ধান চাষ করিত। পান সুপারির ব্যবহার জানিত তাহারা। অনেকের মতে কলার চাষও তাহারা করিত। শুধু কলা নয়, তাহারা নানারকম সবজিও ফলাইত। তাহারা গরু চরাইত না, গরুর দুধও পান করিত না। কিন্তু মুরগী পুষিত, হাতীকে পোষ মানাইতে পারিত। কুড়ি হিসাবে হিসাব করিতেও তাহারা জানিত। তাহারাই সম্ভবত চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিথি মাস এদেশে প্রচলিত করে। ইহাদের সহিত পরে দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভুক্ত এক জাতি আসিয়া মিলিত হয়। কেহ কেহ বলেন খর্বাকৃতি নিগ্রোবটু জাতিও আসিয়া এদেশের আদিবাসীদের সহিত মিশিয়াছিল। মোট কথা বহু জাতির সম্মেলনেই বাঙালী জাতির সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই ইতিহাস এই। অবিমিশ্র কোন 'বিশুদ্ধ' জাতি ধরাপৃষ্ঠে নাই। এ কথা স্মরণযোগ্য যে এই বাঙালী জাতি অসভ্য ছিল না। আর্যধর্মের সহিত তাহাদের ধর্মের মিল ছিল না, কিন্তু তবু তাহাদের অধার্মিক বলিব না। তাহাদের একটা নিজস্ব ধর্ম ছিল। তাহারা শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর আরাধনা করিত। বৃক্ষ প্রস্তর পর্বত অরণ্যও তাহাদের আরাধ্য ছিল। অনেক পশু-পক্ষীকেও তাহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তাহাদের পুরাণ ছিল, ব্রত-আচার ছিল। বিবাহ ক্রিয়ায় তাহারা হলুদ এবং সিন্দুর ব্যবহার করিত। শিল্প-প্রতিভাও ছিল তাহাদের। নৌকা-নির্মাণে নিপুণ ছিল তাহারা। তাহারাই যে ধুতি শাড়ি এবং অন্যান্য পরিচ্ছদের উদ্ভাবক একথাও অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর্যরা বাংলা দেশে আসেন। বাংলা দেশ জয় করিয়া আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর্যদের সহিত তদানীন্তন বঙ্গদেশবাসীর যে সব সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কোথাও নাই। আর্যদের লিখিত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যাহা আমরা পাঠ করি তাহা হইতে এইটুকু শুধু অনুমান করা যায় যে আর্যগণ আদিম বঙ্গবাসীদের সুচক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে পুরাণে বঙ্গবাসীদের বর্বর, পাপাশয়, রাক্ষস, পক্ষী প্রভৃতি নিন্দাসূচক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সভ্য ছিলেন, বর্বর বা রাক্ষস ছিলেন না। অবশ্য ইহাও সত্য তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর্যদের নানা-ভাবে বিব্রতও করিতেন। আর্যগণ বঙ্গদেশে অবশেষে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয় যাহাদের তাঁহারা অনার্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই। তাহাদের বৈশিষ্ট্য বারম্বার আর্যসভ্যতার উপর নিজেদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে পরিণতি সহজিয়া ধর্মে মূর্ত হইয়াছিল তাহা মনে হয় এইরূপ একটি ছাপ। বাগদী রাজা, লুইপাদ, ডোম্বিনী প্রভৃতির প্রভাব সাহিত্যে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবী প্রতিমার ভিতর বাহন রূপে পশু-পক্ষীর পূজাও সম্ভবত 'অনার্য' প্রভাব। বিল্ব, বট, তমাল, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষও

আর্য হিন্দুদের নিকট পবিত্র। তুলসী গাছ হিন্দুদের ঘরে ঘরে। 'মানত' করা, মাদুলী পরা, তুকতাকে বিশ্বাস করা—এ সবই সম্ভবত সেই আদিবাসীদের ধর্মের অঙ্গ। বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে গোপালদেব বিখ্যাত নাম। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে সর্বসম্মতিক্রমে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কি আর্য ছিলেন? তাঁহার পিতার নাম ছিল বপ্যট, স্ত্রীর নাম ছিল দেদ্দা। এই নাম দুইটি কিন্তু বিশুদ্ধ আর্য নাম বলিয়া মনে হয় না। গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে যুগে যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই অনার্য ছিলেন। এই বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপটা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা তাহার 'সহজিয়া' রূপ। কেহ কেহ বলেন গোপালদেব ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন। বৌদ্ধ ছিলেন অথচ ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন—কথাটা কেমন যেন গোলমেলে শোনায়। অথচ তিনি আবার এতটা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে সর্বসম্মতিক্রমে সকলে তাঁহাকে গণতন্ত্রের নেতারূপেও নির্বাচিত করিয়াছিল। এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কি? যদি মনে করা যায় যে যোদ্ধা হইলেও তিনি আদি বঙ্গবাসীদেরই বংশধর ছিলেন এবং সহজীয়া মতের বৌদ্ধ ছিলেন তাহা হইলে কিছুটা বোধগম্য হয়। ইহা হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাসে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। গোপালদেবের গোপাল নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বা রাখালের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ইতিহাসে বলে, আদি বঙ্গদেশ-বাসীরা গরু চরাইত না, গরুর দুধ খাইত না। হয়তো অতি প্রাচীনকালে ইহা সত্য ছিল, কিন্তু গরুর মতো একটি উপকারী জীবকে কৃষিজীবী বাঙালী আদিবাসীরা যে বেশী দিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং, অনার্য হওয়া সত্ত্বেও গোপালদেবের 'গোপাল' নাম হয়তো অস্বাভাবিক নহে। অনার্যেরা বিষ্ণুর পূজা করিত (বিষ্ণু কৃষ্ণেরই নামান্তর) তাহা ইতিহাসে লেখা আছে। গোপালদেবের পিতামহের নাম ছিল 'দয়িতবিষ্ণু' তিনি সর্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ ছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা আর্য ছিলেন, না, অনার্য ছিলেন এ বিষয়ে ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে না। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগে। গোপালদেবের কৌলিক উপাধি কি? দেব? তাঁহার পিতা বা পিতামহের নামের শেষে দেব উপাধি দেখা যায় না। গোপালদেব যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে পাল-সাম্রাজ্য নামে খ্যাত। 'পাল' উপাধি দেখিয়াও সন্দেহ হয় গোপালদেব সম্ভবত অনার্যই ছিলেন। এ সমস্তই অবশ্য অনুমান। গোপালদেবের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নিঃসংশয়ে জানা যায় না, ইহাই সত্য কথা। আমি যে কথা বলিবার জন্য এই ভূমিকা করিলাম তাহা এই যে আদিম বঙ্গবাসীরা—যাহাদের আর্যগণ অনার্য বর্বর পক্ষী রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—তাহার কখনই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। নানাভাবে তাহারা ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হয়তো গোপালদেব যে পাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা রূপান্তরিত অনার্যদেরই সাম্রাজ্য। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে বারংবার ঘটিয়াছে। অতি আধুনিক যুগের ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ আছে। 'আউল' 'বাউল' সম্প্রদায়, সুফীগণ, দাদু-কবীর-নানকপন্থীরা কেহই আর্য ধর্ম অনুসরণ করে না—তাহারা যে ধর্ম অনুসরণ করে তাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত 'মরমিয়ার' পথ, যে পথে গুরুই পথপ্রদর্শক—হয়তো তাহা সেই পথ যে পথে আদিম বঙ্গবাসীরা একদা চলিত—যাহা তন্ত্রে শাক্তপূজায়, বৈষ্ণব লীলায় নানাভাবে

রূপান্তরিত হইয়া সমাজে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, জাতিভেদের মূলে যাহারা এখনও কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়াছে, যাহার বাহিরের চেহারা হয়তো আধুনিক, কিন্তু আসলে যাহারা আদিম। ইংরেজের আমলেও এ ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে জাতিভেদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার যে উদ্যম দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যেও অবহেলিত ঘৃণিত 'একঘরে' অনার্যদের পুনরভ্যুদয়ের আভাস পাওয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহ আইনত স্বীকৃত হইবার পর এবং ইংরেজী আমলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অর্থকৌলিন্যই সমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। তথাকথিত নীচুবংশীয়া কন্যারা উচ্চ কুলীন বংশের কুলবধূরূপে স্বীকৃত হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত অনার্যদের বন্যায় আবার চতুর্দিক ভাসিয়া গেল এবং অনেকের ঘরেই সে বানের জল ঢুকিল। এখনও ঢুকিতেছে। ইহা রোধ করিবার উপায় নাই। সম্ভবত রোধ করিবার চেষ্টা নিরর্থকও। কারণ হিন্দুধর্মের আদর্শ অতি উচ্চ। তাহা ক্ষুদ্র ভেদাভেদ লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহার সাধনা প্রেমের সাধনা, যে প্রেম মৃন্ময়ীর মধ্যেও চিন্ময়ীকে প্রত্যক্ষ করে, যে সাধনার সিদ্ধি ভগবান লাভে। ভগবান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য; যে কোনও ধর্মমত অনুসরণ করিয়া ভগবান লাভ করা যায়। কেহই ছোট নয়, কারণ সকলেই ভগবানের অংশ, সকলেরই অন্তরনিবাসী আত্মা নিষ্কলুষ—এই যদি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয় তাহা হইলে আর্য অনার্য, নীচ উচ্চ এসব বিচার নিরর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যদি এ যুগের অবতার বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে মানিতে হইবে যে তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়াছেন, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মমতকে নহে। আমি অরণ্যের কথা লইয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম, অরণ্যের কথা দিয়াই শেষ করি। অরণ্য আমাদের চতুর্দিকে এখনও আছে। সে অরণ্য তামসিকতার অরণ্য। সে অরণ্যের বিবরণ আপনারা কবির নিকট শুনিবেন। কবি আসিতেছেন। আমি চলিলাম—"

ইতিহাস অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তর-আসনও মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। গোপালদেব দেখিলেন শুভ্র একটি মেঘের নৌকায় কবি আসিতেছেন। গোপালদেবের মনে হইল অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধরিতেছে। আভিজাত্যের পর্বতশিখরে যে গজদন্ত-নির্মিত প্রাসাদে তিনি বাস করিয়াছেন সেই পর্বত এবং প্রাসাদও মেঘের মতো উড়িয়া যাইতেছে যেন।

আপাতদৃষ্টিতে কবি তরুণ নহেন, বৃদ্ধ। তাঁহার শুভ্র দাড়ি, শুভ্র চুল। মুখে কিন্তু জরার চিহ্ন নাই। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্বপ্নময়। মুখ-ভাবে তারুণ্যের দীপ্তির সহিত বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার একটা অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সমন্বয় হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে কবির চারিদিকে মহীরুহ-সমাকীর্ণ এক বিশাল অরণ্য মূর্ত হইয়া উঠিল। মহীরুহ একরকম নহে। কোনটা শ্যামপত্রাচ্ছাদিত, কোনটা ফুল-ফল সমন্বিত, কোনটা অর্ধমৃত, কোনটা একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কঙ্কালটা দাঁড়াইয়া আছে কেবল। মৃত কঙ্কালের সংখ্যাও কম নহে। ছোটবড় নানা আকারের প্রস্তরও রহিয়াছে নানা রকম। দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া শ্বাপদ পশুরা চীৎকার করিতেছে। তৃণভোজী ভীরু মেষ-মৃগেরা দলে দলে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কীট পতঙ্গ, নানারূপ বিচিত্র-পক্ষ পক্ষীরও অভাব নাই সে অরণ্যে। তাহারাও পরস্পরকে শিকার

করিতে ব্যগ্র। সকলেই সকলের শত্রু। অরণ্যে মনুষ্য নাই। সেই মনুষ্যশূন্য অরণ্যে একটা শঙ্কা যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। একটা অন্ধকার যেন চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

কবি কথা কহিলেন। মনে হইল বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

"আমি যা দেখছি, আমি যা অনুভব করছি, যে সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি আকুল হয়ে আছি তাই আমি শুধু বলব। চারিদিকে এই যে অরণ্য দেখছেন, আপাতদৃষ্টিতে এরা অরণ্য মনে হলেও আসলে এটা অরণ্য নয়। এ বিরাট একটা মনুষ্যসমাজ। রূপকথায় শুনেছিলাম যক্ষিণীর প্রভাবে মানুষেরা নাকি পাথরে গাছে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে ছিল। এখানেও তেমনি এক যক্ষিণীর প্রভাব অনুভব করছি আমি। এক যক্ষিণীই বিরাট মনুষ্যসমাজকে বিরাট অরণ্যে পরিণত করেছে। অরণ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও এই অরণ্যে নেই, কারণ এ অরণ্য স্বাভাবিক অরণ্য নয়। যক্ষিণীর মায়া-কৌশলে এর রূপ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে নি। যক্ষিণীর নাম তামসিকতা। তারই প্রভাবে জীবন্ত মনুষ্যসমাজ ম্রিয়মাণ অরণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে একদা এর অতীত উজ্জ্বল ছিল। সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন এইখানেই জ্ঞানের দীপ জ্বলেছিল একদিন। আবার সমস্ত জগতে অন্ধকার নামছে আবার জ্ঞানের দীপ জ্বলবে এখানে। আমি জানি এর ভবিষ্যতও সমুজ্জ্বল কিন্তু সে ভবিষ্যতকে সমুজ্জ্বল করবেন কে? যিনি করবেন তিনি আসবেন ঊর্ধ্বলোক থেকে। তিনি আবির্ভূত হবেন। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে যে স্বচ্ছ নির্মল আকাশ আছে, যে আকাশে নক্ষত্রের আলো স্পন্দিত হয়, নীহারিকারা স্বপন দেখে, সেই আকাশেই তিনি আছেন, সেখান থেকেই তিনি আসবেন। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভই যুগে যুগে অবতরণ করেন সেখান থেকে নানা রূপে, সেই চিরন্তন স্বপ্নের বাস্তব মূর্তি ধারণ করে নিজেকে বিকশিত করেন মানবসমাজে, যে স্বপ্নের বাঙ্ময়রূপ 'সত্যমেব জয়তে'। সত্য-শিব-সুন্দরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই তিনি আসেন। নানা চিত্র আছে তাঁর পুরাণে ইতিহাসে। কখনও শ্রীরামচন্দ্ররূপে তিনি রাক্ষসনিধন করছেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে উৎসাহিত করছেন অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য, কখনও তিনি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীচৈতন্যরূপে, তিনিই শঙ্কররূপে অদ্বৈতবাদের শাণিত তরবারি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধঃপতিত বৌদ্ধদের সঙ্গে। কাব্যে ও ইতিহাসে তাঁর অনেক রূপ, অনেক ছবি। বাইরের দিক থেকে দেখলে সে ছবিগুলি বিভিন্ন, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। রাজা গোপালদেবের জীবন-চরিতের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিতের ঘটনাগত মিল নেই, অগ্নিযুগের যে বীরেরা স্বাধীনতার জন্য কারাগারে ফাঁসিকাঠে, দ্বীপান্তরে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন তাদেরও বাইরের চরিত্র-চেহারা সব আলাদা আলাদা। কিন্তু তাদের অন্তরের দিকে কান পেতে শুনুন—সকলেই সেই এক মন্ত্র জপ করছে, সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি জানি এই মহাঅরণ্যেও সত্য-শিব-সুন্দর আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন। যে দেশের অতীত এত মহান যে দেশের মাটিতে যুগে যুগে মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন—এই সেদিনও যে দেশের মাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের উদ্ভব হয়েছিল, যে দেশে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন, শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। আলো আসবে। এই অরণ্য

তখন সভ্য মানবসমাজে রূপান্তরিত হবে। এই অরণ্যের অন্তরালে মনুষ্যত্ব চাপা আছে, সে আচ্ছাদন একদিন সরে যাবে। এই যে পুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহ দেখছ, এ গাছ নয়, এ মানুষ। তামসিকতা-যক্ষিণীর প্রভাবে ওর এই দশা হয়েছে। কিছু ফুল ফোটাচ্ছে. কিছু ফলও ফলাচ্ছে, কিন্তু চিরকালই একরকম ফলাচ্ছে। বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্যহীনতা মৃত্যুর নামান্তর। তাছাড়া এরা এক স্থানেই প্রোথিত হয়ে আছে, নড়ছে না। তা-ও একরকম মৃত্যু। এদের শেষ পরিণতি ওই দেখ। অতীতের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনও গাছে আর প্রাণ নেই, আর ফুল ফুটছে না, ফল ফলছে না, পাতাও শুকিয়ে গেছে, ওদের ডালে ডালে নব কিশলয়ের উৎসব আর জাগে না। আলো যখন আসবে, যক্ষিণী যখন অপসারিত হবে তখন এরাও নবজীবন লাভ করবে। পূর্ণ মানুষ সৃষ্টিকর্তা, সে নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, সে প্রগতিশীল, এক জায়গায় অনড় হয়ে থাকে না, সে চলে, এগিয়ে যায়। এরাও মানুষ হবে, এদের নব নব কীর্তি নিত্যনূতন বৈচিত্র্যে জগতকে আবার মুগ্ধ করবে। ওই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাথরগুলি দেখছ, ওরাও পাথর নয়, ওরাও মানুষ, তামসিকতার চরম প্রভাব ওদের প্রস্তরে পরিণত করেছে। ওরা অনড়, অচল, মূক, বধির হয়ে গেছে। ওরা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়, হিমানীপাতে শীতল হয়, ঝঞ্জার তাণ্ডব ওদের উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, ওদের উপর ধুলো জমে, মরা পাতার শবস্তূপে ওরা ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু তবু ওরা বিচলিত হয় না, প্রতিবাদ করে না। ওরা নির্বিকার মহাপুরুষ নয়, ওরা সমাধিস্থ যোগীও নয়, ওরা মৃত, প্রাণস্পন্দনহীন। ওরা স্থাণু কিন্তু শিব নয়। ওরাও মানুষ হবে একদিন, ওরাও জাগবে। কল্পনা কর, এতগুলি প্রস্তর যদি মানুষ হয়, আর তাদের দৃঢ়তা যদি প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে, সে কি অপরূপ রূপান্তর হবে। ভবিষ্যতে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের সঙ্গে সত্য শিব ও সুন্দরের যখন যুদ্ধ হবে—হবেই, যুগে যুগে হয়েছে,—তখন এরাই হবে সে যুদ্ধের দৃঢ়চিত্ত সৈনিক। আর ওই যে শ্বাপদেরা গর্জন করছে ওরা পাথরের চেয়ে উন্নত বটে, কিন্তু ওরাও তামসিকতার আর এক প্রকাশ। ওদের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু রাজসিকতা জেগেছে, যে রাজসিকতার লক্ষ্য আত্মসুখভোগ। নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের ক্ষুধা-পিপাসাই এখন ওদের জীবনের নিয়ামক। তার বাইরে ওরা আর সব কিছুকে নিরর্থক বলে মনে করে। ওরাও মানুষ হবে, ওরা মানুষ হলে ভোগী বীর হবে, বীর্যবলে বসুন্ধরাকে ভোগ করবে ওরা, আর ওরাই হবে সেই আদর্শ ক্ষেত্র যেখানে আধ্যাত্মিকতার বীজ পড়লে ভালো ফসল ফলবে। ওদের মধ্যেই জন্মাবে রাজা জনক। সবই হবে যক্ষিণী তামসিকতার প্রভাবমুক্ত হলে। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে এই অনিবার্য ঘটনা ঘটবে তাঁর স্বরূপ কেমন হবে তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কল্পনার ভাণ্ডারে অনেক রং, সে রং দিয়ে আমি অনেক রকম ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু সে ছবি যে ভবিষ্যৎ-যুগের ত্রাতার ছবি হবেই এমন ভরসা দিতে পারি না। নিখিল বিশ্বের কবি মহাস্রষ্টার চিত্রশালায় সে ছবি আঁকা হচ্ছে। তিনি নিজেকেই প্রকাশ করবেন একদিন অভিনব শিল্পশৈলীর মাধ্যমে। অবতীর্ণ হবেন যথাসময়ে। পুরাণে পড়েছি, দশ যুগে দশ অবতার হয়েছিলেন। কূর্ম বা বরাহ অবতারের সঙ্গে বুদ্ধ অবতারের কিছুমাত্র মিল নেই। কোনও অবতারের সঙ্গে কোনও অবতারের সাদৃশ্য থাকলেই সেটা বিস্ময়ের কারণ হ'ত, মহাকবি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের

নিপুণতায় সন্দেহের ছায়া পড়ত। তাঁর বিশাল চিত্রশালায় প্রত্যেকটি ছবিই অনন্য, তাঁর বিরাট কাব্যে একরকম সুর দুবার বাজে নি। তাই এটা আশা করা অসংগত নয়, ভবিষ্যতে যিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হবেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো হবেন না। আলাদা কিছু হবেন। তুমি গোপালদেবের কথা ভাবছিলে, কিন্তু এটা ঠিক, তিনি গোপালদেবের দ্বিতীয় সংস্করণ হবেন না। ভগবানের সৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তি নেই। দুটি যমজের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, তিনি প্রাণবন্ত প্রেমিক হবেন। প্রেম দিয়েই অধঃপতিতকে উদ্ধার করা যায়। অবতাররা যুগে যুগে তাই করেছেন, ভবিষ্যতে যিনি আসবেন তাঁকেও তাই করতে হবে। তিনিও কোনও পাপকে ঘৃণা করবেন না, কোনও অন্যায়ের সঙ্গেও আপোষ করবেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারবেন সব কার্যেরই কারণ আছে, সব অন্যায়েরও কারণ আছে, সব পাপের জন্য পাপীরা দায়ী নয়, দায়ী পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং পরিবেশ। তাঁর স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে এসবই প্রতিভাত হবে, তাঁর বিচারের নিকষে আসল সোনা চেনা যাবে, তাঁর প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে অনেক লোহা সোনা হয়ে যাবে। সর্বযুগের নেতাদের চরিত্রে এসব গুণ ছিল ভবিষ্যৎ নেতার চরিত্রেও এসব গুণ থাকবে, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটবে অভিনব উপায়ে, সেইখানেই দেখা যাবে সৃষ্টিকর্তার অনন্যতা। আরও কয়েকটা গুণ থাকবে সে নেতার। তিনি তেজস্বী হবেন, বীর্যবান হবেন, বলবান হবেন, ওজস্বী হবেন, অন্যায়দ্রোহী হবেন, সহনশীল হবেন। বাজসনেয় সংহিতার প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা ভগবান পূর্ণ করবেন সেই অনাগত নেতার চরিত্রে, বিগত নেতাদের চরিত্রে যেমন করেছিলেন। বলাবাহুল্য এসবেতেই অনন্যতা থাকবে। একটি কথা কিন্তু বিশেষভাবে বলতে চাই। বাজসনেয় সংহিতার ঋষি যে প্রার্থনাটি ভগবানকে জানিয়েছিলেন তার শেষ কথা হচ্ছে, 'সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'। তুমি সহ্যশক্তি-স্বরূপ, আমাকেও সেই সহ্যশক্তির উপর স্থাপন কর। অবতারদের বা নেতাদের এই সহ্যশক্তি অফুরন্ত থাকা চাই। তরুর মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে তাঁকে, তবেই স্নিগ্ধ পুষ্প ফুটবে তাঁর জীবনে। সে পুষ্পও হয়তো লোকে ছিঁড়ে নেবে, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে, তবে আর একটি পুষ্প ফুটবে। স্থির হয়ে অপেক্ষা করলেই ফুল ফোটে। আমি কল্পনানেত্রে দেখতে পাচ্ছি, অবর্ণনীয় বর্ণসমারোহে আকাশগঙ্গার জ্যোতির্ময় সম্ভাবনা-স্রোতে আগামী যুগের নায়ককে রূপায়িত করছেন মহাশিল্পী সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উপাদান সনাতন, কিন্তু প্রকাশ হবে অভিনব। চিরন্তন স্বপ্নই নূতন নায়কের চক্ষে লাগাবে নূতন অঞ্জন, নূতন সুর তাঁর কণ্ঠে বাজবে যা অতীতেও দুঃখীর দুঃখে কেঁদেছে আর উদাত্ত সুরে বলেছে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।...

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল।

কবি অন্তর্হিত হইলেন।

সিভিল সার্জন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কেমন আছ গোপাল ?"

"ভালোই আছি। স্বপ্ন দেখছি নানারকম—"

"কিসের স্বপ্ন ?"

"নানারকম স্বপ্ন। আমার বিদ্যা বুদ্ধি কল্পনা স্বপ্নরূপে দেখা দিচ্ছে এসে।

সারাজীবন ধরে যে ছবিটা এঁকেছিলাম বর্তমান যুগের ঝোড়ো হাওয়ায় সেটা ছিঁড়ে গেল। নতুন আর একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি মনে মনে—"

তাহার পর সহসা থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমাকে তুমি কি পাগল মনে কর—"

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"মানুষমাত্রেই একটু আধটু পাগল। কম বেশী ছিট সকলেরই আছে। আর আছে বলেই মানুষ এত সুন্দর। যাদের মধ্যে কোন পাগলামি নেই তাদের স্বাদগন্ধ বৈচিত্র্য কিছুই নেই, তারা পশুর মতো। তোমার পাগলামির জন্যেই তোমাকে ভালোবাসি।"

"প্রমাণ তো পাচ্ছি না। পাগলা গারদে এনে আটকে রেখেছ।"

"তুমি রেগে মেগে যা কাণ্ড করেছিলে। আমি টেম্পরারী ইনস্যানিটি বলে একটা ভালো ঘরে এখানে তোমাকে রেখেছি, তা নাহলে তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে রাখত। মকোর্দমা হত, নানা কাণ্ড হত। তোমার স্ত্রী নালিশ করলে জটিল মকোর্দমা হ'তে পারত, কিন্তু তিনি নালিশ করবেন না। তুমি তাঁকে চিনতে পেরেছ কি না জানি না, কিন্তু আমি চিনেছি। খুব উঁচুদরের স্ত্রীলোক তিনি। তোমার উদ্যত তলোয়ারের মুখে ঘাড় পেতে দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। অথচ তোমার প্রতিও তাঁর অগাধ ভক্তি দেখলাম, তোমাকে দেবতা মনে করেন—"

"কি করে বুঝলে সেটা—"

"খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ এসেছিল। উনি বললেন, আমার স্বামী দেবতা। ওর কোনও দোষ নেই। দোষ আমারই। নিজের দোষেই আমি আঘাত পেয়েছি। আমার কোন নালিশ নেই। এ শুনে পুলিশ চলে গেল।"

গোপালদেব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছে সে।"

"ভালো আছে। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ (discharge) করে দিয়েছি। স্কিন-ডীপ (skin-deep) উণ্ড (wound) হয়েছিল। সেরে গেছে একেবারে। ঘাড়ে একটা দাগ থাকবে অবশ্য। তোমার বীরত্বের কীর্তি—"

"বাড়িতেই আছে এখন?"

"তোমার বাড়িতে উনি যান নি। মগনলাল সস্তায় একটা ভালো বাড়ি দেখে দিয়েছে, সেইখানেই উনি প্রবাল, নীলা আর আলতাকে নিয়ে আছেন।"

"খরচ চলছে কি করে? আমি তো অনেকদিন চেক দিই নি।"

"প্রবাল আলতা দুজনেই রোজগার করে। নীলাও বোধহয় কিছু দেয়, নীলার সঙ্গে মগনলালের বিয়ে হয়ে গেছে। মগনলাল ধনী লোক। শুধু ধনী নয়, বিদ্বানও। সেদিন আলাপ হল, চমৎকার ছেলে।"

"আমার বাড়িতে কে আছে তাহলে—"

"মহান।"

"আমাকে আর কতদিন আটকে রাখবে এখানে—"

"আরও সাত দিন।"

"সাত দিন! সাত দিন কেন?"

"তাহলে সব খুলে বলি। তোমার প্রপিতামহরা একান্নবর্তী ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁদেরই এক বংশধর তোমার নামে মোকর্দমা করেছেন। তাঁর দাবী, তোমার ওই তিনতলা বাড়িতে তাঁরও অধিকার আছে। তিনি এতদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন। সম্প্রতি রেফিউজি হয়ে ফিরে এসে এই করেছেন। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও বাড়ি এখন কোর্টের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তোমাকে ও বাড়িতে থাকতে দেবে কি না সন্দেহ। তাই তোমার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরে কম্পাউন্ড-ওলা চমৎকার একটা বাংলো বাড়ি সাতদিন পরে খালি হবে। সেটা আমি তোমার জন্য 'বুক' করে রেখেছি। খালি হলেই সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। এই নাও আদালতের কাগজপত্র—"

সিভিল সার্জন পকেট হইতে কয়েকটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন।

"মহানের কাছে তোমার অনেক চিঠি জমে আছে দেখলাম। তার ভিতর থেকে আদালতের চিঠিগুলো বেছে নিয়ে এসেছি আমি—"

"বাকি চিঠিগুলো ?"

"সেগুলো পরে দেখো। আমিই চিঠিগুলো আনতে মানা করেছি। কোনও চিঠি দেখে হয়তো আবার তুমি উত্তেজিত হ'য়ে কি কান্ড করে বসবে তা তো বলা যায় না। এখন দিনকতক ঠান্ডা হ'য়ে বিশ্রাম নাও। সাতদিন পরে যখন গঙ্গার ধারের বাড়িটাতে যাবে তখন দেখো সব। ওষুধটা খাচ্ছ তো ? ঘুম কেমন হয় ?"

গোপালদেব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এসব কথার জবাব না দিয়া বলিলেন—"ওই গঙ্গার ধারের বাড়িতে আমি একা বাস করব ?"

"তোমার মহান থাকবে। তোমার তেতলার ঘরে তুমি মহানকে নিয়ে একাই তো থাকতে। মহানই তোমার সব দেখাশোনা করত। এখানেও করবে—"

"কিন্তু তেতলার ঘরে ছিল আমার লাইব্রেরি—"

"সেটা এখানেও থাকবে। তোমার লাইব্রেরির আলমারিগুলো আনা অসম্ভব হবে না। তোমার ফার্নিচারগুলোও আনা যাবে। এ জন্যে আদালতের পারমিশন নিতে হবে হয়তো। জজ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—সে হয়ে যাবে।"

"আমি এখানে কতদিন আছি বল তো ?"

"তা প্রায় মাস দুই হবে। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই তোমাকে ঘুমের ওষুধ বা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে রাখা হ'ত, তাই কতদিন এখানে আছ তা ঠাহর করতে পাচ্ছ না। কাল থেকে ঘুমের ওষুধ বন্ধ আছে—"

গোপালদেব আদালতের চিঠিগুলি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে একটি কার্ড বাহির হইয়া পড়িল। নিমন্ত্রণপত্র।

"এটা কি ?"

"ওটা তোমার চিঠিপত্রের মধ্যে ছিল। ভুলে চলে এসেছে সম্ভবত। কই দেখি ? ও, ওটা প্রবালের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। হোটেলে সেদিন বেশ ভালো খাইয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম—"

"ভোজ হয়েছিল তাহলে ? টাকা জুটল কোথা থেকে—"

সিভিল সার্জন হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"মগনলাল দিয়েছে নিশ্চয় ! ছি, ছি, ছি, ছি—"

"মগনলাল দেয় নি। ও নিয়ে তুমি উত্তেজিত কোরো না নিজেকে, টাকাটা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছিল প্রবাল।"

"কি রকম?"

"তা এখন না-ই শুনলে। তবে এটা জেনে রাখ প্রবাল এমন কিছু করেনি যা আত্মসম্মানহানিকর। প্রবাল বেশ ভালো ছেলে—। হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমার ওই বাড়িতে তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে একটি প্রাইভেট নার্স বাহাল করেছি। সে সকালে খানিকক্ষণ আর বিকেলে খানিকক্ষণ এসে থাকবে তোমার কাছে। দুপুরে সে একটা ক্লিনিকে চাকরি করে। ভালো নার্স—"

"আমার জন্যে আবার নার্স কেন।"

তোমাকে কিছুদিন চোখে চোখে রাখা দরকার। তোমার 'পাল্‌স্‌' কাউন্ট (count) করা, তোমার টেম্পারেচার দেখা, তোমার ব্লাডপ্রেসার মাপা—এখানে যে সব রোজ হচ্ছে—সেখানেও তেমনি করতে হবে। মহান তো ওসব করতে পারবে না, তাছাড়া একজন কেউ কাছে-পিঠে থাকলে তোমার মনটাও ভালো থাকবে। ভালো মেয়েটি—"

"মাইনে কত লাগবে—"

"তার সঙ্গে কথা কই নি এখনও। তবে যতই লাগুক তোমার নাগালের বাইরে যাবে না তা—"

গোপালদেব হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। সহসা তাঁহার আবুহোসেনের গল্পটা মনে পড়িল। মনে হইল কোন অদৃশ্য হারুণ-অল-রশিদের খেয়ালের খেলনা হইয়াছেন তিনি!

"ভাবছ কি—"

সিভিল সার্জন হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই ভাবছি না। ভাবছি, তাসের ঘরটা ভেঙে গেল। এখন অপরের করুণা-ভাজন হ'য়ে আধ-পাগলের মতো কাটাতে হবে বাকি জীবনটা।"

"ওসব কথা ভাবছ কেন। তোমার ঘর তাসের ঘর কি পাথরের ঘর, কুটির না তাজমহল, তার বিচার করবে তোমার পরবর্তী কাল। তোমার মতো লোকও যদি বর্তমানের স্তুতি-নিন্দার দোলায় বিচলিত হও তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোক কোথায় দাঁড়াবে? তোমাদের উপর ভর করেই তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তোমার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো—ভালো কথা, গোপালদেব নিয়ে তুমি যে একটা গবেষণা করবে ভেবেছিলে তার কি হল—"

"কিছুই হয় নি। ভাবছি। মুশকিল হয়েছে—"

গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"কি মুশকিল—"

"আমার যে সব কথা মনে হয় তার কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। আর পাথুরে প্রমাণ দাখিল না করতে পারলে সুধীসমাজে তা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য হয় না। লোকে বলবে কাব্য করেছি, ইতিহাস হয় নি।"

"কাব্যই কর না। ইতিহাস আর কটা লোকে পড়ে? ভালো ঐতিহাসিক-কাব্যই লিখে ফেল না একটা।"

"কাব্য লেখবার প্রতিভা আমার নেই। মাঝে মাঝে কেবল মেঘের মতো উদ্ভট কল্পনা ভেসে আসে মনে। একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, গোপালদেব বাংলার গৌরবময় যুগের তৃতীয় শিখর, ইংরেজিতে বললে বলতে হয়—থার্ড পিক (third peak)। প্রথম 'পিক' গঙ্গারিডই নন্দরাজা, দ্বিতীয় 'পিক' শশাঙ্ক, তৃতীয় 'পিক' গোপালদেব। বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের মহিমা-ভগ্নস্তূপের উপর গোপালদেবের কীর্তি-সৌধ স্থাপিত হয়েছিল—"

একটু থামিয়া হাসিয়া আবার বলিলেন—"সব মহিমার সৌধ ভগ্নস্তূপ হয়ে যায় শেষকালে। এইটেই ইতিহাসের শিক্ষা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্কর নামে অনেক মিথ্যা কথা লিখেছেন তাঁর হর্ষচরিত কাব্যে· হর্ষবর্ধনের মিতে হুয়েনসাংও অনেক কলঙ্ক লেপন করেছেন শশাঙ্কের নামে। শশাঙ্কের এরকম সভাকবি বা বন্ধু ছিল না—মনে হয় তিনি চাটুকার পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন না। খাঁটি মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর সে স্বপ্ন কিছুটা সফলও হয়েছিল। পরাক্রান্ত মৌখরি রাজশক্তিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন নি। তিনি তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আমরণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। বাণভট্টের মতো চরিত-লেখক অথবা হুয়েনসাংয়ের মতো বন্ধু থাকলে হর্ষবর্ধনের মতো তাঁরও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তিনি স্বদেশে অখ্যাত, অজ্ঞাত· কোনও বাঙালী তার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস লেখে নি, শত্রুর কলঙ্ককালিমাই জগতে তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর মৃত্যুর পরই সব শেষ হ'য়ে গেল, তারপর মাৎস্যন্যায়ের যুগ—"

ইতিহাসের এই লম্বা বক্তৃতায় সিভিল সার্জন একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি রোগী দেখিতে বাকী ছিল তখনও। তাঁহাকে উসখুস করিতে দেখিয়া গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"তোমার তাড়া আছে না কি—"

"হ্যা কয়েক জায়গায় যেতে হবে।"

"তাহলে তোমাকে আর আটকে রাখব না। শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার একটা রোম্যান্টিক থিওরি আছে। সেটা পরে শুনো না হয়—"

"হ্যাঁ পরে শুনব। আজ উঠি তাহলে, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না-তো।"

"তুমি স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন আমার সহায় তখন আর অসুবিধা কি—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

গোপালদেবের মনে কিন্তু সেই রোম্যান্টিক থিওরিটি মেঘের মতো সঞ্চারিত হইতে লাগিল, বিসর্পিত হইতে লাগিল নানাভাবে, অবশেষে বহুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিল।

সূত্রধার আবির্ভূত হইলেন।

বলিলেন—"কল্পনা মিথ্যা নয়। ইতিহাসের সত্য তর্ক-কণ্টকিত। মানুষের বুদ্ধিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের সত্যও

তাই সীমিত। নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে সে সত্যের চেহারা বারবার বদলে যায়। তথাকথিত বিজ্ঞানেরও এই দশা। কোনও সত্যকে সে স্থায়ী রূপ দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যেন টর্চ ফেলে ফেলে অন্ধকারে সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদেরও সম্বল কল্পনা। কল্পনাই তাঁদের পথ দেখাচ্ছে। সেই পথে চলেই তাঁরা অনেক সময় সত্যের খণ্ডরূপ দেখতে পাচ্ছেন। আপনার কল্পনাও হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো সত্যিই শশাঙ্ক আর মালবরাজ দেবগুপ্ত একই বংশোদ্ভুত ছিলেন বলেই বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। হয়তো এ কথাও সত্য শশাঙ্ক যখন মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন তখন প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে ভালবেসেছিলেন। হয়তো তার পাণিপ্রার্থনা করে অপমানিতও হয়েছিলেন। হয়তো রাজ্যশ্রীই অপমান করেছিল, হয়তো বলেছিল—"তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে চাও, সামান্য সামন্ত হ'য়ে বিয়ে করতে চাও স্থানীশ্বরের রাজকন্যাকে। মৌখরী-রাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। হয়তো এই জন্যই গ্রহবর্মার উপর শশাঙ্কের আক্রোশ, এই জন্যই হয়তো তিনি তাঁর বন্ধু মালবরাজ দেবগুপ্তের সাহায্য নিয়ে গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করেছিলেন। গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন, রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। শেষে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে চিতায় আত্ম-বিসর্জন করতে উদ্যত হন, এমন সময় রাজ্যবর্ধন গিয়ে তাঁকে রক্ষা করে। কেউ আবার বলেছেন শশাঙ্কের আদেশেই রাজশ্রী কারামুক্ত হয়েছিলেন। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিম্বদন্তী আপনার কল্পনায় যে রং লাগিয়েছে তা মিথ্যা নয়। ওই দেখুন আকাশ রঙ্গমঞ্চে তার মহোৎসব।"

গোপালদেব দেখিতে লাগিলেন সমস্ত আকাশটা যেন এক বিরাট রণাঙ্গনে রূপান্তরিত হইয়াছে। বহু রক্তাক্ত সৈন্য পড়িয়া রহিয়াছে চতুর্দিকে। সমস্ত আকাশটাই যেন রক্তাক্ত। দূরে দিগন্তরেখায় আগুন জ্বলিতেছে। আর একটা স্থান ধূমাকীর্ণ। একটা হাহাকার যেন মূর্ত হইয়াছে সেখানে। আর এই রণাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন একটি তন্বী রক্তাম্বরা যুবতী। মাথার চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, দুই বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, চোখের আকুল দৃষ্টি সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছে। গোপালদেবের মনে হইল—রাজ্যশ্রী শশাঙ্ককেই যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। রাজকন্যার গর্ব চূর্ণ হইয়াছে, সে এখন সেই সামন্তেরই পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়···। ধীরে ধীরে ধূসর মেঘমালা আসিয়া সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনকে ঢাকিয়া দিল। দিগন্তরেখার অগ্নি নিবিয়া গেল। রাজ্যশ্রী অন্তর্হিত হইলেন। ধূসর মেঘমালা ক্রমে ক্রমে যাহা রচনা করিল—তাহা বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ। গোপালদেবের সহসা মনে হইল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল?"

এইখানে আমি—গল্পের লেখক ফকিরচাঁদ সামন্ত—নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সেদিন আমার পথে-পাওয়া গুরু বুধ আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন তাহার কিছুটা ফলিয়াছে মনে হইতেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে বই লিখিতে আরম্ভ করার পর হইতেই আমার মনে উৎসাহ এবং দেহে বল সঞ্চারিত হইয়াছে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছে, নিজেকে আর ক্ষুদ্র কেরানী বলিয়া মনে হইতেছে না। এমন কি মালিনী—আমার ছাত্রের বোন মালিনী, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মনে একটা

রোম্যাণ্টিক স্বপ্ন পুষ্পিত হইয়াছিল, যে মালিনী আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না, সেই মালিনীও আজকাল আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। সেদিন আমার ছাত্রকে পড়াইতেছিলাম হঠাৎ মালিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'মাস্টার-মশাই, আমি প্রাইভেটে এবার আই-এ দেব। বই কিনেছি, যেখানে বুঝতে পারব না, আপনার কাছে আসব ? বুঝিয়ে দেবেন তো ?'

বলা বাহুল্য, আপত্তি করি নাই, সানন্দে সম্মত হইয়াছিলাম। প্রায়ই তাহাকে পড়া বলিয়া দিতাম, অবশ্য তাহার দাদা রণধীরের ঘরেই সে আসিত। নির্জনে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। আর একটা লাভও হইয়াছে। মালিনী প্রত্যহ আমাকে একথালা জলখাবার পাঠাইয়া দেয়। রাবড়ি, হালুয়া, নানারকম ফল, সন্দেশ—প্রচুর খাবার। উহা খাইয়া পেট ভরিয়া যায়, দ্বিপ্রহরে আর খাইবার প্রয়োজন হয় না। সত্যই আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, মনেও একটা প্রেরণা জাগিয়াছে, মনে হইতেছে জীবন বৃথায় যাইবে না, নেপথ্যে একটা বৃহৎ জীবন যেন আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে। সে জীবন গোপালদেবের জীবনের অনুরূপ হইবে কি না জানি না, কিন্তু অনুভব করিতেছি আমার জীবনের আঁস্তাকুড়ে নন্দনকাননের আবির্ভাব ঘটিবে। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছে। মালিনী ইতিহাসের বই পড়িতে খুব ভালোবাসে। হঠাৎ সেদিন আসিয়া বলিল, "মাস্টারমশাই, রাণী দুর্গাবতীর কাহিনী পড়ে খুব ভালো লাগল। আকবরের সৈন্য যখন সিংহগড় আক্রমণ করে তখন তিনি নিজে হাতীর পিঠে চড়ে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিপক্ষদলের দুটি শর এসে তাঁর চোখে মুখে বিঁধে যায়। এ দেখে সৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করে। তিনি আর তাদের ফেরাতে পারেন নি। মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ যুগে কি ওরকম দুর্গাবতী হয় না ?"

"হয় বই কি। অগ্নিযুগের অনেক বীর রমণীই ওরকম করেছেন প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথাই ধর না—"

মালিনীর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা ঝলমল করিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি ঘোড়ায় চড়া শিখব। আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন ?"

"ছেলেবেলায় চড়েছি দু'একবার মাঝে মাঝে। গরীব মানুষ ঘোড়া কোথায় পাব ?"

"বেশ, আমি দাদাকে বলব। আমাদের সহিসটাকে নিয়ে মাঠে যাব দু'জনে—আমাদের সহিস ধনপৎ খুব ভালো ঘোড়সোয়ার।"

মনে হইল কপাট যেন ধীরে ধীরে খুলিতেছে।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল খেজুরি বিবি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। গালে টোল পড়িয়াছে। কপাট খোলা ছিল, সে কখন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছে কার্তিক টের পায় নাই।

"সুরৎ, তুমি এই পাপীয়সীর বাড়িতে এমন শান্তভাবে থাকবে তা প্রত্যাশা করি নি। আমার ভয় হচ্ছিল এসে হয়তো দেখব রাখাল তোমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে আর

তুমি মুখের বাঁধা কাপড়টা খুলতে চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তোমার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু এসে দেখছি তুমি লক্ষ্মীটি হ'য়ে বসে আছ। ভারি আনন্দ হচ্ছে—"

খেজুরি বিবি আগাইয়া আসিল।

"বসব বিছানায় ? রাগ করবে না তো।"

"না রাগ করব কেন—"

কার্তিক উঠিয়া পড়িল। বেশ একটু দূরে প্রায় দেওয়াল ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিল, যাহাতে খেজুরি বিবির গায়ে গা না ঠেকিয়া যায়। ইহা দেখিয়া খেজুরি বিবি আবার হাসিল, আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"তোমার যে এমন ছুঁচিবাই আছে তাতো জানতাম না। আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে ?"

সোৎসুকে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল সে।

"বিশ্বাসযোগ্য হলেই করব।"

"তোমার এই ছুঁচিবাই দেখে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।"

"তার মানে ?"

"আমি দেহবিক্রি করি এ খবর জানবার পর সাধারণ যে কোনও পুরুষ একটু উস্-খুস্ করত, তার চোখের দৃষ্টিতে রিরংসা লোভ প্রভৃতি ফুটে উঠত, ঘৃণা ফুটে উঠত না। তোমার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠেছে দেখে খুশি হলাম।"

কার্তিকের গলার কাছটায় কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করিতে লাগিল। তাহার চপলাদি—তাহার কল্পনার শ্রী—যাহার চোখে মুখে পবিত্রতার ছাপ এখনো সুস্পষ্ট —সে দেহ-বিক্রয় করে ? একি সত্য ?

"যদি ফুটে থাকে তাহলে আমি লজ্জিত সে জন্য। কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। কিন্তু মনের সংস্কার কাটতে চায় না ; বরাবর সবাই যেটাকে ঘৃণ্য মনে করেছে, ঘৃণ্য মনে করতে শিখিয়েছে সেটার প্রতি ঘৃণাই আছে আমার, যদিও একথা স্বীকার করছি—যুক্তির নিকষে যাচাই করলে আমার এ সংস্কার অর্থহীন বা হাস্যকর বলে মনে হবে। রাসায়নিকের কাছে যেমন বিষ্ঠা আর চন্দন কতকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমষ্টি মাত্র, তাদের নিয়ে ঘৃণা বা উল্লাস প্রকাশ করা যেমন—"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি আমি। কিন্তু যদিও আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ নির্বিকার হওয়া কিন্তু আমার মনে হয় ভাগ্যে সবাই নির্বিকার হতে পারে না তাই জীবনে কিছু স্বাদ আছে—"

এই সময় বাহিরে কয়েকটা লোকের পদশব্দ শোনা গেল।

"এটা কোথায় রাখব মা—"

"এইখানেই নিয়ে এস আপাতত। নিবারণবাবু এলে সকালে যা হয় ব্যবস্থা করবেন তিনি—"

একটা প্রকাণ্ড বস্তা লইয়া চারজন লোক প্রবেশ করিল।

"ওই কোণের দিকে রাখ—"

ধপাস করিয়া বস্তাটা কোণের দিকে রাখিয়া লোকগুলি চলিয়া যাইতেছিল।

"তোমাদের মজুরি পেয়েছ ?"

"নিবারণবাবু আট আনা করে দিয়েছেন জন পিছু।"

"আচ্ছা, আরও কিছু নিয়ে যাও।"

খেজুরি বিবি একটি সুদৃশ্য ব্যাগ খুলিয়া আরও দুইটি টাকা তাহাদের দিল। তাহারা তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

"বস্তায় কি আছে?"—কার্তিক প্রশ্ন করিল।

"চাল।"

"কিছু কিনে রাখলে বুঝি। কিছু 'স্টক' করা ভালো, যা দাম বাড়ছে।"

"স্টক করবার জন্যে কিনি নি! বিতরণ করবার জন্যে যোগাড় করেছি!"

"বিতরণ করবে? কাদের?"

"ঠিক বিতরণ করব না। সামান্য কিছু দাম নেব। বিতরণ করতে পারলেই ভালো হ'ত, কিন্তু যাদের দেব তারা ভিক্ষা নেবে না। তারা ভদ্রলোক—অথচ খুব গরীব—"

"বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা খুব গরীব, তারা আধপেটা খেয়ে থাকে, কখনও উপবাস করে তবু ভিক্ষা করতে পারে না। তাদের কাছেই এই চাল চার আনা সের দরে বিক্রি করব—"

"চার আনা সের? কত করে কিনেছ তুমি—"

"আড়াই টাকা। আড়াই টাকারও বেশী। আজ দু'মণ চালের দাম দু'শো দশ টাকা নিয়েছে।"

"এ চাল তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?"

"চোরাবাজার থেকে।"

কার্তিক স্তম্ভিত হইয়া খেজুরি বিবির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

"চোরাবাজার থেকে চড়া দামে চাল কিনে—"

খেজুরি বিবি তাহার কথা শেষ করিতে দিল না। হাসিয়া বলিল—"যারা দেহ বিক্রি করে তারা সব পারে!"

সত্যটা হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো প্রতিভাত হইল কার্তিকের মনে, কিন্তু বিদ্যুতের মতো মিলাইয়া গেল না। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল চপলাদি দেহ-বিক্রয় করে না। ওই কুৎসিত যবনিকাটার অন্তরালে যে চপলাদি আত্মগোপন করিয়া আছে সে পাপীয়সী নয় মহিয়সী।

"চপলাদি তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছ। তুমি দেহ-বিক্রি কর না—"

খেজুরি বিবি এবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা অবুঝ তুমি তো। মেলায় মেলায় ওই সব তাঁবু যারা ভাড়া নেয় তারা দেহ-বিক্রি করবার জন্যেই নেয়। গভর্ণমেণ্টের কাছে তাদের লাইসেন্স নিতে হয়। এ ব্যবসাকে গভর্ণমেণ্ট ন্যায়সঙ্গত মনে করে। আমারও লাইসেন্স আছে—"

"তা থাক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম না তুমি সাধারণ বারবনিতা। বাজে কথা বলেছ তুমি আমাকে—"

"বিশ্বাস না করবার কারণ?"

"তোমার চোখ-মুখ দেখে সেটা বুঝেছি। সাধারণ বেশ্যাদের চোখ-মুখে ওরকম

পবিত্রতার ছটা থাকে না। তারা গরীব মধ্যবিত্তদের জন্যে চাল সংগ্রহ করে বেড়ায় এ কথাও কখনও শুনিনি—"

খেজুরি বিবি আর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল না, স্মিতমুখে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গালে টোল দুইটি দেখিয়া কার্তিক সহসা যেন আর একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি একটুও বদলাও নি চপলাদি। তুমি এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। কেন আমার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছ বল দিকি—"

খেজুরি বিবি একথারও উত্তর দিল না, নীরবে হাসিতেই লাগিল।

দৈত্যাকৃতি রাখাল দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"আপনার স্নানের গরম জল তৈরি হ'য়ে গেছে মা। আপনি আসুন—"

"এঁর বন্ধু আর কুকুরকে কোথায় রেখেছ?"

"নীচের ঘরে রেখেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েও ছিলেন তিনি। কুকুরটাকেও খাইয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ঘরের কপাট খোলা। ওঁরা কেউ নেই। আমি তো তাঁবুতে পাহারা দিচ্ছিলাম—"

"কোথাও বেরিয়েছেন বোধহয়। চল—"

খেজুরি বিবি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে সে কুলিদের টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল সেটি কার্তিকের বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। ভ্যানিটি ব্যাগটি সত্যই মনোরম। দেখিলেই স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে। কার্তিকের সহসা মনে হইল ওই ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলিয়া দেখিলে হয়তো খেজুরি বিবির সত্য পরিচয়ের আভাস মিলিবে। কোনও চিঠি, কোনও কার্ড বা ওই রকম একটা কিছু হইতেই হয়তো বোঝা যাইবে সব। ব্যাগটা খুলিয়াই কিন্তু চমকাইয়া উঠিল কার্তিক। এক তাড়া নোট রহিয়াছে, প্রত্যেকটা হাজার টাকার! গণিয়া দেখিবার সাহস হইল না। তাছাড়া অনেক খুচরা নোট। সহসা একটা ছবি বাহির হইয়া পড়িল। অর্ধস্ফুট পদ্মকলির ছবি। চমৎকার ছবি। মনে হয় পদ্মকলিটি যেন জীবন্ত। চপলা পর-মুহূর্তেই ফিরিয়া আসিল।

"ব্যাগটা এখানে ফেলে গেছি। ও কি, তুমি খুলে দেখছ না কি—"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল কার্তিক।

"দেখছিলাম ওতে তোমার আসল পরিচয়ের কোন সন্ধান পাই কি না। অন্যায় হ'য়ে গেছে আমার—"

ব্যাগটি বন্ধ করিয়া সে চপলার হাতে দিল। ব্যাগটি হাতে করিয়া চপলা দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে মৃদু হাসি, গালে টোল।

"রাগ করলে আমার উপর চপলাদি?"

"অবাক হয়েছি, রাগ করিনি। হয়তো আমিই নিজেই তোমাকে সব খুলে বলতাম। পদ্মকলি এখনই হয়তো আসবে। তবে এর ভিতর যা দেখেছ তা যেন প্রকাশ কোরো না কারও কাছে। যদি কর তাহলেই রাগ করব—বিপদেও পড়ব—"

তাহার পর হঠাৎ সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার উপর রাগ করা যাবে না জানি। যাবে? তুমি সুহৃৎ, এতদিন পরে ফিরে এসেছ, তোমার উপর রাগ করতে পারব না কিছুতে। একটা কথা শুধু জেনে রাখ একথা যদি প্রকাশ পায়, আমার

কঠিন শাস্তি হবে, হয়তো যাবজ্জীবন জেলে পুরে রেখে দেবে আমাকে। শুধু আমি নয়, পদ্মকলি বেচারাও বিপদে পড়ে যাবে। এইটে মনে রেখো—"

"না, একথা প্রকাশ পাবে না আমার কাছ থেকে। কিন্তু চপলাদি, তোমার সম্বন্ধে বিস্ময় যে ক্রমেই অন্তহীন হয়ে উঠছে। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ছি।"

"কবিরা নারীদের বলেছেন প্রহেলিকা, ধার্মিকরা বলেছেন শয়তানি। সাধারণ পুরুষরা তাদের দেখে দিশাহারা হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাকে আমি অসাধারণ মনে করি সুরং, তুমি দিশাহারা হবে একথা ভাবতেই পারি না। অনেকদিন তো তোমার শালার বাড়িতে একসঙ্গে ছিলাম, তখন তো দিশাহারা হওনি। তোমার শালা বরং হয়েছিল, সে সাধারণ পশু একটা—"

"মা জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

রাখাল আবার দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিল।

"আমি স্নান করে এখন ঘুমুব। তুমিও ঘুমিয়ে নাও না একটু। সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরি—এখন তিনটে বেজেছে—"

খেজুরি বিবি চলিয়া গেল। কার্তিক বসিয়া রহিল আরও খানিকক্ষণ। তাহার পর উপন্যাসটাই খুলিল।

"গোপালদেব অস্থির চিত্তে কেবলি ভাবিতে লাগিল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল? সহসা সেই সৌম্য প্রাজ্ঞ গম্ভীর ইতিহাস প্রস্তরবেদী 'পরে আবার মূর্ত হইলেন। বলিলেন—"সামাজিক নিয়মে গণ্ডীবদ্ধ কোন জাতিরই শাশ্বত মূল্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি বহুজাতির সংমিশ্রণ সর্বত্র ঘটিয়াছে। কোনও একটা জাতি নিজের বৈশিষ্ট্যকে বেশীদিন স্থায়ী করিতে পারে নাই। আর একটা জাতি আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পর আর একটা। নিত্য নূতন জাতি, নূতন ধর্ম, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। বহু নদীর ধারায় বাহিত হইয়া বহু ঘাটের জল এক জলাশয়ের ভিতর জমা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে কত উদ্ভিদের খণ্ডাংশ, কত জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কত বিভিন্ন মাটির বৈচিত্র্য-বৈভব। কিন্তু এখন সব একাকার, এখন সব পঙ্ক। সকলের বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে ওই বিরাট পঙ্ককুণ্ডে। তবে একটা কথা বলিব। ওই পঙ্ককুণ্ডেই আবার নূতন রকম জাতিভেদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ওই পঙ্ককুণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া গুগুলি, শামুক, ব্যাং, সাপ, শ্যাওলা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে, ওই পঙ্ককুণ্ডে পদ্মও ফোটে। পদ্ম এবং শামুক এক জাতের নহে। তাদের বিশেষ গুণাবলীর সমষ্টিই তাহাদের পদ্ম বা শামুক করিয়াছে। ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না, সে পদ্মের রূপ-গুণেই মুগ্ধ। পদ্ম নিজের রূপ-গুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সব জাতিরই মূল কথা ইহাই। গুণ ও কর্ম একটি জাতিকে অপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশে যদি চণ্ডালের জন্ম হয় সে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা পায় না। নীচ বংশে মহাপুরুষদের জন্ম হইয়াছে এরূপ উদাহরণও ইতিহাসে বিরল নহে। তাঁহারা সমাজে সম্মানিতও হইয়াছেন। একই পঙ্ক হইতে কি করিয়া পদ্ম ও শামুকের উদ্ভব হয় এ রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকিয়া

যাইবে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পদ্ম নিজগুণেই, নিজের মহিমার জোরেই চিরকাল আধিপত্য বিস্তার করিবে গুণী ও রসিকদের কাছে। সরস্বতী চিরকাল আসিয়া তাহার উপরই নিজের আসন পাতিবেন। রাজ্যশ্রী ও শশাঙ্ক এক জাতের ছিল কি না এ চিন্তা সুতরাং নিরর্থক। তোমার কল্পনা যদি শশাঙ্ককে রাজ্যশ্রীর প্রণয়ীরূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা হইলে তোমাকে একথা মানিতেই হইবে উহারা একজাতের পক্ষীই ছিল। কারণ ভিন্নজাতীয় পক্ষী কখনও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহের দিক দিয়া বিচার করিলে সব মানুষকেই একজাতের মনে হয় বটে, জড়বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বর্বর ও সভ্য, নির্বোধ ও প্রতিভাবান সকলেই হোমোস্যাপিয়েনস্ (Homosapiens)—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা একজাতের নহে। যে কুলেই তাহারা জন্মগ্রহণ করুক, বিভিন্ন প্রবৃত্তি, কর্ম ও গুণ অনুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতীয় হয়। আর্যগণ গুণ কর্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে-কোন কুলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী যে একই জাতের নরনারী ইহা কল্পনা করিলে অসঙ্গত হইবে না—"

পড়িতে পড়িতে কার্তিকের চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। ঘুমাইয়া পড়িল সে।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, দেখিল অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরে কেহ নাই। চারিদিক স্বর্ণকিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল আলোর দেশে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে। আর অন্ধকার আসিবে না। যদিও বা আসে তাহা হইলে তাহা সন্ধ্যার বর্ণসমুদ্রে অবগাহন করিয়া নক্ষত্রমালায় সাজিয়া জ্যোৎস্নার উত্তরীয় গায়ে দিয়া আসিবে। যে শোভাহীন কুৎসিৎ অন্ধকার সে এতদিন ভোগ করিয়াছে এ অন্ধকার সে রকম হইবে না। বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর চোখে পড়িল পাশেই তে-পায়ার উপর একটি চিঠি রহিয়াছে। খামের চিঠি। খামের উপরে লেখা—স্মরং। চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

স্মরং,

তুমি অগাধে ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ওঠালাম না। আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, বারোটা নাগাদ ফিরব। রাখাল এখানে রইল সে তোমার দেখাশোনা করবে। তোমার বন্ধু আন্টো আর কুকুর লর্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। খুব ভালো লেগেছে ওদের। আন্টোর নূতন নামকরণ করেছি অবতার। স্বয়ং ভগবানই তো একদিন বামন অবতার হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কশ্যপের সন্তানরূপে। চূর্ণ করে-ছিলেন বলির দর্প। আন্টো অনির্বাণ প্রাণস্ফুলিঙ্গ। ওকে আমি কাজে লাগাব। ওকে আর তোমার কুকুরকে খেজুরিতে পাঠিয়ে দিলাম। সেইখানেই ওরা আরামে থাকবে। আমি ফিরে এসে তোমাকেও খেজুরিতে নিয়ে যাব। সেখানেই ভালো লাগবে তোমার। ইতি চ

চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া কার্তিক দেখিল নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্তিবৎ বলিষ্ঠকায় বিশালদেহ রাখাল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হ'তেই সে আগাইয়া আসিল।

"আপনি কি আগে স্নান করবেন, না জলখাবার খাবেন ?"

"স্নানটা করলেই ভালো হ'ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কাপড় নেই—"

"সেজন্যে ভাববেন না। মা সে সব ব্যবস্থা করে গেছেন।"

"তবে চল স্নানটাই সেরে ফেলি আগে।"

স্নানের ঘরে গিয়া কার্তিক দেখিল তেল, সাবান, গরম জল, ঠাণ্ডা জল এ সব তো আছেই তাছাড়া আছে একটি ভালো শান্তিপুরে কাপড়, একটি তোয়ালে এবং একটি সিল্কের চাদর। সিল্কের চাদরে একটি কাগজের টুকরা 'পিন' দিয়া আটকানো আছে। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—'সুরং, তোমার গায়ের মাপ জানি না, তাই তোমার পাঞ্জাবি গেঞ্জি কিনতে পারলাম না। আপাতত এই সিল্কের চাদরটা গায়ে দিয়ে থাকো খানিকক্ষণ। ফিরে এসে তোমার পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির ব্যবস্থা করব। ইতি চ—

কার্তিক বাহিরে আসিয়া রাখালকে প্রশ্ন করিল—"আমার থলিটা কোথা ?"

"সেটা মা ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করে রেখে গেছেন। আপনার কাপড় জামা কিছু আছে কি না দেখবার জন্যেই থলিটা দেখছিলেন উনি। কিন্তু একটা কড়াই আর খুন্তি আর একটা মোটা খাতা ছাড়া আর তো কিছু ছিল না তাতে।"

"না, আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা, স্নানটা সেরে ফেলি—"

স্নানান্তে জলযোগ করিতে বসিয়া কার্তিক অবাক হইয়া গেল। দেখিল, সে একদা যাহা ভালোবাসিত তাহাই যেন আজ সংগৃহীত হইয়াছে। ওভালটিন, মাখন-দেওয়া গরম টোস্ট, ডিম-ভাজা আর সন্দেশ। আপেলও রহিয়াছে একটি। প্রথম প্রথম সে যখন ঘরজামাই হইয়া আসিয়াছিল তখন এসব খাদ্য সে নিয়মিত পাইত। কিন্তু কালীকিংকরের আমলে মুড়িও জুটিত না তাহার। মনে পড়িল চপলাদিকে মনের দুঃখে এ সব সে বলিয়াছিল একদিন। দেখিল চপলা তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ চপলার টোল-খাওয়া গালের মৃদু হাসিটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। আর একবার সে মনে মনে বলিল—'হতেই পারে না। চপলা দেহ-বিক্রয় করে টাকা রোজগার করে না। কিছুতেই না।'—বলিয়া ভারি তৃপ্তি পাইল।

ঠিক বেলা বারোটার সময় ঘর্মাক্তকলেবরে খেজুরি বিবি ফিরিল। বাহিরে প্রখর রৌদ্র এবং উত্তপ্ত হাওয়া। খেজুরি বিবির মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। চুল শাড়ি ধূলি-ধূসরিত। কিন্তু তবু তাহার মুখের হাসি নিবিয়া যায় নাই, চোখের দীপ্তিও ম্লান হয় নাই।

"আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি। জানি আমি না ফিরলে তুমি খাবে না। আর একজনও আমাদের সঙ্গে খাবে।"

"সে কে—"

"আমার প্রণয়ী!"

"তোমার প্রণয়ী!"

"হ্যাঁ। সে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। রাখাল, ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এস আর আমাদের খাবার দাও—"

একটি মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের ভদ্রলোক মুচকি হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

"আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার আত্মীয় সুরং, অনেকদিন পরে কাল মেলায় দেখা হল এর সঙ্গে। আর সুরং ইনি আমার একজন বন্ধু। খুব ভালো লোক, চমৎকার গান করেন, চমৎকার বাঁশী বাজান। এঁর পরিচয় পেলে তুমি খুশি হবে—"

রাখাল দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল আবার।

"খাবার দেওয়া হচ্ছে।"

"চলুন খাওয়াটা শেষ করে ফেলা যাক—"

কার্তিক ক্রমশই যেন একটা জটিল ধাঁধার জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। এই মোটা লোকটা চপলাদির প্রণয়ী? বিশ্বাস হয় না। প্রণয়ীটি কিন্তু একটি কথাও বলিল না। নীরবে খাইয়া যাইতে লাগিল। মাছ, মাংস, পায়েস সবই প্রচুর খাইল। কিন্তু নীরবে।

"দারোগা সাহেব এসেছেন—" রাখাল আসিয়া খবর দিল।

"ও। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এস। চেয়ার দাও একটা।"

ইউনিফর্ম-পরা দারোগা সাহেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন।

"আমি একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে এসেছি কিন্তু। আপনার বাড়িটা সার্চ করতে হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে—"

"বেশ করুন। আমরা তো বেওয়ারিশ মাল, যে কেউ যখন তখন আমাদের নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। আপনারা পুলিশের লোক, আপনারা তো পারেনই, এর জন্যে আপনাদের কোন খরচও নেই কিন্তু যারা পুলিশ নয় তারাও আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে অবশ্য তার জন্যে তাদের অর্থমূল্য দিতে হয়—এই ইনি যেমন দিয়েছেন—"

খেজুরি বিবি তাহার প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রণয়ীটিও হাসিলেন। দেখা গেল তাঁহার সামনের দাঁত দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত।

দারোগা সাহেব বলিলেন—"আমি নীচের ঘরগুলো দেখেছি। সবই তো খালি দেখলাম। উপরে যে ঘরটায় তালাবন্ধ আছে সেইটে একবার দেখব। আর দেখব আপনার বাক্স—"

খেজুরি বিবি চাবির গোছাটা কোমর হইতে খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"আমার বাক্স নেই—একটি কিন্তু অনুরোধ আছে—। খাওয়ার সময় এসেছেন কিছু খেয়ে যেতে হবে। গরম গরম কাটলেট আর—"

"না, আর কিছু নয়। কাটলেটই দিন তাহলে খান দুই—"

টেবিলের একধারে খেজুরি বিবির সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখা ছিল। সেটি দারোগা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"ওটা কি—"

"ওটা আমার ব্যাগ। যা রোজগার করি ওতেই থাকে—"

"দিন তো দেখি ওটা। কাল কত রোজগার করেছেন—"

"তা আমার প্রণয়ীটিকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি যা দিয়েছেন তাই আছে ওতে—"

"কত দিয়েছেন আপনি—"

প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া দারোগাবাবু প্রশ্ন করিলেন।

"বেশী নয়। মাত্র পঁচিশ টাকা—" কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন প্রণয়ীটি।

দারোগা সাহেব ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন পঁচিশ টাকাই রহিয়াছে।

কার্তিক সবিস্ময়ে দেখিল হাজার টাকার নোট একটিও নাই। পদ্মকলির ছবিটাও দেখা গেল না।

"আমি ওই ঘরটা দেখে আসি তাহলে—"

"রাখাল ঘরটা খুলে দাও আর উনি যা যা দেখতে চান দেখাও—"

একটু পরেই দারোগা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

"ও ঘরেও তো কিছু নেই। অথচ ওঁরা খবর দিয়েছেন, কিছু চোরাই চাল এখানে এসেছে--"

"চোরাই চাল নিয়ে আমি কি করব ? যা কিনি খোলা বাজার থেকে কিনি—"

"আচ্ছা চলি—"

দারোগা সাহেব চলিয়া গেলেন।

হতভম্ব কার্তিক বলিল—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না চপলাদি—"

"পৃথিবীতে অধিকাংশ জিনিসই দুর্বোধ্য। আমরা ভান করি যেন বুঝতে পেরেছি। তুমিও তাই কর।"

হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ছুটিতে ছুটিতে লর্ড আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার গলায় একটা দড়ি বাঁধা। সে আসিয়াই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিককে জড়াইয়া ধরিল।

"পাছে এদিকে ওদিকে চলে যায় তাই একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম ওকে। শিকল তো নেই—"রাখাল অপ্রস্তুত মুখে জবাবদিহি করিতেই লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে বকিয়া দিল।

"চমৎকার কুকুরটি তোমার স্বরং—একে ভালো করে যত্ন করতে হবে। আমরা এবার খেজুরিতে যাব। সেইখানেই বিশ্রাম করা যাবে। রাখাল আমাদের যাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছ—"

"দুটো পালকি আনিয়েছি—"

প্রণয়ীটি বলিল—"আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। পরে আবার দেখা করব।"

প্রণয়ী চলিয়া গেল। তাহার পরই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এ দুটো এখন থাক আপনার কাছে" তাহার পর হাসিল। কার্তিক দেখিল তাহার সামনের দাঁত দুইটি ফাঁক ফাঁক, সে দুইটিতে আর সোনা নাই। খেজুরি বিবি তাহার নিকট হইতে সোনার টুকরাগুলি লইয়া ব্যাগে পুরিল। সে চলিয়া গেলে হাসিয়া বলিল—"ওর ওই ফাঁক ফাঁক দাঁত দুটিতে মাঝে মাঝে সোনার টোপর পরিয়ে রাখতে ভালোবাসে ও। কলকাতায় গিয়ে করিয়ে এনেছে এ দুটি—"

সোনার টুকরা দুইটি ভ্যানিটি ব্যাগে পুরিয়া খেজুরি বিবি তাহার সেই টোল খাওয়া হাসিটি হাসিয়া কার্তিকের দিকে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল সহসা।

"চপলাদি আমি চললুম। খেজুরিতে আর যাব না—"

"কোথায় যাবে?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়। এত রকম রহস্যের জট ছাড়ানো আমার কর্ম নয়। আমি

সহজ সরল জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, এত রকম ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে আমি শান্তি পাব না। চললুম। একটা কথা কিন্তু বলে যাচ্ছি—তুমি আমার কাছে এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। তোমার বাইরের ছদ্মবেশ আমাকে একটুও ভোলাতে পারেনি।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সৃষ্টির সঙ্গে আমার তুলনা না দিলে তোমার যদি তৃপ্তি না হয় তাহলে আমাকে বরং দেবীচৌধুরাণী বলতে পার। অবশ্য দেবীচৌধুরাণীর পায়ের নখের সঙ্গেও আমার তুলনা চলে না। আমি সত্যিই অতি সাধারণ মেয়েমানুষ—"

"আচ্ছা আমি চললুম—"

"তোমাকে যেতে আমি দেব না সুরং। তুমি কাল আমাকে বলেছিলে, তুমি এ যুগের গোপাল দেব হ'তে চাও। সে সুযোগ তোমাকে আমি করে দেব। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ যুগের গোপালদেব রাজা হবে না। সে সিংহাসনে আরোহণ করবে না, নিজের খ্যাতির ঢাক পেটাবে না, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে না, সে কেবল সেবা করবে। আমাদের দেশ, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, নানা দুঃখে কাতর। যারা রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষা করতে পারে তারা দুঃখী নয়, যারা গুন্ডা জোর জবরদস্তি করে লুটপাট করে তারাও দুঃখী নয়, যারা গণতন্ত্রের কল্যাণে দেশের শাসনকর্তা তারা দুঃখী নয়, যারা ধনী তারা তো নয়ই—দুঃখী শুধু ওই ভদ্র নিম্নমধ্যবিত্তের দল যারা ভিক্ষে করতে পারে না, লুটপাট করতে পারে না, ভোট সংগ্রহ করে মন্ত্রী হতে পারে না, যারা সমাজের সব রকম দায়িত্ব বহন করে, অথচ যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, শিক্ষা পায় না, দারিদ্র্যের জন্যই যাদের বারবার পদস্খলন হচ্ছে। ওদেরই বাঁচাতে হবে, ওদেরই সেবা করতে হবে। বর্তমান যুগের গোপালদেব ওদেরই সেবা করবে, ওদেরই বাঁচাবে, দরকার হ'লে ওদের জন্যে প্রাণবিসর্জন দেবে। কিন্তু সে রকম লোক কোথাও পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে আমার আশা হয়েছে—"

"দেশসেবকের তো অভাব নেই, কাগজে দেখি—"

"কাগজের দেশসেবক অনেক আছে। তাঁদের ছবি ছাপা হয়, তাঁরা রেডিওতে 'টক' দেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে প্লেনে উড়ে উড়ে বেড়ান, কিন্তু আমি যে ধরনের সেবক চাইছি ওঁরা ঠিক সে জাতের নন। কাগজের দেশসেবকদের সেবা করার চেয়ে আত্মপ্রচারের দিকেই লক্ষ্য বেশী। সেবা করা বড় শক্ত কাজ। যার সেবা করবে তার আত্মসম্মানে আঘাত না করে তার আপন জন না হ'য়ে যেতে পারলে তাকে সেবা করা যায় না। সেবা করতে হলে ভালোবাসতে হবে। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে পাইকারি রীতিতে ভালো ভালো বক্তৃতা করা সহজ কিন্তু পাইকারি হিসাবে ভালোবাসা সহজ নয়। তোমাকে একটি পরিবারের ভার দিতে চাই প্রথমে। তাদের ভালোবেসে সেবা করে আগে আপন কর, তারপর দ্বিতীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ কোরো। আলাপ অবশ্য আপনিই হবে, প্রেমের আলো সূর্যের আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। তোমাকে আমার চাই সুরং—"

লর্ড লুথ তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে খেজুরি বিবির কথাগুলি শুনিতেছিল। রাখাল বাহিরে গিয়াছিল পাল্কিতে বিছানা পাতিবার জন্য। কার্তিকও অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল খেজুরি বিবির মুখের দিকে। 'তোমাকে আমার চাই সুরং'—এই কথাগুলি একটা দমকা হাওয়ার মতো আসিয়া রহস্যের কুয়াসাটাকে যেন উড়াইয়া লইয়া গেল।

সহসা সে যেন চপলাদির সত্য রূপটা দেখিতে পাইল। তবু তাহার মনের সংশয় ঘুচিল না। তবু সে বলিল, "চপলাদি, সব কথা পরিষ্কারভাবে না জেনে তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। আমাকে অকপটে সব খুলে বল। আভাসে ইঙ্গিতে এতক্ষণ তোমার যে পরিচয় পেয়েছি তা আলো-আঁধারির মতো রহস্যময়। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। নিমুকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। বুঝতে পারছি দেশে আমার বাস্তুভিটেতে আমি যেতে পারব না। কোথাও একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নতুন বাসা করে সেখানেই নিমুকে নিয়ে আসতে হবে—আমি সেই চেষ্টাই করতে চাই—"

"আমিও সেই ব্যবস্থাই করতে চাইছি তোমার জন্যে। নিমুকে আমারও চাই। খেজুরিতে আমার অনেক ধানের জমি আছে। যদিও গভর্ণমেন্ট সে ধানের অনেকখানি নিয়ে নেয়, তবু যা বাঁচে তাতে আমাদের খাওয়া-পরা স্বচ্ছন্দে চলবে। তরি-তরকারিও অনেক হয়, পুকুরে মাছ আছে, হাঁস মুর্গিও পুষেছি, গরু আছে। খাওয়ার অভাব হবে না তোমাদের। তোমাকে থাকার জন্যে আলাদা বাড়িও দিতে পারব একটা। তাছাড়া তুমি মাসে মাসে দুশো টাকা করে হাতখরচ যদি পাও—তাহলে তোমার কি চলবে না?"

"মাসে মাসে দু'শ টাকা আমাকে দেবে কে—"

"কে দেবে তা এখন নাই শুনলে। কিন্তু আমি যখন বলছি পাবে, তখন পাবেই।"

"কি কাজ করতে হবে আমাকে?"

"ওই তো বললুম। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। তোমাকে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অভিযোগের খবর নিতে হবে আর সেগুলি মোচন করতে হবে। সস্তায় চাল ডাল গম দিতে হবে তাদের। আর খেজুরি গ্রামের একটি দরিদ্র ভদ্রপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তাদের ভালোবেসে তাদের শত দোষ ক্ষমা করে তাদের সেবা করতে হবে। তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। পরিবার বড় নয়, একটি ছেলে দুটি মেয়ে, আর তাদের বাবা মা। বাবা সামান্য চাকরি করেন। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। কিন্তু আসলে খুব কঠিন কাজ। নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, চরিত্রবান, প্রেমিক না হলে এ কাজ করতে পারবে না। দু'জন লোক রেখেছিলাম পর পর। তারা কেউ মনোমত হ'লো না। কাল হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেছি সুরং, তোমাকে আমি ছাড়ব না, এ কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে—"

"এসব কাজে তো অনেক টাকা দরকার। সে টাকা পাচ্ছ কোথায় তুমি।"

"সবই জানতে পারবে। তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। কিন্তু তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ করব—কারো কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। করলে আমি মহাবিপদে পড়ব—"

"এতে এত লুকোছাপার কি থাকতে পারে তাতো আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"ঢুকবে। খেজুরিতে চল সব বলব। যেতেই হবে তোমাকে।"

লর্ড হঠাৎ কার্তিকের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া উন্মুখ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর 'কুঁই' 'কুঁই' করিতে লাগিল।

"ওই দেখ তোমার কুকুরও তোমাকে অনুরোধ করছে।"

"অনুরোধ করছে, না মানা করছে কি করে বুঝলে—"

"ওর মুখ দেখে। শুনলাম রাখাল ওকে আজ মাংস খাইয়েছে —"

"তাহলে পালিয়ে এল কেন?"

"তোমাকে ডাকতে এসেছে।"

রাখাল প্রবেশ করিয়া বলিল—"মা, পালকি তৈরী হয়েছে। কুকুরটাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব?"

"না, ওটা আমার সঙ্গে পালকিতেই যাবে—"

লর্ড হঠাৎ মুখ তুলিয়া একটানা একটা ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ শব্দ করিল, মনে হইল যেন আবদার করিতেছে।

"হ্যা হ্যা তোমাকে ফেলে যাব না, সঙ্গেই নিয়ে যাব, চল না—"

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সহসা খেজুরি বিবি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করিয়া বসিল।

"তুমি আমাকে কথা দাও সুরং, তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না। তুমি জান না, আমি সত্যিই বড় অসহায়।"

॥ ৩ ॥

"গঙ্গার ধারের বাংলোটি গোপালদেবের খুব পছন্দ হইয়াছিল। উত্তরদিকে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত 'লন'। ঘরে অনেক জানলা। প্রত্যেক জানলা দিয়াই আকাশ দেখা যায়। তাঁহার সমস্ত ঘরটাই যেন আকাশময়। বাহিরের ঘরটাতে দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাঁহার লাইব্রেরির আলমারিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। আলমারিগুলির মধ্যেও অনেক আকাশ, অনেক মনের অনেক কবির, অনেক মনীষীর, অনেক প্রতিভার আকাশ। এখানে গোপালদেব ভালোই ছিলেন। তাঁহার যে আত্মীয়টি বাড়ি এবং বিষয়ের উপর দাবী করিয়াছেন গোপালদেবের ব্যারিস্টার তাহার সহিত পাঞ্জা কষিতেছেন এবং গোপালদেবকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যদিও কিছু সময় লাগিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জিতিবেন। গোপালদেব বৈষয়িক লোক নন, সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপার তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি এখন যে পরিবেশে আছেন তাহা তাঁহার অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাঁহার পুরাতন বাড়ির ত্রিতলের ঘরটার কথা এখন স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে পড়ে এবং স্বপ্নের মতোই ভালো লাগে। সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কোনও ক্ষোভ নাই, স্বপ্নকে স্বপ্নের মাধুর্য দিয়াই তিনি মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাকে বাস্তবে পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হন নাই। তবে তাঁহার চিত্ত যে একেবারে ক্ষোভ-হীন তাহা নহে। গঙ্গার ধারে যে চমৎকার বাংলোটিতে তিনি আছেন তাহার মালিক রামগম্ভীর সিং। খুব বড়লোক। এককালে সে তাঁহার ছাত্র ছিল। তাঁহারই সাহায্যে সে এম-এ পাশ করিয়াছে, ইতিহাসে ডক্টরেটও হইয়াছে। সে যখন তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই সে অত বড়লোকের ছেলে। গোপালদেব টিউশনি করিতেন না। যখন যে ছাত্র আসিত এমনিই তাহাদের পড়াইয়া দিতেন। অনেক বাঙালী ছাত্রকেও তিনি পড়াইয়াছেন।

কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়ার পর অর্থাৎ পাশ করিবার পর কোনও বাঙালী ছেলের টিকি তিনি আর দেখিতে পান নাই। বিহারী ছাত্র রামগম্ভীর কিন্তু মাঝে মাঝে আসিত এবং তাঁহার খবর লইয়া যাইত। তাঁহার বাত হইয়াছিল, সাধারণ ঔষধে কোনও ফল হইতেছিল না. একজন কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সে এক হাঁড়ি শুশুকের তেল তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতে তিনি উপকারও পাইয়াছিলেন। তিনি দাম দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রামগম্ভীর দাম লয় নাই, বলিয়াছিল—আপনার সেবায় এই সামান্য জিনিস দিলাম এর দাম কি নেব। আমার দাম লাগে নি, আমার জেলে প্রজারা দিয়েছে। সেইদিনই গোপালদেব জানিতে পারেন রামগম্ভীর জমিদারের ছেলে। তখনও জমিদারিপ্রথা লোপ পায় নাই। একদিন আসিয়া বলিল সে নিজেদের গ্রামে একটা স্কুল করিয়াছে. সেই স্কুলের উদ্বোধন দিবসে গোপালদেব যদি যান সে কৃতার্থ হইবে। গোপালদেব বিশেষ কোথাও যান না। তাহার স্কুল উদ্বোধন করিতেও যান নাই। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়াছে, আমরা স্বাধীন হইয়াছি, দেশে অনেক রকম রাজনৈতিক ওলটপালট হইয়াছে। হঠাৎ রামগম্ভীর একদিন আসিয়া বলিয়াছিল--সার, আপনি এম-পি হইবার জন্য প্রার্থী হোন। যাহাতে আপনি জেতেন তাহার সব বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব। গোপালদেব রাজি হন নাই। কিন্তু তখনই তিনি শুনিয়াছিলেন, এ-অঞ্চলের ভোটদাতারা রামগম্ভীরের কথায় উঠ-বোস করে। রামগম্ভীর নিজে কখনও মিনিস্টার বা এম-পি হইবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সাহায্যে অনেক লোক মিনিস্টার হইয়াছে। সে নিজে চাষী। দেহাতে তাহার অনেক জমি আছে। জমি লইয়াই সে থাকে। তাহার 'কামতে' একটি ভালো লাইব্রেরিও সে করিয়াছে। এজন্য গোপালদেবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একাধিকবার সে আসিয়াছে তাঁহার কাছে। তখনও গোপালদেব জানিতে পারেন নাই যে এই শহরেই গঙ্গার ধারে তাহার এমন সুন্দর একটি বাড়ি রহিয়াছে। জানিলে এইখানেই তাহাকে লাইব্রেরী করিবার পরামর্শ দিতেন। রামগম্ভীর বাড়িটি করিয়াছিল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য লইয়াই। তাহার ইচ্ছা ছিল এখানে ঐতিহাসিক মিউজিয়ম করিবে এবং গোপালদেবের তত্ত্বাবধানে সেটি থাকিবে। কিন্তু সিভিল সার্জনের মুখে যখন সে গোপালদেবের মানসিক এবং বৈষয়িক বিপর্যয়ের কথা শুনিল এবং সিভিল সার্জন যখন বলিলেন যে কোনও নির্জন স্থানে কিছুদিন থাকা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দরকার তখন সে ওই বাড়িটি গোপালদেবের সেবায় উৎসর্গ করিল। গোপালদেবকে সত্যই সে ভক্তি করিত। সুতরাং 'উৎসর্গ' কথাটা কেবল আলঙ্কারিক শোভা হিসাবেই ব্যবহার করিতেছি না, রামগম্ভীরের আন্তরিকতার প্রকাশ করিতে হইলে ওই কথাটাই ব্যবহার করিতে হয়। রামগম্ভীর সিভিল সার্জনকে বলিল. বাড়িটা যে আমার একথা মাস্টার মশাইকে বলিবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখা গেল না। গোপালদেব প্রায়ই সিভিল সার্জনকে প্রশ্ন করিতেন, বাড়ির ভাড়া কত, বাড়ির মালিক কে, কোথায় ভাড়া পাঠাইব, এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে রাখিয়াছ কেন। তখন সিভিল সার্জন একদিন বলিলেন—বাড়ির মালিককে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। দিন দুই পরে রামগম্ভীর সসংকোচে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কি খবর রাম। ভালো আছো তো। আমি মহা বিপদে পড়েছি। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দিন কয়েকের জন্য। সুরেশের চিকিৎসায় এখন অনেকটা

ভালো আছি। এর উপর আর এক মুশকিল হয়েছে, আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে মকোর্দমা করে আমাকে আমার বাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। এখন পরের বাড়িতে এসে থাকতে হচ্ছে—"

রামগম্ভীর সবিনয়ে বলিল—"এটাও পরের বাড়ি নয়। আপনারই বাড়ি—"

"না, না এটা—"

"আপনার ছেলের বাড়ি—"

"আরে না না আমার ছেলে তো—"

"আমি কি আপনার ছেলে নই ?"

গোপালদেব বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামগম্ভীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"এটা তোমার বাড়ি ?"

"আপনারই বাড়ি। যতদিন ইচ্ছে থাকুন—"

গোপালদেব নির্বাক হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কিন্তু তোমাকে এর ভাড়া নিতে হবে রাম।"

"এ কথা কেন বলছেন, কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে !"

"অপরাধ কিছু কর নি। তুমি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু আমারও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে—ইংরেজিতে যাকে 'প্রেস্টিজ' বলে—আমি তোমার মহত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকব, এটা কি ভালো—এটা ভাড়া দিলে তুমি মাসে অন্তত পাঁচশ টাকা পাবে—"

"এ বাড়ি ভাড়া দেবার জন্যে আমি করি নি মাস্টার মশাই। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যেই এটা করেছি আমি। ইচ্ছে আছে এখানে একটা হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম (historical museum) করব—আপনিই সে মিউজিয়ামের কর্তা হবেন। আপনার আশীর্বাদে আমার সংসারে অসচ্ছলতা নেই, আপনার কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হবে না—আপনি আমার বাড়িতে আছেন এতেই আমি কৃতার্থ। আপনি মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না। আপনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা অমূল্য—তার দাম কখনও দিতে পারব না। আমার বাড়িতে কিছু দিন বাস করলে—"

গোপালদেব বজ্রকণ্ঠে তাহাকে থামাইয়া দিলেন—"তা হয় না রাম। আমি সেকেলে লোক—আই বিলিভ ইন ওল্ড্ ভ্যালুজ (I believe in old values). আমি ছাত্রের কাছে কখনও পয়সা নিইনি, কখনও নেব না। তুমি বাঁকা পথে আমাকে টাকা দেবার চেষ্টা কোরো না। যদি ভাড়া না নাও, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব !"

রামগম্ভীর হেঁটমুখে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা ভেবে দেখি, পরে জানাব আপনাকে।" প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে এখনও রামগম্ভীরের কোনও খবর আসে নাই। গোপালদেবের মনে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে, কেবলই মনে হইতেছে সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করিতেছে। যে নার্সটি সুরেশ এখানে বাহাল করিয়াছে সে-ও বেতন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না। গোপালদেব একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে বলিল—সুরেশবাবু আমাকে মাইনের কথা কিছু বলেন নি। তিনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। সুরেশকে (সিভিল সার্জন) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"নার্সটির মাইনে কত ?

এতদিন কাজ করছে এখনও তো দিইনি কিছু। চায় না, কাল জিগ্যেস করাতে বললে তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।"

"কেমন লাগছে মেয়েটিকে—"

"চমৎকার!"

"কি হিসেবে চমৎকার?"

"নিজেকে কখনও থ্রাস্ট (thrust) করে না। অকারণে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতে দেখিনি কখনও। নেপথ্যেই থাকে, অথচ মনে হয় বাড়িটা পূর্ণ করে আছে। তুমি যা যা করতে বলেছ তা ভালোভাবে করে তো?"

"হ্যাঁ। কোন খুঁত ধরতে পারি নি। ওর মাইনে একশ টাকা করে দেব ভেবে রেখেছি—"

"বেশ। টাকাটা নিয়ে যাও তাহলে আমার কাছ থেকে!"

"দাঁড়াও দাঁড়াও অত ব্যস্ত হ'য়ো না। একটা কথা আছে—"

"কি—"

"নার্সের মাইনে প্রবাল দেবে বলেছে। বলেছে বাবার সেবা করবার সুযোগ পাইনি জীবনে। আমাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এই সুযোগটা অন্ততঃ আমাকে দিন। নার্সের মাইনেটা আমি দেব। আমি তাকে বলেছি, বেশ দিও। তাই তোমার কাছে চাইনি—"

সুরেশবাবু আড়চোখে একবার গোপালদেবের দিকে চাহিলেন। গোপালদেব খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া পা নাচাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"দেখ, যে লোকটা নিজের গায়ের জোরে স্বচ্ছন্দে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে তার প্রতি অনুগ্রহ করে কেউ যদি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যেতে চায় তা যেমন হাস্যকর হয় তোমরা তেমনি করছ। কারো অনুগ্রহের কিছুমাত্র দরকার নেই আমার, অথচ তোমরা সবাই আমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। রামগম্ভীর বাড়ির ভাড়া নিতে চাইছে না, ভেবে দেখি বলে সেই যে চলে গেছে আর কোনও খবর দেয়নি। আমার উপর এতো অনুগ্রহ বর্ষণের মানে কি। আমি কারও অনুগ্রহভাজন হ'তে চাই না—"

"তুমি ভুল করছ গোপাল। প্রশ্নটা অনুগ্রহের নয়, কর্তব্যের। তোমার ছেলে, তোমার শিষ্য তাদের কর্তব্য পালন করছে তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?"

"আমার শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধটা আধ্যাত্মিক থাকুক এইটেই আমি বরাবর চেয়ে এসেছি, সেটাকে আর্থিক নোংরামির মধ্যে নামিয়ে আনতে চাই না। দরকার হলে হয়তো নামিয়ে আনতে হ'ত কিন্তু আমার সে দরকার নেই। আর ছেলের কথা বলছ? যে ছেলে আমার আদর্শের মুখে লাথি মেরে চোং প্যাণ্ট পরে বেলেল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে, যে নীচ বংশের মেয়েকে বিয়ে করে আমাদের বংশে কালি দিয়েছে তার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব একথা যদি তুমি ভেবে থাক তাহলে বলব এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তুমি আমাকে চেননি। তার মা তাকে 'নাই' দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে কারণ—"

সুরেশবাবু বাক্যটি সম্পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"কারণ তিনি মা, সর্বংসহা বসুমতীর মতো মা-ও সর্বংসহা। যে ছেলে মাকে রোজ মারে সেই ছেলেকেও মা ছেড়ে

যেতে পারে না। কিন্তু তোমার ছেলে অত খারাপ নয়। সে ভালো ছেলে। সে-ও আদর্শবাদী, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার আদর্শের সঙ্গে তোমার আদর্শের মিল নেই। তুমি যদি চেষ্টা করতে হয়তে মিল হ'ত। কিন্তু তুমি চেষ্টা করনি—"

"তার মানে?"

"তুমি নিজেকে নিয়েই সব সময় কাটিয়েছ। ওদের আদর্শ গঠন করবার দিকে মন দাওনি। ওরা পরিবেশ অনুসারে নিজেদের আদর্শ নিজেরাই গড়েছে—"

গোপালদেব কোন উত্তর দিলেন না। নির্বাক বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেশবাবু বলিয়া চলিলেন—"একথাটা ভুললে চলবে না যে আমাদের মধ্যে পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব দুটো জিনিসই পাশাপাশি স্ফুরিত হয়। এদের নিজের মনোমত করতে হ'লে অনেক খাটতে হয়, নিম্নস্তরের প্রাণীদের 'ট্রেন' করতে খুব বেশী খাটতে হয় না। একটা লতাকে অতি সহজে নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও দেওয়ালে বা যে কোনও বেড়ায় ওঠানো যায়, কিন্তু কুকুরকে 'ট্রেন' করতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে, কারণ তার মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বটা যাকে ইংরাজিতে বলে individuality আরও প্রবল, তা সহজে কারো কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না। মানুষকে 'ট্রেন' করা আরও কঠিন। কারণ তার মনুষ্যত্ব আরও স্বাধীন আরও পরিস্ফুট। তাকে নিজের আদর্শের অনুরূপ করতে হ'লে অহরহ তাকে নিজের কাছে রেখে সেই আদর্শের মন্ত্র তার কানের কাছে জপ করতে হবে, তাকে বাইরের প্রভাব থেকে বাঁচাতে হবে, নিজের চারিত্রিক আদর্শ তার কাছে অম্লান রাখতে হবে এবং সর্বোপরি তাকে ভালোবাসতে হবে। ভেবে দেখ, তুমি এর কতটুকু করেছ?"

গোপালদেব মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন—"যতটা করা সম্ভব ততটা করেছি বইকি। ভালো ভালো মাস্টার রেখেছি ওদের জন্য, ভালো ভালো স্কুলে কলেজে ভরতি করে দিয়েছি, বাপের পক্ষে ছেলেমেয়েদের যতটা ভালোবাসা স্বাভাবিক এবং সম্ভব ততটা ভালোও বেসেছি। তার ফল যে এই হবে—"

"ফল কিছু খারাপ হয়নি। প্রবাল ভালো ছেলে। তবে সে তোমার আদর্শের অনুরূপ হয়নি। তার কারণ সেজন্য তোমার একাগ্র চেষ্টা ছিল না। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা অনেকটা ছবি আঁকার মতো। তোমার ছবি তোমাকেই আঁকতে হবে, অপরের সাহায্য নিয়ে আঁকলে সে ছবি তোমার ছবি হবে না, তাদের ছবি হবে। তবে এটা জেনে রেখো প্রবাল খারাপ ছেলে নয়। তার পোষাক-পরিচ্ছদ হাব-ভাব মতামত হয়তো তোমার সঙ্গে মেলে না কিন্তু তবু বলব সে খারাপ ছেলে নয়। আর এটাও বলব তার সঙ্গে তোমার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী আছে, যদিও বাইরেটা অন্য রকম। তুমিও কি তোমার পূর্বপুরুষদের হুবহু নকলমাত্র? তাঁরা গোঁফ দাড়ি রাখতেন, তুমি ক্লীন শেভ্‌ড্‌। তারা বহুবিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন, তুমি একটি মাত্র বিবাহ করেই হাঁপিয়ে পড়েছ, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো তান্ত্রিক ছিলেন, মা কালীর সামনে নরবলি দেওয়া অন্যায় মনে করতেন না, তুমি নিশ্চয় সেটা সমর্থন কর না, তাঁদের পণপ্রথা, তাঁদের কৌলিক আচার-বিচার, তাঁদের দশবিধ সংস্কার—এর অধিকাংশই তুমি মান না। তাতে কিছু ক্ষতিও হয়নি, তুমি ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি আদর্শে নিজেকে গড়েছ। পূর্বপুরুষের নকল নও বলে মানুষ হিসাবে তুমি

খারাপ হওনি। তুমি চরিত্রবান, বিদ্বান, সত্যনিষ্ঠ, ভণ্ডামিকে ঘৃণা কর,—তোমার ছেলে প্রবালও তাই। সে যদি বাজে দুশ্চরিত্র ছেলে হ'ত তাহলে আলতাকে সে বিয়ে করত না, ফেলে পালাতো। সে-ও ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে বলে তোমার কাছে বা তার মায়ের কাছে ছদ্মবেশের মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায় নি। সে যা ভালো মনে করে তা প্রকাশ্যেই করেছে, প্রকাশ্যেই বলেছে। এ বিষয়ে তোমার সংগে তার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী। তোমার মতো সে-ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। সে—"

গোপালদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে না কি!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সুরেশ ডাক্তার।

"সে আমাকে কিছুই বলেনি।"

"তুমি বলেছিলে তার ভোজের খরচ সে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছে। লটারির টাকা পেয়েছে না কি!"

সুরেশবাবু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম তাকে। আলতাকে একখানা বেনারসী শাড়ী আর আড়াই হাজার টাকার চেক দিয়েছিলাম আমি—"

"তুমি একাজ করতে গেলে কেন?"

"দেখ ভাই, আমি ব্যাচিলার মানুষ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু। প্রবালকে আমিও ছেলের মতো ভালোবাসি। তাছাড়া তোমার উপর টেক্কা দেবার ইচ্ছা হল—ছেলেবেলায় তোমার ঘুড়ি কেটে দিতাম—সে প্রবৃত্তিটা আমার যায়নি এখনও।"

সুরেশবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার এই গণ্ডমূর্খ অসভ্য ছেলেটাকে তোমার ভালো লাগে? তোমার সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গেল আমার!"

"তোমার ছেলে গণ্ডমূর্খও নয়, অসভ্যও নয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ নয়। পরীক্ষায় পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর উৎসাহ নেই। তোমাদের সময় তোমরা জানতে যে পরীক্ষা পাশ করলেই তোমরা একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারবে, হ'তেও, কিন্তু এখন আর সে আশা নেই। এখন আমাদের দেশের অধিকাংশ ভালো ছেলেরা বেকারের দলে। কম্পিটিটিভ্ (competitive) পরীক্ষাতেও পক্ষপাতের বিষ ঢুকেছে। তাই পরীক্ষা পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর তেমন উৎসাহ নেই। উৎসাহ না থাকার আর একটা কারণ তোমাদের সময় স্কুল কলেজে যে রকম শিক্ষক ছিলেন আজকাল আর সে রকম নেই। আজকাল অধিকাংশ মাস্টার প্রফেসারই অর্থলোলুপ দোকানদার। হয়তো বাধ্য হয়েই তারা দোকানদার হয়েছে, কিন্তু হয়েছে বলে ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ করতে পারছে না তারা। আগে আমরা আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে আড়ালে আবডালে একটু আধটু ঠাট্টা মশকরা করতুম—যেমন হেরম্ব মৈত্র, মনমোহন ঘোষ, আমাদের মেডিকেল কলেজের গ্রীন আরমিটেজ, অ্যানাটমির শিক্ষক নগেন চাটুজ্যে, বসাক—কিন্তু এদের আমরা শ্রদ্ধাও করতুম খুব। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে পারে না। সকলেরই উপর তাদের ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা তাদের চরিত্রকে বিষময় করে তুলেছে। শুধু শিক্ষকদের উপর নয়, গভর্ণমেণ্টের উপর, নেতাদের উপর, লেখকদের

উপর, ব্যবসায়ীদের উপর—কারো উপরই এ যুগের ছাত্ররা সশ্রদ্ধ হ'তে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে সবাই চোর, সবাই মতলববাজ। এই অশ্রদ্ধারই নানাবিধ প্রকাশ দেখেছি ছাত্র-আন্দোলনে। ওরা খারাপ নয়, ওরা ডিস্‌অ্যাপয়েনটেড্ (disappointed)—দু'চারজন গুণ্ডাপ্রকৃতির খারাপ ছেলে যে ওদের মধ্যে নেই তা বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ভালো, তারা আরও ভালো হতে চায়—কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই বিদ্রোহ করছে। যা কিছু পুরাতন তাই ভেঙে ফেলবার জন্য তারা উদ্যত —যে মনোভাব হ'লে লোকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করে না, ওদের সেই রকম মনোভাব। লেখাপড়াতেও এ যুগের ছেলেরা যে সবই খারাপ তা নয়, ওদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলে আছে। তোমার প্রবালও খুব ভালো ছেলে। সে মূর্খ নয়। তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তার বিদ্যে 'রীডার্স ডাইজেস্ট' বা বিলিতী-বিজ্ঞাপন-গান্ধী-খবরের-কাগজ পড়া পল্লবগ্রাহিতা নয়। অনেক ভালো বই পড়েছে সে। শেক্স্‌পীয়র শেলী রবীন্দ্রনাথ তার কণ্ঠস্থ, তোমার সব লেখাও তন্ন তন্ন করে পড়েছে, সেদিন দেখলাম শেল-উল-মুতাক্ষরিণের অনুবাদ পড়ছে। খুব পড়ে—"

"তার সঙ্গে তোমার এত আলাপ হল কি করে?"

"সে আমার বন্ধু যে। আমার বাড়িতে রোজ 'ব্রীজ' খেলতে আসে। ব্রীজও খুব ভালো খেলে—"

হঠাৎ গোপালদেব বলিলেন—"একটা কথা তুমি জেনে রাখ সুরেশ, তোমার চক্ষে প্রবাল যতই ভালোই হোক আমার আত্মসম্মানকে সে ক্ষুণ্ণ করেছে। তার সঙ্গে আপোস আমি করতে পারব না। করবার দরকারও নেই। নীলা আর মগনলাল শুনলাম বিলেত চলে গেছে। যাক। যে যেখানে গিয়ে সুখে থাকে থাকুক, কিন্তু আমি কারও সঙ্গে আপোস করব না। আমার মহান আছে, আর ওই নার্স মেয়েটিও খুব ভালো, ওরা যদি টিকে থাকে, আমার চলে যাবে—মহান—"

মহাদেব দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"আমার চেক বুকটা দিয়ে যাও তো—"

মহাদেব চলিয়া গেলে সিভিল সার্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলারা বিলেত চলে গেছে এ খবর তোমাক কে দিলে ?"

"আমার পাবলিশার। যাবার আগে সে নাকি আমার এক সেট বই তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেছে। আমার নামে একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে। মগন আমারই ছাত্র। লিখেছে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যেই সে বিলেত যাচ্ছে। যে থীসিস সে লিখবে তাতে সে আমার লেখা থেকে কিছু কিছু 'কোটেশন' দিতে চায়, তাই আমার অনুমতি চেয়েছে।"

"তুমি অনুমতি দিয়েছ ?"

"আমি নিজে কোনও চিঠি লিখি নি। আমার হ'য়ে আমার পাবলিশারই অনুমতি দিয়েছেন। আপত্তি করিনি। ছাপা বই থেকে যে কেউ 'কোটেশন' করতে পারে—"

মহাদেব 'চেক বুক' লইয়া হাজির হইল।

"সুরেশ তোমাকে ওই নার্সটির এক বছরের মাইনে এই চেকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে দিয়ে দিও—"

"আহা ওর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি। পরে দিলেও চলবে—"

"যদি না নাও, তাহলে কাল থেকে ওর আসবার দরকার নেই—"

"বেশ দাও তাহলে। সত্যি কি জেদী তুমি! মেয়েটিকে তোমার ভালো লেগেছে তো?"

"খুব ভালো লেগেছে—"

গোপালদেব আড়াই হাজার টাকার একটা চেক লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"একশ' টাকা মাসে খুব কম হয়। আমি দু'শো টাকা দিতে চাই। আর একশ' টাকা বেশী দিলাম. ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দিও—"

"হঠাৎ এরকম বদান্যতা!"

গোপালদেব কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"মেয়েটি সত্যিই ভালো। এখানে বাথরুমে 'ফ্লাশ্' নেই, খারাপ হয়ে গেছে। আমি একটা আলাদা কমোড কিনে সেইটেই ব্যবহার করি, একটা মেথর এসে রোজ পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। দু'দিন মেথর আসেনি। মহানের কাছ থেকে শুনলাম ওই মেয়েটিই কমোড পরিষ্কার করেছে, অথচ আমাকে কিছুই জানতে দেয়নি। আমি ভেবেছিলাম মেথরই এসে বুঝি পরিষ্কার করে গেছে। তারপর ব্যাপারটা মহানের কাছে শুনলাম। ও আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু। এইটেই আমার খুব ভালো লেগেছে। ওকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিও। যদি একশ' টাকার বেশীও লাগে তা-ও দেব আমি—"

"চেকটা যখন আমার নামে লিখেছ তখন আমার ব্যাংকেই জমা করব। আমিই ওকে মাসে মাসে মাইনে দেব। শাড়িটা এখন দেব না।"

"কেন?"

"হঠাৎ একটা দামী শাড়ি দিলে সেটা একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে। কয়েক মাস পরেই তো পুজো, তখন দিলেই হবে। এখন হঠাৎ শাড়ি দিলে লোকে কানাঘুষো করবে ভাববে, ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা হয়েছে—"

"লোকের কানাঘুষোকে আমি গ্রাহ্য করি না। আর মেয়েটির সম্বন্ধে সত্যিই তো আমার দুর্বলতা হয়েছে। ওকে ভালো লেগেছে। ভাবছি ও যেন আমার নীলা—ছেলেবেলায় যে আমার 'পীসপট' পরিষ্কার করত—"

হঠাৎ থামিয়া গেলেন গোপালদেব।

তারপর বলিলেন—"কালই কিনে দিও ওকে শাড়িটা—"

"দেব, দেব, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"না, কালই দিও।"

ছেলেমানুষের মতো জিদ করিতে লাগিলেন গোপালদেব।

"বেশ তাই দেব। তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ আছ গোপাল। ভালো কথা, এখনও তেমনি ভিশন (vision) টিশন দেখ—"

"দেখি বই কি। ওই নিয়েই তো আছি। আগে ইতিহাসের কথা কাগজে লিখতাম, বইয়ে পড়তাম, এখন তা চোখের সামনে আকাশে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। ভারি ভালো লাগে। সত্যের সঙ্গে কল্পনা, কল্পনার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা ছবি দেখি।"

"কি ছবি দেখছ আজকাল—"

"কেন জানি না, গোপালদেবই যেন আজকাল আমার উপর ভর করেছেন। তাঁর

সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছু লেখা নেই, সেই জন্যে তাঁকে নিজের মতো করে গড়ছি। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে তিনি তাঁর চরিত্রবলে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে—ওল্ড্ ইটারনাল ভ্যাল্যুজকে (old eternal values) সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই সবাই তাঁকে নেতারূপে বরণ করেছিলেন। বিরাট আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে মহীরুহের মতো উঠেছিলেন তিনি নিজের চরিত্রবলে এবং সেই চরিত্রবলের উৎস ওল্ড ইটারনাল ভ্যাল্যুজ। বিশুদ্ধ এবং দৃঢ়চরিত্র মানুষই সূর্যের মতো সব অন্ধকার দূর করে। এ যুগে তার একটিমাত্র নমুনা স্বামী বিবেকানন্দ। খাঁটি সোনার মূল্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গোপালদেব খাঁটি সোনা ছিলেন। শশাঙ্কও সোনা ছিলেন, কিন্তু খুব খাঁটি নয়। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় রাজ্যশ্রীর সঙ্গে তাঁর একটা অবৈধ প্রণয় ছিল। সে প্রণয়কে তিনি সাবলিমেট (sublimate) করতে পারেননি। তিনি ওই নিয়ে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে, মৌখরিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই জন্যেই সম্ভবত অনেকে তাঁর শত্রু হয়েছিল। তিনি যদিও বাহুবলে আমরণ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোপালদেবের মতো কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেল সব। তার পরই অনৈক্য, আত্মকলহ, বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণ এবং এর ফলে মাৎস্যন্যায়। এরপরে গোপালদেবের আবির্ভাব। আমার মনে হয়, এ আবির্ভাবের মূলে আছে 'ওল্ড্ ভ্যাল্যুজ' (old values)—আর্য ঋষিরা একদিন যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ …গোপালদেবও তেমনি বলেছিলেন—"জাগো, ওঠ। পাঁকে ডুবে আর কতদিন থাকবে—পাঁক ধুয়ে ফেল, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াও আকাশের দিকে চেয়ে

সুরেশবাবু জানিতেন গোপালদেবের ইতিহাস ম্যানিয়া (mania) একবার মাথা চাগাড় দিলে সহজে থামিবে না। তিনি তাঁহার সামনে থাকিলে অনবরত বকবক করিবেন।

বলিলেন—"এখন চলি আমি। দু'একটা রোগী দেখতে হবে। বাকিটা পরে এসে একদিন শুনে যাব। তোমার এ বাড়িটা ভালো লাগছে তো?"

"খুব। কিন্তু তুমি রামগম্ভীরকে একটা খবর দিও। তাকে ভাড়া নিতে হবে। তা না নিলে আমি এখানে থাকব না।"

"সে তো এখানে থাকে না। আমি সুখলালকে বলে যাচ্ছি।"

"সুখলাল কে—"

"তার এ অঞ্চলে যত বাড়ি আছে তার ম্যানেজার। খান দশেক বাড়ি আছে ওর এ শহরে।"

"ও যে এত বড়লোক তা তো জানতাম না।"

"শুধু টাকার দিক দিয়ে বড়লোক নয়, মনের দিক দিয়েও রাম বড়লোক। সুখলাল তো ওর প্রশংসায় গদগদ। বলে, দেওতা। আচ্ছা, আসি এখন। বলব সুখলালকে।"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন গোপালদেব। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সূত্রধার ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন আবার। তাঁহার অঙ্গে রঙ্গন ফুলের

অলঙ্কার, কণ্ঠে পলাশের মালা। মাথায় গৈরিক শিরস্ত্রাণ, তাহাতে কৃষ্ণচূড়ার একটি পুষ্পিত পল্লব অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। পরিধানে গৈরিক বসন গৈরিক উত্তরীয়।

সূত্রধার বলিলেন—"সভ্য মানুষ শবদেহকে পুড়িয়ে ফেলে কিংবা পুঁতে ফেলে। কেউ কেউ তাদের শকুনিদের মুখে সমর্পণ করে দেয়। একটা সাধারণ মানুষের শবদেহ নিঃশেষ হ'তে সময় লাগে না। দেখতে দেখতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা বৃহৎ, যাঁরা কীর্তি রেখে যান, তাঁদের বৃহত্ত্ব, তাঁদের কীর্তি লোপ পেতে কিছু সময় লাগে। বৃহৎ জন্তুও যখন মরে—যেমন হাতী বা গণ্ডার—তাদের শেষকৃত্য মানুষে যদি না করে তাহলে তাদের শবদেহও পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ চট্ করে শেষ করতে পারে না। বৃহৎ কীর্তি শেষ হতে অনেক সময় শতাধিক বৎসর লাগে। ওই দেখুন শশাঙ্কের কীর্তির ধ্বংসস্তূপের উপর শকুনি গৃধিনীর দল এসেছেন। ওই যে মঙ্গোলিয়ান মুখ দেখেছেন উনি তিব্বতের রাজা আর তাঁর পিছু পিছু আসছেন গুপ্তবংশের সম্রাটরা, ওই দেখুন আগুন জ্বলছে—ও'রা টিকতে পারলেন না—জনমতের আগুনে আর ধোঁয়ায় সরে পড়ছেন সব। তারপর ধোঁয়া ধোঁয়া—ধোঁয়া—কেবল ধোঁয়া—"

গোপালদেব বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন আকাশপটে কৃষ্ণবর্ণ ধূম-কুণ্ডলী বিসর্পিত হইতেছে, তাহার মাঝে মাঝে ক্বচিৎ অগ্নিশিখা। দেখিতে দেখিতে এ ছবিও ক্রমশ অপসৃত হইল। শস্যশ্যামল একটি ছবি আকাশপটে মূর্ত হইল আবার। আকাশচুম্বী মন্দিরচূড়া, কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে।

সূত্রধার বলিলেন—"অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমৃদ্ধ পুণ্ড্রদেশের চিত্র ওই আকাশপটে আভাসিত হয়েছে। কিন্তু এ সমৃদ্ধিও বেশী দিন থাকে নি। ওই দেখুন শৈলবংশীয় একজন রাজা এসে পুণ্ড্রদেশ জয় করেছেন। হাহাকার উঠেছে চতুর্দিকে—"

হাহাকারে চীৎকারে গর্জনে আর্তনাদে বিলাপে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। একজন তন্বী শ্যামা সুন্দরীকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সূত্রধার বলিলেন "উনি পুণ্ড্রদেশের রাজলক্ষ্মী, বেশী দিন শৈলবংশীয় রাজার কবলে থাকেন নি। ওই দেখুন কনৌজের রাজা যশোবর্মা সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন—"

আবার রণাঙ্গনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল আকাশে। কিন্তু তাহাও মিলাইয়া গেল দেখিতে দেখিতে। ইহার একটু পরেই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল কে যেন। সূত্রধার বলিলেন, "কনৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাঁর 'গৌড়বহো' কাব্য পাঠ করেছেন। এ কাব্যে তিনি বঙ্গরাজ্যের রণ-হস্তিবাহিনীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ওই দেখুন যশোবর্মার রাজ্যও টিকল না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটল। ওই দেখুন ওই কাশ্মীরের রাজকবি কল্‌হন্ আসছেন। তাঁর হাতে 'রাজতরঙ্গিণী'।"

কল্‌হন্ রাজতরঙ্গিণী খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বহুকাল পূর্বে গোপালদেব রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছিলেন, তাহা বাংলা ভাষায় লেখা নয়, কিন্তু তাহার মনে হইল কল্‌হন্ যেন চলতি বাংলা ভাষাতেই বলিতেছেন—"ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে

কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুমূর্তি স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন যে কাশ্মীরে তাঁর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু কাশ্মীরেই তাঁকে হত্যা করেন ললিতাদিত্য। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলা থেকে গৌড়রাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর কাশ্মীরে যান তীর্থযাত্রার ছলে। তাঁরা উক্ত বিষ্ণুমূর্তিটি ভেঙে ফেলবার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁরা ভাঙতে আরম্ভ করেন আর একটি মূর্তি। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজার সৈন্যরা এসে তাঁদের বধ করে। ওই বাঙালী বীরগণের প্রভুভক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা আমি উচ্চকণ্ঠে করছি। উক্ত মন্দিরটি আজ শূন্য, কিন্তু গৌড়বীরগণের প্রশংসায় আজ পৃথিবী পূর্ণ। তাঁদের মহিমার জয় হোক।" কলহন্ বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু মনে হয় পুণ্ড্ররাজ্য বেশী দিন ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেনি কারণ, তাঁর পৌত্র জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বার হন আবার এবং সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী জজ্জ তাঁর রাজ্য দখল করে। তাঁর সৈন্যরাও তাঁকে ত্যাগ করে পালায়। জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে হাজির হয়ে দেখেন যে সেখানে জয়ন্ত নামে একজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করছেন। ছদ্মবেশী জয়াপীড় জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের শ্বশুরকে অর্থাৎ জয়ন্তকে তাঁদের অধীশ্বর করেন।' সূত্রধার বলিতে লাগিলেন, পট বারংবার পরিবর্তন হয়েছে। ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষও গৌড়ে রাজত্ব করেছেন। খড়্গবংশীয় রাজারাও—খড়্গোদ্যম, জাত-খড়্গ এবং দেব-খড়্গ। তারপর দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ (কারও মতে রাজরাজভট্ট) বাংলা দেশের রাজা ছিলেন। অনেক মনে করেন গোপালদেব এই রাজরাজভট্ট বংশ থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।"

গোপালদেবের অন্তরতম সত্তা কিন্তু অনুভব করিল মতান্তর থাকুক তবু ইহাই সত্য কথা। তিনিও বোধহয় ওই খড়্গবংশের সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ জীমূতবাহন এবং তাঁহার তরবারিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল। ওই তরবারির প্রতি, ওই খড়্গের প্রতি জীমূতবাহনের অসীম ভক্তি ছিল। প্রতি কালীপূজায় রাত্রে তিনি ওই খড়্গকে পূজা করিতেন। গোপালদেব তরবারিটি এখানেও আনিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই টাঙানো ছিল সেটা। সহসা সেই তরবারির ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বাহির হইয়া গোপালদেবকে বলিলেন—"দেখ গোপাল, অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরকে ছিন্নভিন্ন করে সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ। কিন্তু সে কাজ আমি করি শক্তিধর, নিঃস্বার্থপর আদর্শবাদী বীরের সাহায্যে। আমি মহাকালীর হস্তে বিরাজ করি, যিনি শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, বরপ্রদা, যিনি মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, যিনি মুহুর্মুহুঃ পাপীদের রক্ত পান করেন– তাঁরই হস্তের অমোঘ আয়ুধ আমি। পাপের অন্ধকারে যখন পুণ্যের আলো নিবে যায়, যখন পাপীদের পাপের কালিমাই অমাবস্যা-রূপ ধারণ করে, তখনই গৌরী কালীরূপে আবির্ভূতা হন। সরমস্নিগ্ধা বধূরূপিণী উমাই তখন হন উলঙ্গিনী করালবদনা—সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃখড়্গ-বামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজা কালী—আমারই সাহায্যে তিনি তখন বিনাশ করেন পাপকে, ধ্বংস করেন পাপীদের—"

জ্যোতির্ময় পুরুষ সহসা থামিয়া গেলেন। তাহার পর মুদিতনয়নে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"ঘনকৃষ্ণ অত্যাচার ধরে যবে অমাবস্যা রূপ
আর্তদের হাহাকার অন্ধকারে যবে পুঞ্জীভূত
নিরুপায় মনুষ্যত্ব ধূলিতলে যবে বিলুণ্ঠিত
তমিস্রায় অবলুপ্ত পর্বত-সাগর-নদী-কূপ,
নিদারুণ সে সংকটে তোমার ভীষণা মূর্তি ভায়,
অত্যাচারে অবিচারে গৌরী হন উলঙ্গিনী কালী,
খল খল অট্টহাস্যে কাঁপে ধরা, দেয় করতালি
ভূত প্রেত পিশাচেরা ভয়ংকর শ্মশান-সভায়।
সে সভার সভানেত্রী তুমি কালী অমাবস্যার
সে সভায় বজ্রকণ্ঠে তব তীক্ষ্ণ তুরীয় ভাষণ
শূন্য-গর্ভ বাক্য নহে—পাতকীর অন্তিম শাসন,
খড়্গ-মুখে সমাধান করে দাও সব সমস্যার।
লোল-জিহ্বা, এলোকেশী, নেত্রী তুমি সকল ক্রান্তির
উৎখাত করিছ নিত্য যুগে যুগে সকল ভ্রান্তির।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন, "আমি সেই খড়্গ। এইমাত্র সূত্রধারের জাদুমন্ত্রবলে আকাশপটে বাংলাদেশে অনেক রাজ্যের উত্থান পতন তুমি ছবির মতো দেখলে, কাহিনীর মতো শুনলে। তোমারই অন্তর্নিহিত জ্ঞান সূত্রধার-রূপে মূর্ত হ'য়ে পুরাতন কথা তোমাকে শুনিয়ে গেল। আর একটা কথাও তুমি জান, কিন্তু সেটা তবু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমাদের দেশে বাইরে থেকে এত শত্রু কেন এসেছে জান? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকরা সব যুগেই আছে। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে তাদের কি নাম ছিল তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি জানি তারা ছিল। তারাই খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছিল। আধুনিক ইতিহাসের উমিচাঁদ মীরজাফরকে তোমরা সবাই চেন। তারও পরে যে সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশের বিদ্রোহী তরুণ-তরুণীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, জেলে পুরে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেশের উন্মুখ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্পিষ্ট বিদলিত করে ইংরেজের দরবারে খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছিল—তাদের কথাও আশা করি মনে আছে তোমার। অতি আধুনিক যুগে আর একদল বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তাদেরও আশা করি তুমি চিনতে পেরেছ। এরা সব ইনটেলেকচুয়ালিজম্ (intellectualism) অথবা আর্টের মুখোশ পরে থাকে। বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যা কিছু খারাপ (অবশ্য তাদের মতে খারাপ) তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা বিদেশের দরবারে প্রদর্শনী খোলে আর ভারি বাহবা পায়, অনেকে পুরস্কারও পায়। মনে রেখো ওরা ভারতবর্ষের মহাশত্রু। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে ওদের যোগ নেই, এদেশের কিছুই ওদের চোখে ভালো নয়, ওরা বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের দল। ভয় হয় ওরাই হয়তো আবার শত্রু ডেকে আনবে এদেশে। কারণ আমাদের স্বাধীনতার পর এদেশেও আবার ম্যাৎসন্যায় প্রচলিত হয়েছে। যারা শক্তিমান তারাই আবার দুর্বলকে গ্রাস করেছে। দেশে একটা অসন্তোষের ভাব জেগেছে। এরই সুযোগ নেবে ঐ বিশ্বাসঘাতকরা। কিন্তু আমার আশা আছে এই নব-মাৎস্যন্যায়ের

যুগে আবার নতুন গোপালদেব আবির্ভূত হবেন। হয়তো তোমাকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। তখন আমাকে ভুলো না। অতীতে অনেক বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি, এখনও দরকার হ'লে করব।"

জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্ধান করিলেন।

টক্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গোপালদেব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সেই নার্সটি ব্লাড-প্রেসার মাপিবার যন্ত্রটি আনিয়াছেন। মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। সন্নত দৃষ্টি, ধীর, স্থির, কোনরূপ প্রগল্‌ভতা নাই। শাড়িটি ভদ্রভাবে পরা, গলায় একটি স্টেথোস্কোপ ঝুলিতেছে।

মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ব্লাড-প্রেসারটা নি ?"

"নাও।"

নিপুণতার সহিত ব্লাড-প্রেসার মাপিয়া নার্সটি চলিয়া যাইতেছিল।

গোপালদেব তাহাকে ডাকিলেন।

"কত প্রেসার দেখলে ?"

"নর্মালই আছে। ইউরিনও দেখেছি, শুগার অ্যালবুমেন নেই—"

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

"আজকাল আমার পাল্‌স্ (pulse) কাউন্ট (count) কর না ?"

"ডাক্তারবাবু বলেছেন, আর দরকার নেই।"

বলিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছিল।

"শোন—"

দাঁড়াইয়া পড়িল আবার।

"তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার নামটাই জেনে নেওয়া হয়নি। কি নাম তোমার ?"

"আমার নাম অরুণা মণ্ডল।"

"নার্সগিরি ছাড়া আর কি জানো তুমি ? কোনও 'হবি' (hobby) টবি আছে ?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল কয়েক সেকেণ্ড। তাহার পর বলিল, "আছে। আমি ওয়াটার কালারে (water colour) ছবি আঁকি। রাঁধবারও শখ আছে।"

"তুমি ছবি আঁক কখন ? সমস্ত দিন তো নার্সগিরি করে বেড়াতে হয়—"

খানিকক্ষণ আবার নতমস্তকে থাকিয়া অরুণা উত্তর দিল, "আমার স্কেচবুক আর রংয়ের বাক্স আমার সঙ্গেই থাকে আমার ব্যাগে। নার্সদের তো সব সময় কাজ করতে হয় না, যখনই একটু অবসর পাই আঁকি—"

"এখানেও তো তোমার বিশেষ কোন কাজ নেই। এখানেও আঁকলে পারো—"

"আঁকি তো—"

"তাই নাকি। নিয়ে এসো তো, দেখি তোমার ছবি কেমন—"

কোন উত্তর না দিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

একটু পরে মহান আসিয়া একটি খাতা দিয়া গেল। অরুণা আর আসিল না।

ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন গোপালদেব। প্রথম ছবিটা একটা পদ্মের। পঙ্ক ভেদ করিয়া অপরূপ একটি পদ্ম সগৌরবে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে।

"ঘনকৃষ্ণ অত্যাচার ধরে যবে অমাবস্যা রূপ
আর্তদের হাহাকার অন্ধকারে যবে পুঞ্জীভুত
নিরুপায় মনুষ্যত্ব ধূলিতলে যবে বিলুণ্ঠিত
তমিস্রায় অবলুপ্ত পর্বত-সাগর-নদী-কূপ,
নিদারুণ সে সংকটে তোমার ভীষণা মূর্তি ভায়,
অত্যাচারে অবিচারে গৌরী হন উলঙ্গিনী কালী,
খল খল অট্টহাস্যে কাঁপে ধরা, দেয় করতালি
ভুত প্রেত পিশাচেরা ভয়ংকর শ্মশান-সভায়।
সে সভার সভানেত্রী তুমি কালী অমাবস্যার
সে সভায় বজ্রকণ্ঠে তব তীক্ষ্ণ তুরীয় ভাষণ
শূন্য-গর্ভ বাক্য নহে—পাতকীর অন্তিম শাসন,
খড়্গ-মুখে সমাধান করে দাও সব সমস্যার।
লোল-জিহ্বা, এলোকেশী, নেত্রী তুমি সকল ক্লান্তির
উৎখাত করিছ নিত্য যুগে যুগে সকল ভ্রান্তির।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন, "আমি সেই খড়্গ। এইমাত্র সূত্রধারের জাদুমন্ত্রবলে আকাশপটে বাংলাদেশে অনেক রাজ্যের উত্থান পতন তুমি ছবির মতো দেখলে, কাহিনীর মতো শুনলে। তোমারই অন্তর্নিহিত জ্ঞান সূত্রধার-রূপে মূর্ত হ'য়ে পুরাতন কথা তোমাকে শুনিয়ে গেল। আর একটা কথাও তুমি জান, কিন্তু সেটা তবু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমাদের দেশে বাইরে থেকে এত শত্রু কেন এসেছে জান? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকরা সব যুগেই আছে। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে তাদের কি নাম ছিল তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি জানি তারা ছিল। তারাই খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছিল। আধুনিক ইতিহাসের উমিচাঁদ মীরজাফরকে তোমরা সবাই চেন। তারও পরে যে সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশের বিদ্রোহী তরুণ-তরুণীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, জেলে পুরে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেশের উন্মুখ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্পিষ্ট বিদলিত করে ইংরেজের দরবারে খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছিল—তাদের কথাও আশা করি মনে আছে তোমার। অতি আধুনিক যুগে আর একদল বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তাদেরও আশা করি তুমি চিনতে পেরেছ। এরা সব ইনটেলেকচুয়ালিজম্ (intellectualism) অথবা আর্টের মুখোশ পরে থাকে। বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যা কিছু খারাপ (অবশ্য তাদের মতে খারাপ) তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা বিদেশের দরবারে প্রদর্শনী খোলে আর ভারি বাহবা পায়, অনেকে পুরস্কারও পায়। মনে রেখো ওরা ভারতবর্ষের মহাশত্রু। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে ওদের যোগ নেই, এদেশের কিছুই ওদের চোখে ভালো নয়, ওরা বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের দল। ভয় হয় ওরাই হয়তো আবার শত্রু ডেকে আনবে এদেশে। কারণ আমাদের স্বাধীনতার পর এদেশেও আবার ম্যাৎসন্যায় প্রচলিত হয়েছে। যারা শক্তিমান তারাই আবার দুর্বলকে গ্রাস করেছে। দেশে একটা অসন্তোষের ভাব জেগেছে। এরই সুযোগ নেবে ঐ বিশ্বাসঘাতকরা। কিন্তু আমার আশা আছে এই নব-মাৎস্যন্যায়ের

যুগে আবার নতুন গোপালদেব আবির্ভূত হবেন। হয়তো তোমাকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। তখন আমাকে ভুলো না। অতীতে অনেক বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি, এখনও দরকার হ'লে করব।"

জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্ধান করিলেন।

টক্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গোপালদেব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সেই নার্সটি ব্লাড-প্রেসার মাপিবার যন্ত্রটি আনিয়াছেন। মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। সম্নত দৃষ্টি, ধীর, স্থির, কোনরূপ প্রগল্ভতা নাই। শাড়িটি ভদ্রভাবে পরা, গলায় একটি ষ্টেথোস্কোপ ঝুলিতেছে।

মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ব্লাড-প্রেসারটা নি ?"

"নাও।"

নিপুণতার সহিত ব্লাড-প্রেসার মাপিয়া নার্সটি চলিয়া যাইতেছিল।

গোপালদেব তাহাকে ডাকিলেন।

"কত প্রেসার দেখলে ?"

"নর্মালই আছে। ইউরিনও দেখেছি, শুগার অ্যালবুমেন নেই—"

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

"আজকাল আমার পাল্‌স্ (pulse) কাউণ্ট (count) কর না ?"

"ডাক্তারবাবু বলেছেন, আর দরকার নেই।"

বলিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছিল।

"শোন—"

দাঁড়াইয়া পড়িল আবার।

"তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার নামটাই জেনে নেওয়া হয়নি। কি নাম তোমার ?"

"আমার নাম অরুণা মণ্ডল।"

"নার্সগিরি ছাড়া আর কি জানো তুমি ? কোনও 'হবি' (hobby) টবি আছে ?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল কয়েক সেকেণ্ড। তাহার পর বলিল, "আছে। আমি ওয়াটার কালারে (water colour) ছবি আঁকি। রাঁধবারও শখ আছে।"

"তুমি ছবি আঁক কখন ? সমস্ত দিন তো নার্সগিরি করে বেড়াতে হয়—"

খানিকক্ষণ আবার নতমস্তকে থাকিয়া অরুণা উত্তর দিল, "আমার স্কেচবুক আর রংয়ের বাক্স আমার সঙ্গেই থাকে আমার ব্যাগে। নার্সদের তো সব সময় কাজ করতে হয় না, যখনই একটু অবসর পাই আঁকি—"

"এখানেও তো তোমার বিশেষ কোন কাজ নেই। এখানেও আঁকলে পারো—"

"আঁকি তো—"

"তাই নাকি। নিয়ে এসো তো, দেখি তোমার ছবি কেমন—"

কোন উত্তর না দিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

একটু পরে মহান আসিয়া একটি খাতা দিয়া গেল। অরুণা আর আসিল না।

ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন গোপালদেব। প্রথম ছবিটা একটা পদ্মের। পঙ্ক ভেদ করিয়া অপরূপ একটি পদ্ম সগৌরবে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে।

সহসা মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে তাঁহার মনেও এরূপ একটি কল্পনা পুষ্পিত হইয়াছিল। আকাশপটে প্রস্তরবেদীর উপর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সৌম্যমূর্তি ইতিহাস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না। পদ্ম নিজের রূপগুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। অনেকক্ষণ তিনি মুগ্ধনেত্রে ছবিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় ছবিটি একটি প্রকাণ্ড পাখীর—বিরাট ডানা মেলিয়া প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্মুখে কালো মেঘে অশনির সংকেত, ঝড়ের বেগে বড় বড় বনস্পতি মাথা নত করিয়াছে, পাখীটা কিন্তু নির্ভয়, সে ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহার আকাশ-বিহার সমাপ্ত করিবে। কোন বাধাকেই সে মানিবে না। এ ছবিটি দেখিয়াও মুগ্ধ হইলেন গোপালদেব। তৃতীয় ছবিটি একটি ক্যাক্‌টাসের। নিষ্করুণ মরুভূমির সমস্ত রুক্ষতা সত্ত্বেও গাছটি প্রাণের প্রাচুর্যে যেন দম্ভভরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শাখায় শাখায় অদ্ভুত ধরনের ফুলও ফুটিয়াছে। এ ছবিটিও ভালো লাগিল তাঁহার। চতুর্থ ছবিটি একটি অশ্বারোহীর। দক্ষিণ হস্তে তরবারি তুলিয়া বাম হস্তে অশ্বের বলগা ধরিয়া তেজোদৃপ্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। যেন মূর্ত বিদ্রোহের প্রতীক। অশ্বারোহীর মুখটা দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এ যে তাঁহারই মুখ।

"মহান, মহান—"

মহান আসিয়া উপস্থিত হইল।

"অরুণাকে ডাক তো—"

"অরুণা কে ?"

"ওই নার্সটি। ওর নাম অরুণা।"

"তিনি তো একটু আগে চলে গেলেন। উনি রোজ এগারোটার সময়ে চলে যান। এখন সওয়া এগারোটা বেজেছে। এইবার স্নানটান কর—"

মহান গোপালদেবের সহিত প্রভুর মতো ব্যবহার করে না, বন্ধুর মতো করে।

"হ্যাঁ, চল। আচ্ছা ও মেয়েটি সকাল থেকে বসে বসে কি করে বল তো ? খালি ছবি আঁকে ?"

"ছবি আঁকে মাঝে মাঝে। কিন্তু আরও অনেক কাজ করে। আমার অর্ধেক কাজ তো ওই করে। তোমার জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করে ওই সব তোমার আলমারিতে রাখে। তুমি জিগ্যেস করলে তাই বলে ফেললাম, কিন্তু উনি মানা করেছিলেন তোমাকে বলতে। ঠাকুরকে বলে তোমার জন্যে নতুন রকম তরকারিও করায়। এই যে আজকাল স্ট্যু খাচ্ছ, কাল যে মাছের দমপোক্ত খেয়েছিলে, পরশু চায়ের সঙ্গে মুগের ডালের যে ওমলেট খেলে—এ সবই ওই নার্সটি ঠাকুরকে বলে বলে করিয়েছেন। খুব ভালো মেয়েটি। আমি বলেছিলাম, আপনি নিজেই রাঁধুন না। উনি বললেন—আমার ছোঁয়া রান্না হয়তো উনি খাবেন না। কি জাত কে জানে। জাত যা-ই হোক, মেয়েটি ভালো। তুমি ওঠ আর দেরি কোরো না।"

ওঠা কিন্তু হইল না। দ্বারপ্রান্তে রামগম্ভীরের ম্যানেজার সুখলাল দর্শন দিল। তাহার বগলে একটি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স এবং হাতে একটি চিঠি। সে আগাইয়া আসিয়া গোপালদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মালিক অনেক আগেই আমাকে এ চিঠিটা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাক্সটা তৈরি করতে বড় দেরি করে ফেললে গুলাব মিস্ত্রি।

কাল সন্ধ্যের সময় ফিরে গেছে। একটু আগে সিভিল সার্জনও খবর পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি এখনই চলে এলাম।"

গোপালদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন।

শ্রীচরণেষু,

মাস্টার মশাই, আপনার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আমি চাই না। আপনার কাছে হাত পেতে ভাড়া নেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই একটি ছোট বাক্স আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি ভাড়া বাবদ যা দেওয়া সঙ্গত মনে করবেন তা ওই বাক্সতেই রেখে দেবেন। আমি পরে কোন সময়ে আপনার কাছে গিয়ে পরামর্শ করব টাকাটার কিভাবে সদ্গতি করা যায়। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রণত

রামগম্ভীর

সুখলাল সুদৃশ্য বাক্সটি গোপালদেবের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

গোপালদেব কোনও মন্তব্য করিলেন না। তাঁহার মন রামগম্ভীরের প্রস্তাব বা বাক্সকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিল না। তাঁহার মন অরুণাকেই লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। তাঁহার সহসা মনে হইল, মেয়েটি যে কয়টি ছবি আঁকিয়াছে সবই তো বিদ্রোহের ছবি। পাঁককে তুচ্ছ করিয়া পদ্ম স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ঝড়কে তুচ্ছ করিয়া পাখীটা নির্ভয়ে আকাশে পাড়ি জমাইয়াছে, মরুভূমিকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণবন্ত ক্যাক্টাস (cactus) স্বমর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সকলেরই ভঙ্গীতে বিদ্রোহের বাণী। ওই অশ্বারোহী তরবারি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কি বাণী বলিতে চায়? অরুণা তাহার মুখের মতো করিয়া অশ্বারোহীর মুখ আঁকিয়াছে কেন? আমার মধ্যে সে বিদ্রোহের কোন বাণী-মূর্তি দেখিয়াছে কি?

"আমি, গল্পের লেখক ফটিকচাঁদ সামন্ত, এখানে নিজের কথা কিছু বলিতে চাই। আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। আমার মনটা যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বন্ধুর নির্দেশে গোপালদেবের চিন্তাই অহরহ করিতেছি। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ আদর্শবাদী পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া আধুনিক যুগের আর এক অধ্যাপক গোপালদেবের মর্মে তাঁহাকে চিত্রিত করিতেছি। অধ্যাপক গোপালদেব অনমনীয় চরিত্রের লোক, তিনি আদর্শের জন্য সমাজ সংসার সব ত্যাগ করিয়াছেন। নীচবংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া নিজের পুত্রকে হত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে হয়তো আমি আরও কঠোর আরও উগ্ররূপে আঁকিতাম, কিন্তু মালিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছি। কারণ অধ্যাপক গোপালদেবের পুত্র প্রবালের যে সমস্যা, আমার সমস্যাও অনেকটা সেইরূপ। মালিনীরা অবাঙালী, যদিও কলিকাতা শহরে তিন পুরুষ বাস করিয়া তাহারা বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় করিয়া তাহার অর্থও উপার্জন করিয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাতিতে তাহারা 'ছত্রি'। আমি শূদ্রবংশীয়। আমার আশংকা হইতেছে, প্রবাল-আলতা নীলা-মঙ্গলের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে, গোপালদেবের যে অনমনীয় রক্ষণশীল চরিত্র আমার বর্ণনায় ফুটিয়াছে আমার নিজের জীবনেও তাহা সত্য হইয়া উঠিবে না কি? আমার বাবা নফর সামন্ত সুদূর পল্লীগ্রামে চাষবাস করেন। আমাকে

উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। আমি প্রতি মাসে তাঁহাকে টাকা পাঠাই। আমি মাতৃহীন। ভাই বোনও কেহ নাই। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসী আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বাবার দেখাশোনা করেন। বাবা তাঁহার এক বন্ধুর মেয়ের সহিত আমার বিবাহের কথাবার্তা প্রায় ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমি উত্তর দিয়াছি, আয় কিছু না বাড়িলে বিবাহ করিব না। ইহা কিন্তু আমার সত্য মনোভাব নয়। আমি মালিনীকে ভালোবাসিয়াছি। মালিনীও আমাকে প্রশ্রয় দিতেছে। মালিনীর দাদা রণধীরও এ মেলামেশায় তেমন অশোভন কিছু দেখে না। তাহারা বড়লোক, তাহারা বিলাসের খরস্রোতে ভাসিতেছে, নানারকম আমোদ-প্রমোদ, হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা তাহাদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ইহাও তাহাদের বিলাসেরই একটা অঙ্গ। রণধীর এখন আর আমার ছাত্র নহে, আমি তাহার বয়স্য হইয়া পড়িয়াছি, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে ইতিহাসের পাঠ লইয়া আমাকেই অনুগ্রহ করে যেন। তাহার শখ, নামের পিছনে এম-এ ডিগ্রী লাগাইবে। তাহার বয়স পঁচিশ বছর, এখন সে প্রাইভেটে আই-এ দিতেছে। একটি সুন্দরী ইহুদী তরুণী আসিয়া তাহাকে ইংরেজি পড়ায়। আমি জানি ওই ইহুদী মেয়েটি রণধীরের প্রণয়িনী। হয়তো ইহাকেই সে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিবে। তাহার ভগ্নী মালিনীর সম্বন্ধেও তাহার কোন কড়াক্কড়ি নাই। মালিনী স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে মিশিতেছে। আপিসের পর আমরা দুজনেই দুইটি ঘোড়া লইয়া গড়ের মাঠে যাই। মালিনীর আদর্শ সে বীরাঙ্গনা হইবে। ইতিহাস হইতে নানা বীরাঙ্গনার কাহিনী বাছিয়া তাহাকে পড়িতে দিই। আমার উপর সে প্রসন্ন, কিন্তু সে ঠিক আমার প্রেমে পড়িয়াছে কি না জানি না। আমি কিন্তু হাবুডুবু খাইতেছি। এজন্য গোপালদেবের চরিত্রে যতটা দৃঢ়তা আমি সঞ্চার করিব ভাবিয়াছিলাম ততটা দৃঢ়তার উপকরণ আমি নিজের কল্পনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে তাঁহাকেও আমার মতো প্রেমিকরূপে চিত্রিত করি। ইতিহাসে লেখা আছে, তাঁহার পত্নীর নাম ছিল দেদ্দা। দেদ্দাকে মালিনীরূপে আঁকিবার প্রলোভন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন দেদ্দা রাজবংশোদ্ভবা ছিলেন। সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলেই তো রাজা ছিল। শক্তিমান মাত্রেই নিজের গণ্ডীতে রাজমহিমায় বাস করিত। দেদ্দাকে সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শূদ্র—যে কোনও জাতের মেয়ে বলিয়া কল্পনা করিতে বাধা নাই। গোপালদেবকে সহজিয়া পন্থী করিতেও আমার লোভ হইতেছে—যে সহজ-পন্থীর শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে যদি বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর। তবে সে উপভোগ সাধারণ মানুষের মতো করিও না, করিলে পাপপুণ্যে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যদি কোন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই তখনই পঞ্চকাম উপভোগ ধর্ম হইবে, তাহাতে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন থাকিবে না। দারিকপাদ বলিয়াছেন, তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। আর যত রাজা আছেন তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধে ইহা পাঠ করিয়াছি। গোপালদেবকে বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমোন্মত্ত

সহজিয়া যোগীরূপে চিত্রিত করিবার বাসনা হইতেছে। হয়তো তিনি বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমিক ছিলেন বলিয়াই অতি সহজে সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই সকলেই তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের নেতারূপে অভিবাদন করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু গোপালদেবের যে কোনও বজ্রগুরু ছিল ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত অধ্যাপক গোপালদেবকে যতটা অনমনীয় রক্ষণশীল বিদ্বান ব্যক্তি-রূপে আঁকিয়াছি তাহাতে তাহার মনে এখন পঞ্চকামোপভোগজারিত সহজিয়া মত সঞ্চারিত করা কি শোভন হইবে? আর একটা মুশকিল হইয়াছে মালিনীর প্রণয় যদিও, আমাকে এইদিকে প্রবৃত্ত করিতেছে কিন্তু আমার মনের ভিতর যে অদৃশ্য লেখক বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতেছে সে ইহাতে রাজি নয়, কে যেন তাহার লেখনীকে দৃঢ়হস্তে অতীতের সেই সনাতনলোকে চালিত করিতেছে যে লোকে গোপালদেবেরা সনাতন সত্যে বিশ্বাসী—'ওলড্ ভ্যালুজ' (old values) প্রস্তর-ভিত্তির উপর যাঁহারা আজও মহিমান্বিত।

মুশকিলে পড়িয়াছি, কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না, মনটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে

কার্তিক তন্ময় হইয়া উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা পড়িতেছিল। এতদিন সে ওটা খুঁজিয়া পায় নাই। রাখাল তাঁহার ছেঁড়া থলিটা গুদামঘরে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিল। চপলাই তাহাকে কি একটা জরুরি কাজে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিল। মাস তিনেক পরে কাল সে ফিরিয়াছে। চপলা এখনও ফেরে নাই। সে কার্তিককে খেজুরি গ্রামের বাড়িতে বসাইয়া জরুরী দরকারে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, কবে আসিবে রাখালও জানে না। ইহাদের অবর্তমানে কিন্তু কার্তিকের কোনও অসুবিধা হয় নাই। সে রাজার হালে একটি চমৎকার বাড়ি অধিকার করিয়া আছে। চাকর ঠাকুর তাহার সেবা করিতেছে। তাছাড়া আছেন বোসবাবুরা। এই বোসবাবুরা তাহার প্রতিবেশী। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-পরিবার, ইহাদের সেবা করিবার ভার চপলা তাহার উপর দিয়াছে। বলিয়াছে ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করিয়া লইতে হইবে। দূরে হইতে টাকা ছুঁড়িয়া সাহায্য করিলে দরিদ্রের মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয় মাত্র, তাহাদের সেবা করা হয় না। খুবই ঠিক কথা, কিন্তু কার্তিক ইহাও অনুভব করিতেছিল ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করাও সহজ কাজ নয়। ইহাদের অসংখ্য অভাব সে গোপনে প্রকাশ্যে পূরণ করিয়া চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহাদের মন এখনও পায় নাই। বাড়ির কর্তা বোসবাবু—কৃষ্ণধন বসু—একটু খেঁকী প্রকৃতির লোক। স্থানীয় একটি মাড়োয়ারির তেলকলে কাজ করে। মাড়োয়ারি বণিক জগৎরাম শহর হইতে বহুদূরে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া এই তেলকলটি বসাইয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। কৃষ্ণধনবাবু সেইখানেই কেরানী। মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেতন পান। আগে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইতেন চপলাদির অনুরোধেই তিনি এখন বেতন বাড়াইয়া পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিয়াছেন। চপলাদিকে জগৎরাম খুব খাতির করেন, "দেবীজি" বলিয়া ডাকেন। খাতির করিবার হেতুটা কি তাহা কার্তিক এখনও বুঝিতে পারে নাই। প্রথম আসিয়া কৃষ্ণধনবাবুর সহিত কার্তিকের কয়েকদিন দেখাই হয় নাই। তিনি ভোরে বাহির হইয়া যান, ফেরেন রাত্রি দশটার পর। একদিন

রবিবার সকালে তাঁহার সহিত কৃষ্ণবাবুর দেখা হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমস্কার। আমি আপনার নতুন প্রতিবেশী। এতদিন দেখাই হয়নি আপনার সঙ্গে।"

কৃষ্ণধন প্রতি-নমস্কার করিলেন না। মুখ গোমড়া করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ মালতী, আরতির কাছে আপনার কথা শুনেছি। ওদের কিন্তু বেশী না-ই দেবেন না মশায়, গরীবের মেয়ে গরীবের মতো থাকাই উচিত। আপনার দেওয়া চকোলেট বিস্কুট রোজ রোজ খেলে মাথা বিগড়ে যাবে। গরীবের ঘরের পান্তাভাত মুড়ি তখন মুখে রুচবে না—"

কৃষ্ণধনবাবুর চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন উষ্মার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি চোখ উলটাইয়া নিজের ভুরু দুইটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল তাঁহার চোখের সাদা অংশটি পীত বর্ণের। ইহাও লক্ষ্য করিল তাঁহার কপিশবর্ণের গোঁফগুলি খোঁচা খোঁচা। বেঁটে লোক। সমস্ত দেহটাই যেন একটু মোচড়ানো। এই ব্যক্তিকে কি করিয়া সে প্রেমাস্পদ করিবে ভাবিয়া মনে মনে একটু বিপন্ন বোধ করিল।

হাসিয়া বলিল—"আমার নিজেরই চকোলেট বিস্কুট নেই তো ওদের দেব কোথা থেকে রোজ রোজ। সেদিন শখ করে কিনে এনেছিলাম নিধিরামের দোকান থেকে—"

"ওটা তো একটা চোর—।" 'চোর' কথাটা 'ছোর' মতো শুনাইল।

"কিছুদিন আগে একটা পেন্সিল কিনেছিলাম মশাই ওর দোকান থেকে। সাধারণ পেন্সিল। দাম নিলে ছ'আনা। দরকার ছিল কিনে ফেললাম। পরে শুনলাম কলকাতায় ও পেন্সিলের দাম দু'আনা। ছোর, ছোর ব্যাটা—"

ইহার উপর কার্তিক অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিল।

"আপনি জগৎরামবাবুর তেলকলে কাজ করেন বুঝি। কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম তাই ওই মেড়ো ব্যাটার পায়ে তেল দিতে হচ্ছে। কাজকর্ম মানে দিনগত পাপক্ষয়—হ্যাঁ—"

কোন পথে আলাপ করিলে যে কৃষ্ণধনবাবুর একটা প্রসন্ন ভদ্ররূপ দেখা যাইবে তাহা কার্তিক সেদিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মনে হইয়াছিল কখনও পারিবে না। কথা কহিলেই লোকটার একটা অসভ্য বর্বর পরশ্রীকাতর মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। তাহার মেয়ে দুইটির সহিত এবং ছেলেটির সহিত কিন্তু সহজেই কার্তিকের ভাব হইয়া গিয়াছিল। বড় মেয়েটির নাম মালতী—তেরো চোদ্দ বছর বয়স—সুশ্রী সদা-সপ্রতিভ হাস্যময়ী কিশোরী একটি। তাহার ছোট আরতি—দশ বছরের মেয়ে। কিন্তু মালতীর মতো চঞ্চলা নয়, সে একটু স্থির ধীর. গিন্নী-প্রকৃতির। প্রথম দিনই কার্তিককে উপদেশ দিয়াছিল—'তুমি অমন আদুড় গায়ে থেকো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে'। মুখে যদিও কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু কিছু দিলে টপ করিয়া সেটা লইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকে। কার্তিক ইহাদের জন্য ওই নিধিরামের দোকান হইতেই নানারকম ছেলে-ভুলানো জিনিসপত্র কেনে। জলছবি, পুঁতি, লজেন্স, চকোলেট, বিস্কুটও। লজেনস্ চকোলেট বিস্কুট কিন্তু তাহারা আর বাড়িতে লইয়া যায় না, পাছে বাবা রাগ করে। কার্তিকের বাসাতেই সেগুলি নিঃশেষ করিয়া তবে বাড়ি যায়।

একদিন মালতী মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনার কাছে আর চকোলেট আছে ?"

"এখন তো নেই। তোমার বাবা তোমাদের বেশী চকোলেট দিতে মানা করেছেন। জানতে পারলে আবার আমার উপর রাগ করবেন। যে কটা চকোলেট ছিল পরশু দিনই তো তোমরা খেয়ে গেলে।"

মালতী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তাহার পর চুপি চুপি বলিল—"মা খেতে চেয়েছে। আমাদের আপনি চকোলেট দিয়েছেন শুনে মা বললে, 'আহা আমার জন্যে যদি একটা আনতিস। ছেলেবেলায় আমিও চকোলেট খুব ভালোবাসতুম। বাবা প্রায়ই কিনে এনে দিতেন। বিয়ের পর তো আর ও জিনিস চোখেও দেখিনি।' মায়ের জন্যে দেবেন একটা ?"

কার্তিক চকোলেট কিনিয়া দিয়াছিল আবার। বলিয়া দিয়াছিল—"দেখো তোমার বাবা যেন না জানতে পারেন।"

কার্তিক একদিন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা পড়াশোনা কর না ?"

আরতি হাসিয়া বলিল—"না। বাবা বলেছে পড়াশোনা করে কি হবে, কিছুদিন পরে ঘানিতে জুড়ে দেব—"

"তার মানে—"

মালতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"মানে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে। আমরা গিয়ে সংসারের ঘানি টানব।"

"তোমার ভাই পদুকেও পড়াবেন না নাকি। ওর কত বয়স হ'ল।"

"সাত বছর। এইবার হাতে খড়ি হবে। তারপর পাঠশালায় যাবে।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্তিক শেষে একটা বুদ্ধি বাহির করিয়াছিল। মরীয়া হইয়া একদিন সে কৃষ্ণধনবাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া ফেলিল—"আপনি আমার উপর একটু দয়া করবেন ?"

"আমি সামান্য লোক, গরীব মানুষ, আমি কিভাবে আপনাকে দয়া করতে পারি তা তো আমার মাথায় আসছে না। কি করতে হবে বলুন।"

"আমার স্ত্রী এখনও এসে পৌঁছয় নি। কবে পৌঁছবেন তার স্থিরতাও নেই। কিন্তু আমি ওই মৈথিল ঠাকুরের রান্না আর হজম করতে পারছি না। রোজই বিকেলে বুক জ্বালা করে। আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনি যদি আমাকে পেইং গেস্ট (paying guest) হিসাবে রাখেন, মা লক্ষ্মীর হাতের বাঙালী রান্না খেয়ে আমি বর্তে যাই। আমার আর আমার কুকুর লর্ডের জন্য আমি চাল ডাল নুন তেল মাছ মাংস তরিতরকারি সব কিনে দেব, তাছাড়াও মাসে মাসে টাকাও দেব—"

"আমরা গরীব গৃহস্থ লোক। আমার বাড়ি তো হোটেল নয় মশাই।"

"হোটেল হ'লে কি আমি যেতে চাইতুম, হোটেল হলে কি আপনাকে বলতুম আমার উপর দয়া করুন। আপনার গৃহস্থলী মা-লক্ষ্মীর স্পর্শে পবিত্র, ভাগ্যে না থাকলে ওখানে আশ্রয় পাওয়া যায় না।"

"মা-লক্ষ্মী মা-লক্ষ্মী করছেন, কিন্তু আমার ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তা জানেন ? মোটেই লক্ষ্মী নয়, উড়ুনচণ্ডে। কাল ফট্ করে একটা লাল গামছা কিনে বসল পাঁচসিকে দিয়ে—কিছুই দরকার ছিল না—"

"আপনি বিজ্ঞ লোক আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি জানি দারিদ্র্যের মধ্যেও লক্ষ্মী রাজরাণীর মতো থাকেন। অনেক সময় দারিদ্র্যটাও তাঁর বিলাস, তাঁর বাইরের ছদ্মবেশ, অন্তরে তিনি সর্বদা ঐশ্বর্যময়ী। আমি বলছি আপনার দুঃখের দিন থাকবে না।—"

কৃষ্ণধন কার্তিকের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই শব্দ করিয়া উঠিলেন, "হুহ্যাঃ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বলিলেন—"কত টাকা দেবেন আপনি? একটা বাইরের লোকের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পোয়ানো তো সহজ কথা নয়—আমার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পারব না মশায়। কত টাকা দেবেন আপনি?"

"আপনি যা বলবেন তাই দেব—"

"আপনি চাল ডাল নুন তেল ঘি তরিতরকারি মাছ মাংস সব দেবেন বলছেন?"

"দেব—"

কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার কপিশবর্ণ খোঁচা গোঁফের উপর কয়েক সেকেণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"এর উপর আরও টাকা পঞ্চাশেক দিতে পারবেন?"

"তাই দেব।"

কার্তিক কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া আর একটা কাজ করিয়াছে। পদুর হাতে খড়ি দিয়া তাহার পড়ার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তাহাকে সে রোজ 'বর্ণপরিচয়' পড়ায়। পড়ার অপেক্ষা অবশ্য খেলার দিকেই পদুর (ভালো নাম প্রদ্যুম্ন) বেশী মন। কার্তিক তাহার খেলার সাথীও হইয়াছে। বাড়ির উঠানেই দুইজনে মার্বেল খেলে। ভোমরা (কৃষ্ণধনের স্ত্রী) রান্নাঘর হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক কার্তিকের আর ওঁর কচি ছেলে পদুর গুলি খেলা প্রত্যহ স-কৌতুকে উপভোগ করেন। কার্তিকের উপর তাঁহার যে স্নেহ-সঞ্চার হইয়াছে তাহা এই কারণে আরও অকপট যে, বহুকাল পূর্বে তাহার যে ভাইটি অকালে মারা যায় কার্তিকের সহিত তাহার নাকি অনেক সাদৃশ্য আছে। কার্তিক তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং প্রত্যহ তাহার রান্নার অজস্র প্রশংসার অত্যুক্তিতে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু কার্তিককে টাকার লোভেই নিজের পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর একটা সন্দেহ ছিলই। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়তো ওই মালতী মেয়েটার জন্যই লোকটা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিতেছে। কিন্তু কয়েক-দিন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সে ভুলটা ভাঙিয়া গেল। তবু কিন্তু তিনি কার্তিকের উপর ঠিক প্রসন্ন হইতে পারিতেছিলেন না। অন্তর-নিহিত একটা হিনম্মন্যতাই বোধহয় তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। উপকারী কার্তিকের খুঁত বাহির করিবার জন্য তাঁহার মন সর্বদা গোপনে গোপনে যেন উৎসুক হইয়া থাকিত। একদিন কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যে তিনি কার্তিকের প্রতি বিরূপতা আর বজায় রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার উপর তাঁহার ভক্তিই হইয়া গেল।

কৃষ্ণধনবাবুর বাড়ির লাগাও একটা ছোট ঘর ছিল। একদিন সকালে দারোগাবাবু দুইজন পুলিশ লইয়া সেখানে হাজির হইলেন এবং কৃষ্ণধনবাবুকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কার্তিক আগে বাহির হইয়া আসিল। কৃষ্ণধনবাবু কিছুক্ষণ পরে

আসিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই দারোগাবাবু বলিলেন—"মিলের ম্যানেজার থানায় একটা খবর পাঠিয়েছিলেন যে মিল থেকে তেলের টিন প্রায়ই নাকি গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কাল নাকি তাঁকে একজন খবর দিয়ে গেছে যে দুটো লোক দুটিন তেল নিয়ে আপনার এই বাড়িতে রেখে গেছে। ম্যানেজার সাহেবের ইচ্ছে আমরা আপনার বাড়িটা সার্চ করে দেখি—"

কার্তিক সহসা সপ্রতিভভাবে আগাইয়া গিয়া কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল—"আমি কাল আপনাকে যে দু'টিন তেল আনতে বলেছিলাম তা এনেছেন নাকি। দাম তো নিয়ে যান নি।"

"দাম আজ নেব। ছোট ঘরটাতে আছে টিন দুটো। আজ দাম দিয়ে ক্যাশ মেমো দিয়ে যাব আপনাকে।"

অকম্পিত কণ্ঠে মিথ্যাভাষণ করিয়া গেলেন কৃষ্ণধনবাবু। তাহার পর দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া দেঁতো হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ম্যানেজারবাবু ঠিকই খবর পেয়েছেন। কার্তিকবাবুর জন্যে দু'টিন তেল এনেছি আমি, ওই ছোট ঘরটাতে আছে—চলুন আপনাকে দেখিয়ে দি। ম্যানেজারবাবুর হুকুম নিতে পারিনি, কারণ তখন তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, অথচ তেলটা ওঁর আজই দরকার—খেলাতপুরে কার জন্যে যেন পাঠাতে হবে, না কার্তিকবাবু?"

কার্তিক মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ—"

দারোগা সাহেব টিন দুইটি দেখিয়া এবং কার্তিকের নিকট হইতে একটি স্টেটমেণ্ট (statement) লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পর কার্তিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে কৃষ্ণধনবাবুর দিকে চাইতেই কৃষ্ণধনবাবুর চোখ দুইটি আবার উলটাইয়া ভ্রূ-মুখী হইল।

বলিলেন, "চলুন, আপনার বাসায়। সব বলছি—"

কার্তিকের বাসায় এক লর্ড ছাড়া আর কেহ থাকে না। তাহারা আসিবামাত্র কৃষ্ণধনবাবুকে দেখিয়া লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া বকিয়া দিল। লর্ডের সঙ্গে মালতী, আরতি, পদু সকলেরই খুব ভাব, কৃষ্ণধনবাবুকে সে সহ্য করিতে পারে না। দেখিলেই ভর্ৎসনা করে।

"লর্ড তুমি ও ঘরে যাও—"

লর্ডের স্বভাবটি কিন্তু ঢ্যাটা, সে বাধ্য কুকুর নয়, সমানে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

"যাও—"

তবু লর্ড যাইতে চাহিল না।

কৃষ্ণধনবাবু মন্তব্য করিলেন, "কুকুর জানোয়ারটা অতি ব্যাদড়া—"

কার্তিক লর্ডের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে দুই থাপ্পড় মারিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। লর্ড আর চীৎকার করিল না, বুঝিল মনিব সত্যই চটিয়াছে।

কৃষ্ণধনবাবু বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিলেন, "যখন ধরা পড়ে গেছি তখন সব কথাই খুলে বলছি আপনাকে। ও দুটিন তেল আমি চুরিই করেছিলাম এবং সুবিধে পেলেই করি—"

"কেন করেন !"

প্রশ্নটা সোজাই করিয়া বসিল কার্তিক।

"করি, কারণ না করে উপায় নেই। মালতী আরতীর বিয়ে দিতে হবে। মালতীটার তো এখনই দিলে হয়। কম করে করলেও তিন চার হাজার টাকা খরচ করতে হবে। সমাজ আমাকে রেহাই দেবে না। মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই তার থেকে কত জমবে বলুন এ বাজারে। তবু আপনি এসেছেন বলে আমার মাইনের টাকাটা জমাতে পারছি—"

"তা বলে চুরি করবেন !"

"সবাই যেখানে চোর—মালিক, নফর, সমাজ, রাষ্ট্র, সবাই যেখানে চোর—সেখানে আমি সাধু থাকি কি করে বলুন। আমাদের দেশ আলকাতরার কারখানা, সবারই গায়ে আলকাতরা লাগবেই। আপনার ওই চপলাদি—না থাক ও'র কথা আর বলব না—উনি যাই হোন আমার অনেক উপকার করেছেন। শুধু আমার নয় এ অঞ্চলের অনেকেরই উনি উপকার করেছেন। আপনার গায়েও আলকাতরা লেগেছে নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় লেগেছে তা আমার চোখে পড়েনি এখনও। চপলাদির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি তা-ও আমি জানি না, শুধু জানি আপনার উপর তাঁর অসীম অনুগ্রহ, হয়তো কোনও কারণ আছে, কিন্তু আমি আলকাতরা-ঘাঁটা মানুষ, নানারকম সন্দেহ হয়—মাপ করবেন—অকপটে সবই বলে ফেললাম।"

এই বলিয়া তিনি সামনের এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁতগুলি বাহির করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

কার্তিক বলিল—"না না, মাপ করবার কিছু নেই। আপনার অকপট কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। চপলাদি আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। হঠাৎ মেলায় সেদিন দেখা হ'য়ে গেল—আমিও বেকার হ'য়ে ঘুরছিলাম—উনি আমাকে এখানে একটা কাজ দিলেন। উনি এ অঞ্চলে যে কো-অপারেটিভ করেছেন তারই ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন আমাকে। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনি মেয়েদের বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন। ওদের পড়ান। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিক—"

"পড়াবে কে। প্রাইভেট টিউটার রাখবার সামর্থ্য আমার নেই—তাছাড়া এ অঞ্চলে মেয়ে প্রাইভেট টিউটার নেইও—"

"আমি যদি সে ভার নিই—"

কৃষ্ণধন চুপ করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন—"মাপ করবেন, আমার যা মনে হচ্ছে তা বলছি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। এই অল্প পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাকে মাখামাখি করতে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। এটাও বলব, আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে দূষ্য কিছু দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু ভরসা পাচ্ছি না। আমরা গরীব মানুষ, কেলেংকারী কিছু হয়ে গেলে সেটা সামলাবার মতো টাকা নেই আমার। তাছাড়া আর একটা কথা, লেখাপড়া শেখালেই কি বিয়ের সমস্যাটা মিটবে ? আমার পিসতুতো বোনরা গাদা গাদা টাকা খরচ করে বি-এ, এম-এ পাশ করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের বিয়েও দিতে হয়েছে গাদা গাদা টাকা খরচ করে। একটা বোন তো কুলে কালী দিয়ে বোর্ডিং থেকেই পালিয়েছে—সেই জন্যে ওসব রাস্তায় চলবার সাহস নেই আমার।

ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি ওদের ঘানিতে জুড়ে দেব। তাই চুরি করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।"

কার্তিক সহসা হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল কৃষ্ণধনকে। হাঁ-হাঁ করিয়া পিছাইয়া গেলেন কৃষ্ণধন। কার্তিক বলিল, "আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষরাই সরল সত্য কথা এমন নির্ভয়ে বলতে পারেন। আপনি যা বললেন তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। আপনি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, না পারবারই কথা, কিন্তু তবু আমি বলব লেখাপড়া শেখানো ছাড়া মেয়েদের এ যুগে বাঁচবার কোনও উপায় নেই। আপনার মেয়ে লেখাপড়া শিখে বিয়ে করবে কেন, আপনার ছেলের স্থান অধিকার করবে, অন্য সব দেশে তো এই হচ্ছে, আমাদের দেশেই হবে না কেন—"

কৃষ্ণধন বলিলেন, "মেয়ের রোজগার খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। ও দেশে মেয়েরা যে কিভাবে রোজগার করে তার কিছু কিছু খবর জানা আছে আমার। তেলের দামটা কি এখনি দিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ। তেলটা বাড়িতেই থাক—"

"বাড়িতে অনেক তেল আছে। ওটা বিক্রি করে দেব। অনেক চোরাবাজারী হাঁ করে বসে আছে—। টাকাটা আপনাকেই দিয়ে যাব কি!"

"না, ওটা তো আপনারই প্রাপ্য—।"

কার্তিক বাক্স খুলিয়া দুইখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া কৃষ্ণধনকে দিল।

"তেলের দাম নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়ে যাবেন—"

কৃষ্ণধন নোট দুইটি হাতে লইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটা কথা জিগ্যেস করব। সদুত্তর দেবেন?"

"নিশ্চয়, কি কথা—"

"আপনি এত টাকা পান কোথা থেকে—"

"চপলাদি যে কো-অপারেটিভের দোকান সব করেছেন, আমি তার ম্যানেজার। মাসে দু'শ টাকা করে আমার বেতন। সে টাকা আমার খরচ হয় না। কারণ আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থাও চপলাদি করেছেন। কলকাতা যাবার আগে তিনি আমাকে পাঁচ মাসের মাইনে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে গিয়েছিলেন—"

"আপনার চপলাদিই বা এত টাকা পান কোথায়।"

"তাতো জানি না। আমাকে সব কথা খুলে বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু এসেই তাঁকে কলকাতা চলে যেতে হয়েছে। এখনও ফেরেন নি। ফিরলে সব জানতে পারব আশা করি।"

"উনি দশটা কো-অপারেটিভ দোকান করেছেন। কিন্তু নামেই সে সব কো-অপারেটিভ, কেউ কো-অপারেশন (co-operation) করে নি, শুনেছি সব ওঁরই টাকা। আপনার সেই বামন বন্ধুটি তো একটা দোকানের ইনচার্জ (in-charge)—সে তো ওখানে খুব জমিয়েছে মশাই। সার্কাসের খেলা দেখায়। একটা বাঁদরও পুষেছে। সে যদি আসে তাকে একটা কথা বলে দেবেন মশাই। পাশের গাঁটা মুসলমানদের। অনেকগুলো মুসলমান ছোঁড়া আসে ওর কাছে। আমার মতে ওদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করাটা ভালো নয়। আমার বাড়ির পাশেও একটা মুসলমান ছোঁড়া ঘুরঘুর করে—মাঝে মাঝে সিটি মারে—"

"কেন—"

"কেন আবার, এই মালতীর জন্য। আমি গরীব মানুষ, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় মশাই। ওই বামনটা কি আসে আপনার কাছে?"

"না, অনেকদিন আসে নি।"

"এলে একটু বলে দেবেন। মুসলমান ছোঁড়াগুলোকে যেন একটু সামলে রাখে—"

"না, না, সে সব ভয় কিছু নেই—"

কৃষ্ণধন চলিয়া গেলেন।

এই তিন মাসে বসু-পরিবারের সহিত তাহার বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বটে, কৃষ্ণধনবাবুর উগ্রতা ও বিরূপতাও অনেকটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও কার্তিক অনুভব করিতেছে এখনও সে উহাদের আপন করিতে পারে নাই, উহাদের ভালোও বাসিতে পারে নাই, যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তাহা টাকার জোরে হইয়াছে, প্রেমের জোরে হয় নাই। ব্যাপারটাকে সে এখনও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারে নাই, এখনও তাহা আর্থিক স্তরেই নিবন্ধ আছে। এজন্য তাহার লজ্জার আর কুণ্ঠার সীমা নাই। তাহার মনে হইতেছে, চপলাদির কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া সে কাজে নামিয়াছিল সে প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এক হিসাবে চপলাদির সহিত সে প্রতারণাই করিতেছে। আর একটা কারণেও তাহার মনে একটা উৎকণ্ঠা সদাজাগরূক হইয়া আছে—নিমু কবে আসিবে। চপলাদি বলিয়াছিল নিমুকে এখানে লইয়া আসিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু চপলাদি আসিয়াই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করিয়াই। কার্তিক অবশ্য নিমুকে পত্র লিখিয়াছে, নিমুর উত্তরও আসিয়াছে, কিন্তু নিমু না আসা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছে না। চপলাদি না ফিরিলে যে নিমুর এখানে আসা হইবে না তাহা কার্তিক বুঝিয়াছিল। রাখাল বলিল, "মা শীগগিরই ফিরবেন। চালের আর গমের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। মৃণালবাবু কাল রাত্রে এসেছেন, তিনি বললেন সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজই বোধহয় মা ফিরবেন।"

"মৃণালবাবু কে?"

"তিনি ঠিক কে তা তো আমার জানা নেই। তবে তিনি মায়ের ডান হাত। কোলকাতার লোক—"

"আমার ছোট থলিটা তুমি কোথায় রেখেছ বল তো? তাতে একটা বই ছিল।"

"থলিটা আপনার দরকার হবে তা ভাবিনি তো। ঘরে বন্ধ করে রেখেছি—"

রাখাল থলিটা বাহির করিয়া আনিল।

"কড়া আর খুন্তিটা দিয়ে দাও কাউকে। এই বইটা আমার কাছে থাক। ও থলিটাও দিয়ে দাও কাউকে—"

"যে আজ্ঞে—"

পাণ্ডুলিপিটা বাহির করিয়া কার্তিক তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল। অরুণার কথা পড়িতে পড়িতে সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, মালতীর কথা মনে পড়িল তাহার। যদিও সে কাহাকেও এখনও কিছু বলে নাই কিন্তু মালতী মেয়েটি ক্রমশ যেন

একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহার পক্ষে। মেয়েটা যখন তখন তাহার ঘরে আসিয়া ঘুরঘুর করে। ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চায় আর মুচকি মুচকি হাসে, মাঝে মাঝে গায়ের কাপড়চোপড় যেন ইচ্ছা করিয়া একটু অসম্বৃত্ত করিয়া ফেলে। সেদিন সে দুপুরে শুইয়াছিল, হঠাৎ পাশ ফিরিয়া দেখে মালতী তাহার বিছানায় বসিয়া আছে, আর মুচকি মুচকি হাসিতেছে। বকিয়া দিয়াছিল তাহাকে।

"তুমি বারবার আমার ঘরে আস কেন বল তো। বিছানায় বসেছ কেন? তুমি বড় হয়েছ, একটু সামলে চলতে শেখ, তা না হলে সবাই যে নিন্দে করবে। একা আমার ঘরে আর এসো না।"

লজ্জায় সেদিন মালতী মাথা হেঁট করিয়াছিল। তাহার আনত চোখের কম্পনে মুখের শঙ্কিত মৃদু হাসিতে রক্তিম গণ্ডে যাহা সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অনির্বচনীয়। মালতী চলিয়া যাইবার পর কার্তিকের মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে যদিও মালতী একা আর কখনও তাহার ঘরে আসে নাই, কিন্তু কার্তিক অনুভব করে সে সর্বদাই যেন লুকাইয়া তাহাকে দেখিতেছে। এদিক ওদিক চাহিলেই তাহার সহিত চোখাচোখি হইয়া যায় এবং তাহার চোখে যে ভাষা ফুটিয়া ওঠে তাহা অস্বস্তিকর। তাই সে ইদানীং বাড়িতেও বড় একটা থাকে না। যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান খোলা হইয়াছে তাহারই তদারক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। কো-অপারেটিভ দোকানগুলির প্রধান কাজ গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারদের খুব কম মূল্যে চাল গম বিক্রয় করা। কাজটা কিন্তু গোপনে করিতে হয়। চাল প্রতি দোকানে গোপনে সংগৃহীত হইয়া গোপনেই বিক্রীত হয়। কাহারা চাল যোগাড় করে, কে চালের দাম দেয় তাহা কার্তিক জানে না। মাঝে মাঝে এক একটা লোক (কখনও বা স্ত্রীলোক) প্রতি দোকানে চাল লুকাইয়া দিয়া যায়। কেন দিয়া যায়, কে তাহাদের চালের দাম দেয় তাহা কার্তিকের অজ্ঞাত। কার্তিককে শুধু দেখিতে হয় চালগুলি যেন প্রকৃত গরীব লোকেরা কম মূল্যে পায়। আশপাশের গ্রামগুলি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। তাহাদের মধ্যেও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার অনেকে আছে। তাহারাও চাল পায়। আনুটা যে গ্রামে থাকে সেটা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। আনুটা সেখানে খুব জমাইয়াছে। সার্কাসের আখড়া খুলিয়াছে একটা।

কার্তিক উপন্যাসটায় ক্রমশ তন্ময় হইয়া গেল। গোপালদেবের চরিত্রটি লেখক শেষ পর্যন্ত কিভাবে কোন রঙে আঁকিবেন তাহা জানিবার জন্য সে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল।

"সুরং নিশ্চয় রাগ করে বসে আছ।"

কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক।

"এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার একজন বন্ধু। অনেকে বলে আমার ডান হাত। কিন্তু আমি জানি মস্তবড় শত্রু আমার উনি একজন—"

"শত্রু?"—কার্তিক সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করিয়া পারিল না।

"হ্যাঁ পয়লা নম্বরের শত্রু। আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। তাই আমার হিতৈষীরা—হিতৈষীদের তো অভাব নেই এদেশে—নানা রঙের উপদেশ এবং

কুৎসা ছড়িয়ে বেড়ান আমাকে কেন্দ্র করে। নানা রঙের মধ্যে আলকাতরার রংও থাকে—"

কার্তিক নমস্কার করিল।

"এ'র নাম মৃণাল, আমি কিন্তু এ'কে পদ্মকলি বলে ডাকি। স্বরং-এর সঙ্গে পদ্মকলি আশা করি বেমানান হবে না।"

পদ্মকলির দিকে চাহিয়া কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করেন?"

পদ্মকলি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"আমি অকর্মণ্য। আমি সেই দলভুক্ত যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও গদিতে বসতে পায় না—অর্থাৎ আমি বেকার। ইনি আমার ভরণ-পোষণ করেন তাই আমি বে'চে আছি এখনও।"

চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দুটি টোল পড়িয়াছিল তাহার গালে।

"পদ্মকলি খুব বিনয়ী লোক। সে বেকার ঠিক, কিন্তু সেইটেই যে তার গৌরব তা ও মানতে চায় না। সর্বদেশে সর্বকালে মহৎ লেখকরা, মহৎ শিল্পীরা, মহৎ জননায়করা বেকার জীবন যাপন করেছেন। কিছুদিন আগে দেশনেতাদের পদস্পর্শে জেল তীর্থ হয়ে উঠেছিল। বহু অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাবান কবি শিল্পীরাও তেমনি বেকার-সম্প্রদায়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়েও বড় মর্যাদা দিয়েছেন। ওই একদা-বেকার মানুষরাই যে মানব সমাজের ভূষণস্বরূপ—ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। পদ্মকলি একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। ওর আঁকা ভিসুবিয়সের (Vesuvius) ছবি যদি দেখ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ও ভিসুবিয়স কখনও দেখে নি, তবু ওর ভিসুবিয়স অপূর্ব। আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে যেন কাঁদছে। আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি ওর মধ্যে। ও ভিসুবিয়সের ছবি এ'কেছে বটে কিন্তু ওর বুকের ভিতর যা তোলপাড় করছে তার ছবি ও এখনও আঁকতে পারেনি—সেটা একটা সাগর, অশ্রুর সাগর—"

"কি যে বলছ তুমি, থামো থামো। আমি চললুম—"

মৃণাল সত্য সত্যই বাহিরে চলিয়া গেল।

কার্তিক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। চপলার ভ্যানিটি ব্যাগে একতাড়া নোটের সহিত পদ্মকলির একটি ছবি দেখিয়াছিল।

"চপলাদি, আমাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে। কবে বলবে? এই কুয়াশার মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে ভালো লাগছে না। তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে একটা পদ্মকলির ছবি দেখেছিলাম—"

"সেটা ওরই আঁকা। ওইটে ওর সই। ও যখন চিঠি লেখে তখন নাম লেখে না তার তলায় একটা পদ্মকলি আঁকা থাকে শুধু। ও যখন কোন জিনিস পাঠায় তার সঙ্গে পদ্মকলির ছবি থাকলেই বুঝতে পারি কে পাঠিয়েছে। ওর আঁকা অনেক পদ্মকলি আছে আমার কাছে।"

"ওর সঙ্গে আলাপ হল কি করে? আত্মীয়তা আছে নাকি কোনও—"

"আলাপ হয়েছিল এক মেলায় তাঁবুর মধ্যে। যদি বলি উনি একদিন আমার খদ্দের হয়ে এসেছিলেন তাহলে—"

"তাহলে আমি অবিশ্বাস করব। আমি তোমাকে চিনেছি চপলাদি, হেঁয়ালি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না!"

চপলা স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল। তাহার পর চুপিচুপি বলিল, "উনি একজন টেরোরিস্ট। ওর দাদা আই-এন-এতে (I.N.A.) সৈনিক ছিল। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। মৃণালের মতে দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতার নামে কতগুলি বিশেষ ধরনের বাজে লোক টাকা আর প্রোপাগ্যান্ডার জোরে নবাবী করছে।"

"তুমি ওর নাগাল পেলে কি করে।"

"একদিন ট্রেনে যাচ্ছিলাম। কামরাটা প্যাসেঞ্জারে ভরতি ছিল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে সবাই নেবে গেল। দেখলাম এক কোণে একটি ছেলে বসে খাতায় কি লিখছে। একটু পরে উঠে এসে নমস্কার করে খাতার পাতাটা ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বললে— "অচেনা লোকের সামান্য উপহার গ্রহণ করুন!" দেখলাম আমারই একটা ছবি এঁকেছে। সেই থেকে আলাপ শুরু। হ্যাঁ, আর একটা কথা। একটা 'লরি' ভাড়া করেছি। নিমুকে আনবার জন্যে। তুমি নিমুকে আর তোমার শালা শ্রদ্ধেয় কালীকিংকরবাবুকে একটা চিঠি লিখে দাও যে তুমি এখানে আলাদা একটা বাসা করেছ, নিমু যেন এই লরিতে চলে আসে।"

"নিমু কি একলা আসতে সাহস করবে?"

"রাখাল যাচ্ছে। তুমি লিখে দাও রাখালকে তুমিই পাঠাচ্ছ, চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

কার্তিক গুম হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"দেখো চপলাদি, তোমার সব কথা খোলসা করে না জানা পর্যন্ত আমি ঠিক করতে পারছি না, তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়াব কি না।"

"তুমি বলেছিলে তুমি এ যুগের গোপালদেব হতে চাও। তার সুযোগ কি তুমি পাওনি?"

"পেয়েছি। এখানে আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে অনেকের সঙ্গে ভাব হয়েছে। বোসবাবুদের সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়েছে খানিকটা। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার মনে যে সংশয় আছে তা না ঘুচলে আমার পক্ষে এখানে থাকা শক্ত।"

"আজই সব বলব তোমায়। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেলো। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে মেম্বার করে দিয়েছি তোমাকে। তুমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে পছন্দসই বই নিয়ে আসতে পার। কলকাতা তো এখান থেকে বেশী দূরে নয়। একটা কার্ড এনেছি সেটা সই করে পাঠিয়ে দাও। চাঁদা আমি জমা করে দিয়েছি—"

এই সংবাদে খুব খুশী হইয়া উঠিল কার্তিক। তাহার মনের মেঘ সহসা কাটিয়া গেল যেন।

"খুব ভালো করেছ। তুমি তোমার চারিদিকে যে রহস্য ঘনিয়ে রেখেছ সেটা সরিয়ে ফেল চপলাদি। স্বচ্ছ পরিষ্কার আলোতে তোমাকে দেখতে পেলে আমার মনে আর কোন দ্বিধা থাকবে না। তোমার সব কথা আমি জানতে চাই।"

"সব কথা বলা যায় না সুরং। সব কথা বলা উচিতও নয়। তবে যতটা পারি ততটা

তোমাকে বলব। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেল। 'লরি'টা এখনি এসে পড়বে। রাখাল তৈরী হয়ে বসে আছে।—"

"হঠাৎ 'লরি' ভাড়া করতে গেলে কেন?"

"লরিটা ভাড়া করেছি আমাদের কাজের জন্য। হয়তো ওটা শেষ পর্যন্ত কিনেই নেব। 'লরি' পাঠালে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে সুবিধে হবে নির্মুর। তাছাড়া তাড়াতাড়ি হবে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার শ্বশুরবাড়ি এখান থেকে মোটে বিশ মাইল। তুমি চিঠি দুটো তাড়াতাড়ি লিখে ও ঘরে এসো।"

খেজুরি বিবি নিজের আত্মকথা বলিতেছিলেন। ঘরে কার্তিক ছাড়া আর কেহ ছিল না।

"তোমার শালা কালীকিংকর যেদিন আমার উপর বলাৎকার করেন সেদিন আমি তার মুখে লাথি মেরে চলে আসি। সেইদিনই আমার নূতন জীবন শুরু। আমার বাবা এ অঞ্চলের একজন বড় গৃহস্থ ছিলেন। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন, তারপর বাবাও যখন অনেকদিন পক্ষাঘাতে ভুগে মারা গেলেন তখন আমি একলা হয়ে পড়লুম। একা এখানে থাকতে ভয় করত। তাই ঠিক করলুম পড়া তো শেষ হয়েছে এবার কোথাও মাস্টারি জুটিয়ে নিই একটা। আর কিছু না হোক পাঁচ জন ভদ্রলোকের মধ্যে থাকতে পারব। আর দেশের মেয়েদের মানুষ করে তুলব। কালীকিংকরদের স্কুলে যখন চাকরি পেলাম তখন বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। কলকাতায় ফিরে গেলাম। কলকাতায় আমার কলেজের এক বান্ধবী ছিল তার নামটা আমি গোপন রাখব। সে চাকরি করত। আমি যখন কলকাতায় যেতাম তারই বাসায় উঠতাম। সে আমাকে বলল দেশের কাজে নেমে পড়। বললাম দেশের তো অনেক কাজ, কোন কাজে নামতে বলছিস তুই? সে বলল মধ্যবিত্ত পরিবারদের সেবা কর। তারা খেতে পাচ্ছে না। তাদের জন্যে খাবার যোগাড় কর। মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই বাংলাদেশে বড় বড় লোক জন্মেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এখনও জন্মাবে যদি ওদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিস। আমি নিজের সাধ্যমতো সেই চেষ্টা করি। তোর তো শুনেছি জমিজমা আছে, তুই যদি এ কাজে লাগিস অনেকের উপকার হয়। আমার সামর্থ্য কম। আমি তো বেশী কিছু করতে পারি না, কিন্তু আমি জানি অনেকের বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। প্রশ্ন করে জানলুম সে যা মাইনে পায় তার অর্ধেক সে দান করে। চোরাবাজার থেকে চাল কিনে দান করে অনেক পরিবারকে। তারপর সে নিজেই বললে—এ রকম দান করে কিন্তু তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই বেশী হচ্ছে আমার। ওরা গরীব, কিন্তু ওরা তো ভিখিরি নয়, এভাবে চাল নিয়ে অনেকে অপমানিত বোধ করে, অনেকে নিতে চায় না, অনেকে আবার লজ্জার মাথা খেয়ে পেটের দায়ে নেয়ও। আমার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করে। যদি কেউ এমন একটা দোকান করত যেখান থেকে ওরা নিজেদের সামর্থ্যমতো কম দামে চাল কিনে নিতে পারত তাহলে ভালো হ'ত খুব। আমি তাকে বললাম তুই এখানে একটা স্টেশনারি দোকান কর। আমি তোকে ক্যাপিটাল দিচ্ছি। সেই দোকানে আমার জমি থেকে কিছু কিছু চালও আমি পাঠাব মাঝে মাঝে। সেটা তুই লুকিয়ে বিক্রি করিস কম দামে। ওইটেই আমার প্রথম দোকান। আমার সেই বান্ধবী এখনও সেটা

চালাচ্ছে। কিন্তু ওই দোকান করতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। বান্ধবীকে বললাম—রোজগার না করলে তো আর চালাতে পারব না। কি করি বল তো ? সে বললে ভগবান তোকে এমন দুটো জিনিস দিয়েছেন যাতে মানুষ ভোলে—রূপ, আর গানের গলা। ইচ্ছে করলে ও দুটো ভাঙিয়ে তুই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারবি। তুই রাজি থাকিস তো বল্ আমি দালালি করি। সেই সময় অনেক জলসায় গান গেয়েছিলাম, অনেক শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছি। প্রণয়ীও জুটেছিল দু'চারজন। তার মধ্যে এখনও একজন টিকে আছে, তার নাম দিয়েছি আমি 'স্বর্ণদন্ত'। তাকে তুমিও দেখেছ একদিন। ও এখন আমার প্রধান একজন সহকারী। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ও কখনও দাঁতের উপর সোনার ওয়াড় লাগায় আবার কখনও খুলে ফেলে। ভারী কাজের লোক। ও না থাকলে আমি অনেক কিছুই করতে পারতাম না। আর একটা কথা—"

কার্তিক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—"আমি কিন্তু যে কথাটা শুনব বলে কান পেতে আছি তার—"

"কোন্ কথা শুনবে বলে তুমি কান পেতে আছ তা আমি জানি। তা আমি বলবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলা যাবে না—"

"আমি এই কথাটা সর্বাগ্রে জানতে চাই তুমি দেহ-বিক্রী করে টাকা রোজগার কর কি না।"

খেজুরি বিবির মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"দেহ বিক্রী করেছি বই কি। আমার হাসি, আমার রূপ, আমার গান, আমার অভিনয়-ক্ষমতা সবই তো আমার দেহকে কেন্দ্র করে। সেগুলো বিক্রী করিনি বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু—"

হঠাৎ নিজের শাড়ির ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটা টকটকে-লাল-খাপে-মোড়া ছোরা বাহির করিয়া সে বলিল—"কিন্তু এটাও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। এর থেকে তুমি যা বোঝবার বোঝ। আর একটা কথাও শোনো। ভালোবাসবার মতো লোক যে পাইনি তা নয়, কিন্তু পেয়েও তাকে পাইনি, সে বাহুবন্ধনে ধরা দেবার লোক নয়। আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তাকে আমি নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি নিজের স্বার্থের জন্য নয়, ওই ভাগ্যহত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারদের স্বার্থের জন্য। মনে মনে নিজেকে স্তোক দিচ্ছি একটা মহৎ কাজের জন্য নীতির পথ থেকে একটু আধটু সরে' গেলে ক্ষতি কি। সবাই তো চোর, আমি সাধু থাকব কি করে। এ স্তোকবাক্যে কিন্তু মন ভুলছে না। সে বারবার বলছে, ওর মোহের সুযোগ নিয়ে ওকে তুমি নষ্ট করছ। ওর মোহ যদি না থাকত তাহলে আমি—"

কার্তিক আবার বাধা দিল।

"মেলায় মেলায় তাঁবুতে তাঁবুতে বাইজী সেজে ঘোরবার অর্থটা কি সেইটে খুলে বল আগে—"

"ওখানে আমার খদ্দের আসে। তারা আমার গান শোনে। টাকাও দেয় অনেক—"

"মনে হচ্ছে তুমি বলেছিলে তোমার লাইসেন্স আছে। কিসের লাইসেন্স—"

"আগে ছিল। এখন গভর্ণমেণ্ট সুনীতিপরায়ণ হয়েছেন। পতিতাদের এখন কে৷

লাইসেন্স লাগে না। পতিতা-পল্লী উঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এখন আইনের চক্ষে পতিতা আর উর্থিতার কোন তফাত নেই। পতিতারা ভদ্রপল্লীতে গিয়ে বসবাস করছেন। এখন লাইসেন্স নেই, গোড়ার দিকে ছিল—"

"তোমার তাঁবুতে কি ধরনের খদ্দের আসে—"

মুচকি হাসিয়া খেজুরি বিবি বলিল—"রূপ এবং রূপিয়া দু'য়েরই খদ্দের আসে !"

"রূপিয়ার খদ্দের কি রকম ?"

"আমি তাদের অনেক টাকা দিই যে—"

"কি রকম ?"

"সেদিনই তো আমার ভ্যানিটি ব্যাগে দেখলে এক তাড়া হাজার টাকার নোট আছে। তুমি চমকে গিয়েছিলে, গুণে দেখলে আরও চমকে যেতে—ওতে এক লক্ষ টাকা ছিল !"

"বল কি ! অত টাকা তুমি পেলে কোথা ?"

"প্রায়ই পাই। তা না হলে এত বড় কাণ্ড চালাচ্ছি কি করে !"

"টাকা পাচ্ছ কোথায় !"

গম্ভীর হইয়া গেল খেজুরি বিবি। তারপর বলিল—"সেটা শোনবার আগে শপথ করতে হবে তোমাকে যে এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। এমন কি নিমুর কাছেও নয়—"

"না, তা করব কেন, তুমি যখন মানা করছ—"

"আর একটা কথাও তোমাকে বলা উচিত। এ কথা যদি প্রকাশ করে ফেল তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

"কে মারবে আমাকে—"

খেজুরি বিবির চোখের দৃষ্টি চকচক করিয়া উঠিল।

"আমি ! এ কথা গোপন রাখতে না পারলে যে লোকের প্রাণসংশয় হবে সে লোকের নিরাপত্তার ভার শপথ নিয়ে আমি গ্রহণ করেছি। যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাকে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। তাই আমি বলছি একথা তুমি শুনতে চেও না। অথচ তোমাকেও আমার চাই, তোমার মতো লোক আমি আর পাব না—"

"একথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না ?"

"না। আমার তাঁবুর সামনে যে লোকটা পাহারা দেয় সে হয়তো কিছু জানে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, কারণ সে বোবা। বোবা বলেই তাকে ও কাজে বাহাল করেছি।"

"রাখাল ?"

"রাখাল কিছু জানে না। ও হচ্ছে মস্ত পালোয়ান, গায়ে খুব জোর, ইচ্ছে করলে ও একটা মানুষকে শূন্যে তুলে মট্‌ করে ভেঙে ফেলতে পারে আখের মতো। ও আমার অন্ধ ভক্ত। হয়তো রূপে মুগ্ধ। ও আমার বডিগার্ড, আর্মড ফোর্সও (armed force) বলতে পার। ও কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। আমার কাছে থাকতে পেলেই ও খুশী, তোমার মতো ওর কোনও কৌতূহল নেই, আমার আদেশ পালন করেই ওর তৃপ্তি—"

"ওর বাড়ি কোথা—"

"উত্তর প্রদেশে। ডাকাতি করে জেল খেটেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে চলে আসে কলকাতায়। ওর আসল নাম ভীম তেওয়ারি। পদ্মকলির কাছে অনেকদিন ছিল। চমৎকার বাংলা শিখেছে। অবাঙালী বলে বোঝা যায় না। পদ্মকলিই ওর নাম দিয়েছে রাখাল। পদ্মকলির কাছ থেকেই ওকে পেয়েছি। ওর একটি মাত্র ছেলে, আর কেউ নেই। ছেলেটিকে মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে পদ্মকলি। রাখাল এখন আমাদের পরিবারের লোক। তোমাকেও আমাদের পরিবারভুক্ত হ'তে হবে। নিমু হবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি—"

"কিন্তু ওই লক্ষ টাকার কথাটা তো বললে না—"

"ওটা না-ই শুনলে। শোনার অনেক রিস্‌ক্ (risk) আছে। সেটা না-ই নিলে।"

"না আমাকে শুনতেই হবে। তোমার সমস্ত পরিচয় সম্পূর্ণভাবে না পেলে তোমার কাছে থাকা যাবে না। তুমি সব খুলে বল—"

"বেশ শোন তবে। আমি নোট জাল করি। ঠিক আমি করি না। আমার জন্যে পদ্মকলি করে। সে চিত্রকর, নোট ছাপাবার যন্ত্রও তার কাছে আছে—"

"নোট জাল কর!"

কার্তিক বিস্ফারিত নয়নে খেজুরি বিবির দিকে চাহিয়া রহিল।

"হ্যাঁ করি। যেখানে সমস্ত ব্যাপারই জাল-জুয়াচুরি পৈরবী, তদ্বির, খোশামোদ আর মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে জাল না করলে এতগুলি গরীব লোককে আমি খেতে দিতে পারব না।"

কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিল।

"আমি চললুম। জাল-জুয়াচুরির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। তুমি ওই জাল নোটের জালে নিজেই একদিন জড়িয়ে পড়বে। আমি দূরে চলে যেতে চাই, কারণ প্রথমত ওসব জিনিসকে আমি ঘৃণা করি আর দ্বিতীয়ত জেল খাটবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি চললুম। নিমুকে আনতে গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই—"

"কি অবুঝের মতো কথা বলছ সুরং। তোমাকে এখন আমি কিছুতেই যেতে দেব না। নিমু আসুক, তারপর যা হয় ঠিক কোরো। বস না। পদ্মকলির সঙ্গে আলাপ কর একটু—"

কার্তিক কিন্তু বসিল না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা বগলদাবা করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল সে। খেজুরিবিবি তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছোট খুকীর মতো তাহার নীচের ঠোঁটটি বারবার কাঁপিতে লাগিল। এ কান্না সে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে। তাহার বিবেক জানে কাজটি অন্যায়, তাহার অন্তরতম সত্তা অনুভব করে তাহার প্রেমাস্পদকে দিয়া সে অতি ঘৃণ্য কাজ করাইতেছে। এ সবই সে বারবার অনুভব করিয়াছে। কার্তিকের মুখেও সে যখন শুনিল—'আমি ওসব জিনিসকে ঘৃণা করি' তখন তাহার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মর্মটা কে যেন মাড়াইয়া দিল। কিন্তু চপলা আর একটা জিনিসও ভুলিতে পারে না। তাহার মায়ের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখটা। সেই কোটরগত চক্ষু, সেই ঈষৎ-ব্যাদত আনন, কালো রঙের সেই দাঁতগুলা। পঞ্জরের মধ্যান্তরের

সময় তাহার মা কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল। অনাহারে মারা গিয়াছিলেন তিনি। এক ছটাক চালও তাঁহার নিকট পেঁছাইয়া দিতে পারা যায় নাই। সমস্ত চাল তখন লীগ গভর্ণমেণ্টের হাতে। তাহাদের জমির সমস্ত ধান ইস্পাহানিরা কিনিয়া লইয়াছিল। চপলার বয়স তখন আট নয় বৎসর। সে তখন তাহার দিদিমার কাছে ছিল কুমিল্লায়। খবর পাইয়া যখন আসিল তখন মা মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় রাস্তাঘাটে মড়া পড়িয়া আছে। বাবাও তখন খেজুরিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনিও মাকে দেখিতে পান নাই তাঁহাকে কোন সাহায্য করিবারও সামর্থ্য ছিল না তাঁহার। চপলা অনুভব করিতেছে—ওই রকম আর একটা মন্বন্তর আসন্ন। তাই সে—

লরিটা আসিয়া পড়িল।

চপলা নিজেই চিঠি লিখিয়া দিল একটা।

ভাই নিমু,

তোমার জন্যে লরি পাঠালাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে এস তুমি। স্বরং বাইরে গেছে, তাই আমিই চিঠি লিখলাম। আমরা ভালো আছি। আশীর্বাদ নাও। ইতি

চপলাদি

চিঠি লইয়া 'লরি' চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল খেজুরি বিবি। ক্রমশ তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল, মুখের ভাব প্রশান্ত হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে আবার সেই প্রশ্নটাই তাহার মনে জাগিল যাহা বহুবার জাগিয়াছে। মা বাবাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন কেন? তাহাকেই বা সুদূর কুমিল্লায় মামার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়ার হেতু কি? হেতুটা ঠিক কি তাহা চপলা জানে না। শুধু জানে একদিন সকালে উঠিয়া মা বলিলেন, চল আজ আমরা কলকাতা যাব। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন এবং সেখানে বাপের বাড়ির একজন লোককে পাইয়া তাহার সহিতই চপলাকে কুমিল্লা পাঠাইয়া দেন। এসব করিবার কি কারণ ছিল? চপলা ঠিক জানে না। কিন্তু নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল একটা। একটা জনশ্রুতি অবশ্য সে শুনিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবুর মায়ের সহিত তাঁহার বাবার নাকি একটা অবৈধ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা এখানে জমিদারি স্টেটে সামান্য বেতনের মুহুরি ছিলেন। মা যেদিন সে কথা টের পান সেইদিনই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বাড়ির পুরাতন দাসী মুনুর মায়ের কাছে এ কথা শুনিয়াছিল সে। শুনিয়া ধমকাইয়া দিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু মানুষের মন এমন বিচিত্র যে মুনুর মাকে ধমকাইয়া দিলেও কথাটাকে সে অবিশ্বাস করে নাই। নিজের সে এখন বুঝিয়াছে পুরুষ-জাতের স্বভাবটা কি। যুবতী নারীর সংস্পর্শে প্রায়ই তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। অনেকটা পতঙ্গের মতো, আলো দেখিলেই ছুটিয়া আসে। এই সাধারণত সব পুরুষেরই স্বভাব, কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। এ জন্য বাবার উপর তাহার রাগ নাই। বরং এই জন্যই সে কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত নিজের কেমন যেন একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন হয়তো ইহাদের এতো অভাব থাকিত না। কৃষ্ণধনবাবুর মাকে সে ছেলেবেলায় দেখিয়াছিল। তিনি কালো ছিলেন, কিন্তু কি অপরূপ শ্রী যে ছিল তাঁহার! চপলাকে তিনি খুব আদর করিতেন। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা রূপবান ছিলেন না…হঠাৎ তাহার

মায়ের মুখটা আবার তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। কঠিন হইয়া উঠিল তাহার মুখের ভাব। সে মনে মনে বলিল—না, আমি ঠিকই করছি। অনাহারে কাউকে আমি মরতে দেব না। এর জন্যে যদি আমাকে নরকেও নামতে হয় নামব।

"এখন কি করছ আলো—কার্তিকবাবু কোথা"—পদ্মকলি আসিয়া প্রবেশ করিল। চপলা মৃণাল নামটাকে বদলাইয়া পদ্মকলি করিয়াছিল, মৃণালও তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিল—আলো।

"বেরিয়ে গেল। আমি ওকে সব কথা বলেছি, পদ্মকলি। তুমি রাগ করবে না তো? ও এমন না-ছোড়, বলতেই হল—"

"একটা কথা তুমি মনে রেখো। পদ্ম কখনও আলোর উপর রাগ করে না। তার স্পর্শে সে সর্বদাই আনন্দিত। তুমি আমার আনন্দের উৎস। তুমি যা খুশী কর আমার আপত্তি নেই, আমার ভয় নেই, ভাবনাও নেই—"

চপলা স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল—"কিন্তু উৎসে অবগাহন করবার প্রবৃত্তি তো হয় না তোমার কোনও দিন—"

"না। উৎসকে আমি অপবিত্র করতে চাই না। আমি জানি প্লেটোনিক ভালোবাসা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ওই অসম্পূর্ণতারই আনন্দে আমি ভরপুর। ওর সীমাবদ্ধতার সীমায় দাঁড়িয়ে আমি অসীমকে দেখতে পাই। তা যখন পাব না তখনই সীমা লঙ্ঘন করবার কথা ভাবব। চল কার্তিকবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক—"

"সে বেরিয়েছে। দেখি কোথায় গেল—"

বাহির হইয়া তাহারা কার্তিককে দেখিতে পাইল না।

॥ ৪ ॥

বাহির হইয়াই কার্তিক একটা খালি রিকশা পাইয়া গেল। তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

"কোথা যাবেন বাবু—"

"চল না কিছু দূর এগিয়ে। কোনও ফাঁকা জায়গায় নেমে পড়ব।"

"কোন ফাঁকা জায়গায়—"

"আরে তুমি চল না, আমি ঠিক জায়গায় নেমে পড়ব।"

কার্তিককে এ অঞ্চলে সকলেই চিনিত, সকলেই জানিত যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান এ অঞ্চলে গরীবদের সহায় কার্তিকই তাহার সর্বেসর্বা। রিকশাওয়ালা আর আপত্তি করিল না। মাইল দুই দূরে একটা ফাঁকা মাঠে সে নামিয়া পড়িল। মাঠের ওপারে বৃক্ষবেষ্টিত একটা স্থান ছিল। রিকশাওলার ভাড়া মিটাইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল কার্তিক। গিয়া দেখিল মস্তবড় একটা পুষ্করিণী। একটা গাছের নীচে বসিয়া সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে মনোনিবেশ করিল। চপলার নিদারুণ স্বীকারোক্তি তাহার মনে যে ঝড় তুলিয়াছিল, যে অনিশ্চিত জীবনের ছবি আবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহার অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আকস্মিকতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এই নির্জন

স্থানটিতে এবং চেষ্টা করিতেছিল এই অখ্যাত লেখকের অদ্ভুত লেখাটার সাহায্যে নিজেকে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে।

"সূত্রধার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনে হইতেছিল তিনি যেন সর্ব-শুক্লা স্বরস্বতীর পুরুষ-সংস্করণ। হস্তে শ্বেতপদ্ম, পরিধানে শ্বেত বসন, শ্বেত উত্তরীয়, কণ্ঠে শ্বেতপুষ্পের মালা, ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ও মুখের হাসিতেও যেন শুভ্রতা ক্ষরিত হইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন, "মানুষ যে জঘন্যতম পশু এর অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আছে। সমস্ত পশুরাই মাৎস্যন্যায়ের অনুবর্তী। পশুশক্তিই তাদের কাছে ন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি। মানুষ-পশুরাও অন্য ন্যায় জানে না। এই পশু-দানবদের দলন করতে হলে তাই পশু-শক্তিই প্রয়োগ করতে হয়। যেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে অহিংসার বাণী যত জোরেই এবং যত রকমেই বলা হোক আগুন নিববে না। আগুনে জল ঢালতে হবে, আগুন নেবাবার জন্য দমকল ডাকতে হবে। গীতার অর্জুন থেকে আরম্ভ করে আপনাদের যুগের নেতাজী পর্যন্ত ওই এক কথা বলে গেছেন। গোপালদেবও যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করে তার নেতারূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারও মূলে ছিল তাঁর বাহুবল। এর কোনও ঐতিহাসিক তথ্যই তো পাওয়া যায় না। কিন্তু ফল থেকে কারণ অনুমান অসঙ্গত নয়। তিনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশে অত বড় একটা অভিনব রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন শুধু অহিংসার বচন আউড়ে বা প্রেমের বাণী বিতরণ করে—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি সৈনিক ছিলেন, হয়তো নানা সদ্‌গুণের জন্য তিনি জনপ্রিয়ও ছিলেন—কিন্তু শুধু সদ্‌গুণের জন্যই তিনি একটা রাজ্যের নেতা হয়েছিলেন, কোনরকম বলপ্রয়োগ বা কৌশলপ্রয়োগ করেন নি একথা মন মানতে চায় না। আমি বলব মাৎস্যন্যায়ের বিশৃঙ্খলা তিনি বীর্যবলেই সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তারপরও আমাদের দেশে অনেকবার মাৎস্যন্যায়ের বীভৎসতা দেখা গেছে, যদিও ইতিহাসে সে কথা মাৎস্যন্যায়ের নামে চিহ্নিত হয়ে নেই। আজকালকার কথাই ভাবুন না। আজকাল ন্যায়ের মুখোশ পরে মাৎস্যন্যায়ই কি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে নেই ? ওই যে ইতিহাস আসছেন, তাঁর মুখেই ইতিহাসের কথা শুনুন।......"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব সবিস্ময়ে দেখিলেন আকাশপটে এক বিরাট বাদক স্কন্ধে এক বিরাট দামামা ঝুলাইয়া সেটি বাজাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মাথায় স্বরঞ্জিত শিরস্ত্রাণ, পরিধানের বস্ত্রটিও বর্ণ-শোভায় মনোহর। গায়ে কিন্তু কোন জামা নাই। সর্বাঙ্গ সুগঠিত পেশীতে সমৃদ্ধ। সেই দুন্দুভি-নিনাদে গোপালদেব যেন শুনিতে লাগিলেন সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক। নানাভাবে নানা ছন্দে দুন্দুভি কেবল বলিতে লাগিল সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক। সর্বশেষে বাদ্য থামাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ইতিহাস আসিতেছেন।

ঘোষক অন্তর্ধান করিলেন। আকাশপটে পুনরায় সেই শিলাবেদি মূর্ত হইল। তাহার উপর সৌম্যকান্তি ইতিহাস আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া ভূর্জপত্র হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"আমাদের দেশে প্রত্যেক রাজত্বের অবসান সময়েই মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়াছিল। পাল রাজগণ যখন দুর্বল হইয়া পড়িলেন তখন বর্মরাজবংশের উদ্ভব হইল। এই বংশের বজ্রবর্মা একাধারে বীর কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্মার অনেক কীর্তিকথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইঁহারাও বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভোজবর্মাই এ বংশের শেষ রাজা। তাহার পর আসিলেন সেন রাজগণ কর্ণাটক হইতে। কোনও রাজ্যের প্রজাগণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহা হইলে বহিরাগত কোন শত্রু আসিয়া সহসা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। পাল রাজাগণ সকলেই প্রায় বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের বাড়াবাড়ি বঙ্গদেশ বোধহয় আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বর্ম বংশীয় রাজারা বৈদিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই জন্যই সম্ভবত তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্মরাজবংশ বেশীদিন নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কর্ণাটদেশীয় বিজয় সেন এই বর্মরাজবংশকে উৎখাত করেন। সেন রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন না। পাল রাজত্বের শেষ যুগে বাংলায় রাজনৈতিক একতা আর ছিল না, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে মত্ত হইয়াছিলেন। বিজয় সেন দ্বিতীয় গোপালদেবের মতো আবির্ভূত হইয়া দেশে দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বত্র সুখ ও শান্তি আনয়ন করিলেন। বিজয় সেনের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসে গৌরবের যুগ। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন দেশকে গৌরবের শিখরে লইয়া গিয়াছিলেন। শস্ত্রচালনা ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজর্ষিতুল্য বল্লাল সেন বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যরক্ষারূপ দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের পুস্তক হইতে ঐটুকু উদ্ধৃত করিলাম। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থ দুইখানি বল্লাল সেনের অমর কীর্তি। লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময়ই তুরস্ক সেনারা গৌড় জয় করিল। বাংলার মাটিতে মুসলমান মহম্মদ বখতিয়ার. খিলজী পদার্পণ করিলেন। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেন খুব খারাপ রাজা ছিলেন না, তবু তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইল খুব সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করিয়াছিলেন মীনহাজুদ্দিন লিখিত এই অদ্ভুত গাল-গল্প নিতান্তই অবিশ্বাস্য। ইহার কোন দলিল বা বিবরণ নাই। লোকমুখে শোনা কথা। আধুনিক কালে ইংরেজরাও আমাদের নামে এরূপ মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের নামে অনেক মিথ্যা কুৎসাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হলওয়েল মনুমেন্ট একটা বিরাট মিথ্যার প্রতীক ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলঙ্কের স্তম্ভটাকে অপসারিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে যাহা লেখা হয় সব সময়ে তাহা সত্য নয়। তবে এটা সত্য কথা যে যখন কোন রাজ্যের পতন হয় তখন সে রাজ্যের ভিতরই অনেক গলদ থাকে। সেই গলদের সুযোগ লইয়া বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুপক্ষের সুবিধা করিয়া দেয়। প্রত্যেক রাজত্বের পতনের পূর্বে রাজা আর রাজ্যের সম্বন্ধে সমনস্ক থাকেন না। তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট রাজকর্মচারীরা তখন যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত

হয়, মাৎস্যন্যায়ের মতোই একটা অন্যায় কাণ্ড সর্বত্র চলিতে থাকে, প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় এবং বিশ্বাসঘাতকরা সেই সুযোগে শত্রুদের ডাকিয়া আনে। ইতিহাসে বারংবার ইহা ঘটিয়াছে। আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছে। দেশ যখন বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হইয়া যায় তখন দেশের ভিতর হইতেই ইহার প্রতিকার ইহার প্রতিবাদ কোনও নেতা বা রাজার ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করে। সেকালে রাজা গোপালদেব ইহার উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ রাজা গণেশ। তিনিই একমাত্র স্মরণীয় পুরুষ যিনি পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলমান শাসনের মধ্যে হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময় এইরূপ আরও দুইটি অবিস্মরণীয় পুরুষ শিবাজী এবং রানা প্রতাপ সিংহ। মুসলমান শাসন-কালে আর একজন বিদ্রোহী পুরুষও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্য। ইনি অসিহস্তে যুদ্ধ করেন নাই, দুই বাহু বাড়াইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনব বিদ্রোহ শুধু ধর্মজগতেই নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতেও যে পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। শ্রীচৈতন্য তপস্বী ছিলেন, তপস্যা কখনও নিস্ফল হয় না। ইতিহাসে এইরূপ আর একটি তপস্যার প্রভাব ভারতের ভাগ্যে নিদারুণ অভিশাপই বহন করিয়া আনিয়াছিল। এ তপস্যা করিয়াছিলেন পর্তুগালের ইতিহাসবিখ্যাত রাজকুমার হেনরি। তিনি চিরকুমার থাকিয়া সেন্‌ট্‌ ভিনসেন্ট (St. Vincent) নামক অন্তরীপে পুরোহিতগণের পবিত্র সাধনক্ষেত্রে বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেন—কি করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রপথে নূতন দেশে যাওয়া যায়। তাঁহার অপূর্ব অধ্যবসায় বলে তিনি বায়ুবলে পোত-চালনা করিবার শিক্ষালাভ করিয়া বড় বড় সমুদ্রপোত নির্মাণের উদ্যম করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছিল। বায়ুচলিত অর্ণবপোতে সুশিক্ষিত নাবিকরা সমুদ্রপথে বহুদূর অগ্রসর হইতেও পারিয়াছিল। এই তপস্যার ফলেই ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক প্রভৃতি দস্যুরা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের মালাবার উপকূলে কেরলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহা সভ্যমানুষের কীর্তি নয়, অসভ্য বর্বর নর-পশুদের লোভোন্মত্ত পাশবিক অত্যাচার। এমন লোককে সাহায্য করিবার জন্যও ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতক জুটিয়াছিল—কোচিনরাজ সাহায্য না করিলে তাঁহারা কালিকটরাজ সামরীকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন না। আলবুকার্ক যখন ভারতের উপকূলে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন গোয়া স্থানটির সন্ধান তাঁহাকে একজন ভারতীয় জলদস্যুই দিয়াছিল—লোকটার নাম টিমোজা। এরূপ টিমোজা ও কোচিনরাজের অস্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র আছে। নেতাজী আই-এন-এ হইতেও ইহাদের সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই। আমি এসব কথা বলিতেছি তাহার কারণ যেখানে ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ নাই সেখানে সবরকম সম্ভবপর কথাই ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত। ইতিহাস কেবল মহৎ লোকদের কাহিনীমালাই নহে, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে অনেক নীচ স্বার্থপর লোকেরও কুকীর্তি। গোপাল-দেব সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, ঐতিহাসিক তাঁহাকে মহামানব বলিতেও যেমন ইতস্তত করিবে মহাদানব বলিতেও তেমনি ইতস্তত করিবে। ইতিহাসের আলোকে এক যুগের বীর অন্য যুগে দস্যু বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। ইহাও স্মরণযোগ্য আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, হিটলার এখন আর বীর বলিয়া লোকের সম্ভ্রম উদ্রেক

করিতে পারেন না। গোপালদেব সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক মনোভাব সেজন্য নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। হয়ত তিনি মহাকৌশলী ছিলেন—ও বাবা, কবি আসিতেছেন। আমি চলিলাম। তাঁহার কল্পনার ফেনায়িত সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার সাধ্য আমার নাই।"

ইতিহাস সহসা আকাশপট হইতে বিলীন হইয়া গেলেন। কবির আবির্ভাব হইল। এবার কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ-রূপ নহে তরুণী-রূপ। গায়ত্রীর ধ্যানে মধ্যাহ্নকাশে তাঁহাকে যে রূপে ঋষিরা কল্পনা করিয়াছেন—এ যেন সেই রূপ। রক্তিম স্বর্ণাভায় সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত, বিরাট গড়ুরপক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীতবাসা যুবতী দুই হস্তে বৃহৎ একটি স্বর্ণ প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সে প্রদীপের অকম্পিত শিখা জবাকুসুমসঙ্কাশ। তাহার আকাশমুখী সমুজ্জ্বল বার্তা নীরব অথচ বাঙ্ময়। তাহা যেন বলিতেছে—'আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই তোমাদের ভবিষ্যৎ। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমার জন্ম হইয়াছিল সুদূরে অতীতে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমি এখনও দেদীপ্যমান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরেই ভবিষ্যতেও আমার জ্যোতি অম্লান থাকিবে। যাঁহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আমি প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি, তিনি সাগ্নিক কবি। তিনি সরস্বতীর কৃপায় ধন্য। তিনি নারীরূপেই শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, কারণ গরুড়ই একদা বিবদমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করেন, গরুড়ই জননীর জন্য অমৃত উদ্ধার মানসে স্বর্গে গমন করিয়া অগ্নিবেষ্টিত চক্রকুণ্ডে প্রবেশ করতঃ অমৃতরক্ষাকারী ভীষণ সর্পকে বধ করিয়া অমৃত উদ্ধার করেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও এই গরুড়কে বধ করিতে পারেন নাই। এই গরুড় সর্পকুলের শত্রু। এই গরুড় পালনকর্তা বিষ্ণুর বাহন। তাই কবি আজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া শক্তিরূপিণী নারীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বাণী শ্রবণ করুন।'

কবি কথা কহিলেন।

"গোপালদেব কি রকম ছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করা আমি পণ্ডশ্রম মনে করি। গোপালদেব সত্যিই যেদিন আসবেন সেদিনও তাঁকে জনতা চিনতে পারবে না কিছুদিন। যেদিন পারবে সেদিন কেউ ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আসবে, কেউ কাদা ছুঁড়বে। এই কিছুদিন আগেই তোমাদের মধ্যেই মহান নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি দেশের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যা করেছিলেন তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। এক সভায় সেই নেতাজীর গলায় ফুলের মালা পরাতে গিয়ে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, বৃটিশ সরকার আপনার স্বদেশ-প্রীতির জন্য আপনাকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন—আমরা আপনার দেশবাসীরা আপনার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছি। নেতাজী এখন নেই। তাঁর দেশ এখন খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়েছে। সেই স্বাধীন সরকারও তাকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অনেক নেতারই এ দুর্দশা ঘটেছে। তাই আমি এমন নেতার রূপ কল্পনা করছি, এমন একজন গোপালদেবের কথা ভাবছি, যিনি এখনও মূর্ত হননি, যাঁর মাথায় কেউ এখনও কাঁটার মালা পরিয়ে দেয়নি, যিনি এখনও অকলঙ্কিত চন্দ্রের মতো আমার মানসলোকে জ্যোৎস্না বিকিরণ করছেন, যাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাবে আমার মনের আকাশ পুলকিত হয়ে উঠেছে। যাঁর অভ্যর্থনায় শত শত শঙ্খ বাজছে, যাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করছেন স্বর্গের দেবতারা। এই অজাত নেতাকে আমি প্রতিদিন

নানা অলংকারে সাজাই, নানা বর্ণে রঞ্জিত করি অর্চনা করি নানা বন্দনায়, চর্চিত করি যে গন্ধ-প্রসাধনে তা মর্ত্যলোকে সুলভ নয়। সে নেতার আগমনী গান ধ্বনিত হচ্ছে দুঃখীর ক্রন্দনে, আর্তদের হাহাকারে, অত্যাচারের অট্টহাস্যে. সে নেতার পথে আলোর দীপাবলী সাজিয়েছেন আশাবাদী বিশ্বাসীরা, সে আবির্ভাবের পটভূমিকা তৈরি করছে বর্তমান যুগের শহীদদের আত্মোৎসর্গ, তাঁর বন্দনা-গান রচনা করছি আমি, শাশ্বত কালের কবি। কিন্তু তিনি এখনও আসেন নি, তবে এও জানি তিনি আসন্ন। তিনি আসবেন। অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, মহামান্য টিলক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ইনিও সেই বাণী উচ্চারণ করবেন। কারণ বাণী চিরকাল একই থাকে, প্রকাশ করবার ভঙ্গীতেই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। বন্দেমাতরম্ আর জয় হিন্দ—মূলত একই ভাবের প্রকাশ। দেশের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা বলেছেন সেই ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে। তবু কত বিভিন্ন ওঁদের আবির্ভাব। সত্য শিব সুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই বহু প্রাচীন কালে উপনিষদের কবি গেয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তার পর লক্ষ লক্ষ কবি লক্ষ লক্ষ নেতা ওই একই ভাবে ডাক দিয়েছেন নিদ্রিত জনতাকে—কিন্তু ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ভঙ্গীতে। অনাগত যুগের অজাত নেতার মুখে কোন্ ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে এই সনাতন বাণী ফুটবে তা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি, কিন্তু এখনও শুনতে পাইনি। আপনি গোপালদেবের কথা ভাবছেন, গোপালদেবই আবার আবির্ভূত হবেন, কিন্তু নব রূপে। কোনও লোভ, কোনও মোহ, কোনও স্বার্থ তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না, অতন্দ্রিত তপস্যায় নিজেকে তিনি পবিত্র করছেন, প্রস্তুত করছেন নিজেকে স্বদেশ-প্রেমযজ্ঞাগ্নির আহুতি রূপে। দেশের জন্য আত্মবিসর্জন করবেন তিনি। গরুড়ের মতো ধ্বংস করবেন সর্পকুলকে, অমৃত এনে দেবেন দেশমাতার হস্তে, বহন করবেন পালনকর্তা বিষ্ণুকে, দহন করবেন সর্ববিধ পাপ ও অশান্তি। তারপর দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মবিসর্জন করবেন, তাঁর দেহটা হয়তো ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি মরবেন না, তাঁর অমর কীর্তির অমরাবতীতে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকবেন ভবিষ্য যুগের আদর্শ হয়ে চিরকাল। ইতিহাসের নজীর নিয়ে গোপালদেবের কল্পনা করবেন না, কারণ তিনি হবেন অনন্য, অভূতপূর্ব। তিনি কি বলবেন কি করবেন তা আমরা জানি অথচ জানি না। কোন্ অভিনবত্ব নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন তার নানারকম কল্পনা করে চিত্তবিনোদন করতে পারি, কিন্তু বার বার স্বীকার করতে হবে —জানি না জানি না তুমি কেমন হবে।—"

মহান আসিয়া প্রবেশ করিতেই স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গেল। মহান ডাক লইয়া আসিয়াছিল। ডাকটি রাখিয়া সে বলিল—"একটা ঘোড়া এসেছে। খুব ভালো ঘোড়া।"

"ঘোড়া?"

"হ্যাঁ। যিনি এনেছেন তিনি এই চিঠিটাও দিলেন।"

শিলমোহর-করা একটি পত্র সে গোপালদেবের হাতে দিল। পত্রটি পড়িয়া গোপালদেব বিস্মিত হইয়া গেলেন। বহুকাল পূর্বে তিনি যে অশ্বব্যবসায়ীকে পত্র

লিখিয়াছিলেন তিনিই ঘোড়াটি পাঠাইয়াছেন। লিখিয়াছেন—'অধ্যাপক মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি এই পত্রবাহকের সহিত একটি ভালো ঘোড়া পাঠাইতেছি। এটি আমার উপহারস্বরূপ যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হইব। একজন প্রকৃত গুণীকে সেবা করিবার সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না। সে সুযোগ যখন আসিয়াছে তখন আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। .....'

গোপালদেব মহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কোথা ?"

"সে বাইরের ঘরে রয়েছে। তার একটি কথা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত কাবুলী—"

"তাকে ডেকে আন—"

একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল চক্ষু, তীক্ষ্ন নাসা, সূচ্যগ্র দাড়ি। মাথায় কাবুলী টুপি পরিধান করিয়া আছে। সে আসিয়াই গোপালদেবকে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করিল। যে ভাষায় কথা কহিল তাহা গোপালদেব বুঝিতে পারিলেন না, মনে হইল পুস্তু ভাষা। গোপালদেব তখন মহানকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলমারি থেকে একটা একশ টাকার নোট নিয়ে এস।"

কাবুলী কিন্তু নোট লইল না। আর একবার স্যালুট করিয়া পকেট হইতে একটি ছোট চামড়ার থলি বাহির করিল। থলিটি খুলিয়া সে দুইখানি একশত টাকার নোট গোপালদেবকে দেখাইল। এবং বার কয়েক মাথা নাড়িল। গোপালদেব তখন বাহিরে গিয়া ঘোড়াটি দেখিলেন। অপূর্ব ঘোড়া। মনে হইল আরব দেশের ঘোড়া এটি। ঘোড়াটির গ্রীবা-ভঙ্গী, গড়ন, উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন ঘোড়াটি সুসজ্জিত করিয়াই পাঠাইয়াছেন ভদ্রলোক। নূতন জিন, লাগাম, রেকাবে ঘোড়াটি সুসজ্জিত। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি পত্র লিখিয়া কাবুলীকে দিলেন। লিখিলেন—'আপনার বদান্যতায় আমি মুগ্ধ। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ি নাই, এবার চড়িবার চেষ্টা করিব। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

পত্র লইয়া কাবুলী পুনরায় স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল—হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ঘেউ শব্দে চমকাইয়া উঠিল। কুকুরটা যে কখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে টের পায় নাই। দেখিল ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে লর্ড তাহাকে বকিতেছে। ভাবটা—এমন ভাবে পালিয়ে আসার মানেটা কি।

"তুই কি করে এলি এখানে!"

লর্ড তাহার কাঁধের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া আবদারের সুরে বলিল—"গো-ও-ও-ও—।"

"সর। পড়ছি, এখন বিরক্ত করিস না—"

লর্ড পুনরায় বলিল—"গো-ও-ও-ও—।"

তাহার পরই সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পুকুরের পাড়ে গিরগিটি দেখিতে পাইয়াছিল সে। গিরগিটিকে ধরিতে পারিল না। একটা গাছের ডালে কয়েকটা শালিক বসিয়াছিল, পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া তাহাদেরই বকিতে লাগিল। শালিকরা

উড়িয়া গেল। তখন সে মাথা নীচু করিয়া মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে পুকুরের পাড়ের ঝোপঝাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কার্তিক আবার পাণ্ডুলিপিতে মন দিল।

"গোপালদেব ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা খাম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খামের উপর পরিচিত হস্তাক্ষর, যে হস্তাক্ষরের আশায় প্রথম যৌবনে একদা তিনি পিয়নের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। দময়ন্তীর চিঠি। খামের ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগি[illegible] পড়িতে পড়িতে তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তী লিখিয়াছিলেন—

শ্রীচরণেষু,

অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। কাল আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি। মগনলালে সেখানে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নীলার ছেলে-পেলে হবে। ওরা টাকা দিয়ে যদিও নার্স হাসপাতাল ডাক্তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু নীলা, আমাদের সেই নীলা, যার তুমি অনেক নাম দিয়েছিলে— নীলটু, নাইল, নীল পাখী, নীলম—আমাদের সেই নীলা বিদেশে গিয়ে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। আমাকে চিঠি লিখেছে—'মা, এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। টাকা দিয়ে সব কেনা যায় ভালোবাসা কেনা যায় না। এখানে কোনও জিনিসেরই অভাব নেই, তবু মনে হচ্ছে আমি নিতান্ত অসহায়। জলের মাছকে কে যেন ডাঙায় তুলে এনেছে। কাল রাত্রে একটা ভারী বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মগন যেন মারা. গেছে, আর সে 'নিগার' বলে তার মড়া যেন কেউ ছুঁচ্ছে না। আমি যেন পাগলের মতো নোটের তাড়া নিয়ে সকলের খোশামোদ করে বেড়াচ্ছি, তবু কেউ আসছে না.। বড্ড খারাপ লাগছে আমার। এখানে স্নেহ ভালোবাসা সেবা যত্নও সব নিক্তির ওজনে, ডলারের মাপে। তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তুমি কাছে থাকলে আমি নির্ভয় হবো। এখানে এই অচেনা জায়গায় সর্বদাই ভয় ভয় করে আমার। মা তুমি এস। আমি এই সঙ্গে একটা ড্রাফ্‌ট পাঠালুম। প্লেনে চলে এস। দাদাকে বললেই সে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবে। বাবাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু ভয়ে লিখতে পারি না। তাঁর চক্ষে আমরা দোষী। যদিও আমরা যা করেছি তা নিজেদের বিবেক অনুসারেই করেছি, কিন্তু তাঁর বিবেকের সঙ্গে আমাদের বিবেকের মিল নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, তিনি অসাধারণ। তাঁর নাগাল পেলুম না. এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সেই দুর্ভাগ্যটাকে নতশিরে মেনে নিয়েছি। সত্যি, জীবন জিনিসটা কি আশ্চর্য—কত রকমই যে হয়—আমাদের বাবা অত দূরে চলে যাবেন এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তুমি কিন্তু মা এসো। বুঝলে ? কোন ওজর আমি শুনব না।'

প্রবাল সব ঠিক করে দিয়েছে। কাল আমি যাচ্ছি। তুমি তো জানো, আগে আমার নানারকম সংস্কার ছিল, ছুঁচিবাই ছিল, গঙ্গাজল ছেটানো আর বারবার কাপড় ছাড়া নিয়ে তুমিও একদিন কত ঠাট্টা করেছ। এখন ছেলেমেয়েদের জন্য সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন মনে হয়, স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের সেবা করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তুমি তো তরোয়াল চালিয়ে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, ইচ্ছে থাকলেও তোমার কাছে তাই আর যেতে পারি না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ

এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই যতদিন বাঁচি তাদেরই সেবা করব, তাদেরই জীবনকে মধুময় করে তুলব। তাদেরই অনুরোধে তাই পেটকাটা ব্লাউজ পরি, তাদেরই অনুরোধে জুতা পায়ে দিই, সিনেমায় হোটেলে যাই, তারাই নানারকম ফ্যাশানে আমাকে সাজিয়ে তৃপ্তি পায়। তাদের সে তৃপ্তিতে আমি বাধা দিতে চাই না, বাধা দিতে পারি না। ওরাই এখন আমার ধর্মকর্ম, ঈশ্বর ভগবান—সব। নীলা চিরকালই ভীতু, রাতে আমাদের বাড়ির বড় দালান পেরিয়ে একা যেতে ভয় করত তার, তাকে তার শোবার ঘরে পেঁছে দিয়ে আসতে হত আমাকে! সে ওই বিদেশ বিভুঁই থেকে ডাক দিয়েছে, মাগো তুমি এস। আমি কি না গিয়ে পারি? প্রবাল একটা মেসে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। মেসটি ভালো। আমি দেখে এসেছি। আমাদের পুরানো ঠাকুর অর্জুনই সেখানে রান্না করে। প্রবাল এখন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসে আছে। সুরেশ ঠাকুরপো বললেন—তার বউকে তোমার না কি খুব ভালো লেগেছে। অরুণা—প্রবালেরই বউ। সুরেশ ঠাকুরপো ওকে নার্স সাজিয়ে নিয়ে গেছে তোমার কাছে। অনেকদিন আগে ও নার্সের কাজ করেও ছিল অবশ্য কিছুদিন। এখন করে না। ও যে তোমাকে খুশী করতে পেরেছে এতে আমিও খুব সুখী। বউ সত্যিই ভালো হয়েছে আমাদের।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো। কবে ফিরব—ফিরব কি না—তা মা মঙ্গলচণ্ডীই জানেন। সাবধানে থেকো। এখনও কি বেশী লঙ্কা খাও? খেও না, লক্ষ্মীটি।

প্রণতা

দময়ন্তী

পত্রটি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন গোপালদেব। তাঁহার রগের শিরাগুলি দপদপ করিতে লাগিল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"ওই নার্সটিকে ডেকে দাও তো—"

একটু পরেই অরুণা আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ কেন।"

অরুণার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আনতনয়নে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গোপালদেব বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রবালের বউ এ কথা তো প্রকাশ করনি একদিনও।"

"ডাক্তার কাকা মানা করেছিলেন, তাছাড়া নিজের মুখে ও কথা বলব কেমন করে!"

গোপালদেব নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তোমাকে যদি পুত্রবধূরূপে স্বীকার করতে পারতাম তাহলে খুব সুখী হতাম। তুমি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে পারব না। আমার অতীত বংশগৌরব তোমার আমার মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভূশায়ী করে তোমার কাছে আমি যেতে পারব না। আমরা সেকেলে লোক। প্রাচীন মত প্রাচীন পথ আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগ করবার ইচ্ছাও নেই। তুমি

ভালো মেয়ে, কিন্তু প্রবালের মা, আমার মা, আমার ঠাকুমা, আমার প্রপিতামহী যে আসনে বসেছিলেন, সে আসনে তোমাকে আমি বসাতে পারব না। সে আসনে অন্য জাতের মেয়েকে বসাবার অধিকার আমার নেই। আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।"

অরুণা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চলিয়া গেল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোড়াটাকে নিয়ে এস। এখুনি চড়ব—"

"কোথায় যাবে এখন—"

"তুমি নিয়ে এস না, আমার যেখানে খুশী যাব—"

"ও ঘোড়া আমি আনতে পারব না। ও তো পাহাড় একটা। সহিসটাহিস বাহাল কর আগে, দু'দিন থাকুক এখানে, একটু পোষ মানুক।"

"না, আমি এখনি চড়ব—"

গোপালদেব উঠিয়া পড়িলেন। সম্মুখের দেওয়ালেই তরবারিটি টাঙানো ছিল, সেটি কোষমুক্ত করিয়া তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া রহিলেন চক্ষুর সম্মুখে। দময়ন্তীর চিঠিটা পড়িয়া তাঁহার অন্তর্লোকে ভূমিকম্পের মতো একটা বিপর্যয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে বিংশ শতাব্দীর লোক একথা সহসা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি সেই অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব, তাঁহাকে ঘিরিয়া বিশ্বাসঘাতকদের একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুরাই প্রতারক হইয়াছে, কিন্তু তিনি গোপালদেব, তাঁহাকে অত সহজে বিধ্বস্ত করা যাইবে না, তিনি তাঁহার সমস্ত সত্তা দিয়া ইহার প্রতিরোধ করিবেন। যে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর আমাদের দেশের সত্য-শিব-সুন্দর প্রতিষ্ঠিত, যে সামাজিক বনিয়াদের উপর আমাদের গৌরব-মান-মর্যাদা অধিষ্ঠিত, তাহাদের যেমন করিয়া হোক রক্ষা করিব। পরিবর্তন যদি স্বাভাবিক সভ্য পথে আসে তাহা মানিয়া লইতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাম, লোভ ও অসংযমের ন্যক্কারজক যে ঔদ্ধত্য সমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, যথেচ্ছাচারের অসংযত লীলাকেই পরিবর্তন বলিয়া যাহারা আস্ফালন করিতেছে, তাহাদের তিনি মানিবেন না, কিছুতেই মানিবেন না। প্রয়োজন হইলে অসি-হস্তেই আবার তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। মাৎস্যন্যায়কে গোপালদেব অসি-শক্তিতেই দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন—যদিও ইতিহাসে সেকথা স্পষ্টভাবে লেখা নাই। ইতিহাসে—বিশেষত প্রাচীন ইতিহাসে কয়টা সত্য কথাই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে? দেদ্দা? দেদ্দা যে তাঁহার স্বজাতীয়া ছিলেন না এমন কথা তো কোথাও লেখা নাই।... গোপালদেবের সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল বাংলোর আশেপাশেই বুঝি শত্রুরা হানা দিয়াছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অসিহস্তে একাই তিনি হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"কি কাণ্ড করছ তুমি—"

মহান একবার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু গোপালদেব তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। বাংলোর বাহিরে মাঠের উপরই ঘোড়াটা দাঁড়াইয়াছিল। তখনও তাহার পিঠ হইতে জিন নামানো হয় নাই। মুখে লাগাম লাগানই ছিল, একটা খুঁটিতে সেটা আটকানো ছিল কেবল। গোপালদেব এককালে সত্যই ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন।

সোজা গিয়া ঘোড়াটার পিঠে চাপড় দিলেন বার দুই, তাহার পর লাগামটা খুঁটা হইতে তুলিয়া এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বাম হস্তে লাগামটা বাগাইয়া ধরিলেন—দক্ষিণ হস্তে উৎক্ষিপ্ত উন্মুক্ত তরবারি ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরবেগে অশ্ব বাহির হইয়া গেল। শহরের রাস্তা পার হইয়া অবশেষে প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন গোপালদেব। দিগন্তবিস্তৃত বিরাট প্রান্তর। তাঁহার মনে হইল, ওই প্রান্তরের অপর পারে শত্রু সেনারা সমবেত হইয়া আছে। বীরবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। গোপালদেব আরও বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। আরবী অশ্ব বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনা ঘটিল একটা। মাঠের মাঝে বিরাট একটা গহ্বর ছিল, সে গহ্বরের ভিতর হইতে অনেক কুশ, গুল্ম, আগাছা গজাইয়াছিল বলিয়া সেটাকে সমতল মনে হইতেছিল। গোপালদেব অশ্ব সহিত সেই গহ্বরের ভিতর পড়িয়া গেলেন। ঘোড়াটার কোমর ভাঙিয়া গেল, সে ছটফট করিতে লাগিল. গোপালদেবও গুরুতর আঘাত পাইলেন, কারণ তাঁহার হাতের তরবারি তাঁহারই কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটু পরে সেই নির্জন প্রান্তরে নিজের আদর্শ ও স্বপ্ন পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মাদ প্রাচীনপন্থী মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই পর্যন্ত পড়িয়া কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। গোপালদেবের জন্য দুঃখ হইতে লাগিল তাহার। পাতা উল্টাইয়া দেখিল গ্রন্থকার ফকিরচাঁদ আরও খানিকটা লিখিয়াছেন।

"গল্পটা এইভাবে এইখানেই শেষ করিয়া দিলাম। এভাবে শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল না। মালিনীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া আমি যাহা হইয়াছি তাহারই আলেখ্য গোপালদেবের চরিত্রে প্রতিফলিত করিব ভাবিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল অরুণা ও প্রবালের প্রেমকে, মগনলাল ও নীলার বিবাহকে তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন এবং বাকী জীবনটা প্রেমই যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এই উপলব্ধির মহিমা প্রচার করিবেন। কিন্তু তাহা পারিলাম না। গতরাত্রে সেই প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম বৃদ্ধ—আমার গুরুদেব—স্বপ্নে আবার আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষু হইতে রোষ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। বলিলেন—'তুমি যে গোপালদেবের তপস্যা করিতেছিলে তিনি শক্ত সমর্থ অবিচল বীরপুরুষ। তাঁহার মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা তোমার কাজ নহে। তুমি যে ছবি আঁকিতে বসিয়াছ সে ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয় শিল্পী হিসাবে তাহাই তোমার একমাত্র বিবেচ্য। তাহাকে সহজিয়া পন্থী, কামুক, বা প্রেম-ঢুলু-ঢুলু প্রণয়বিলাসী করিলে তোমার কাব্যে ছন্দপতন ঘটিবে। গোপালদেব শক্তিশালী পুরুষ বলিয়াই তাহার তপস্যা তুমি শুরু করিয়াছিলে, এখন যদি অন্য রকম ভাবে তাঁহার মূর্তি কল্পনা কর তোমার তপস্যা দ্বিমুখী দ্বিধাগ্রস্ত হইবে। শক্তিমানের তপস্যা করিতেছিলে বলিয়াই তোমার দেহে মনে ভাষায় দৃষ্টিতে শক্তির দ্যোতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই জন্যই মালিনী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিও, মালিনী কুহকিনী। সে তোমার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়াছে। কুহকিনীর কুহকে না ভুলিয়া তুমি শক্ত সমর্থ প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোপালদেবের তপস্যা কর। পর্বতের চিত্র পর্বতের মতো করিয়া আঁক, তাহার কানে দুল পরাইতে যাইও না। সেটা অশোভন হইবে।

তোমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি একাগ্র হইয়া যুদ্ধের তপস্যা করিয়াছিলাম বলিয়াই যুদ্ধ হইতে পারিয়াছি, যুদ্ধের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের সৌন্দর্যে অভিভূত হইতাম তাহা হইলে আর যুদ্ধ হইতে পারিতাম না। একাগ্র হও, সাধনাকে একমুখী কর—।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষরূপেই আঁকিলাম।

বইটা শেষ করিবার পর রণধীরের চাকর ঝমকু আর একটা খবর আমাকে চুপি চুপি দিয়া গেল। রণধীরের জ্যাঠা রাজপুতানা হইতে আজ আসিয়াছেন। লোকটি ভীষণ-দর্শন এবং অত্যন্ত সেকেলে। আজ এক নজর তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রকাণ্ড জুলপি, প্রকাণ্ড উর্ধ্বমুখী গোঁফ, প্রকাণ্ড নাক, প্রকাণ্ড পাগড়ী। কিংখাবের কোট প্যান্টলুন পরা, যাত্রাদলের রাজার মতো। আমার সহিত মালিনীর প্রণয়-লীলার কথা কে নাকি তাঁহার কানে তুলিয়া দিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া অবশেষে না কি হিন্দীতে বলিয়াছেন—শালা কুত্তাকো পিটতে পিটতে রাস্তে মে নিকাল দেও। উসকা সামান ভি রাস্তে মে ফেক দো। (শালা কুকুরকে মারতে মারতে রাস্তায় বের করে দাও। ওর জিনিসপত্রও রাস্তায় ফেলে দাও)। মালিনী একথা শুনিয়া নাকি খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে। জ্যাঠামশাই বিষয়ের মালিক। তাই ভয়ে ভয়ে আছি, কি জানি কি হয়। মালিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে? কথাটা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আর একটা কথাও এখানে লিখিয়া রাখি—আমি খুব ভালো ঘোড়-সওয়ার হইয়াছি। মালিনীদের ঘোড়াটার সহিত আমার খুব ভাবও হইয়াছে। যদি বেগতিক দেখি ঘোড়ায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব। প্রচার করিব সেই গোপালদেবকে, যিনি আমার মতে প্রেমময়, যিনি প্রেমের বলেই সে যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এইখানেই শেষ হইল। যদিও শেষে দুই একটা অবান্তর ব্যক্তিগত কথা লিখিয়া ফেলিলাম।"

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা শেষ করিয়া কার্তিক অসহায় বোধ করিতে লাগিল। যে অবলম্বনটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, আশা-আশঙ্কার অলীক দোলায় দুলিতেছিল তাহা সহসা ফুরাইয়া গেল। মন অবলম্বনহীন হইয়া নূতন স্বপ্নের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। চপলাদিকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আর মনোরম নাই, তাহা বীভৎস বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনও প্রতারণাকে সে চিরকাল মনে মনে ঘৃণা করিয়াছে। এণ্ড জাস্টিফাইজ দি মীনস (End justifies the means)—এ নীতিতে সে কোনকালেই বিশ্বাস করে নাই। সহজ সরল নীতির পথে চলিয়া সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে চায় সে। মনে পড়িল কলেজ জীবনে এই জন্যই তাহার এক পরম বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। সে গোপনে ডাকাতি ও নরহত্যা করিয়া টাকা যোগাড় করিয়াছিল, সে টাকায় বোমা পিস্তল কিনিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিবে বলিয়া। স্বদেশের জন্য ইংরেজের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিতে কার্তিকের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিরীহ স্বদেশবাসীর ধনসম্পত্তি লুঠ করিয়া—নির্দোষ লোককে হত্যা করিয়া বোমা পিস্তল সংগ্রহ ব্যাপারে তাহার মন সায় দেয় নাই। তাছাড়া ওই পদ্মকলির সঙ্গে

চপলাদির সম্পর্কটাও যেন কেমন কেমন। হয়তো তাহারা পরস্পরকে ভালোবাসে, ভালোবাসা খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু সমাজে বাস করিতে গেলে ভালোবাসাকে সমাজের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, না বাঁধিলে সে একদিন সর্বনাশ আনিবেই। নদীর ঘাট যেখানে মজবুত শানবাঁধানো নাই সেখানে নদী যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ংকরী হইয়া উঠিতে পারে। তা-ও না হয় সে সহ্য করিত, কিন্তু নোট জাল করিয়া পরোপকার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিছুতেই পারিবে না। কিন্তু··· এখানেই তাহার চিন্তাধারা যেন একটা বিরাট গহ্বরের সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ইহার পর কি করিবে সে। থলি হাতে করিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িবে? দ্বারে দ্বারে আপিসে আপিসে কড়া নাড়িয়া বেড়াইবে—চাকরি দাও, আমাকে বাঁচাও? হঠাৎ মনে হইল বাঙালীদের সহিত 'জু'-দের (Jew) অনেক মিল আছে। কত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত দেশে কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। এই কিছুদিন আগে হিটলার তো তাহাদের নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। 'জু'-বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত অস্ত্রই হিটলারকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। জার্মানীর যাহা কিছু গৌরবজনক তাহার অধিকাংশই প্রতিভাবান 'জু' মনীষীদের কীর্তি—সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে সর্বত্রই তাহাদের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। হিংসার বশে হিটলার (নিজেকে তিনি খাঁটি আর্য বলিয়া জাহির করিতেন!) তাহাদের বর্বরের মতো পিঁষিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। হিটলার আজ নাই—কিন্তু 'জু'-প্রতিভাবানেরা আজও অম্লান। সহসা তাহার মনে হইল—প্রতিভাবানেরা প্রতিভার জোরে চিরকাল অম্লান থাকে। কিন্তু সাধারণ 'জু'-দের জীবন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? আর্নলড্ ওয়েসকারের (Arnold Wesker) লেখা তিনখানা নাটকের কথা সহসা মনে পড়িল। নিম্নমধ্যবিত্ত গরীব শ্রমিক 'জু'দের কি অপরূপ চিত্রই না আঁকিয়াছেন তিনি। চিত্র চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান নাই। আমাদের অবস্থাও তাই। উত্তর ভারতের তথাকথিত আর্যগণ চিরকাল বাংলা দেশকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, এখনও চাহিতেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীর কৃতিত্বটা যথাসম্ভব চাপা দিয়া মিথ্যা ইতিহাস লিখাইতেছেন—ইতিহাসের সত্যকে জুয়াচুরির কুয়াসা দিয়া আবৃত করিতেছেন—কিন্তু কুয়াসা বেশী দিন টিকিবে না। সহসা তাহার কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের কথা মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সন্দেহ-সংশয়-কণ্টকিত শজারুর মতো ব্যবহার—মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রী ভোমরাকে, তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, তাহার সলজ্জ হাসি, তাহার নিখুঁত ভদ্রতা, তাহার চমৎকার রান্না, মনে পড়িল আসন্ন যৌবনা মালতীকে, মনে পড়িল তাহার উন্মুখ যৌবনের স্বাভাবিক যৌন-প্রবণতা, মনে পড়িল তাহার ছোট বোন চাপাস্বভাব লোভী আরতিকে, মনে পড়িল পড়ায়-অন্যমনস্ক খেলুড়ে পদুকে—কয়দিনের বা আলাপ—তবু তাহারা কেমন আপন হইয়া গিয়াছিল—সে যদি চপলাদিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, যাইতেই হইবে, তাহা হইলে আর কি উহাদের সহিত দেখা হইবে জীবনে—সে যেমন উহাদের আপন করিয়া লইয়াছিল তাহার পরবর্তী ম্যানেজার কি তাহাদের তেমনভাবে আপন করিয়া লইতে পারিবে—জীবনটা কি বিচিত্র—অদৃশ্য একটা স্রোতে নানাঘাটে ভাসিয়া বেড়ানো। হঠাৎ দেখিতে পাইল লর্ড মাটি খুঁড়িতেছে একটা ঝোপের ধারে। বোধহয় ছুঁচা বা ইঁদুরের সন্ধান

পাইয়াছে। জমিটা কার, ও জমি খুঁড়িবার অধিকার তাহার আছে কি না, নিরীহ ছুঁচা বা ইঁদুরকে হত্যা করা উচিত কি না—এ সব নীতির ঝামেলায় তাহার জীবন জড়িত-বিজড়িত নয়—কে মুখ্যমন্ত্রী হইল, র‍্যাশানের বরাদ্দ কমিল না বাড়িল, পাকিস্তান বা চীনের সহিত আমাদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ হইলে দুশ্চিন্তা থাকিবে না—এসব লইয়া লর্ড মাথা ঘামায় না—চাকুরির জন্যও সে লালায়িত নয়, কোনও মনিব যদি না জোটে, পথ আছে। লর্ড সুখী, অথচ আমরা তাহাকে পশু বলি—অথচ আমরা নিজেরা কি পশুত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছি? আর একটা দৃশ্যও তাহার চোখে পড়িল—একটা গাছে একটা লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়া অজস্র ফুল ফুটাইয়াছে—রৌদ্রকিরণে আত্মহারা হইয়া জীবনটাকে উপভোগ করিতেছে। আমরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটাইয়া সর্বত্র জাহির করিয়া বেড়াইতেছি যে আমরাই সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব—অথচ অশান্তির দাবানলে মানব সমাজ বারবার পুড়িয়া যাইতেছে, হানাহানির রক্তস্রোতে সভ্যতা ভাসিয়া যাইতেছে—ইহাই আমাদের ইতিহাস। কার্তিক মুগ্ধনেত্রে ফুলগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

চপলা কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

"কি বললে! দরকার হলে আমাকে তুমি মুছে ফেলতে পার? এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার পদ্মকলি, সত্যি পার?"

"পারি। শিল্পীরা নিষ্ঠুরই হয়। সে নিজের শিল্প ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। ভগবান নিজের শিল্পকেও ভালোবাসেন না, তাই তিনি মহাশিল্পী। অহরহ কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তিনি গড়ছেন আবার ভাঙছেন। কোন কিছুর উপরই তাঁর মায়া নেই!"

চপলার মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"কিন্তু আমি তো তোমার আঁকা ছবি নই। আমিও ভগবানের সৃষ্টি—"

"ওইখানেই ভুল করছ তুমি। ভগবান চপলা নামে যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করেছিলেন সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো, কিন্তু শিল্পী পদ্মকলি যাকে সৃষ্টি করেছে সে আলো, সে অনন্য। তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি এ ছবি পৃথিবীর কোন আর্ট-গ্যালারিতে নেই, আছে আমার মনে। আমি সেই ছবিটার কথাই বলছিলাম। রক্তমাংসের তৈরি তোমার ওই দেহটার কথা আমি বলিনি। তোমার ওই রক্তমাংসের তৈরি দেহটাকে অবলম্বন করে যে আলো আমি জেলেছি সেইটেই আমার ছবি। সেটা যতক্ষণ আমার ভালো লাগবে ততক্ষণ আমি সেটাকে জ্বালিয়ে রাখব, ভালো না লাগলেই নিবিয়ে দেব এক ফুঁয়ে। তুমি বারবার আমাকে বলছ, তোমার দুঃখ তুমি আমাকে নষ্ট করছ। কিন্তু আমাকে নষ্ট করবার ক্ষমতা তোমার নেই আলো। আমি শিল্পী। আমি যা করছি, নিজের খুশীতে নিজের খেয়ালে করছি। আমার জাল-করা নোট দিয়ে তুমি অনেক লোকের উপকার করছ, এটা আমার কাছে বড় কথা নয়, আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা, ওই নোটগুলো পেয়ে তুমি উৎফুল্ল, তুমি আনন্দিত হ'য়ে ওঠ—সেই তুমি যাকে আমি সৃষ্টি করেছি, সে চপলা নয়, সে আলো। সেবার তুমি বলেছিলে, তোমার মেলার তাঁবুতে তাঁবুতে যে সব খদ্দেররা জাল নোটের বদলে আসল নোট দিয়ে যায় তারা তোমার পুরো দাম দেয় না। হাজার টাকার নোট কোথাও পাঁচশ টাকাতেও

বিক্রি করতে হয়েছে তোমাকে। প্রতিবার তোমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে যাই—এবার দু'লাখ টাকা এনেছি—এতে আশা করি তোমার কুলিয়ে যাবে। দাঁড়াও তোমাকে দিয়ে দি—"

পদ্মকলি ঝুঁকিয়া খাটের নীচে হইতে একটা ছোট স্যুটকেশ বাহির করিল। স্যুটকেশের ভিতর হইতে বাহির করিল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে জড়ানো নোটের তাড়াটা।

"এতে দু'শোটা নোট আছে। প্রত্যেকটি হাজার টাকার। যদি প্রত্যেক নোটটা পাঁচশ টাকাতেও বিক্রি কর তাহলেও তোমার 'নেট্' এক লাখ টাকা থাকবে। এই নাও—"

অবহেলাভরে সে পুলিন্দাটা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া দিল।

"খুশী তো? কই এবার তোমার চোখে সেই দীপ্তি তো ঝলমল করে উঠল না যা দেখবার জন্যে আমি জাল-জয়োচুরির আশ্রয় নিয়েছি—"

সত্যই চপলার মুখটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার চোখের কোণে এক ঝলক রোষ-বহ্নি চকমক করিয়া উঠিল।

"তোমার আলোর জন্যে তুমি যা এনেছ তাতে আমার আনন্দিত হবার কি আছে। তোমার আলো তো তোমার মনের ভিতর আছে তাকেই একথা জিগ্যেস কর। আমার এই রক্তমাংসের দেহটা তো তোমার কাছে কিছুই নয়।"

পদ্মকলি হাসিমুখে উত্তর দিল—"সত্যিই কিছু নয়। ওটা বরং বাধা। মল মূত্র ব্রণক্ষত কৃমিকীটদের লীলাভূমি ওই দেহটা খুব একটা লোভনীয় জিনিস নয়। তোমাদের দেহের মধ্যে যা লোভনীয় তার সম্বন্ধেও শঙ্করাচার্য সাবধান করে দিয়ে গেছেন—নারীস্তন ভরণাভিনিবেশং, মিথ্যা-মায়ামোহাবেশং। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্!"

"শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী ছিলেন—তুমিও কি সন্ন্যাসী?"

"বড় শিল্পী, বড় বিজ্ঞানী, বড় সন্ন্যাসী সব একজাতের লোক। তাঁরা নানা পথ দিয়ে সত্য সন্ধান করেন। আমার পথ সৌন্দর্যের পথ, শিল্পের পথ—আমি হয়তো খুব বড় শিল্পী নই, কিন্তু পথ নিয়েই আমি মেতে থাকতে চাই না, পথ অতিক্রম করে আমি সেই মন্দিরে পেঁছিতে চাই যেখানে আলো জ্বলছে। তোমার দেহ নিয়ে একবার যদি উন্মত্ত হয়ে পড়ি তাহলেই সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।…"

"কিন্তু পদ্মকলি তুমি আমাকে এত দিচ্ছ, আমি তোমাকে কি দেব বল, দেহ ছাড়া তো আমার আর কিছু নেই—"

"তোমার দেহকেই তো গ্রহণ করেছি আমি, কিন্তু স্থূলভাবে নয়, তোমারই সূক্ষ্ম সুষমা দিয়ে তো আমি জেলেছি আলো—"

"আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বল আমায় পদ্মকলি। আমি নানা জায়গায় বাইজী সেজে গান গাইতে যাই, তোমার কোনও সন্দেহ হয় না তো, একদিন তুমি বলেছিলে যে, আমি যদি রূপজীবাও হতাম তাহলেও তুমি আসতে আমার কাছে। কিন্তু বিশ্বাস কর পদ্মকলি আমি অপাপবিদ্ধা, আমি কুমারী এখনও—আমি—"

সহসা চপলা মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং পদ্মকলির দুই পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস কর আমি সতী, বিশ্বাস কর আমি দেহ-বিক্রী করি না। আমাকে নাও তুমি, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি—"

পদ্মকলি আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

"আলো, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি! ছিঃ, অমন কোরো না।"

চপলার চোখে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"তুমি নিশ্চয় আর কাউকে ভালোবাস। দেখি তোমার ওই স্যুটকেসে কি আছে।"

পাগলিনীর মতো সে পদ্মকলির স্যুটকেসটা হাঁটকাইতে লাগিল। স্যুটকেসে আরও কয়েক হাজার টাকা ছিল আর ছিল একটা 'পাসপোর্ট'!

"এটা কি—"

"আমি কাল প্যারিস যাচ্ছি। সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত আর্ট-গ্যালারিটা দেখে তারপর যাব রোমে—"

"তুমি চলে যাবে! আমি যে ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে আর একটা সেন্টার খুলব—"

"দেখ আলো, ওসবে আমার তেমন উৎসাহ নেই। আমি জানি কোনও কিছু করেই শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না। মানুষ চিরকালই এমনি আছে, চিরকালই এমনি থাকবে। আগে কলেরায় মরত, এখন গুলিতে কিম্বা অ্যাটম-বমে মরবে। আগে চণ্ডীমণ্ডপে গুলতানি করত, এখন কাগজে, লোকসভায় গুলতানি করে। মন্বন্তর আগেও হয়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, এখন কনট্রোলের মন্বন্তর চলছে। আবার নতুন রকম কিছু হবে ভবিষ্যতে। মানুষ বদলাবে না, ওকে বদলানো যাবে না। মানুষের একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র শিল্পে, যেখানে সে সৃষ্টিকর্তা, যেখানে সে স্বাধীন, যেখানে সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া চপলা বলিল—"মানুষের দুঃখের দিনে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? তুমি কি মানুষের সমাজে বাস কর না?"

"মানুষের সমাজে বাস করি বাধ্য হ'য়ে। মানুষের সমাজে জন্ম গ্রহণ করবার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি তুমি এই সমাজে জন্মাতে চাও কি না। ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন আমাকে এই হুল্লোড়ের গোলক-ধাঁধায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই গোলকধাঁধায় ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি করে চলেছি জন্মে থেকে। তবে যিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকুন, একটা বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি—তিনি আমাকে বেনে করেন নি, দেশহিতৈষী করেন নি, গুণ্ডা করেন নি, সৈনিক করেন নি, শিল্পী ক'রে পাঠিয়েছেন—শিল্পের ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন। কোনও বিশেষ একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখতেন যদি আমাকে, আর সেই বাঁধা খুঁটিতেই যদি ঘুরতে হ'ত আমাকে সারাজীবন, তাহলে বোধহয় আমি পাগল হ'য়ে যেতাম। আর একটা বিষয়েরও জন্য কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আমাকে তিনি ধনীর সন্তান করে পাঠিয়েছেন, কারও কাছে হাত পাততে হয় না আমাকে। স্যুটকেসে যে বাকি টাকাগুলো আছে ওগুলো জাল নয়—"

এমন সময় বাহিরে একটা রিকশার টুনটুন শুনিয়া পদ্মকলি বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল এবং হাত তুলিয়া থামাইল রিকশাটাকে।

"আমি এই রিকশাতেই চলে যাই আলো। কাল আমার প্লেন ছাড়বে। মাস-দুই পরে ফিরব।"

স্যুটকেসটা বন্ধ করিয়া নির্বিকারভাবে সে রিকশায় গিয়া উঠিয়া বসিল।

"তোমার টাকাও নিয়ে যাও। চাই না এ টাকা—"

নোটের পুলিন্দাটা বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া চপলা কপাট বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল খানিকক্ষণ। ক্রন্দনাবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

"মা—মা।"

কৃষ্ণধনবাবুর কণ্ঠস্বর।

চপলা উঠিয়া বসিয়া সম্বৃত করিয়া লইল নিজেকে। তাহার পর কপাট খুলিল। খুলিয়া প্রথমেই দেখিতে পাইল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে-মোড়া নোটের পুলিন্দাটা গেটের একধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। পদ্মকলি সেটি লইয়া যায় নাই।

কৃষ্ণধনবাবু আকুল কণ্ঠে বলিলেন—"মা সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। মালতী সকালে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। গিয়ে দেখলাম কলসীটা পুকুর পাড়ে পড়ে আছে, মালতী নেই। শুনলাম রাউতপুরের কয়েকটা গুণ্ডা নাকি ধরে নিয়ে গেছে তাকে—। বিজনবাবুর ভাইপো দুটো গুণ্ডা মুসলমান ছেলের সঙ্গে তাকে রাউতপুরের দিকে যেতে দেখেছে। কার্তিকবাবুও নেই দেখছি। আমি এখন কি করব ভেবে পাচ্ছি না—"

স্তম্ভিত হইয়া গেল চপলা।

মনে পড়িল, সুরং এবং পদ্মকলি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা দৈবী শক্তি যেন তাহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া গেল। মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতাটি—'আমাকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার'। মনে পড়িল 'মুক্তি' কবিতার সেই লাইন দুইটি, 'আমি নারী আমি মহীয়সী আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী'।

কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল, "আপনি থানায় এক্ষুনি খবর দিয়ে দিন। ভয় নেই; আমি আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণধনবাবু চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরই নোটের পুলিন্দাটা সে ঝোপের ভিতর হইতে কুড়াইয়া আনিল। সেটাকে নিজের ব্যাগে রাখিল না। আলমারিতে বড় ফাঁক-মুখ একটা থার্মোফ্লাস্ক ছিল। সেইটার ভিতর পুলিন্দাটা পুরিয়া রাখিল। আলমারিতে নানারকম কাচের বাসনের মধ্যেই রাখিয়া দিল 'ফ্লাস্কটা'।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল গেটের সামনে। ট্যাক্সি হইতে নামিলেন চপলার সেই মোটা-সোটা স্বর্ণ-দন্ত প্রণয়ীটি। ইনিও দুঃসংবাদ আনিয়াছিলেন।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিশ জাল নোটের খবর পেয়েছে। ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে না কি আমাদের দুজনের নামে। তাই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম। চলুন পালাই।"

"কি করে প্রকাশ পেল জাল নোটের কথা—"

"যে বোবা চাকরটাকে আপনি বহাল করেছিলেন, সে বোবা সেজে থাকত। সে পুলিশের চর। পুলিশ অনেকদিন আগে থাকতেই আপনাকে সন্দেহ করত তাই ওই লোকটাকে লাগিয়ে রেখেছিল আপনার পিছুতে—। চলুন পালাই, আর দেরি করা ঠিক হবে না—"

"আপনি যান, আমি যাব না—"

"যাবেন না ?"

"এদের ফেলে আমি যেতে পারব না। যদি মরতে হয় ওদের মধ্যেই মরব। আপনি যান—"

স্বর্ণ-দম্ভ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"ব্যাপারটা ভেবে দেখুন ভালো করে।"

"ভেবে দেখেছি। আপনি যান—"

স্বর্ণদম্ভকে লইয়া ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেই চপলা ত্বরিতপদে বারান্দার ওপারে চলিয়া গেল। দেখিল কোঁথাও কেহ নাই। বারান্দার কোণে শাবলটা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি শাবলটা লইয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিয়া গেল সে। সেখানটা ঘেঁটুর জঙ্গল, তাহারই মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়িতে লাগিল সে। বেশ গভীর গর্ত খুঁড়িল একটা। তাহার পর সেই ফ্লাস্কটা আনিয়া পুঁতিয়া ফেলিল। মাটি ঢাকা দিয়া কিছু আবর্জনাও ছড়াইয়া দিল সেখানে। কয়েকটা ঘেঁটু ফুলের চারাও পুঁতিয়া দিল তাহার উপর। তাহার পর বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল। কাপড়চোপড়ে মাটি লাগিয়া নোংরা হইয়া গিয়াছিল। বাথরুম হইতে একটি টকটকে লাল শাড়ি পরিয়া বাহির হইল সে। মনে হইতে লাগিল সে যেন মানবী নয়—মূর্তিমান অগ্নিশিখা। তাহার পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিয়া আলমারি হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল। একটা ছোট রিভলবারও বাহির করিল, তাহাতে গুলি পুরিল এবং সেটিও কোমরে গুঁজিয়া লইল। তাহার পর মাথার বেণীতে বাঁধিল সাচ্চা জরির প্রকাণ্ড ফুল একটা। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। চোখের দৃষ্টিতে যাহা ঝলমল করিতে লাগিল তাহা অনির্বচনীয়। বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রিকশার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল তাহার পর। রিকশা পাইতে বেশী দেরি হইল না। তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠিয়া বলিল—'চল রাউতপুর'। রিকশা চলিতে আরম্ভ করিলে নিজের ব্যাগটা খুলিয়া গণিতে লাগিল কত টাকা আছে। দেখিল দশখানা হাজার টাকার নোট ছাড়া আরও কয়েক শত টাকা আছে। খুচরাও আছে কিছু।

"জোরে চল।"

"দুটাকা ভাড়া নেব মাইজি।"

"তোকে পাঁচ টাকা দেব। জোরে চল—"

কার্তিক পুকুরের ধারে ফুলের দিকেই তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। হঠাৎ লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল সে।

"আরে হুই—হুই—হুই—তুই এখানে কি করছিস রে—"

আনটার গলা না ? কার্তিক উঠিয়া পড়িল। হ্যাঁ, আনটাই তো। একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে।

"এ কি তুমি এখানে! মাছ ধরছ না কি—"

"না। অমনি এসেছি। ঘোড়া পেলে কোথা।"

"আমি যে সার্কাসটায় চাকরি করতাম—সেটা আসানসোলে এসেছে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম কাল মোহিনীকে দেখতে। আমার মাইনেও বাকি ছিল তিন

মাসের। মোহিনীকে দেখতে পেলাম না, শুনলাম সে হারামজাদী পালিয়েছে রিং মাস্টারের সংগে। ম্যানেজার বললে, সার্কাস ভালো চলছে না, মাইনে দিতে পারবে না। অনেক খেলোয়াড় ভেগেছে। সার্কাসের জিনিস-পত্র জানোয়ার-টানোয়ার বিক্রি করে সে সার্কাস উঠিয়ে দিচ্ছে। আমি এই ঘোড়াটায় চড়লুম। বললাম—আমাকে বাকি মাইনের-বদলে তাহলে এই ঘোড়াটাই দাও। প্রথমে দিতে চায় না, শেষে আরও একশ' টাকা দিয়ে নিলাম ঘোড়াটা। ভালো করি নি ?"

"ঘোড়া নিয়ে কি হবে !"

"চড়ব আমরা ! তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না ?"

"তা জানি। কিন্তু—"

"তোমাকে দশটা গাঁয়ে ঘুরতে হয়, সাইকেলে চড়ে ঘোরা সহজ না কি। তার চেয়ে খটখটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবে, ম্যানেজার সাহেবকে মানাবে। আর এ কি যে সে ঘোড়া। হেট্—হেট্—হেট্।"

হঠাৎ ঘোড়াটা পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং পিছনের দুই পায়ের উপরই ভর করিয়া আগাইয়া গেল কার্তিকের দিকে। লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ঘোড়াটাকে।

"সাবাস বাচ্চা সাবাস !—"

আনটা ঘোড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া আদর করিল।

"একশ টাকা তুমি পেলে কোথায় ?"

"দোকান থেকে শ' দুই টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মোহিনী যদি আসতে চায় আমার সঙ্গে তাকে কিছু গয়না কাপড় কিনে দেব। কিন্তু সে তো সটকান দিয়েছে। একশ' টাকা দিয়ে ঘোড়াটাই কিনে ফেললাম। ভালো করিনি ?"

"আমাকে না জিগ্যেস করে দোকান থেকে টাকা নিয়ে তুমি অন্যায় করেছ আনটা—"

"তুমি এবার মঞ্জুর করে দাও। সার্কাসটা কাছে এনেছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। বাই করে চলে গেলাম। তোমার কাছে আসবার সময় পেলাম কই—"

"অন্যায় করেছ—"

"আমার মাইনে বাকি নেই ? হিঁ হিঁ সেটি মনে রেখো। এমন লাচুনি ঘোড়া তুমি একশ' টাকায় কোথা পাবে—"

কার্তিক গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কিছুই যেন ভালো লাগিতেছিল না।

"ওই, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে ! আমার পিছন দিকে চেপে পড়—"

"রেকাব নেই চড়ব কি করে—"

"এ পিঠ পেতে তোমাকে তুলে নেবে—। বৈঠ্—বৈঠ্—"

ঘোড়াটা পিছনের পা দুইটি মুড়িয়া পিঠ নীচু করিয়া দিল।

"এইবার চেপে পড়, চেপে পড়—চেপে আমাকে জাপটে ধরে থাক।"

কার্তিক অবশেষে না চড়িয়া পারিল না। ঘোড়া কদম চালে চলিতে শুরু করিল। আর তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল লর্ড। দেখা গেল, তাহার একটা কান উলটাইয়া গিয়াছে। তীরবেগে ছুটিতেছে সে।

আনুটা বলিল—"খেজুরিতে রমেশ সিংগীর বাড়িতে একটা পুরানো ঘোড়ার সাজ আছে। জিন লাগাম—সব। সেটা কিনতে হবে বুঝলে—আরে তুমি রা কাড়ছ না কেন।"

কার্তিক তবু কিছু বলিল না।

রাউতপুরের মাঠে গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়াছিল। সে মাঠের ধারে প্রকাণ্ড একটা আম গাছ ছিল। আম গাছের দুইটি শাখা খুব নীচু হইয়া প্রায় সমান্তরাল রেখায় কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তাহারই একটি শাখার উপর বসিয়াছিল চপলা। শ্যাম-পত্রপল্লবের পটভূমিকায় রক্তাম্বরধারিণী চপলাকে দেবীমূর্তি বলিয়া মনে হইতেছিল। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে এই ধরনের একটি মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন—"মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশিমণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি।" সে মূর্তি সীতারামপত্নী শ্রীর। সে মূর্তিও অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সকলে দেখিয়াছিল "অতুলনীয়া এক রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার টাটের মতো, চারিদিকে বৃক্ষশাখা বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে, চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে—"।

সেদিন সেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রী যাহা বলিয়াছিল চপলা কিন্তু তাহা বলিল না। তাহার ভাষা অন্যরূপ। আবেদনও ভিন্ন।

চপলা বলিল—"আমি তোমাদের মা। এই দুর্দিনে তোমরা সসম্মানে যাতে খেতে পাও তার ব্যবস্থা আমি করেছি। সে ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে সর্বস্ব পণ করতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম তোমরা সুখে শান্তিতে ভদ্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু আজ শুনলাম আমার প্রতিবেশী কৃষ্ণধনবাবুর মেয়ে মালতীকে নিয়ে দুটি গুণ্ডা না কি রাউতপুরে এসেছে। সে গুণ্ডা বাঙালী কি বিহারী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তারা গুণ্ডা তারা অভদ্র এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তোমাদের সকলকে তাই আমি অনুরোধ করছি সেই গুণ্ডাদের ধরে তোমরাই শাস্তি দাও আর মালতীকে ফিরিয়ে দাও তার বাবা মায়ের কাছে।…"

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—"মেয়েটি নিজে চলে এসেছে। কেউ তাকে জোর করে আনে নি। সে বিয়ে করতে চাইছে ওই ছেলেটিকে। এতে জোর জবরদস্তি কিছু নেই—"

চপলা সে দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"নাবালিকা মেয়ে নিজের মতে চলতে পারে না। তার বাবা মায়ের মতেই তাকে চলতে হবে—"

"ওইখানেই আমাদের আপত্তি। ছেলেমেয়েদের উপরও তার বাবা মার অন্যায় অত্যাচার আমরা বরদাস্ত করব না। তাছাড়া বয়স হিসাবেই নাবালিকা সাবালিকা ঠিক করা সঙ্গত নয়। মালতী বয়স হিসাবে হয়তো নাবালিকা, কিন্তু তার দেহ ও মন সাবালিকার। তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার কোনও অধিকার নেই তার বাবার—"

"ভীড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কে কথা বলছেন, সামনে এসে দাঁড়ান।"

কেহ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল না। জনতার ভিতর উত্তেজনা দেখা দিল।

"মালতী সত্যিই যদি নিজের ইচ্ছায় চলে এসে থাকে, নিজের মতে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে কথাও সে সকলের সামনে এসে বলুক—"

"যদি দরকার হয় সে কথা সে আদালতে বলবে। এখানে বলবে কেন!"

চপলা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর শান্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি আমার সর্বস্ব পণ করে এই দুর্দিনে তোমাদের খাওয়াবার ভার নিয়েছি। আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু তোমরা মানবে না?"

জনতার ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না। উত্তেজিত কলরব উঠিল চতুর্দিকে। জনতার ভিতর হইতে একজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা আপনি শুধু একবার হুকুম দিন। আমরা মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি ওদের হাত থেকে—"।

নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল চপলা।

"জয় মা অন্নপূর্ণার জয়, জয় মা অন্নপূর্ণার জয়, মা অন্নপূর্ণার জয়—"

তাহার পর হঠাৎ শোনা গেল—"আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে—"

চপলা দেখিল কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

"অন্নপূর্ণা, না রাক্ষসী? দেবী না দানবী? আমাদের ঘরে ঘরে আগুন লাগাবার বন্দোবস্ত করে ভালো মানুষের মতো এখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন—হারামজাদী, শয়তানী—"

একদল গুণ্ডা তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

চপলার কাছে রিভলভার ছিল, কিন্তু সে গুলি ছুড়িল না, ছোরা ছিল কিন্তু ছোরা বাহির করিল না। প্রস্তরমূর্তিবৎ সে নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেবল। একটা প্রকাণ্ড থান ইঁট আসিয়া তাহার কপালে লাগিল। মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল সে। আর উঠিল না।

॥ ৫ ॥

ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক নারী ধর্ষিতা হইয়াছে। চপলার কো-অপারেটিভ দোকানগুলি লুঠ করিয়াছে গুণ্ডারা। পুলিশের গুলি চলিয়াছে, কারফিউ জারি হইয়াছে। তবু কিন্তু শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। শক্তিমানেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলদের পীড়ন করিতেছে। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট একটি শান্তি-সমিতি গঠন করিয়াছেন। সে সমিতির কাজ গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া শান্তির বাণী শোনানো এবং হিতোপদেশ বিতরণ করা। কার্তিক এইরূপ একটি সমিতির নেতা। তাহার কাজ বন্দুকধারী পুলিশ পরিবৃত হইয়া সভায় সভায় বক্তৃতা করা। চপলা বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সে চপলাকে ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু চপলা মরিয়া যাওয়াতে তাহা আর হইল না। চপলার অনুপস্থিতিই

যেন তাহার পায়ে একটা অদৃশ্য শৃংখল পরাইয়া দিল। বার বার মনে পড়িতে লাগিল —"অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালদেব যা করেছিলেন এ যুগে তোমাকেও তাই করতে হবে। কারণ এ যুগটাও মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগের গণতন্ত্রও মাৎস্যন্যায়ের গণতন্ত্র। তোমাকে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে স্বয়ং। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

চপলা ঠিক এই কথাগুলিই হয়তো বলে নাই, কিন্তু যাহা বলিয়াছিল তাহার ভাবার্থ উহাই। কার্তিক ঠিক করিয়াছে চপলার এই আদর্শকে সে মূর্ত করিবে। এ স্থান ত্যাগ না করিবার আর একটা কারণ নিমু। নিমু বলিয়াছে সে আর কোথাও যাইবে না। এইখানেই থাকিবে। চপলাদির আদর্শ অনুসরণ করিয়া সে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সেবা করিবে। কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত সে মিশিয়া গিয়াছে। ভোমরা এখন তাহার সখী। ভোমরার ছেলেমেয়েরা তাহারই ছেলেমেয়ে। মালতী মাথায় সিঁদুর পরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বিবাহ করিয়াছে একটি অবাঙালী নীচজাতীয় যুবককে। কৃষ্ণধনবাবু এ বিবাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। নবজামাতাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজন করাইয়াছে নিমু। মালতীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। একটি দুঃখজনক ঘটনায় কার্তিকের অর্থসমস্যারও সমাধান হইয়া গিয়াছে। করোনারি হইয়া কালীকিংকর মারা গিয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। নিমুই এখন সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সেদিন একটি জনসমাবেশে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া কার্তিক উপস্থিত হইল। আন্টার ঘোড়াটা সে-ই আজকাল ব্যবহার করে। আন্টা ঘোড়াটারই সেবা করে আজকাল কেবল। আর কিছু করে না। নিমুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে। তাহার ফাই-ফরমাস খাটে এবং মাঝে মাঝে সার্কাসের নানা রকম বাজি দেখায় তাহাকে।

বিরাট জনতাকে সম্বোধন করিয়া কার্তিক বলিতে লাগিল—এখনও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছে সবলরা দুর্বলকে পীড়ন করছেন। আপনাদের সেবক আমি। আপনাদের কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি, জোর যার মুলুক তাক—এ নীতি ভুল নীতি। সংস্কৃতে এর নাম মাৎস্যন্যায়। দেশে অষ্টম শতাব্দীতে এই মাৎস্যন্যায় আমাদের দেশকে যখন ছারখার করছিল তখন দেশের লোকেরা গোপালদেব নামক একজন লোককে নির্বাচিত করে এ দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করেন। দেশে আবার সুখ-শান্তি ফিরে আসে। কেন এই গোপালদেবকে নির্বাচন করেছিলেন দেশের লোকেরা? ইতিহাসে এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। ইতিহাসে এর সদুত্তর না থাকলেও আমাদের মনের ভিতর এর সদুত্তর আছে। গোপালদেব সকলকেই সমান মনুষ্যত্ব মর্যাদার আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে আশ্বাস আমরা এই সেদিনও শুনেছি কবি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে, তাঁর 'আখেরী' কবিতায়—

> কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে
> মিথ্যা দলিল তাদের যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে'।
> দলিল তাদের বাতিল যারা মানুষকে চায় করতে খাটো।
> হামবড়াইয়ের সংহিতা কোড, বেবাক কাটো বেবাক কাটো।
> সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোট নয় কারোই চেয়ে ॥

কার কাছে তুই নোয়াস মাথা ত্রস্ত চোখে কম্পদেহে ?
সবাই সামনে আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের
ভেদের তিলক-তকমাতে লোকসংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ বলেই গরব যাদের, চায় নারীদের দলতে পায়ে
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ, মরদ সে কি ? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিসও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সেকি ? জিজ্ঞাসা কর
মাংসপেশীর পেষণ বলে হয় না মহৎ হয় না ডাগর।

প্রতিটি মানুষ যেদিন প্রতিটি মানুষকে এই মর্যাদা দিতে পারবে, শুধু বাহ্যিক লোক দেখানো আর্থিক সাম্য নয়, যেদিন শ্রদ্ধা-পূত আন্তরিক সাম্য জাগবে সকলের মনে, সেই দিনই আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আমাদের হীন করে, দুর্বল করে এবং তারই পঙ্কে আমরা শেষে তলিয়ে যাই নিজেরাও। অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব যা করতে পেরেছিলেন আমরাই বা তা পারব না কেন ? যে গণতন্ত্রে টাকা দিয়ে বলপ্রয়োগ করে লোভ দেখিয়ে ভোট যোগাড় করতে হয় সে গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয়—গণতন্ত্রের নামে তাও ধনতন্ত্র তা-ও জবরদস্তিতন্ত্র। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা পশুত্বের পথ ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে উন্মুখ হোন, স্থাপন করুন সেই গণতন্ত্র যা স্বাধীন বিচার-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা লোভ বা মোহ দ্বারা প্রভাবিত নয়—"

আর একজন অশ্বারোহী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কার্তিকের পাশে আসিয়া অশ্বের বল্গা সংযত করিলেন। বলিলেন, "আপনার বক্তৃতা শুনলাম। যদি অনুমতি করেন এ বিষয়ে আমার মতামতও ব্যক্ত করি।"

"কে আপনি।"

"আমার নাম ফকির চাঁদ সামন্ত।"

নামটা শুনিয়া কার্তিকের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। নামটা যেন শোনা-শোনা।

"আপনিই কি গোপালদেব সম্বন্ধে একটা বই লিখেছিলেন ? ডাস্টবিন থেকে আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করেছিলাম—"

"ও। মালিনীর জ্যাঠা আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন। আমার সমস্ত জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। আমি পালিয়ে এসেছি। আমি কিছু বলতে চাই—"

"বেশ তো, বলুন—"

"আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই বলছি। সবাই জানেন, গোপালদেব অষ্টম শতাব্দীতে অসাধ্যসাধন করেছিলেন। আমার মনে হয় তা তিনি করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি প্রেমিক ছিলেন। তিনি শুধু যে বৌদ্ধ ছিলেন তা নয়, আমার মতে তিনি সহজিয়া-পন্থী সাধকও ছিলেন। দেদ্দা ছিলেন তাঁর সাধনসহচরী। তাঁদের অনাবিল প্রেমই জনপ্রিয় করেছিল তাঁদের। প্রেমের জোরেই তাঁরা জাতিভেদের বৈষম্য দূর করে স্থাপন করেছিলেন আদর্শ গণতন্ত্র—"

ফকির চাঁদের পিছনে আর একটি ছায়া অশ্বারোহী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শাণিত তরবারি, চোখের দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা।

তিনি বলিলেন—"আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে শক্তির জোরে। সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবার আগে, বিনাশ করতে হবে অসত্য অশিব ও অসুন্দরকে। তা প্রেম অহিংসা বা সাম্যের বুলি আউড়ে হবে না—তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করতে হবে!"

তাঁহার কথা কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না। তাঁহার আবির্ভাবও কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সেই মহাপ্রেত মহাশূন্যে অসি আস্ফালন করিতে করিতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেলেন।

দুই পথিক

উৎসর্গ

শ্রীমুরারীমোহন বাঁগচি
প্রীতিভাজনেষু

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে তুমুল মেঘ, ঝড় আসন্ন। গোবর্ধনবাবু পারঘাটায় এসে পেঁছিলেন পারের আশায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশা অবশ্য হতাশায় পরিণত হল। এও তিনি অনুভব করলেন পিতৃবাক্য অমান্য করে অন্যায় করেছেন। যখন জেনেছিলেন আজ ত্র্যহস্পর্শ তখন তাঁর আসা উচিত হয়নি। পারঘাটার ঘরটির দিকে তাকালেন তিনি। তাকিয়ে কোনও আশ্বাস পেলেন না। পারঘাটায় যাত্রীদের জন্য যে ঘরটি আছে সেটি একটি অদ্ভুত সমন্বয়। একটা দেওয়াল পাকা, সাবেক আমলের চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। বাকি তিনটে দেওয়াল কাঁচা, মাটি দিয়ে তৈরি। মাথার উপর যে চালাটা আছে সেটাও অদ্ভুত। সেটার খানিকটা খড়, খড়ের উপর খাপরাও আছে কিছু, আর খানিকটা টিন। একটু হাওয়া হলেই খড় খড় শব্দ হয়। গোবর্ধনবাবু দেখলেন পারঘাটায় যাত্রীদের কাছে পয়সা নেবার জন্য যে ট্যারা লোকটি এখানে সাধারণত থাকে সে-ও অনুপস্থিত। বস্তুত, কেউ নেই আশে পাশে। থমথম করছে চতুর্দিক। গঙ্গাও যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিসের প্রত্যাশায়। তারপরই শোঁ শোঁ করে শব্দ হল। ঝড় এসে গেল। খড় খড় করে উঠল টিনটা। গোবর্ধনবাবু দৌড়ে ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলেন।

"দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, পা-টা মাড়িয়ে দেবেন না।"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গোবর্ধনবাবু।

"টর্চ আছে আপনার পকেটে?"

"না।"

"আমার কাছেও নেই। অথচ বাড়িতে ফুললি লোডেড ভালো টর্চ আছে একটা। আসবার সময় আনতে ভুলে গেলাম। আমি তো সব জিনিসই ভুলি, আমার গিন্নিও ভুলে গেলেন, মেয়েটাও ভুলে গেল। দাঁড়ান, আমি একটু সরে যাচ্ছি ঘেঁষটে ঘেঁষটে। আপনি একটু বাঁ-দিকে ঘেঁষে আসুন। ঘাটের কাছে এই গর্তটায় পড়ে গিয়ে পা-টি বেশ মচকেছি, বেশ জমাটি রকম মচকেছি। একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে এসে ওই বাঁ দিকের কোণটাতেই বসে পড়ুন। যা গতিক দেখছি আজ সমস্ত রাত্রিই এখানে অবস্থান করতে হবে। নৌকা আজ আর আসছে না, এলেও তাতে চড়া নিরাপদ নয়। যাক্, তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আসুন, আসছেন?"

"আসছি, বাঁ-দিক ঘেঁষেই আসছি।"

খুব সন্তর্পণে গিয়ে বাঁ কোণটাতে বসে পড়লেন গোবর্ধন।

"আপনি কি ওপারের যাত্রী নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আসুন আজ এইখানেই দুজনে মিলে রাত্রিবাস করা যাক। আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সহ-অবস্থান। ভালোই হল, কথা কয়ে সময়টা কাটবে, অবশ্য ঘরটা যদি হুড়মুড় করে মাথার উপর না পড়ে—"

"যদি পড়েও উপায় কি, মাথা পেতে নিতে হবে। বাইরের অবস্থা বেশ ঘোরালো—"

"এবং জোরালো। ওই কোণের দিকে খড় আছে, ভালো করে গুছিয়ে বসুন যতক্ষণ পারেন।"

"বসছি। দাঁড়ান কুকুরটাকে ডেকে আনি।"

"কুকুর? কুকুর আছে নাকি আপনার?"

"সঙ্গে ছিল না, রাস্তায় জুটে গেল। নেড়ি কুকুর। ভাব হয়ে গেছে। দেখি, কোথা গেল।"

"ঘরের তো এই অবস্থা। এর ভেতর কুকুর ঢোকাবেন? ভেবে দেখুন।"

"আমি ঢোকাতে চাইলেই ঢুকবে কি? ওরা মনমর্জি প্রাণী। বাইরে দাঁড়িয়ে বা কোনও আস্তাকুঁড়ের ছাইগাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপবে তবু ভিতরে আসবে না। তবু দেখি কোথা গেল।"

বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু।

খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন, "এল না। ভজুয়ার বউটার সঙ্গে ভাব

"ভজুয়া আবার কে?"

"ট্যারা ভজুয়াকে চেনেন না? এখানে প্রথম এসেছেন বুঝি! ভজুয়াই তো এখানকার মালিক। পারাণির পয়সা নেয়, ট্যাক্স কলেক্টার।"

"আমি যখন এলাম তখন তো সে ছিল না!"

"মদটদ আনতে গেছে বোধ হয়। বউটা তো চাট্ তৈরি করছে দেখলাম।"

"আমাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করে দেয় না। পয়সা দেব।"

"পয়সা দিলে দেবে না। এমনি যদি হয়। বলে তো এলাম। মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে দেব। দেবে কি না ভগবানই জানেন। ওদেরই আজকাল রাজত্ব, বুঝলেন—"

"রাজত্ব মানে?"

"মানে, কারও পরোয়া করে না। মানুষেরও নয়, প্রকৃতিরও নয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই গতর খাটিয়ে খায়। ঝড় বৃষ্টিতে আমরা বেকায়দায় পড়েছি, ওদের গ্রাহ্য নেই। স্বামীটা মদ আনতে গেছে, স্ত্রী চাট্ তৈরি করছে। আমরা কি ও রকম পারি?"

"রাম কহ। তবে আমরা যা পারি তা আবার ওরা পারে না। বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আমার সুখ হবে মনে হচ্ছে। অদৃষ্টে যদি থাকে ভজুয়ার বউ সদয় হবে। হয়তো চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সবই জুটে যাবে শেষকালে। অদৃষ্টের খেল তো আগে থাকতে বোঝবার উপায় নেই। ভজুয়ার বউয়ের কানে একটা কথা তুলে দিলে হয়তো কাজ হত।"

"কি কথা?"

"একজন সাধুবাবা এখানে আছেন। অন্ধকার বলে দেখতে পাচ্ছেন না, আমার আপাদমস্তক সব গেরুয়া।"

"ও, তাই নাকি। আমার প্রণাম নিন। গেরুয়ার উপর আমার খুব ভক্তি।"

"শুধু আপনার কেন, অনেকেরই। আমি গেরুয়ার উপযুক্ত হতে পেরেছি কি না

জানি না—খুব সম্ভবত পারিনি—কিন্তু ওরই জোরে বেশ চালিয়ে যাচ্ছি। এ দেশে গেরুয়াধারীরা অনেকেই বেশ বড়লোক, অনাহারে তো কেউ মরেই না। ভক্ত জুটে যাবেই। ওই ভজুয়ার বউ যদি শোনে একজন সাধুবাবা এখানে বসে আছে, খাবার নিয়ে আসবে ঠিক। অন্তত ফলও আনবে দু'একটা। এ এক অদ্ভুত দেশ।"

গোবর্ধনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের লোক ?"

"আরে না মশাই। আমি এই সেদিন পর্যন্ত পুলিশে চাকরি করেছি। আমার জীবন-কাহিনী বিচিত্র। আপনার নামটি কি ?"

"আমার নাম গোবর্ধন। গোবরও বলতে পারেন, ষাঁড়ের গোবর", বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

"বাড়ি কোথা ? বিহারেই ?"

"আজ্ঞে না। বাংলাদেশে। তা না হলে এমন দুর্দশা হয়। কোলকাতায় আমার কাজ ছিল কি জানেন ? ফাটা একটা পেয়ালায় পানসে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতাম সকাল বেলা। তারপর সারাদিন চক্কোর মারতাম, যদি কোথাও কিছু লেগে যায়। অনেক জায়গায় লাগব-লাগবও হয়েছিল। কিন্তু লাগল না। ভায়ারা শত্রুতা করলেন। বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু কে জানেন ? বাঙালী।"

"বিহারে কেন এসেছেন ?"

"ওই চাকরির চেষ্টায়। ওপারে বিটলা গ্রামে সৌদামিনী দেবী বলে কে আছেন, তিনি যদি একটা চিঠি লিখে দেন, একজন উপমন্ত্রী তাহলে নাকি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন। করবেন, মানে করতে পারেন। নদীর ওপারে বিটলা গ্রাম। ও গ্রামের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এসে দেখছি নৌকো নেই, নৌকোর আশাও নেই। যে রকম ঝড় বৃষ্টি নেবেছে তাতে এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি ?"

"সাহেবগঞ্জ থেকে। সেখানে আমার এক আত্মীয় রেলে চাকরি করেন, তিনিই খবরটা দিলেন। আর সেখানে বটুদা বলে এক পরোপকারী শিক্ষক আছেন তাঁর কাছ থেকে চিঠিও যোগাড় করে দিলেন একটা। এককালে সৌদামিনী দেবী নাকি বটুদার ছাত্রী ছিলেন।"

গেরুয়াধারী চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। হঠাৎ টিকটিকি ডেকে উঠলে যেমন শোনায় তেমনি শোনাল। কয়েক মুহূর্ত উসখুস করে গোবর্ধনবাবু বললেন, "ভজুয়ার বউয়ের কানে তুলে দিয়ে আসব নাকি কথাটা। ঠিকই বলেছেন সাধু সন্ন্যাসীদের উপর ওদের অগাধ ভক্তি।"

"কুকুর খুঁজতে গিয়ে এই তো খানিকটা ভিজে এলেন। আবার যাবেন ?"

"তাতে কি হয়েছে। বৃষ্টিতে আমার কিছু হয় না।"

আবার উঠে বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। ফিরতে প্রায় আধঘণ্টা খানেক দেরি হল। গেরুয়াধারী মচকানো পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে নিবিষ্ট চিত্তে বাইরে ঝড়ের আওয়াজ শুনছিলেন। তাঁর মনে হল ঝড়ের বেগটা যেন কমছে। গোবর্ধনবাবু ফিরলেন।

"ঝড়টা কমলো। কিন্তু বৃষ্টিটা চেপে এল।"

"কি বললে ভজুয়ার বউ ?"

"কিছু বললো না, ঘাড়টি তুলে মুচকি হাসল একটু। আর এইটে করে দিলে—। এইটের জন্যই দেরি হল একটু।"

গোবর্ধন কোঁচার টেপ দিয়ে একটা বাটি ধরে এনেছিলেন, অন্ধকারে গেরুয়াধারী দেখতে পাচ্ছিলেন না।

"কি করে দিলে ?"

"এই চুনে-হলুদটা। ভজুয়ার টর্চটাও এনেছি। দাঁড়ান লাগিয়ে দিচ্ছি ভালো করে।"

টর্চ জেলে অবাক হয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। দিব্যকান্তি গৈরিকধারী কে এই মহাপুরুষ। টকটক করছে গায়ের রং, বড় বড় প্রদীপ্ত চোখ, কুচকুচ করছে চোখের কালো তারা।

"চুনে-হলুদটা এনে ভালোই করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। দিন, লাগিয়ে দিই।"

"আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি, কোন্ পা-টা ? আপনার মতো একজন সন্ন্যাসীর পদ-সেবা করতে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য।"

"ভুল করবেন না। আমি সন্ন্যাসী নই। সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছি। রিহার্সাল দিচ্ছি। আচ্ছা করুন পদ-সেবা, আমি ঠিক লাগাতেও পারব না।"

এই বলে একটা পা তিনি বাড়িয়ে দিলেন।

"এই পা-টায়। গোড়ালিটার একটু ওপরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইখানে" গোবর্ধন সসম্ভ্রমে গেরুয়াধারীর পায়ে চুনে-হলুদ লাগাতে লাগলেন।

গেরুয়াধারী বললেন, "অন্ধকারে আপনার কথা শুনে এবং কাজকর্মে উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল আপনার কম বয়স। কিন্তু আপনার চুলে পাক ধরেছে দেখছি, অনেকের অবশ্য কম বয়সেই চুলে পাক ধরে—"

"না, না, তা নয়। মেঘে মেঘে আমার বেশ বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি। গত জুনে আটচল্লিশ পার হয়েছি।"

"এ বয়সে তো লোকে রিটায়ার করবার কথা ভাবে। আপনি এখনও চাকরি খুঁজছেন ? আশ্চর্য তো। চাকরি করেছিলেন এর আগে ?"

"কতবার। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি কি জানেন ? আমার বাবা। তাঁর জন্যেই আমার কিছু হ'ল না। জীবনে প্রথম চাকরি পেয়েছিলাম একটা বইয়ের দোকানে—"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও আই—"

"ও তাই নাকি ! গ্রেট মেন থিংক্ অ্যালাইক শুনেছিলাম, কিন্তু এ যে গ্রেট মেন বিগিন অ্যালাইক দেখছি।"

আবার সেই ঘর-কাঁপানো হাসি।

"আপনার বাবার কথা কি বলছিলেন ?"

"আমার বাবা এক অদ্ভুত লোক। এককালে জমিদার ছিলেন, মেজাজও সেই রকম। কিন্তু দেশ হয়ে গেল স্বাধীন এবং নেতাদের ভাগ-বাটোয়ারায় আমাদের জমিদারিটি পড়ে গেল পাকিস্তানে—। ভাগাভাগি হবার আগেই বাবা ভাগ্যে কোলকাতায় একটা আস্তানা করেছিলেন তাই কোনরকমে সেখানে মাথা গুঁজে আছি—"

"আপনার ভাই বোন—"

"কেউ নেই। একচন্দ্রো তমো হন্তি। আমিই একমাত্র বংশধর। আর সেইটেই হয়েছে ট্র্যাজিডি। বাবা কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে আমি জমিদারের বংশধর। তাই চাকরি পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেন, কি করতে হয়, ওদের ব্যবহার কেমন, মালিক ভদ্রলোক কি না, যদি কোথাও একটু খুঁত বেরুল, ব্যস্ আর রক্ষা নেই। ছেড়ে দাও ও চাকরি। এ ভাবে যে কত চাকরি গেছে তা আর কি বলব আপনাকে। অথচ বাড়িতে আমার কি কাজ জানেন? বাবার তামাক সাজা। ওরে গোবরা তামাক দে, ওরে গোবরা আর এক ছিলিম সাজ—হরদম লেগেই আছে। সারি সারি বারো চোদ্দটি কলকে সেজে রাখি আর যখন দরকার হয় টিকেটি ধরিয়ে দিই। শুধু কি টিকে ধরিয়েই নিস্তার আছে, ফুঁ দিতে হবে যতক্ষণ না ধরছে। বেশ করে ধরিয়ে গড়গড়ার উপর কলকেটি বসিয়ে নলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে, নিন টানুন। তিনি তখন চোখ বুজে ভড়াক ভড়াক করে টানবেন। রাত্রেও নিস্তার নেই। গোবরা ঘুমিয়েছিস নাকি? একটা কলকে ধরিয়ে দে তো বাবা। রোজ এই ব্যাপার। আমার হাতের তামাক সাজা না হলে বাবার কিছুতেই পছন্দ হয় না। বউকে তামাক-সাজা শেখালুম। লুকিয়ে বউয়ের সাজা কলকে দু'একটা দিলুম ধরিয়ে। কিন্তু একটান দিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল বাবার। কে সেজেছে? এটা সুবিধে হয়নি তো! বুঝুন, এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাবার তামাক সাজতে হচ্ছে। আসলে এই তামাক-সাজার জন্যে সম্ভবত আমাকে উনি কাছছাড়া করতে চান না। যেই একটি চাকরি যোগাড় করি, অমনি জেরা শুরু হয়। তোমার মালিক কি জাত? সোনার বেণে? ব্রাহ্মণের ছেলে সোনার বেণের অধীনে চাকরি করবে কি! ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিতে হয়। ছেড়ে দিয়ে আবার এসে তামাক সাজা। এই চলছে সারাজীবন। কিছু রেস্ত ছিল এতদিন, তাই ভাঙিয়ে চলছিল, আর কিছু নেই তাই বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে। এখন ওই সৌদামিনী দেবী যদি দয়া করেন—"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"তা মা ষষ্ঠী কৃপা করেছেন। চারটি মেয়ে, চারটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স কুড়ি, বড় ছেলেটির বয়স পনরো। কি যে অকূল পাথারে পড়েছি দাদা তা আর আপনাকে কি বলব—"

"হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি। আমর এই গেরুয়া চাদরটাই নিন, একধারটা ছিঁড়ে ফেলুন, ইতস্তত করবেন না, পুরোনো চাদর। এইবার বেশ করে ব্যাণ্ডেজটা করুন।"

ব্যাণ্ডেজ করা শেষ হলে গোবর্ধন বললেন, "ভজুয়ার টর্চটা দিয়ে আসি। অন্ধকারে বউটা না হ'লে আতান্তরে পড়বে।"

"যান

আবার বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। বৃষ্টিটা আরও চেপে এল। গেরুয়াধারী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন একটু। আমি কি একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের জন্য এতটা করতুম? এই আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

গোবর্ধনবাবু আবার ফিরলেন মিনিট দশেক পরে। হাতে একটা লণ্ঠন, মাথায় গায়ে একটা কাপড় জড়ানো।

"লণ্ঠন পেয়েছেন একটা? ভালোই হয়েছে। গায়ে মাথায় কি জড়িয়েছেন ওটা?"

"ভজুয়ার বউয়ের একখানা শাড়ি। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কি না, কিছুতেই ছাড়লে না, বললে কাল ওটা কাচতেই হবে, আপনি এখন গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিন ওটা, তা নাহলে আপনার সব ভিজে যাবে।"

"আপনার সঙ্গে চেনা ছিল বুঝি ওদের?"

"হ্যাঁ, এদিকে এসেছিলাম বার দুই ফুটবল ম্যাচ খেলতে। ওদের বাড়ির কাছেই ফুটবল ফিল্ড্। ম্যাচ খেলবার পরও ছিলাম দিন দুই। এই ঘাট পেরিয়েই শিকারে গিয়েছিলাম। ওপারের জঙ্গলে বটের আছে অনেক। সেই সময় ভাব হয়েছিল এদের সঙ্গে। অনেক পাখি মেরেছিলাম, শুধু বটের না, হাঁসও। এদেরও দিয়েছিলাম, কি করব অত পাখি নিয়ে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত না। এইখানে একটা পিকনিক গোছের করা হয়েছিল। ভজুয়ার বউ মশলা পিষেছিল আর জল তুলেছিল ভজুয়া। অনেক লোক জুটে গিয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। ওরা লোক ভালো। এই যে লোকে বাঙালী-বিহারী ফিলিং বলে, সাধারণ লোকের মধ্যে তা তো দেখতে পাই না। যত ফিলিং শিক্ষিতদের মধ্যে—"

"ঠিকই বলেছেন। শিক্ষিতরাই পাজি। শিক্ষিতরা ওদের মতো খেটে খেতে পারে না। তাদের অধিকাংশই নির্ভর করে চাকরির উপর। তাই চাকরিতে কেউ বখরা বসাতে এলে ফিলিংয়ের সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা গুণের কদর করত, এরা ভাইপো-ভাগনেদের কদর করে। ইংরেজরা যখন এদেশের প্রভু ছিল তখন তাদের অধীনে আমি চাকরি করেছি। তাদের মহত্ত্বে আমি অভিভূত। আমার বিদ্যে সাধ্যি তেমন ছিল না, কিন্তু আমি কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম, আর অসাধুও ছিলাম না। আমার এই দুটো গুণের মর্যাদা তারা দিয়েছিল, এরা দিত না।"

"আপনি পুলিশে কাজ করতেন?"

"সে অনেক পরে। আমার জীবন-কাহিনী বড় বিচিত্র। আর এ বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি আগে থাকতে প্ল্যান করে ঢুকিনি। আমার বিশ্বাস কি জানেন? আমাদের প্রত্যেকেরই মাথায় একটি অদৃশ্য টিকি আছে এবং একটি অদৃশ্য হস্ত ধরে আছে সেই টিকিটি। টিকি ধরে সেই হস্ত আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে আমরা যাচ্ছি, যেখানে দাঁড় করাচ্ছে দাঁড়াচ্ছি, যেখানে বসাচ্ছে বসছি। অথচ আমাদের ধারণা আমরাই সব নিজেরা করছি। নিজেদের করবার ক্ষমতা আমাদের কিছু নেই। আমরা সবাই নিয়তির দাস। নিজেদের জীবন থেকে এই শিক্ষাটি পেয়েছি। আর এও জেনেছি প্রত্যেকের জীবনেই উত্থান পতন দুইই আছে। একটানা উত্থান বা একটানা পতন কারো জীবনেই নেই। হয় না। প্রাইম মিনিস্টার নেহেরুকেও জেল খাটতে হয়েছিল—"

গোবর্ধনবাবু স্মিতমুখে কথাগুলি শুনলেন। কৌতুক মিশ্রিত ঈষৎ কৌতূহল জাগল তাঁর মনে।

"এখন তো আর কিছু করবার নেই, যদি আপত্তি না থাকে শোনান আপনার জীবন-কাহিনী। শুনে হয়তো কিছু শিক্ষালাভ করব—"

"বলতে আপত্তি নেই, বলছি। কিন্তু যদি ভাবেন শুনে কিছু শিক্ষালাভ করবেন তা হলেই ভুল করবেন। অপরের জীবন-কাহিনী শুনে বা অপরের জীবন-চরিত পড়ে কারও কোন শিক্ষা হয় না। মনে একটু সুড়সুড়ি লাগে শুধু। সাধু মহাপুরুষদের জীবনী তো কত রয়েছে বাজারে, স্কুল কলেজে পড়ানোও হয়, কিন্তু সাধু মহাপুরুষ

কটা দেখতে পান ? 'ম' কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হাজার হাজার বিক্রি হয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন মাত্র একটি। দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আর তো হল না। হয় না। ওই যে গোড়াতেই বললুম অদৃশ্য টিকি আর অদৃশ্য হাত, আমাদের জীবন ওদেরই লীলা-খেলা। মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে মহাপুরুষ হবার আশা জাগে অনেকেরই, কিন্তু হবার উপায় আছে ? টিকি ধরে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেইখানে যেতে হচ্ছে। সুতরাং আমার জীবন-কাহিনী শুনে শিক্ষা পাবেন সে আশা করবেন না। শিক্ষার কথা অনেক আছে কিন্তু সে শিক্ষা আপনার কাজে লাগবে না। আপনাকে আপনার টিকির টানে চলতে হবে—"

"কিন্তু একই শিক্ষা বহু লোকের কাজে লাগে নাকি ? এই ধরুন স্কুল কলেজে অঙ্ক বা ভাষা আমরা সবাই শিখেছি, সেটা কি আমাদের কাজে লাগছে না ?"

"কিন্তু সে শিক্ষা পেয়ে আমরা কি সবাই একরকম হয়েছি ? যিনি অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তিনি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর যিনি অঙ্কে লাস্ট ক্লাস লাস্ট তিনি তার পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে সাঁ করে চলে যাচ্ছেন। এটা কোন্ মন্ত্রবলে হচ্ছে ? স্কুল কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই তা অনেকটা জামাজুতোর মতো। সবাই জামাজুতো পরে, কিন্তু সবাই একই রকম হয় না। যে শিক্ষা আমাদের জীবনপথে চালিত করে, যার জোরে আমি আমার বৈশিষ্ট্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই তার নামই শিক্ষা। আর সে শিক্ষার প্রেরণা আসে নিজের ভিতর থেকে এবং আমার বিশ্বাস সেটা যোগায় আমাদের অদৃশ্য টিকিধারী অদৃশ্য চালকটি—তার নাম ভগবান, অদৃষ্ট, নিয়তি—যা ইচ্ছে দিতে পারেন, কিন্তু আসল মালিক তিনি—। আমি একবার আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—বড় অদ্ভুত স্বপ্ন—"

"কি রকম ?"

"আচ্ছা সেটা যথাস্থানে বলা যাবে। জীবন জিনিসটাই বড় মজার—"

"বলুন শুনি আপনার জীবন-কাহিনী। আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে মনে হচ্ছে যেন কোন উপন্যাস পড়ছি—"

"জীবনই তো উপন্যাস। উপন্যাসে তো জীবনের কথাই সাজিয়ে গুছিয়ে বলেন লেখকরা। বেশ শুনুন। তবে আমার ওই থলিটা একটু এগিয়ে দিন। নস্যি আছে বার করি—"

গেরুয়ার থলিটা এগিয়ে দিলো গোবর্ধন। তার থেকে ফাঁক-মুখো বেশ বড় একটি কৌটো বার করলো গেরুয়াধারী। কৌটোটির উপর বার দুই তিন তর্জনী দিয়ে টোকা দিলেন। তার পর ঢাকনাটি খুলে বেশ বড় এক টিপ নস্যি নিয়ে ভর্তি করে দিলেন নাসারন্ধ্র দু'টি। তার পর টান দিলেন জোরে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। গেরুয়া পাঞ্জাবির আস্তিনে চোখের জল মুছে গোবর্ধনের দিকে চাইলেন আর একবার।

"সত্যিই শুনবেন ?"

"হ্যাঁ, বলুন না ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলেন গেরুয়াধারী।

"কোনখান থেকে আরম্ভ করব ? একেবারে ছেলেবেলা থেকে ?"

"তাই করুন না। সমস্ত পিক্‌চারটা পাওয়া যাবে তাহলে।"

"না, তা যাবে না। শেষের দিকটা আঁকাই হয়নি এখনও। আচ্ছা গোড়া থেকে

বলছি। নাম ধাম গোপন করে বলব কিন্তু। যাঁদের কথা অনিবার্য ভাবে এসে পড়বে তাঁদের সম্বন্ধে সত্যভাষণ হয়তো তাঁরা পছন্দ করবেন না, সুতরাং নাম-ধাম চেপে যাচ্ছি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর শুরু করলেন :

"ছেলেবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে আমার। বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন। খুব বিলাসে লালিত পালিত হচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে বাবা মারা গেলেন। সব ফুরিয়ে গেল। রঙীন ফাঁপা বেলুনটা চুপ্সে গেল যেন। শোক কাটতে না কাটতে মা-ও গেলেন। অনেকে সন্দেহ করেন তিনি আফিং খেয়েছিলেন, অনেকে বলেন শোকের আঘাত সহ্য করতে পারেন নি। সে যাই হোক, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলুম। অনেক বাড়িতেই দেখবেন বাড়ির রোজগেরে বাপটি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বাড়বাড়ন্ত। বাজার থেকে রোজ কাটা মাছ আসছে, হপ্তায় দু'দিন মাংস, ছেলেমেয়েদের টিউটার, বউয়ের নিত্য নূতন শাড়ি গয়না, বন্ধুবান্ধবদের বৈঠকখানায় বসে তাস পেটা আর চা খাওয়া —কিন্তু কর্তাটি যেই চোখ বুজলেন সব শেষ। যে বাড়ি একটু আগে ইলেক্ট্রিক আলোতে ঝলমল করছিল হঠাৎ কে যেন তার মেন সুইচ্টা অফ করে দিলে। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি অনাথ হয়ে পড়লুম। বাঙালীর ছেলের জীবন-তরী সাধারণত ছ'টি বন্দরের কোন-না-কোন একটাতে ঠেকে থেকে—"

"ছ'টি ?" প্রশ্ন করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ ছ'টি, সিক্স্। বন্দর ছ'টি হচ্ছে—বাবার বাড়ি, মামার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি, রাস্তা এবং শ্মশান। বাবার বাড়ির বন্দর থেকে আমার নৌকো ছাড়ল। মামারা সেটাকে গুন টেনে নিয়ে এলেন নিজেদের বন্দরে। মামার বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলাম। প্রথম দু'একদিন বড্ড কষ্ট হয়েছিল। খাওয়া সাধারণত ডাল-ভাত-তরকারি আর এক-আধ টুকরো মাছ। বাবার বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন একাই ছিলাম তো, দু'তিন রকম মাছই খেতাম রোজ, মাংস প্রায়ই হ'ত। রাত্রে শুতাম স্প্রিংয়ের গদি-দেওয়া খাটে, নেটের মশারি ছিল। এখানে শুতে হ'ত একটা খাটে; ছারপোকা ভর্তি দড়ির খাটিয়ায় ময়লা তোশকের উপর। একটা মশারি ছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল মস্কুইটো নেট্ নয়, মস্কুইটো ট্র্যাপ্। অজস্র মশা ঢুকত তার ভিতর। দিনকতক পরে অবশ্য সবই স'য়ে গেল। যে শহরে মামারা বাস করতেন সে শহরের নামটা করব না। হোয়াট্ ইজ্ ইন্ এ নেম। মামাদের নাম করব না। তিন মামা ছিলেন আমার। তিনটি টাইগার। মামার বাড়িতে এসেই কাকার খবর শুনলাম। আমার যে একজন কাকা আছেন সে কথা এক-আধবার বাবা-মার মুখে হয়তো শুনে থাকব, কিন্তু মনে ছিল না। কাকাকে কখনও চোখে দেখিনি। তাঁর সম্বন্ধে মামার বাড়িতে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম তিনি একটি নমস্য ধনুর্ধর। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, সিভিল সার্জন। তাঁর একটা বিখ্যাত পেটেন্ট ওষুধ ছিল ম্যালেরিয়ার। আমার কাকা সেই ওষুধের কারবারের দেখাশোনা করতেন। বাবা ভাইয়ের উপর বিশ্বাস করে নিজে কিছুই দেখতেন না। বাবা সরকারী চাকরি

করতেন তো, তাই ওষুধের ব্যবসাটা ভায়ের নাম বেনামী করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর ভাই লক্ষ্মণ নন, দুর্যোধন। বাবার সম্পত্তির একটি পয়সা পেলুম না আমি। অথচ শুনলাম কাকা টাকার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন, রোলিং ইন ওয়েলথ্। আমি কিছু পেলুম না। সম্পূর্ণরূপে মামাদের পোষ্য হয়ে পড়তে হল আমাকে। সবাই আমাকে অনুকম্পা করত। এমন কি বাড়ির চাকরগুলো পর্যন্ত। খুব খারাপ লাগত। সেই সময় সকলের মুখে মুখে যে আলোচনা শুনতাম এবং কাকার ব্যবহারে যেটা আমার মনে ছাপ রেখে গেল সেটা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় টাকা জিনিসটা তুচ্ছ নয়। ওটার এমন একটা ভয়ানক দাম আছে যা অনায়াসে ভাইকে ভাইয়ের শত্রু করে তুলতে পারে। আমারও শিশু মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল টাকা রোজগার করতে হবে। দিদিমাকে চুপিচুপি একদিন জিগোসও করলাম, দিদিমা আমি কবে টাকা রোজগার করব। শুনে তো তিনি হেসেই আকুল। তারপর বললেন, "আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তবে তো টাকা রোজগার করবে। মুখ্যুরা তো টাকা রোজগার করতে পারে না। লেখাপড়া শিখলে তখন তো চাকরি হবে। সাহেবদের কাছে কদর হলেই সব হবে।"

গোবর্ধন বললেন, "আমার বাবারও ওই ধারণা ছিল। তাই যতদিন না আমি এম-এ পাশ করলুম ততদিন ফিঙের মতো লেগেছিলেন আমার পিছনে। বাবার তামাক সাজতুম আর পরীক্ষার পড়া পড়তুম। কিন্তু কি হল, কিছুই হল না—"

"আপনি এম-এ পাশ নাকি? বাঃ—! আমি মশাই মুখ্যু মানুষ, কোনও রকমে ছেঁচড়ে মেচড়ে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলুম। মামারা আমাকে ওখানকারই একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমার মা সরস্বতীর সঙ্গে যা কিছু পরিচয় হবার হয়েছিল। মা সরস্বতী না বলে ম্যাডাম সরস্বতী বলাই ভালো, কারণ স্কুলটি ছিল ক্রিশ্চান মিশনারিদের।"

আর এক টিপ নস্য নিলেন গেরুয়াধারী।

"লেখাপড়ায় মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। ওই কোনরকমে ঘেঁষটে-মেষটে প্রমোশনটা পেতাম। ফেল করিনি একবারও। আমি লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম না বটে, কিন্তু 'চলন্তা পুজো' ছিলাম। মাস্টার মশাইরা সকলে ভালোবাসতেন আমাকে। স্কুলেরও অনেক ছেলে ভালোবাসত, অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ক্রিশ্চান স্কুলে নানা জাতের ছেলে থাকে। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান তো থাকেই, হিন্দু মুসলমানও থাকে। আমাদের স্কুলে 'জু'ও ছিল দু'একটা। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের, বিশেষত সাঁওতাল ক্রিশ্চানদের, খুব ভালো লাগত আমার। তাদের মধ্যে সাঁওতালি সরলতার সঙ্গে সাহেবী আদায়কায়দার সমন্বয় এত ভালো লাগত যে কি বলব। এই স্কুলে ডেভিস আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে-ও আমার মতো পড়াশোনায় তেমন ধারালো ছিল না, কিন্তু সে জানত কোন্ গাছে হলদে পাখি বাসা বাঁধছে, কাদের গাছে পেয়ারা পাকছে, শীতকালে নদীর চড়ায় হাঁসরা আসতে আরম্ভ করেছে কি না। হাঁসের খবর সে দিত আমাদের থার্ড মাস্টার লম্বোদরবাবুকে। তিনি শিকার করতে ভালোবাসতেন খুব। কোন্ মাস্টার কি খেতে ভালোবাসেন তার খবরও রাখত সে। হেড মাস্টার মশাইকে প্রায়ই মুলোটা কলাটা এনে ভেট দিত নিজেদের বাগান থেকে। আরও খবর রাখত নানারকম। বিশেষ করে চেনাশোনা কারও বাড়িতে কেউ অসুখে

পড়েছে কি না। চেনাশোনা কারও বাড়িতে অসুখ করলে আমরা সেখানে নাইট-ডিউটি করতে যেতাম। আমাদের স্কুলে সমাজ-সেবা দল ছিল, কোথাও কলেরা হলে, কোথাও বন্যা হলে, কারও বাড়িতে অসুখ করলে সেই দলের ছেলেরা যেত সেবা করতে। তাদের সঙ্গে একজন শিক্ষকও থাকতেন। ডেভিস ছিল সেই দলের সেরা পাণ্ডা। আমিও সেই দলের ছিলাম।"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের স্কুলেও ওই রকম একটা দল ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে কোথাও যেতে দিতেন না।"

"অমাক সাজার অসুবিধা হবে বলে বোধ হয়।"

"না, তা ঠিক নয়। বাবা এক অদ্ভুত ধরনের আদর্শবাদী লোক। তাঁর বিশ্বাস ছেলেরা কচি গাছের মতো, তাদের যদি ঠিক মতো বেড়া দিয়ে ঘিরে রক্ষা না করা যায় তাহলে গরু ছাগলে তাদের মুড়িয়ে খাবে। তারা আর বাড়তে পাবে না। আমাকে তাই চিরদিন বাবার কাছেই থাকতে হয়েছে। বাবা আমাকে যেখানে সেখানে যে সে মনিবের কাছে চাকরি পর্যন্ত করতে দেন নি।"

"হ্যাঁ, ও ধরনের একটা হিসাব আছে বটে। কিন্তু সবাই এ হিসেব রাখতে পারে না। আমার তো বাবা মা কেউ ছিল না, হিসেব রাখবে কে। মামাদের মধ্যে একজন কোলকাতায় ডাক্তারি করতেন আর বাকী দু'জন বাড়ির খেয়ে চাকরি করতেন, একজন কমিশনার্স আপিসে, আর একজন কালেক্টারের আপিসে। সেকালের বাঙালী সমাজের দুটি স্তম্ভ ছিলেন দুজন। তাঁরা নটার সময় খেয়ে আপিসে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যার সময়। ফিরে চা জলখাবার খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে আবার বেরিয়ে যেতেন তাস পাশার আড্ডায়। আমি কি করছি না করছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না কেউ। মামীমারাও করতেন না, তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন রান্নাঘরে। আশ্রিত ভাগ্নেটা কি করছে না করছে, পড়াশোনা করছে কি না এ সব খোঁজ রাখা তারা তাঁদের জুরিসডিক্‌শনের বাইরে মনে করতেন, ছেলেদের খোঁজ রাখাটাই তাঁরা তাঁদের জুরিসডিক্‌শনের বাইরে মনে করতেন। নিজেদের ছেলেদেরও খোঁজ রাখতেন না। সন্ধ্যের সময় পড়াতে আসতেন জগু মাস্টার। ক্ষীণ-দৃষ্টি ভীতু লোক। তারই উপর ভার ছিল আমাদের পড়াশোনার। মেজমামা বাঘ লোক ছিলেন, কথায় কথায় লোককে জুতো নিয়ে মারতে দৌড়তেন, শহরের সকলেই তাঁকে ভয় করত, কমিশনার সাহেবের দক্ষিণহস্ত ছিলেন তিনি। ভয় না করে উপায় ছিল না। যাদের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা তিনি 'কচে বারো ছত্তিনু নয়' প্রভৃতি পাশার বোল সগর্জনে আউড়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন, তারাও কেউ কখনও বিরক্ত হয়নি তাঁর উপর। বরং তিনি তাদের বাড়িতে এসে অনুগ্রহ করে পাশা খেলছেন এতে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত সবাই। এর কারণ আতিথেয়তা নয়, এর কারণ প্রতাপ এবং টাকা। কোনও বাজে-মার্কা গরীব লোক যদি রোজ বাড়িতে এসে ওইরকম হাল্লা করত তাহলে তারা তাড়িয়ে দিত তাকে।"

"তা ঠিক বলা যায় না সব সময়ে"—কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন গোবর্ধন—"ছোটবেলা থেকে আমার কুকুর পোষার শখ। ভালো কুকুরের অনেক দাম, তা কেনবার মতো পয়সা অবশ্য ছিল না, কিন্তু দেশী কুকুরের বাচ্চা পেলেই পুষতাম। পুষে বেঁধে রাখতে হত, তা না হলে ঘরদোর নোংরা করত। কিন্তু কুকুরের বাচ্চাকে বেঁধে

রাখলে যে কি রকম চেঁচামেচি করে তা জানেন বোধ হয়। দিনরাত চেঁচাত। কিন্তু বাবা মা কেউ বিরক্ত হন নি—"

"হন নি তার কারণ আপনি। ছেলের খেয়াল মেটাবার জন্য মা বাপ সব সহ্য করতে পারে। আমি মাতাল ছেলের হাতে বাপকে মার পর্যন্ত খেতে দেখেছি, মাকে অম্লান বদনে গয়না খুলে দিতে দেখেছি। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, জগু মাস্টারের কথা। ভীতু ক্ষীণদৃষ্টি লোক ছিল সে। মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পেত। আমাদের পড়াত না, খোশামোদ করত, পাছে মামাকে আমরা তার নামে কিছু বলে দি। তবে একটা ভালো কাজ করত সে। আমাদের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলত। আমাদেরও ইংরেজিতে উত্তর দিতে হত। এর ফলে ইংরেজিটা বেশ বলতে কইতে পারতাম। এ জিনিস পরে কাজে লেগেছিল, খুব কাজে লেগেছিল। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন গেরুয়াধারী। কান পেতে কি শুনতে লাগলেন বাইরে। ঝড় জলের শব্দের সঙ্গে আর একটা আলোড়নের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

"ওটা কিসের শব্দ বলুন তো—"

"গঙ্গার জল তোলপাড় করছে।"

"ও!"

আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

তারপর শুরু করলেন আবার।

"আগেই বলেছি ছেলেবেলা থেকে সবাই একটা ধারণা মনের মধ্যে যেন কাঁটির মতো ঠুকে বসিয়ে দিয়েছিল—টাকা রোজগার করতে না পারলে জীবনই ব্যর্থ। টাকা চাই, টাকা। লেখাপড়া শিখে কি হবে? লাদুরাম মাড়োয়ারি কি লেখাপড়া জানে? ক অক্ষর গোমাংস। কিন্তু তার দুটো ল্যান্ডো, তিনটে মিল, প্রকাণ্ড বড় কাপড়ের দোকান। সবাই তাকে সেলাম করে। আজকাল মিনিস্টাররা পর্যন্ত তার ভয়ে জুজু হয়ে আছে। অনেক ভোট তার হাতে। লাদুরামকে আমার হিংসে হ'ত, কিন্তু এ-ও আমি জানতাম আমি লাদুরাম হতে পারব না। বামন চাঁদে হাত দিতে পারে না, ওদের মতো টাকা রোজগার করবার শক্তি সামর্থ্য ফন্দি ফিকির আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—আমি চাকরি করে বড়বাবু হতে পারি। আমার মামা সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ, কিন্তু কি তার প্রতাপ, কি দবদবা, কমিশনার সাহেব হাতের মুঠোর মধ্যে। বাড়িতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, সরস্বতী পুজো সব হ'ত। কমিশনার সাহেবের বড়বাবু ছিলেন বলেই এত সব পেরেছেন। অবশ্য তিনি কমিশনার সাহেবকে খুব ঝুঁকে সেলাম করতেন এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু এ রকম চাকরি পেলে আমিও সেলাম করতে রাজী ছিলাম। মোটকথা ছেলেবেলা থেকে চাকরিই আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল, লেখাপড়া নয়—"

গোবর্ধন বললেন, "সেলামের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। বলব? আমার বাবা যে কি রকম খামখেয়ালী তাহলে বুঝতে পারবেন।"

"বলুন—"

"অনেক ধরাধরির পর এক জায়গায় অনেক কষ্টে আমার চাকরি হল একটা। চাকরিতে গিয়ে জয়েন করলাম। বেশ ভালোই লাগল। মাইনে দেড়শ টাকা। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—'কি রকম আপিস?' বললাম, 'ভালোই,

তবে একটা রুল দেখলুম একটু ইয়ে গোছের।' বাবা জিগ্যেস করলেন—'ইয়ে মানে?' 'মানে আপিসের প্রথম রুলটা হচ্ছে কোন ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করতে হবে'। বাবা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'ও চাকরি করতে হবে না। মানুষের আত্মসম্মান সবচেয়ে বড়। যেতে হবে না ও আপিসে। এক কলকে তামাক সাজ—' "

"অদ্ভুত লোক তো আপনার বাবা। চাকরি কখনও করেন নি কি না, তাই চাকরির মর্ম বোঝেন না। স্বাধীন জীবিকা শুনতেই ভালো,-কিন্তু ওই স্বাধীন জীবিকায় যত লোককে তেল দিতে হয় চাকরিতে তত হয় না।"

গোবর্ধন উসখুস করছিলেন, শেষে উঠে দাঁড়ালেন।

"আসছি একবার—"

"আবার এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরুচ্ছেন?"

"ভিজতে আমার ভারি ভালো লাগে।"

ভজুয়ার বউয়ের শাড়িখানা মাথায় গায়ে জড়িয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন। গেরুয়াধারী বলে উঠলেন, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন ফিরলেন মিনিট কুড়ি পরে।

"আর একটু হলেই ফসকে গিয়েছিল—"

"কি?"

"তামাক খাওয়াটা। অনেকক্ষণ থেকেই ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সঙ্গে তো কোন সরঞ্জাম নেই। হঠাৎ মনে পড়ল ভজুয়ার বউ তামাক খায়। শিকারে যখন এসেছিলাম তখন তাকে তামাক খেতে দেখেছিলাম। গিয়ে দেখি খাচ্ছে। আর একটা মুশকিল হ'ল দ্বিতীয় হুঁকো নেই। স্বামী-স্ত্রীর একটি হুঁকো। শেষে হাতে করে গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গীতেই খেলাম। ভজুয়ার বউ বললে ও বাজার থেকে আমার জন্য একটা হুঁকো আনবে—"

"এই বৃষ্টিতে আপনার জন্যে হুঁকো কিনতে বাজারে গেল নাকি?"

"ও ভজুয়াকে খুঁজতে বেরুচ্ছে। ওর ভয় হচ্ছে মদ খেয়ে যদি নর্দমায় পড়ে এ দুর্যোগে তাহলে আর বাঁচবে না। এতক্ষণ তার ফেরা উচিত ছিল। নিন, এইবার শুরু করুন আপনার গল্প, চমৎকার লাগছে—"

"এখনও তো কিছুই শোনেন নি। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে যে কত জায়গায় ঘুরিয়েছে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ—"

"যদি একটা কথা জিগ্যেস করি, মনে কিছু করবেন কি?"

"না। স্বচ্ছন্দে করুন।"

"মধ্যে মধ্যে ওঁ তৎসৎ বলছেন কেন অমন করে?"

"সম্প্রতি যাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছি, যিনি বলেছেন যে আমার অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার সূর্য উঠবে, তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন দিনে রাত্রে যতবার পার ওঁ তৎসৎ বলবে। তাঁর আদেশ পালন করে যাচ্ছি।"

"এইবার বলুন আপনার গল্প।"

"হ্যাঁ, কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম ?"

"আপনার স্কুলের জীবনের কথা বলছিলেন।"

"ম্যাট্রিক পাশ করবার পর মামা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আর এক মামার কাছে। উদ্দেশ্য তাঁর কাছে থেকে কলেজে পড়া। মামা ডাক্তার ছিলেন, কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। রয়াল বেঙ্গল টাইগার একটি। চোখের দিকে চাইলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যেত। ইয়া ভারী থমথমে মুখ, ভুঁড়ো নাক, থ্যাবড়া চিবুক, মজবুত চোয়াল। ভাঁটার মতো বড় বড় চোখ। ভুরু নেই। প্রকাণ্ড টাক এসে মিশেছে চওড়া কপালে। দুটোয় মিলে গড়ের মাঠ হয়ে গেছে একেবারে। এই মামার পাল্লায় এসে পড়লাম। প্রথম দর্শনেই তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ। মনে হল একটু যেন হাসির আভাস ফুটি ফুটি করছে তাঁর গম্ভীর মুখে। বললেন, 'খুব লম্বা হয়েছিস তো। প্রায় আমার সমান হয়ে গেছিস।' এটা আমার অপরাধ না গৌরব তা বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। মামা বললেন, 'স্কটিশ চার্চ কলেজে বলে রেখেছি। কাল সকাল সকাল খেয়ে তৈরি হয়ে থেকো, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' পরদিন তিনি আমাকে সোজা স্কটিশ চার্চে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলে দিলেন, 'মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আর একটি কথা মনে রেখো, আমি বেশী উপদেশ দিই না, দরকার হলে হাত চালাই। তাতেও যদি কাজ না হয় দূর করে দি'।' ভয়ে জুজুটি হয়ে রইলাম। রোজ কলেজে যাই, নিয়মিত সময়ে ফিরে আসি। মামা বই পত্তর খাতা পেন্সিল সব কিনে দিলেন। তখন ফাউন্টেন পেনের এত ছড়াছড়ি হয়নি। কলেজের নোটটোট সব পেন্সিলেই লিখতে হ'ত। তারপর দরকার হলে দোয়াত কলমের সাহায্যে সেগুলো 'ফেয়ার' করতে হ'ত বাড়িতে। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ভালই হ'ত। দু'পীস করে পাকা মাছ দুবেলাই পেতাম। সকালে বাসি রুটি আর গুড়। কলেজ থেকে এসে পরোটা বা লুচির সঙ্গে আলুর ছেঁচকি। সে বিষয়ে কোনও খুঁত ছিল না। আমি অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলাম অন্য কারণে। আমার 'পকেট-মনি' বলে কিছু ছিল না। আমার যখন যা দরকার হ'ত মামা নিজেই গিয়ে কিনে দিতেন। জামা, কাপড়, জুতো সব। আমার হাতে কাঁচা পয়সা দিতেন না কখনও। আমারও যে একটা হাত-খরচ দরকার এ হুঁশ তাঁর হ'ত না। একটি পয়সা হাতে তুলে দেননি কখনও। তাঁর ধারণা ছিল হাতে পয়সা পেলেই ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। পয়সা না পেয়েও বিগড়ে গেলাম। কলকাতা শহরে প্রলোভন কত। আর আমার সঙ্গীরা কলেজে সর্বদাই এটা-ওটা কিনত। কখনও চানাভাজা, কখনও ঝালমুড়ি, কখনও ডালমুট, কখনও ঘুগনি কত কি। রেস্টুরেন্টে চা কফি কেক বিস্কুট সবাই খেত। আমি মুখটি চুন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম দূর থেকে। কখনও কমনরুমে বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতুম। কিন্তু প্রাণের ভিতরটা খাঁ খাঁ করত। আত্মসম্মানে আঘাত লাগত যেন। ক্রমশ জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। ভাবলুম এমনভাবে পরের হাত-তোলা হয়ে কতদিন আর থাকব। লেখাপড়া শিখেই বা হবে কি! তাছাড়া লজিকটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না। বড়ই মনমরা হয়ে দিন কাটাতে লাগলুম। একদিন হেদোর ধারে বেড়াচ্ছি এমন সময় ডেভিসের সঙ্গে দেখা। আমার সেই স্কুলের বন্ধু ডেভিস। তার চেহারা দেখে আমি তো অবাক! ঠোঁটের কোণে সিগারেট জ্বলছে, পরনে সাহেবী পোশাক,

পায়ে চকচকে জুতো। তার চলন বলন হাবভাব ভঙ্গী একেবারে সাহেবের মতো। দেখে তাক লেগে গেল।

আমিই এগিয়ে গিয়ে সম্বোধন করলাম তাকে। সে আমাকে দেখতে পায়নি।

'কি রে ডেভিস যে। কোথা আছিস? খুব সুখেই আছিস মনে হচ্ছে।'

'আরে সাণ্ডেল নাকি! তুই এখানে কোথা?'

'আমি স্কটিশে পড়ি। তুইও পড়চিস নাকি কোথাও?'

'না, আমি চাকরি করি। কলকাতাতেই থাকি।'

'চাকরি? কি চাকরি করছিস? তুই তো ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারিস নি।'

'আমি যে চাকরি করছি তাতে কোন পাশের দরকার নেই, ডাঁট থাকলেই হল। তুই যদি চাস তাহলে তোকেও জুটিয়ে দিতে পারি সে-চাকরি। খালি হয়েছে একটা পোস্ট—'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

'কি রকম চাকরি?'

'ভালো চাকরি। ত্রিশ টাকা মাইনে পাবি। তোর নাম হবে সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট। তোর under-এ একটা কেরানী থাকবে। তুই থাকবি ঠিক সাহেবের মতো। Stair case আলাদা, closet আলাদা, কোম্পানী তোকে লাঞ্চ খেতে দেবে। তোর মাইনে তোকে গিয়ে আনতে হবে না। খামে ভরে তোর টেবিলে দিয়ে যাবে ঠিক তারিখে। কিন্তু একটি কথা ভাই, সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। তোর under-এ বা অপর কারুর under-এ যে বাবুরা থাকবে তাদের কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারবে না। আপিসের ভিতর কদাচ বাংলা কথা উচ্চারণ করবে না। পারবি তো?'

'তা চালিয়ে দেব কোনরকমে। ভুলটুল হবে হয়তো, কিন্তু চালিয়ে নেব।'

'কি করছিস তুই আজকাল—'

'স্কটিশে পড়ছি।'

'ছোঃ, কলেজে পড়ে তো অক্‌স্‌ডাং (oxdung) হবি। চলে আয় তুই আমার আপিসে।'

'কিন্তু আমার যে ভাই সাহেবী পোশাক নেই। পোশাক কেনবার পয়সাও নেই। মামার গলগ্রহ হয়ে আছি। সাহেবী পোশাক পরিওনি কখনও, টাই বাঁধতেও জানি না।'

ডেভিস আমার পিঠ চাপড়ে বললে—'সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভয় নেই তোর। আমি তোর ওল্ড ফ্রেণ্ড, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আজ মাইনে পেয়েছি। তুই কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সাত নম্বর চাঁদনি চকে চলে আয়। আমি থাকব সেখানে। আমার চেনা দোকান। সব ঠিক করে দেব তোর।'...পরদিন ভোরবেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে পেঁছে গেলাম সাত নম্বর চাঁদনি চকে। ডেভিস উপস্থিত ছিল। সে আমাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকল। পাঁচ টাকা দিয়ে জিনের একটা সাদা স্যুট কিনে দিলে। তখনকার দিনে হ'ত, অবশ্য স্যুট মানে প্যান্ট, কোট আর টাই। দোকানের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে আমাকে শিখিয়ে দিলে কি করে টাই বাঁধতে হয়। বার কয়েক বেঁধে আর খুলে রপ্ত করে নিলাম ব্যাপারটা। তারপর ডেভিস নিয়ে গেল

আমাকে চিনে বাজারে। সেখানে ন'সিকে দিয়ে এক জোড়া জুতোও কিনে দিলে। এই সাত টাকা চার আনা ধার করে আমার চাকরি জীবন আরম্ভ হ'ল। পরের মাসেই অবশ্য টাকা শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার স্নেহের ধার শুধতে পারিনি। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গেরুয়াধারী চুপ করে যেন আত্মস্থ হয়ে রইলেন। বাইরের হাওয়ার দাপটে একটা ছোট জানলা দুম্ করে খুলে গিয়ে আলোটা নিবে গেল। গোবর্ধনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

"তারপর? চাকরিতে জয়েন করলেন?"

"হ্যাঁ, সেই দিনই ডেভিস আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন থ্যাকার স্পিংক এণ্ড কোম্পানির দোকানে ম্যাকফারসন্ সাহেবের কাছে। রাস্তায় যেতে যেতে সে আমাকে বললে, 'তোমাকে কিন্তু নিজেকে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দিতে হবে।' শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললাম না। তারপর বললে, 'তোমার নামের বানানটা এমনভাবে করবে যেন সাহেবী-সাহেবী মনে হয়। অনিল সাণ্ডেল লিখলে চলবে না। বানান করতে হবে O'neil Sawnyell—এই ভাবে। আপিসে গিয়ে ডেভিস নিজেই একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে এসে বলল—এইখানে সই কর। ঠিক ওই রকম বানান করবি। ওই রকম বানানেই সই করলাম বটে, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, এ করছি কি? হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, অতবড় বংশের বংশধর, এ কি দুর্মতি ঘিরেছে আমাকে। কিন্তু তখন আর পিছুবার উপায় ছিল না। স্যুট জুতো কেনা হয়ে গেছে।...ডেভিস দরখাস্ত নিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই সাহেব ডাকল আমাকে। সেলাম করে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চেহারাটা আমার ভালোই ছিল। আপাদমস্তক দেখলেন আমাকে। নতুন জুতো, নতুন স্যুটে মানিয়েছিল বেশ। প্রথমেই জিগ্যেস করলে—What are you? আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, I am a man. শুনে হা হা করে হেসে উঠল ম্যাকফারসন্। দরাজ হাসি ছিল লোকটার। তারপর বললো, I know you are a man, but what is your nationality? বললাম, I am an Indian. Anglo-Indian কথাটা আর মুখ দিয়ে বেরুল না। তারপর ম্যাকফারসন্ যা করলে তা অদ্ভুত। পকেট থেকে দুটো গুলি বার করে একটা টেবিলের উপর রাখলে; আর একটা আমার হাতে দিলে। তারপর বাঁ চোখটা কুঁচকে বললে—Strike! গুলি খেলায় বাল্যকাল থেকেই দক্ষ ছিলাম, টকাস্ করে মেরে দিলাম। সাহেব বললে—অল্ রাইট্, I appoint you. সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডেভিস্ বললে, সাহেবের একটু মাথার ছিট্ আছে। আমাকে পাঞ্জা ধরতে বলেছিল। ও একটু পাগলাটে গোছের—"

গোবর্ধন হেসে বললেন, "একবার এক পাগলাটে সাহেবের পাল্লায় পড়ে আমার চাকরি গিয়েছিল। শুনবেন গল্পটা?"

"বলুন—"

"পাগলাটে সাহেবেরা সাধারণত লোক ভালো হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের উপকার করে। আপনার যেমন করেছিল, কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উল্টো হয়ে গেল। তখন একটা পোস্টাফিসে চাকরি করি, টেলিগ্রাম স্কুল থেকে পাশ করে টেলিগ্রামে চাকরি পেয়েছিলাম। বেশ চাকরি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বাবাও আপত্তি করেনি।

কিন্তু কোত্থেকে ওই ম্যাজিস্ট্রেট শনির মতো জুটল আমার কপালে। কোন্ সময়টা জানেন ? তখন বিহারে ভূমিকম্প হয়েছিল। নাইন্‌টিন থার্টি ফোর। চারদিকে তখন হাহাকার। বাড়ি ঘর-দোর পড়ে গেছে অনেকের, ট্রেন চলাচলও বন্ধ। টেলিগ্রাফের লাইনও ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। দোকান-পাটও বন্ধ। সে এক বিশৃংখল ব্যাপার। চারিদিকে কেমন যেন থমথমে আবহাওয়া—"

"খুব জানা আছে আমার। আমি তখন রিলিফ গাড়ি নিয়ে ঘুরছি ব্রেট সাহেবের সঙ্গে। আমার ভাগ্যোদয় হয়েছে তখন। পরে বলব সে কথা। তারপর বলুন—"

"সেই সময় একটা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল ওখানে, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সে। মোটর ছিল, মোটর চালাতে জানত, কিন্তু ঘুরত সাইকেলে। তাঁর মত ছিল মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ালে সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শুনতাম খুব নাকি বিদ্বান লোক। আসবাবের মধ্যে ছিল কয়েক কেস মদ, আর কয়েক বাক্স বই। কামাতো না। কটা কটা এক মুখ গোঁফ দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, আর সিগারেট খেত অনবরত। কালো কালো সিগারেট, লোকে বলত ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট। একদিন তার বেড্ সুইচ্‌টা খারাপ হয়ে গেল। দোকানদার বললে, বেড্ সুইচ্ আমার নেই। কোলকাতা থেকে আনিয়ে দেব, কিন্তু যে রকম বিশৃংখল অবস্থা দেখছেনই তো, আজই যদি অর্ডার দিই মাসখানেকের আগে আসবে না। শুনে সাহেব গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, তোমার কাছে হাণ্ড্রেট ওয়াটের বাল্‌ব ক'টা আছে ? দোকানদার বলল—তা শ' দুই হবে। সব পাঠিয়ে দাও আমার ওখানে—বলে সাহেব চলে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে না পড়লে সাহেবের ঘুম আসত না। পড়তে পড়তে যখন ঘুম পেত তখন বেড্ সুইচ্‌টি টিপে আলো নিবিয়ে দিত। বেড্ সুইচ্ যখন পাওয়া গেল না, তখন সাহেব কি করল জানেন, যেই ঘুম আসত অমনি মাথার শিয়র থেকে রিভলবার বার করে বাল্‌বটা লক্ষ্য করে গুলি করত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। দম্ করে কেটে যেত বাল্‌বটা, সাহেব ঘুমিয়ে পড়ত। যতদিন না বেড্ সুইচ্ পাওয়া গেল ততদিন রোজ এইভাবে একটা করে বাল্‌ব ভাঙতো। অদ্ভুত খেয়ালী লোক ছিল। দিনে আপিস করত না। কোর্টে আসত খালি। আর আপিসের ফাইল যেত বাড়িতে। স্টেনোকে বলত দিনের বেলা তোমাকে আপিসে আসতে হবে না। রাত্রি নটার পর আমার বাড়ি যেও। স্টেনোর নাম ছিল মতিবাবু। তাঁর মুখে শুনেছি, সে এক দুর্গতি হয়েছিল তাঁর। সাহেব বসে ডিক্‌টেশন দিত না। লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দিত। আর মতিবাবু তাঁর পিছনে পিছনে খাতায় সেগুলো টুকতে টুকতে যেতেন। টোকা হয়ে গেলে সাহেব সংশোধন করতেন সেগুলো। মতিবাবুর দিকে চেয়ে বলতেন, মোটি, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল। আমি যা বলেছি তার প্রায় অর্ধেক ঠিক লিখেছ। গুড্। এই সাহেব আমার চাকরি খেয়ে দিলে।"

"কেন, কি হয়েছিল ? সায়েবরা প্রায় চাকরি খায় না।"

"সমস্ত দিন সিগারেট খেতে না পেয়ে ক্ষেপচুরিয়াস্ হয়ে গিয়েছিল। তখন ভূমিকম্পের সময় তো, নানারকম গুজব উঠেছে শহরে। মুঙ্গের মজঃফরপুর ধ্বংস হয়ে গেছে। গুজব উঠতে লাগল এর চেয়েও প্রচণ্ড ভূমিকম্প আবার হবে। সবাই বলতে লাগল এটা যা হয়েছে সেটা ভূমিকা মাত্র। গ্রন্থারম্ভ পরে হবে। একটা গুজব উঠলেই আর ঘরে ঢুকতে সাহস হ'ত না কারও। সেই দুর্জয় শীতে সবাই খোলা মাঠে

শুত। আর রোজই নূতন গুজব। হিমালয় নাকি ধ্বসে পড়ছে, সমস্ত নদী নাকি ফুলে ফেঁপে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দেবে। টেলিগ্রাফেও এই সব খবর আসত কোলকাতা থেকে। টেলিগ্রাফের বাবুরা যে যা শুনত তা জানিয়ে দিত পরের স্টেশনে। এইভাবে আমি একদিন জানতে পারলুম যে তার পরদিন এমন একটা 'শক্' (shock) হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন হয়নি। ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চতুর্দিক, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি আর বান হবে। আমি যখন মেসেজটা পেলাম তখন শহরের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন টেলিগ্রাফ করতে। তাকে বললুম আমি খবরটা। তার পরদিন শহরের দোকান-পাট সব বন্ধ, শহরের সমস্ত লোক জড় হয়েছে গিয়ে শহরের বাইরের মাঠে। আর হবি তো হ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও সেদিন দেশলাই ফুরিয়েছে। সাহেবের চাপরাশি বাজার থেকে ফিরে এসে তাঁকে বললে, দেশলাই কোথাও পাওয়া গেল না। বাজার সব বন্ধ। সাহেব জিগ্যেস করলে—বন্ধ কেন? সে বললে, শুনতে হেঁ আজ বড়া জোর ভুকম্প হোগা। হাম্ ভি ছুট্টি মাংতে হেঁ। সাহেব কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। মাঠে গিয়ে দেখে লোকে লোকারণ্য। একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলে—তোমরা এখানে ভিড় করেছ কেন? সে বললে, শুনছি আজ ভয়ানক ভূমিকম্প হবে। সাহেব বলল—ভূমিকম্প হবে কি না তা তো আগে থাকতে বলা যায় না। তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ? লোকটা আমতা আমতা করতে লাগল। সাহেব বললে—লুক হিয়ার, আমি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, কে তোমাকে এ খবর দিয়েছে তার কাছে আমাকে নিয়ে চল, তা না হলে এখুনি তোমাকে অ্যারেস্ট করব। আমি ধরে নেব তুমিই এই প্যানিক্ সৃষ্টি করেছ। এমনিভাবে ট্রেস (trace) করতে করতে সাহেব শেষে আমার কাছে এসে হাজির। জিগ্যেস করলে, তুমিই এই খবর ছড়িয়েছ? সত্যি কথা বললাম। সাহেব পোস্টাফিসে দাঁড়িয়েই ফোন করলে পি. এম. জিকে। বললে, তোমাদের একজন টেলিগ্রাফ ক্লার্ক শহরে ভয়াবহ মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে সমস্ত শহরকে তোলপাড় করে তুলেছে। ওকে এখুনি দূর করে দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, তোমার পুরো নাম কি? নাম বললাম। তার পরদিন বাই ওয়্যারে আমার চাকরি গেল। বুঝুন। আমার দোষ কি বলুন? এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্ত হলাম। ওই ভূমিকম্পের আবহাওয়া থেকে বাবার কাছে পালিয়ে গেলাম। বাবা বললেন, বেশ হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। ভালো করে তামাক সাজ দিকি এক কলকে। তুই যাওয়ার পর থেকে জুৎ করে তামাকই খেতে পাইনি। এরা কেউ কিছু সাজতে জানে না। তোমার বউ তো এমন টিপে টিপে তামাক দেয় যে ধোঁয়াই বেরোয় না।"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও ও চাকরি বেশীদিন থাকেনি।"

"কি করতে হ'ত আপনার চাকরিতে—"

"বিশেষ কিছুই নয়। একমাত্র কাজ বই ডেসপ্যাচ করা, অর্থাৎ অর্ডার অনুসারে ভি. পি. করা। আমরা পাঁচজন ডেসপ্যাচার ছিলাম। একজন মোলার (অর্থাৎ মোল্লা), একজন প্যাটার (অর্থাৎ পাত্র), একজন ডেভিস্ নির্ভেজাল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চতুর্থটি জন হেনরি আব্লুসের চেয়েও কালো। আর পঞ্চম জন আমি সন্ইয়েল। চেহারায় আমি ওদের তুলনায় কন্দর্প-কান্তি ছিলাম। দিনকতক পরেই একটু মুশকিলে পড়তে হ'ল। আমার একটি মাত্র স্যুট। সেটি থাকত ডেভিসের

বাসায়। আপিস থেকে গিয়ে সেটি তার বাসায় খ‍ুলে রাখতুম, আবার আপিস যাবার সময় পরে যেতুম। সাদা জিনের স্যুট দ‍ু'চার দিনেই ময়লা হয়ে গেল। আমাদের যিনি ওপর-ওলা ছিলেন, তিনি বললেন ওরকম ময়লা স্যুট পরে আসা চলবে না। পরিষ্কার পোশাক পরে আপিসে আসতে হয় এ জ্ঞানটাও কি নেই ? ম‍ুশকিলে পড়ে গেলাম। কিন্তু ব‍ুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। ব‍ুদ্ধির জোরে এড়িয়ে গেলাম বিপদটা। আমার মাতুলটি ছিলেন শৌখীন লোক। তিনি দ‍ু'দিনের বেশী কোন স্যুট ব্যবহার করতেন না। পনরো ষোলটা স্যুট ছিল তাঁর। আজ যেটা ছেড়ে দিলেন মাস খানেকের আগে আর সেটি পরবেন না। মামীমা ছাড়া স্যুটটি নিজের হাতে ইস্ত্রি করে রেখে দিতেন। আমি মামীমাকে বললাম, 'মামীমা, কলেজে স্যুট পরে গেলে প্রফেসররা একটু সুনজরে দেখে। মামার ছাড়া স্যুটটা আমাকে পরে যেতে দেবে ?'

মামীমা বললেন—'তোর গায়ে কি হবে ?'

আমার হাইট প্রায় মামার সমান হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ বেমানান হ'ল না। দেখল‍ুম একটু আধটু ঢিলে হচ্ছে বটে, কিন্তু কাজ চলে যাবে।

মামীমা বললেন—'পরে যা তাহলে। কিন্তু দেখো যেন দাগটাগ লাগিয়ে বা ছিঁড়েটিড়ে এনো না।'

'না, ছিঁড়ব কেন। এসেই আবার ছেড়ে রেখে দেব। তুমি যেন আবার মামার কানে কথাটা তুলে দিও না। মামা শ‍ুনলে আর পরতে দেবে না।'

মামীমা হাসিম‍ুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। কি মিষ্টি হাসি যে ছিল তাঁর। হাসলে মনে হ'ত ম‍ুখ চোখের ভিতর থেকে একটা আভা বের‍ুচ্ছে। ব‍ুঝতে দেরি হ'ল না যে মামীমা কথাটা প্রকাশ করবেন না। মামা ঠিক আটটা নাগাদ বেরিয়ে যেতেন তাঁর চেম্বারে। ঠিক তার পরেই আমি বের‍ুতাম। আর ফিরতাম মামা ফেরবার আগেই। মামার ফিরতে রাত আটটা ন'টা হয়ে যেত। কিন্তু অতি-লোভে সব মাটি হয়ে গেল। ওখানে ওভার-টাইম খাটলে বেশ রোজগার হ'ত। স‍ুবিধে পেলেই ওভার-টাইম খাটতাম। একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি মামা রেগে কাঁই হয়ে বসে আছেন। আমার চালচলন দেখে অনেক আগেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। বাড়ির কাছেই কলেজ অথচ আমি ন'টার আগেই রোজ তাড়া-হ‍ুড়ো করে খেয়ে বেরিয়ে যাই কেন ? মামীমাকে বলেছিলাম আমি একজন প্রফেসারের কাছে পড়তে যাই। মামা কলেজে খোঁজ নিলেন, দেখলেন আমি একদিনও কলেজ যাই না। জেরা করতেই সত্যি কথা বলতে হ'ল। মামা কান ধরে একটি চড় মারলেন। তারপর বললেন, এখানে আর থাকতে হবে না। কালই বাড়ি চলে যাও। এখানে থাকলে উচ্ছন্ন যাবে।

আমি মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম ডেভিসের বাসায়। সব শ‍ুনে ডেভিস বললে, 'তাতে কি হয়েছে। তুই আমার বাসায় থাক। আমি তো একলা থাকি একটা মেসে। দ‍ু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। আমার ঘরেই একটা সীট খালি আছে—। একটা খবর কিন্তু তোমায় দিচ্ছি। গ্যাব্রিয়েল গসী তোমার পিছনে লেগেছে।'

গোপাল ঘোষ নামটাকে বেঁকিয়ে চ‍ুরিয়ে ওই রকম করে নিয়েছিলেন আমাদের বড়বাব‍ু। তিনি ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ছিলেন। ইনিই আমাকে পরিষ্কার

স্যুট পরে আসতে বলেছিলেন কিছুদিন আগে। ডেভিসের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'আমার পিছনে লেগেছে মানে ? আমার অপরাধ ?'

ডেভিস বললে, 'ওর ইচ্ছে ছিল ওর গবেট শালাটিকে ঢোকাবে তোমার চাকরিতে। ও আশা করতে পারেনি যে আমি তোকে টপ করে ঢুকিয়ে দেব। ও এখন তোর খুঁত ধরবার তালে আছে। সাবধান থেকো—'

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। আমরা থাকতাম ঠনঠনের কালীবাড়ির কাছে একটা মেসে। একদিন সকালে খুব জোরে বৃষ্টি এল। দু'ঘণ্টা এক নাগাড়ে বৃষ্টি। কালীতলায় জল জমে গেল। ট্রাম বন্ধ। সময়ে আপিসে পেঁছিতে পারলাম না। তার পরদিন যখন গেলাম তখন দেখি আমার টেবিলের উপর লেখা রয়েছে—In view of your irregular attendance your service will be dispensed with. এই irregular কথাটা যেন চড়ের মতো এসে লাগল। সোজা চলে গেলাম ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের কাছে। তাকে বললাম, 'একদিন বৃষ্টির জন্যে আসতে পারিনি বলে তোমার গসী আমাকে এই নোটিশ দিয়েছে। আমি যে এতদিন পাংচুয়ালি কাজ করেছি, তার কি কোনও recognition নেই ? একদিন বৃষ্টির জন্যে আসতে পারলাম না আর অমনি আমাকে irregular বলে নোটিশ দেওয়া হ'ল। যে আপিসের এরকম ব্যবহার সেখানে আমি চাকরি করি না। Appoint his blessed brother-in-law. গুড্‌ বাই।'

সেই দিনই রেজিগ্‌নেশন দিয়ে চলে গেলাম। ডেভিসকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তাকে হোটেলে খাওয়ালাম একদিন। তারপর আমার কলকাতার লীলা-খেলা সাঙ্গ হ'ল। অন্য মামাদের কাছে আবার ফিরে এলাম বিহারের সেই শহরে। গিয়ে দেখলাম মামারা আমার জন্যে খুব চিন্তিত, কারণ আমার অনেক আগেই আসবার কথা। জিগ্যেস করলেন, এত দেরি হ'ল কেন ? কোথায় ছিলি ? বললাম, থিয়েটার দেখছিলাম। কেন জানি না বড়মামা সেইটেকেই যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য করে নিলেন। কিছু বললেন না। তার পরদিন বললেন, 'এখানকার কলেজে ভর্তি হও গিয়ে আর মন দিয়ে লেখাপড়া কর।' আমি মামাদের বললাম, 'আমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না। আমাকে একটা চাকরি করে দিন।' ছোটমামা বললেন, 'বেশ, যতদিন চাকরি না হচ্ছে ততদিন পড়ো। ঘরে বসে কি করবে ? চাকরি তো গাছের ফল নয় যে টপ করে পেড়ে দিয়ে দেব।' তাই হ'ল, কলেজেই ভর্তি হলাম। মানে, মামাদের কতকগুলো টাকা জলে পড়ল আবার।"

চুপ করলেন গৈরিকধারী। চুপ করতেই বোঝা গেল ঘরের বাইরে বৃষ্টিতে আর হাওয়ায় যে আলাপ হচ্ছে তা-ও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়।

গোবর্ধন বললেন, "ঝড় বাদলের শব্দ অনেক শুনেছি। কিন্তু আজকে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। রিম্‌ রিম্‌ সোঁ সোঁ ঝর্ঝর বর্ষার অনেক রকম বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু এ মনে হচ্ছে দু'হাতে তালি দিয়ে কেউ যেন খিকখিক করে হাসছে। শুনতে পাচ্ছেন ?"

"পাচ্ছি। সত্যি হয়তো হাততালি দিয়ে খিকখিক করে হাসছে কেউ। আপনি ভুতে বিশ্বাস করেন ?"

"আমি ? আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি মূল্য আছে বলুন। তবে স্বপ্নে আমি একবার ভুত দেখেছিলাম।"

"স্বপ্নে ? স্বপ্নে অবশ্য মৃত লোককে দেখা যায়। সেটাকে ঠিক ভূত-দেখা বলে না। জাগ্রত অবস্থায় যদি মৃত কাউকে দেখা যায় তাহলেই সেটাকে ভূত দেখা বলে—"

গোবর্ধন বললেন, "অনেক দার্শনিকের মতে আমাদের জাগ্রত অবস্থাটাও স্বপ্নের নামান্তর।"

"হ্যাঁ, তা বটে। কাশীর কৌটের মতো একটা স্বপ্নের ভিতর আর একটা স্বপ্ন থাকে। খোলা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই থাকে না পেঁয়াজের মতো। স্বপ্ন জিনিসটাই আশ্চর্য—।"

বাইরে মেঘ ডেকে উঠল গমগম করে।

মনে হ'ল ভারী গলায় কে যেন হেসে উঠল।

গেরুয়াধারী বললেন—"আমি একবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটু আগে আপনাকে বলছিলাম, না ?"

"কি রকম স্বপ্ন ?"

"সে খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন মশাই। শুনবেন ? এখনও সেকথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।"

"বলুন।"

দ্বিতীয়বার কলেজে যখন ভর্তি হয়েছি তখনই দেখেছিলাম স্বপ্নটা। আমি একটা যেন বিদেহী আত্মা মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার দেহ নেই, কিন্তু মন আছে, কামনা আছে। আমি আকাশে সেই গ্রহদের যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি যাঁরা পরজন্মে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন। অনেক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ টকটকে লাল এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পেলাম। বুঝলাম ইনিই জবাকুসুম সংকাশ সূর্য। আমি বিদেহী, কথা তো বলতে পারি না, মনে মনেই বলতে লাগলাম, হে দেব, আমার জন্মকুণ্ডলীতে তুমি এমন স্থানে অবস্থান কর যাতে আমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। সূর্য কিছু বললেন না, একটু মুচকি হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পূর্বাকাশে দেখলাম চাঁদ উঠছে, গোল রুপোর থালার মতো। ওমা, কাছে গিয়ে দেখি অন্যরকম। রুপোও নয়, থালাও নয়। দিব্যি ফুটফুটে একটি যুবক, শাঁখের মতো রং। নবগ্রহ স্তোত্রে যা পড়েছিলাম ঠিক তাই। ক্ষীরোদার্ণব থেকে উঠেছেন তো, বললে বিশ্বাস করবেন না, গা থেকে ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ ছাড়ছিল একটা। সূর্যকে যা বলেছিলাম তাঁকেও তাই বললাম। ইনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। মনে হ'ল আমার প্রার্থনা বুঝি শুনতে পাননি। দূরে রোহিনী নক্ষত্র উঠেছিল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। মঙ্গলের দেখা আর পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক বাজে নক্ষত্রকে প্রথমে মঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার নবগ্রহ স্তোত্র মুখস্থ, বাজে নক্ষত্রকে মঙ্গল বলে ভুল করবার ছেলে আমি নই, খুঁজতে লাগলাম। তারপর দেখতে পেলাম। দেখলাম যেন প্রবাল-রঙের বিরাট একটা বাল্ব জ্বলছে, সাধারণ বাল্ব নয়, কোটি পাওয়ারের বাল্ব। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ইনিই সেই লোহিতাঙ্গ বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভ ধরণী গর্ভসম্ভূত কুমার। এঁকেও মনে মনে প্রার্থনা জানালাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। দেখতে দেখতে সেই বিরাট বাল্ব একটি মনুষ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হল। মনুষ্য মূর্তি বলছি বটে, কিন্তু আসলে তা যেন বিদ্যুতে-তৈরি জ্যোতির্ময় শাণিত তরবারি একটি। তারপর দেখলুম কোথা

থেকে বিরাট এক ভেড়া এসে হাজির হ'ল। তার গায়ের লোমগুলো যেন আগুনের শিখা, শিং দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তৈরি. চোখের দৃষ্টিতেও হুতাশন। সেই ভেড়া পিঠ পেতে দাঁড়াল, মঙ্গল তার উপর চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন অনন্ত অন্ধকারে। আমিও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর বুধকে খোঁজবার পালা। খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু এ-ও বুঝলাম যে ওঁরা নিজে যদি না দেখা দেন দেখা পাব না। আকুল হয়ে খুঁজতে লাগলাম। কতক্ষণ খুঁজেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখলাম শ্যামবর্ণ এক কিশোর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গা দিয়ে ফিকে সবুজ জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। —চেহারাটা দুষ্টু দুষ্টু। চোখের তারা অদ্ভুত। কালো নয়, নীল নয়, সবুজ। যেন দুখানি বেদাগ পান্না জ্বলছে। মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা জানালাম। তিনি হাত দিয়ে দূরে আকাশের একটা জায়গা নির্দেশ করে দিলেন। দেখলাম সে জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে গেছে। আলোটা কিসের হতে পারে তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। মহাকাশে আলোর উৎস তো অসংখ্য। যেমন আলো, তেমনি অন্ধকার। ওই আলোটা কি তা জিগ্যেস করবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বুধ চম্পট দিয়েছে। তখন ওই আলোটার দিকেই অগ্রসর হলাম। কিন্তু একটা মুশকিল হল। যতই যাই, ততই যেন সেটা সরে সরে যায়। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। একটা সুবিধে ছিল অবশ্য, দেহ তো ছিল না তাই ক্লান্তি হচ্ছিল না একটুও। বরং জেদ চড়ে যাওয়াতে গতিবেগ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম লক্ষ লক্ষ যোজন ব্যাপী বিরাট এক আলোক পরিমণ্ডল। তার ভিতরে অনেকে হাত জোড় করে বসে আছেন এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে চিনতে পারলাম। মার্কামারা চেহারা ওঁদের। ব্রহ্মা চতুর্মুখ, মহেশ্বর পঞ্চানন আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ। তখন বুঝতে পারলাম আর যাঁরা বসে আছেন তাঁরাও দেবতা, আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি। আবক্ষ সাদা দাড়ি, মাথায় ঘন সাদা চুল বাবরির মতো। চোখের দৃষ্টি প্রশান্ত গভীর, এবং সুদূর-প্রসারী। তিনি যে কারও স্তব শুনছেন তা মনে হ'ল না। গায়ের রং ঠিক কাঁচা সোনার মতো। আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে আলো তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর সভয়ে মনে মনে জানালাম—হে দেবগুরু, হে বনস্পতি, পরজন্মে আমার জন্মলগ্নে শুভস্থানে অবস্থান করবেন এই প্রার্থনা জানাই। তিনি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। তাঁর দৃষ্টি যেমন সুদূর-প্রসারী ছিল তেমনিই রইল। মনে হ'ল তিনি যেন সমাধিস্থ।"

গোবর্ধন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললে—"এই সব আপনি একটানা দেখে গেলেন স্বপ্নে?"

"হ্যাঁ মশাই। দেখলাম। Truth is stranger than fiction."

"তারপর?"

"তারপর বৃহস্পতির এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম। খুঁজতে লাগলাম শুক্রকে। বেশী বেগ পেতে হয়নি। একটু পরেই পেলাম তাঁকে। কি রকম দেখতে জানেন? সাহেবের মতো। ধপধপে সাদা রং, কটা চুল, কটা দাড়ি-গোঁফ। লম্বা জোব্বা পরা। হঠাৎ মনে হয় যেন মিশনারি প্রফেসার। আর তাঁর চারদিকে ঘিরে আলোর উৎসব চলছে। রামধনুর সাতটা রং একে একে ফুটছে আলাদা আলাদা, তারপর সব মিলে

মিশে হয়ে যাচ্ছে দুধের মতো সাদা আলো। আমার দিকে সকৌতুকে একবার চাইলেন। ভাবটা যেন—কি হে, তুমি এখানে কেন? মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তাঁর মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন হ'ল না। আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, যদি কিছু বলেন। কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আবার ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে শনিরও দেখা পেলাম। যেন একটা বিরাট গোঁফ-দাড়ি-জটা-ওলা টাওয়ার। টাওয়ারটা যেন নিয়ন-লাইটের বালবের মতো জ্বলছে, নীল আলো বেরুচ্ছে তার থেকে। টাওয়ারের কোমরে, পেটে আর বুকে তিনটে বড় বড় রিং—তা-ও নিয়ন-লাইটের। সে তিনটে থেকেও নানা রকম নীল আলো বেরুচ্ছে। বেরুচ্ছে বললে কিছুই বলা হবে না। ছুটে বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতো। দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মনে মনে প্রার্থনাটা জানিয়ে সরে পড়লাম সেখান থেকে। শনিকে চিরকালই ভয় করি। আমার প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিলেন কি না তা দেখবার জন্যে সেখানে আর দাঁড়ালাম না। বেগে পলায়ন করলাম। কিছুক্ষণ পরেই থমকে দাঁড়াতে হ'ল। সামনে দেখি বিরাট একটা কালো ফুটবলের মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। তার উপর দুটো ভাঁটার মতো চোখ আঙরার মতো জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল কি সর্বনাশ—এ যে রাহু। ঠোঁটের উপর একজোড়া মোচার মতো গোঁফ। সমস্ত মুখে একটা তেরিয়া তেরিয়া ভাব। অনেকটা দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো দেখতে। সেখানেও বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। কোনও রকমে প্রার্থনাটা পেশ করে দিলাম চম্পট। বাবাঃ, ওরকম বিরাট মুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো যায় কখনও। কেতুর দেখা অনেকক্ষণ পাইনি। অনেকক্ষণ আকুল প্রার্থনার পর তিনি নিজেই আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। পোয়াল গাদায় আগুন লাগলে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমনি ধোঁয়ার মতো তাঁর চেহারা। চোখ মুখ নাক কিছু নেই। বিরাট ধোঁয়া খানিকটা। প্রার্থনা জানালাম এঁর কাছেও। ইনি উত্তর দিলেন। সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বললেন, 'রে বিদেহী আত্মা, (আত্মা বললেন না, আৎমা বললেন) তুই বৃথাই ছটফট করে মরছিস। তোর জন্মকুণ্ডলীতে আমরা কে কোথায় থাকব তা তোর জন্মের আগেই ঠিক হয়ে আছে। তোর পূর্ব জীবনের কর্মফলই তা ঠিক করেছে। তা বদলাবার সাধ্য আমাদের কারো নেই, কারণ আমরাও অমোঘ নিয়মে আবদ্ধ। তোর ভাগ্যনিয়ন্তা তুই নিজেই। তোর ভবিষ্যৎ জন্মকুণ্ডলী দেখবি? ওই দেখ!'

অন্ধকার আকাশপটে আলোর রেখায় আমার জন্মকুণ্ডলীটা আঁকা হয়ে গেল দেখলাম। তারপর সব মিলিয়ে গেল। আমারও ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—।"

গোবর্ধন বিস্ফারিত নয়নে শুনছিলেন।

বললেন, "অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্ন। আপনি যতই লুকোবার চেষ্টা করুন আপনার ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ নিশ্চয়ই আছে। না থাকলে এরকম স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে না—।"

"তা হবে। কিন্তু সে সম্পদের উপর এত গরদা জমা হয়েছে যে সেটা ভালো ঠাহর হয় না। ভগবান অবশ্য গরদা সাফ করবার চেষ্টা করছেন যথেষ্ট, ধোপা যেমন করে পাটাতনের উপর কাপড় আছড়ায়, আমাকেও তেমনি তিনি আছড়াচ্ছেন। কিন্তু গরদা যে প্রচুর, সহজে কি সাফ হয়!"

দুজনেই চুপ করে রইলেন। বাইরে ঝড় জলের মাতন তুমুল থেকে তুমুলতর হতে লাগল।

"প্রলয় শুরু হয়ে গেল নাকি—" গেরুয়াধারী বললেন।

"হলেই বা উপায় কি। ওসব ভেবে লাভ নেই। আপনার জীবনকাহিনীই শোনা যাক। কলেজেই আবার পড়তে লাগলেন ?"

"পড়তে লাগলাম বললে ভুল হবে। কলেজে নাম লেখানো রইল। মর্জি মাফিক কখনও যেতুম, কখনও যেতুম না। কোলেদের বাড়িতে আড্ডা দিতুম। থিয়েটারে মেয়ে সাজতুম। ফিমেল পার্ট করে বেশ নাম করেছিলাম। মামারা কিছু বলতেন না। কারণ শহরের তিনটে ক্লাবেরই তাঁরা পেট্রন ছিলেন। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় অদৃশ্য হস্ত অদৃশ্য টিকিটি ধরে আবার টান দিলেন। গোপাল মল্লিকের চোখে পড়ে গেলাম একদিন। আমার এই চেহারাটার জন্যে অনেক সুবিধা হয়েছে আমার। সেকালে ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে সিনেমা স্টার সংগ্রহের এমন চালাও রেওয়াজ ছিল না, থাকলে ওই লাইনেই বাজিমাৎ করতে পারতাম। চেহারাটা সত্যিই ভালো ছিল। যে দেখত মুগ্ধ হয়ে যেত। অভিনয় করে মেডেলও পেয়েছি। হিন্দীতে একটা কথা আছে আগে দর্শনধারী, পিছু গুণ বিচারি। খুব ঠিক কথা। গোপাল মল্লিকের চোখে পড়ে গেলাম আমাদের বাড়ির সামনের গলিটার মোড়ে। সেকালে তুই-তোকারি করলেই আত্মীয়তা প্রকাশ করা হ'ত।

বললেন, 'তুই কে রে ? তোকে তো দেখিনি কখনও।'

বললাম, 'আমি জনকবাবুর ভাগ্নে।'

'কি করছিস ?'

'কলেজে নাম লিখিয়ে চুপ করে বসে আছি বাড়িতে।'

'টাইপ-রাইটিং জানিস ?'

'না।'

'আচ্ছা, আমার আপিসে চলে আয়, একটা খালি টাইপ-রাইটার পড়ে আছে, সেইটেতে হাত মক্শ কর।'

অবাক হ'য়ে গেলাম। গোপাল মল্লিক আমার বন্ধু, শেতলার বাবা। তিনি আমাকে রোজ রাস্তায় দেখেন, কিন্তু ভাবটা করলেন যেন আমাকে চেনেন না, জানেন না। যেন রাস্তা থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিলেন। এক গোপাল আমার চাকরি খেয়েছিলেন, আর এক গোপাল চাকরি দিলেন। মামারা আপত্তি করলেন না, খুশিই হলেন বরং। গোপাল মল্লিক P. W. D. আপিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। হেড্ ক্লার্কদের প্রবল প্রতাপ তখন। আমি যেতেই আমাকে একটা টাইপ-রাইটার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওইটেতে বসে প্র্যাকটিস্ কর।' আর একজন টাইপিস্টকে বললেন, 'ওহে ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও তো। একেবারে মাকাল ফলটি। কিছু জানে না।' শেখ রহিমুদ্দিন প্রবীণ টাইপিস্ট। তিনি এগিয়ে এসে আমাকে আদাব করলেন। হ্যাঁ মশাই, আদাব করলেন। আমি তাঁর ছেলের বয়সী। এই আদব-কায়দাটা মুসলমানদের আছে, কিন্তু বাঙালীদের নেই। বাঙালী ছেলেরা আজকাল গুরুজনদের পর্যন্ত প্রণাম করে না। কেউ কেউ দুহাত তুলে এমন একটা ভাব করে যেন পাঠা কাটছে। যাক্, অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। শেখ রহিমুদ্দিনের কাছে

আমি টাইপ-রাইটিংয়ে প্রথম পাঠ নিলাম। আপিসে বসে সমস্ত দিন প্র্যাকটিস্ করতাম। শহরে একটা শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিং শেখবার স্কুল ছিল। সেখানে রাত্রেও পড়ানো হ'ত। ভর্তি হ'য়ে গেলাম সেখানে এবং ক্রমাগত প্র্যাকটিস্ করতে লাগলাম। একমাসের মধ্যে আমার স্পীড ফিফ্‌টি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট হ'ল। ওই স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হলাম। তখন All Indian Remington Typewriter কম্পিটিশন হ'ত। সে পরীক্ষাটাও দিয়ে ফেললাম কলকাতায় গিয়ে। তাতেও ফার্স্ট হয়ে গোল্ড্ মেডেল পেলাম। তখন আমার স্পীড সেভেন্‌টি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট। একেবারে নির্ভুল। হবেই তো, আপিসে তো আর কোন কাজ ছিল না, কেবল বসে বসে প্র্যাকটিস্ করতাম। এইবার এক বাঙালী মহাপ্রভুর টনক নড়ল। তাঁর ন্যায়-বুদ্ধি জাগরিত হ'ল। আমার মতো আনাড়ি যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে আপিসে বসে টাইপ-রাইটিং শিখছে বড়বাবুর কৃপায়, এ অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। ওই আপিসেরই অন্য ডিপার্টমেণ্টের কেরানী ছিলেন তিনি। সাহেবকে কানে কানে গিয়ে লাগালেন—হেড ক্লার্ক ওই যে লাল টুকটুকে ছেলেটিকে বাহাল করেছে ও একটি গবেট। টাইপ করতে পারে না, আপিসে বসে প্র্যাকটিস্ করে খালি। প্রথম প্রথম আমি তাই করতুম বটে কিন্তু পরে যে আমি দিনরাত খেটেখুটে expert হয়ে গেছি এ খবর রাখতেন না বাছাধন। ফলও পেলেন। তার কথা শুনে সাহেব হঠাৎ একদিন টাইপ-রুমে এলেন সারপ্রাইজ চেক করতে। আমাকে একটা লম্বা রিপোর্ট দিয়ে বললেন, এটা এখুনি টাইপ করে নিয়ে এস। আমার তখন সেভেনটি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট স্পীড। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল টাইপ করে নিয়ে গেলাম। সাহেব আমার উপর মহা খুশি হলেন। যে বঙ্গ সন্তানটি আমার নামে গোপনে নালিশ করেছিল তার কি হ'ল জানেন? একজন ভালো লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্যে সাহেব তার বিরুদ্ধে proceedings ড্র করলেন। চাকরি যায় যায়। আমার পায়ে কেঁদে পড়ল সে তখন। আমি আমার পেট্রন গোপাল মল্লিককে গিয়ে বললাম। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'ও, তাই নাকি! বেশ, সাহেবকে বলতে পারি, ও যদি সবার সামনে তোমার কাছে ক্ষমা চায়।'

চাইতে হ'ল। গোপালবাবু গিয়ে সাহেবকে বলাতে চাকরিটা রয়ে গেল তার।

সায়েব আমার কাজ দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কন্‌ফিডেনশাল্ সেক্‌শনের সব কাজ করতে দিতেন। আমার মাইনেও বাড়িয়ে দিলেন। গভর্ণমেণ্ট থেকে মাসে ৩৫ টাকা করে পেতাম, আর সাহেব নিজের পকেট থেকে ৩৫ টাকা করে দিতেন তাঁর নিজের কন্‌ফিডেন্‌শাল কাজ করাতেন বলে। তখন আমার শনি তুঙ্গী চলছে, শনি আমার ভাগ্যাধিপতি, তখন আমায় আটকায় কে। আয় আরও বাড়ল। প্রাইভেট যে স্কুলটার কথা বলেছিলাম তার প্রিন্সিপাল আমার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিও আমাকে তাঁর নিজের ও স্কুলের কাজ করবার জন্যে বাহাল করলেন। পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে দিতেন। রাত জেগে তাঁর কাজ করতুম। দেবতুল্য লোক ছিলেন। ক্রিশ্চান, কিন্তু দেবতুল্য।"

হঠাৎ থেমে গেলেন গেরুয়াধারী।

"ও মশায়, আলোটা একবার জ্বালাতে পারেন?"

"দেশলাই তো নেই। ভজুয়ার বউ ফিরেছে কিনা সন্দেহ। আলো জ্বালতে চাইছেন কেন?"

"গুরুতর কারণ আছে। আমার পায়ের উপর দিয়ে খুব ঠান্ডা দড়ির মতো খরখরে কি একটা চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কদ্রুর বংশধর কেউ—।"

"কদ্দু? মানে, লাউ?"

"আরে না না, সাপ। মহাভারতও পড়েন নি।"

"আজ্ঞে না, ওটা তো কোর্সে ছিল না। সাপ? বলেন কি!"

"চেঁচামেচি করবেন না। চুপ ক'রে থাকুন, ও আপনিই চলে যাবে। পা-টা তো পার হয়ে গেল। আপনি আলোটা জ্বালবার চেষ্টা করুন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

"আচ্ছা, দেখছি। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ভজুয়ার বউয়ের শাড়িটা ভিজে সপ্ সপ্ করছে।"

"নিংড়ে নিন না।"

"তাই নি।"

গোবর্ধন কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে বললেন, "অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু খুব সম্ভবত আলকাতরার মতো কালো জল বেরুচ্ছে কাপড়টা থেকে। যা দুর্গন্ধ—।"

তবু ওই গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন।

গেরুয়াধারী একা বসে ঝড়বৃষ্টির গর্জন আর সাপের সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগলেন। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, গোবর্ধন ফিরলেন না। গেরুয়াধারীর মনে দার্শনিক ভাবের আমেজ এল একটা। তিনি ভাবতে লাগলেন এক নতুন ধরনের মজার মধ্যে ফেলেছেন তাঁকে ভাগ্যবিধাতা। তাঁর জীবনে অনেক রকম মজার আয়োজন করেছেন তিনি ইতিপূর্বে। সবগুলোই তিনি উপভোগ করেছেন, এমন কি তাঁর ছেলের মৃত্যুটাও। আজকের এই অবস্থাতেই বা ঘাবড়াবেন কেন? এটাকেও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে। হঠাৎ তাঁর গোবর্ধনের জন্য চিন্তা হ'ল। এখনও আসছে না কেন? এই অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল। বেশ লোকটি। সারাজীবন চাকরির চেষ্টা করছে, অথচ কোথাও লাগছে না। তারপর একটা কথা মনে হওয়াতে নিজেরই আশ্চর্য লাগল। লোকটি যদি সব দিক দিয়ে কৃতী হ'ত তাহলে হয়তো ওকে অত ভালো লাগত না। কৃতী হলে লোকের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা অনেক সময় পাওয়া যায়, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক কিংবা স্বার্থদুষ্ট। তার মেজমামার একটা কথাও মনে পড়ল। মেজমামার দুই ছেলে। একটি বেশ কৃতী। কম্পিট করে বড় চাকরি পেয়েছে। বড় বড় শহরে থাকে। আর ছোট ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। সে মেজমামার কাছে থাকত। শেষ বয়সে মেজমামার পক্ষাঘাত হয়েছিল। ওই ছোট ছেলেই সেবা করত তাঁর। ওই পিন্টু কাছে না থাকলে অশেষ দুর্গতি হ'ত মেজমামার। পিন্টুর দাদা তখন লাহোরে। সেখানে মেজমামাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মেজমামা তাই জড়িয়ে জড়িয়ে প্রায়ই বলতেন—বাবা পিন্টু, ভাগ্যে তুই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিস নি, তাই বুড়ো বয়সে তোকে কাছে পেয়েছি। শন্টুর মতো ভালো ছেলে হ'লে অমনি দুর্গতি হ'ত আমার। গেরুয়াধারীর

মনে হচ্ছিল যারা জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি, তারাও অধন্য নয়। তারা অনেকের ভালোবাসা পায়।

...বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর গোবর্ধন এলেন। সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে। একজনের হাতে লণ্ঠন আর লাঠি। আর একজনের হাতে বালতি একটা।

"ভজুয়ার বউ এখনও ফেরেনি। তাই আমি মাঠ পেরিয়ে মাইল খানেক দূরে গ্রামটার ভিতর চলে গিয়েছিলাম। যখন শিকারে এসেছিলাম তখন এখানকার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও খুব ভালো শিকারী। গেলাম তাঁর বাড়িতে। কিন্তু বরাত খারাপ, শুনলাম তিনি কলকাতা গেছেন। খুঁজে বার করলাম তাঁর কম্পাউণ্ডারকে। সব শুনে তিনি বললেন, "বালতি করে স্ট্রং কার্বলিক লোশন নিয়ে যান। সেইটে ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে দিলে সাপ পালাবে। সঙ্গে দু'জন লোক দিলেন, লাঠি আর লণ্ঠনও দিলেন। সাপটাকে যদি দেখা যায় মারা যাবে। লোকটি প্রকৃতই সজ্জন। আমাদের বিপদ শুনে নিজেই আসতেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রসব-বেদনা উঠেছে বলে আসতে পারলেন না। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।"

যে লোক দুজন এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বললে—"ও, এইখানে সাপ বেরিয়েছিল? তা তো বেরোবেই। পীরবাবার সাপ। ও সাপকে আমরা মারতে পারব না। আপনারা নির্ভয়ে বসে থাকুন। ও সাপ কাউকে কিছু বলবে না। দাবাইটা ছিটিয়ে দিন ভালো করে।"

দেখা গেল চালের অনেক জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। গেরুয়াধারীর গেরুয়া ঝুলিটি ভিজেছে। তিনি সেটি তাড়াতাড়ি নিজের কোলের উপর টেনে নিলেন। বললেন, "দরকারি চিঠি আছে এতে একটা। সেটা ভিজে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

ঘরের মেঝে বেশ ভিজেই গিয়েছিল। কার্বলিক লোশন ছেটানোতে আরও ভিজে গেল সব। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধের বদলে কার্বলিক এসিডের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক।

গেরুয়াধারী প্রশ্ন করলেন, "এখানে পীরবাবার সাপ এল কি করে?"

লোকটি বলল, "আপনারা যে পীরবাবার কবরের উপরই বসে আছেন। ওই যে পাকা দেওয়ালটা দেখছেন ওটা কবরের একটা অংশ। কবরের বাকি অংশটা ধসে গেছে বহুকাল আগে। ভজুয়া ওই পাকা দেওয়ালটা কাজে লাগিয়েছে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরা এতে অসন্তুষ্ট। কোনদিন হয়তো দাঙা বেধে যাবে।"

একটু থেমে লোক দুটি বলল, "লাঠিটা আপনারা রাখতে চান তো রেখে দিন। লণ্ঠনটা কিন্তু আমাদের নিয়ে যেতে হবে। বালতিটাও।"

লণ্ঠন এবং বালতি নিয়ে তারা চলে গেল।

গোবর্ধন স্বস্থানে বসলেন এবং বললেন, "অনেক আগে এ-ঘাটটার নামই ছিল নাকি পীরবাবার ঘাট। এক গোঁড়া হিন্দু ক্ষত্রিয় পঞ্চাশ বছর আগে এ অঞ্চলের সব জমিদারি কিনেছিল। সে-ই এই ঘাটের নাম বদল করে দিয়েছিল, নাম রেখেছিল সিংজির ঘাট। এ পীরবাবা খুব জাগ্রত শুনলাম।"

"এত সব খবর কে দিলে আপনাকে—"

"ওই লোক দুটি। ওরা এ অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে আছে। অনেক খবর জানে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর হাতজুড়ে প্রণাম করলেন।

"ওটা কি হল"—জিগ্যেস করলেন গেরুয়াধারী।

"পীরবাবার কাছে একটা মানত করলাম। দেখি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন কি না।"

"কিসের মানত?"

"কিসের আবার, চাকরির। তবে ওই সৌদামিনীর ব্যাপার নয়, অন্য একটা। কোলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ভালো ব্যাংকে কেশিয়ারের চাকরি খালি আছে একটা। কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে হাজার দশেক টাকা জমা রাখতে হবে ব্যাংকে সিকিউরিটি স্বরূপ। বাবার ব্যাংক ব্যালান্স একদম নীল না হলেও নীলচে। দেখি, পীরবাবা যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। টাকা দিতে পারলে ওরা আমাকে রাখবে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ যেন একটু কমেছে।

গোবর্ধন বললেন, "থামলেন কেন? বলুন আপনার জীবন-কাহিনী। বেশ লাগছিল।"

"ভালো লাগছিল?"

"খুব।"

"আমি সেই P. W. D. আপিসেই চাকরি করতে লাগলাম। সাহেবের খুব প্রিয়-পাত্রও হলাম। চাকরি-জীবনে ওইটেই তো লক্ষ্য, আর ওটা হতে পারলেই মোক্ষ। সাহেব খুব ভালোবাসতে লাগল আমাকে। এই ভাবেই চলছিল। এমন সময় হঠাৎ সার্চ-লাইটে একদিন দেখলাম এক বিজ্ঞাপন। গভর্ণমেণ্ট হাউস পাটনায় এক টাইপিস্টের পোস্ট খালি আছে। মাইনে ৫০ টাকা থেকে শুরু। আমি P.W.D. থেকে পাচ্ছিলাম ৩৫ টাকা আর সাহেব আমাকে নিজের পকেট থেকে দিত ৩৫ টাকা। কিন্তু এ ৩৫ টাকা তো ফাউ, অনিশ্চিত, যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাহেবকে দেখালাম বিজ্ঞাপনটা। সাহেব বললেন, দরখাস্ত কর। দরখাস্ত তিনি জোর কলমে রেকমেণ্ড করে দিলেন। দিন তিনেক পরে জবাব এল বাই ওয়ারে। Meet Private Secretary to His Excellency। তখন ব্রেট সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারি। ইণ্টারভিউ করবার জন্য ডেকেছে। টেলিগ্রাম নিয়ে চলে গেলাম বড় সাহেব এক্‌জিকিউটিভ এনজিনিয়ারের কাছে। তিনি বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে, তুমি আজই চলে যাও।' আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। একটু ইতস্ততঃ করে সাহেবকে অবশেষে বললাম, '—স্যার, আমি আমার বাড়িতে ডিপেনডেণ্টের মতো থাকি। পাটনায় যাওয়ার মতো আমার টাকা, পোশাক, বিছানা, মশারি এসব কিছুই তো নেই। এখন শীতকাল। How shall I go to the Government House like a beggar?'

সাহেব—(মনে রাখবেন সাহেব)—সাহেব আমাকে বললেন, 'সব ঠিক করে দিচ্ছি। সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। পঁচিশটা টাকাও দিচ্ছি। একটা 'রাগ'

দিচ্ছি, আর এই ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটাও নিয়ে যাও। উইশ্ ইউ গুড্ লাক। তোমার যা পোশাক আছে ওতেই চলবে।' ঠিক যেন বাবা ছেলেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল আমার। ···যে ট্রেনটায় পাটনা গেলাম সেটা তখন পাটনায় পেঁছত ভোর চারটেয়। পাঞ্জাব মেল। আমি যে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল দশটায় দেখা করতে। আমি স্টেশনে একটু চা জলখাবার খেয়ে সোজা গভর্ণমেণ্ট হাউসেই চলে গেলাম। সেখানে দেখা হ'ল চ্যাটার্জি মশায়ের সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন শালার শালা অর্থাৎ হেড্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টু প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁকে টেলিগ্রাম দেখালাম, তিনি বাঙালী, আমিও বাঙালী, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন ইংরেজিতে চিবিয়ে চিবিয়ে। বললেন, 'গো ব্যাক্, দি পোস্ট ইজ্ ফিলড্ আপ।' আমি বললাম, 'প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করব।' তিনি বললেন, 'হবে না।' আমি সবিনয়ে কেঁচোটি হয়ে বললাম, 'দয়া করে যদি একবার দেখাটা করিয়ে দেন—।' ক্ষেপে গেলেন চ্যাটার্জি মশাই। তাঁর বিলিতি স্যুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল এক ছোটোলোক চাষা। অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়ে বললেন, 'গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম মাই অফিস্।' আপিস থেকে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু আমার রোখ চড়ে গেল যেমন করে হোক ব্রেট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবই। সাহেবের আপিসের সিঁড়ি দিয়ে যে-ই উঠতে যাব অমনি প্লেন ড্রেসের এক সাহেব কনস্টেবল এসে বাধা দিল। বললে, 'পাশ কই, বিনা পাশে ওপরে ওঠা মানা।' আমি তাকে টেলিগ্রামটা দেখালাম। তখন সে নরম হ'ল। বলল, 'ও আই সি, কাম উইথ্ মি।' তিনি উপরে গিয়ে সার্জেণ্ট মেজর গড্ফ্রের হাতে আমাকে সঁপে দিলেন। গড্ফ্রে আমাকে নিয়ে গিয়ে পেঁছে দিলেন ব্রেটের দরজা পর্যন্ত। ভারি পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সেলাম করে সাহেবের দিকে টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে চটে আগুন হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জি কি তোমাকে বলেনি যে পোস্ট ফিলড্ আপ্ হয়ে গেছে? তবে আবার এসেছ কেন?' বললাম, 'আপনার ওয়্যার পেয়েই এসেছি সার। আমি অত্যন্ত গরীব মানুষ। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল খরচ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি as ordered by you. এখন আমার ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই।' সাহেবের মুখে একটা পাইপ ঝুলেছিল, সেটা খাড়া হয়ে উঠল! বুঝলাম সাহেব সেটা কামড়ে ধরেছেন। সেই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে শব্দটি নিঃসৃত হ'ল সেটি একটি হুংকার। হতাশ হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় আর একটি সাহেব ঢুকল তাঁর ঘরে। গায়ে ঢিলে-ঢালা পোশাক, চলার ভঙ্গী অনেকটা নাচের মতো। খাঁটি সাহেব, ও রকম নীল চোখ আর কারও দেখিনি। মনে হ'ল শরতের নীল আকাশের দু'টি ছোট ছোট টুকরো কে যেন বসিয়ে দিয়েছে চোখের মধ্যে। তার আর একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ল—বেলট্ থেকে তলোয়ার ঝুলছে। ব্রেট সাহেবকে কি বলে ব্রেট সাহেবের শেলফ্ থেকে কি একখানা বই নিল। আবার লক্ষ্য করলাম চলাটাতে চমৎকার নাচের ছন্দ আছে। পরে জেনেছি ভালো Waltz নাচতে পারত। হঠাৎ তার নজর পড়ল আমার দিকে। এগিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করল—What do you want, my son? 'Son' শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। তার পর সব কথা বললাম তাকে। ব্রেটের দিকে ফিরে দেখি সে খসখস করে কি লিখে যাচ্ছে। আমার কথা শেষ হতেই সে মুখ তুলে বললে—What he says

is true. তখন ওই সাহেবটি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে ইংরেজিতে যা বলল তা বঙ্কিমবাবু অনেক আগে তাঁর একটা বইতে লিখে গেছেন।

"কি—"

"মামনুসর। Follow me."

গেলাম পিছু পিছু। লোকটা গভর্ণরের A. D. C. ঘরে ঢুকে তো আমি অবাক। মনে হ'ল যেন ইন্দ্রপুরীর একটা কক্ষে ঢুকেছি। সুন্দর কার্পেট পাতা, ভুরভুর করছে ফুলের গন্ধ, পুরু-গদি-আঁটা ড্রইংরুম স্যুট, দামী দামী চেয়ার চারদিকে। ঘরের মাঝখানে চমৎকার একটি সেক্রেটেরিয়েট টেব্‌ল আর তার উপর নানান সব জিনিস সাজানো। আবুহোসেনের যে রকম অবস্থা হয়েছিল, আমারও অনেকটা সেইরকম হলো। 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন সাহেব আমাকে চেয়ারে বসতে বলল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে যে গদি-আঁটা চেয়ারটা ছিল সেইটে দেখিয়ে বলল, 'Sit down and take dictation.' বসলাম। বললাম, 'May I take your pen and paper sir ?'

'ইয়েস, ইয়েস'।

সাহেব ডিক্‌টেশন দিলেন। লিখলাম, বেশ স্পষ্ট আওয়াজ। বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না। তারপর বললেন, 'বেশ ধরে ধরে মন থেকে বানিয়ে কিছু লেখ। তোমার হাতের লেখা কি রকম দেখব।' তৎক্ষণাৎ লিখলাম—'My handwriting is very bad. But my teacher says it is good. You Sir, now judge'। সাহেব পড়ে হেসেই আকুল। তারপর পাশের ঘর থেকে ব্রেটকে ও আর একটি সাহেবকে ডাকলেন। বলতে ভুলেছি লর্ড সিন্‌হা তখন বিহারের গভর্ণর। এই দ্বিতীয় সাহেবটিকে লর্ড সিন্‌হা বিলাত থেকে আসবার সময় অ্যাডিশনাল প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছিলেন। মিস্টার প্যাট্রিক এঁর নাম। আর যে সাহেবটি আমাকে ডেকে ডিক্‌টেশন দিলেন তাঁর নাম ক্যাপটেন হ্যাসকেট্‌ স্মিথ। লর্ড ডাফ্‌রিনের খাস ভাগ্নে। এঁদের নাম আর পরিচয় পরে জেনেছিলাম। হ্যাসকেট্‌, ব্রেট আর প্যাট্রিককে ডেকে আমার লেখা দেখাতে লাগল আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা কইতে লাগল। আমি একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। একটু পরেই ব্রেট আর প্যাট্রিক চলে গেল। তখন হ্যাস্‌কেট্‌ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, 'বেশ, আমি তোমাকে বাহাল করলাম। মাইনে কত চাও ?' বললাম, 'আমি যে পোস্টের জন্য এসেছিলাম সেটার মাইনে ৫০ টাকা আর আমার আগেকার পোস্টে পাচ্ছিলাম ৩৫ টাকা। দুটোতে যোগ করে পঁচাশি হয়। আশি টাকা পেলেই আমি খুব খুশি হব।' সাহেব বললেন. 'অল রাইট।' কিন্তু appointment letter তখন দিলে না। বললে, 'তোমাকে আজ থেকেই বাহাল করছি। কিন্তু গভর্ণর হাউসের চাকরিতে এসব জামা কাপড় চলবে না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের মর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হবে।' আমি বললাম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যে বড্ড গরীব। দামী পোশাক কেনবার পয়সা কোথায় পাব।' বললে বিশ্বাস করবেন না, সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে ৩০০্ টাকার একটা ড্রাফ্‌ট্‌ লিখে দিলেন। বললেন, কিনিয়ে নাও সব। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ড্রাফ্‌ট্‌ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এ টাকা তোমায় শোধ করতে হবে না।' আমি তখন বললাম, 'কোথায় কিনতে হবে, কিরকম জিনিস মানানসই হবে,

আমি তো ঠিক জানি না।' সাহেব বললেন, 'ওয়েট্ এ বিট'। ফোন করলেন উড্ল্যান্ড বলে কোন সাহেবকে। বললেন তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কাম'। আমি তাঁর পিছু পিছু নেমে গেলাম। গিয়ে দেখি পোর্টিকোতে বিরাট উল্‌সে কার দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আমাকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসলেন। নিয়ে গেলেন আমাকে পাটনার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দোকানে। ওর দোকানেই তখন পাটনার সাহেবরা আর রইসরা কাপড় কিনতেন। সেই দোকানে গিয়ে হ্যাস্‌কেট্ সাহেব আমার জন্যে সানপ্রুফ্ সোলারো তিন পিস্ স্যুট কিনলেন। তখনকার দিনে ১৮ টাকা গজ ছিল। তারপর কিনলেন গ্রে ফ্ল্যানেলের আর একটি স্যুট। এ ছাড়া ব্লু ব্লেজার স্যুটের অর্ডার দিলেন একটি। বললেন সাতদিনের মধ্যে চাই, গভর্ণমেন্ট হাউসে। তারপর নিয়ে গেলেন চান্‌লিনের কাছে। চান্‌লিন তখনকার দিনের নামজাদা চীনে জুতো-ওলা। সেখানে একজোড়া পেটেন্ট লেদারের শু, একজোড়া বেস্ট ব্রাউন ব্রোগ্ শু, আর কার্পেটের উপর চলবার জন্য এক জোড়া মোলায়েম চটি অর্ডার দিলেন। তারপর নিয়ে গেলেন আর একটা দোকানে। সেখানে কিনে দিলেন ড্রেসিং গাউন, স্লীপিং গাউন, বেঁটে বেঁটে কোট, কালো টাই, লং কোট সাদা টাই, ডবল-breasted সাদা কামিজ, একডজন নানারঙের মোজা। মানে, আমাকে একটি মিনিয়েচার গভর্ণমেন্ট-হাউস গেস্ট বানিয়ে ছাড়লেন। আমি হতবাক, চেয়ে চেয়ে দেখলুম সাহেব নিজের চেক বই থেকে কচাকচ চেক কাটছেন। সবসুদ্ধ ৯০০ টাকা লাগল। আমি মনে মনে ভাবছি আমার ৮০ টাকা মাইনে থেকে এসব শোধ হবে না কি! তাহলেই তো গেছি! লোকটা বোধহয় অন্তর্যামী ছিল। আমার দিকে ফিরে বলল—'এ সবের দাম তোমাকে দিতে হবে না। তোমাকে সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে এস।' নিজে আমাকে স্টেশনে নিয়ে গেলেন, কেলনারে খাওয়ালেন, তারপর ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে দিলেন একটা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা। কোনও বাঙালীকে পরের জন্য এরকম করতে দেখেছেন?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে গোবর্ধন বললেন, "দেখেছি বই কি! ডক্‌টর বিধুভূষণ রায় সায়েন্স কলেজে ফিজিক্‌সের প্রফেসার ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি তাঁর জার্মানি যাওয়ার আগে আশু মুখুজ্যে তাঁকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে স্যুটের কাপড়-চোপড়, হোল্‌ডল স্যুটকেস—সব কিনে দিয়েছিলেন। হরেন মুকুজ্যের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি ঋণী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো তাঁর সব উপার্জন পরকেই দিতেন—।"

যে গোবর্ধন কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন বাঙালীই বাঙালীর শত্রু এখন তাঁর গলা আবেগভরে কাঁপতে লাগল।

গেরুয়াধারী বললেন, "ওঁরা তো মহাপ্রাণ দেবতা। ওঁদের কথাই আলাদা। আমি সাধারণ বাঙালীর কথা বলছি। ওই যে মিস্টার চ্যাটার্জি, যে আমাকে অভদ্রের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল; সে তার ভাইপোটিকে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওই ব্রেট সাহেবের আপিসে টাইপিস্ট করে। ব্রেট সাহেব বলেছিলেন আমাকে খবর দিয়ে দিতে। কিন্তু দেয়নি। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি ফ্যাটার্জির সাধ্য কি আমার গতি রোধ করে? আমার ভাগ্যদেবতা তখন প্রসন্ন হয়েছে, আমাকে রুক্‌বে কে? ও ব্যাটা চাষার মতো ব্যবহার করে শুধু আত্মপরিচয়টা দিলে—।"

হেসে উঠলেন গোবর্ধন।

"ঠিক বলেছেন। শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম, সেইটে মনে পড়ল আপনার কথা শুনে।"

"কি গল্প—?"

"তাঁদের গ্রামে তাঁদের প্রতিবেশী একজন মুসলমানের মেয়ে হঠাৎ বিধবা হ'ল। ক্ষিতিমোহন বাবুদের মনে হ'ল প্রতিবেশীর এমন বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করতে যাওয়া উচিত। তিনি এবং তাঁদের বাড়ির আরও দু'একটি ছেলে সন্ধ্যার পর সন্তর্পণে হাজির হলেন তাদের বাড়ির উঠোনে। যাওয়া মাত্রই তাঁরা শুনতে পেলেন মেয়ের বাবা বলছেন—আল্লা, এডা তুমি কি করল্যা ? এ কি হেঁদুর মাইয়া পাইছ ? আমি তো আমার ফতিমার আবার বিয়া দিমু। তুমি শুধু তোমার মুখডা চিনাইল্যা। আপনার চ্যাটার্জি মশাইও তাঁর মুখটা চেনালেন কেবল— ।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী। তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

বাইরে ঝপ্ ঝপ্ করে শব্দ হচ্ছিল একটা।

"কিসের শব্দ ওটা বলুন তো ?"

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার।

"গতিক খুব খারাপ মনে হচ্ছে। গঙ্গার পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে।"

"ভজুয়ারা কেউ আসেনি ?"

"তাতো জানি না। ওদিকে তো যাইনি।"

"ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে একটু। এমন বিপদে পড়ব কে জানত। খাবার আনতুম তাহলে সঙ্গে করে। আপনার সঙ্গেও বোধহয় কিছু নেই ?"

"না। তবে ভজুয়ার বউয়ের কানে যখন উঠেছে কথাটা তখন সে যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। আপনি ততক্ষণ জীবন-কাহিনীই শোনান।"

"তাছাড়া কি আর করবার আছে এখন। বসুন, আবার শুরু করি তাহলে। ভালো লাগছে তো ?"

"খুব। অদ্ভুত ঘটনাবহুল আপনার জীবন। পাটনা থেকে তো বাড়ি চলে গেলেন। তারপর ?"

"সাতদিন পরে ফের পাটনায় গেলাম। এবার বেশ জমিয়ে বসলাম গভর্ণরের প্রাসাদে। এসেই বেশ সুসজ্জিত Suite পেলাম আমার নিজের জন্য। শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর। চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। আমার পাশেই রয়েছেন মিস্টার এণ্ড মিসেস্ হ্যানকক্স। বিলেত থেকে আসবার সময় লর্ড সিন্‌হা এঁদেরও নিয়ে এসেছিলেন হাউস-হোলড্ সুপারিন্‌টেন্ডেট করে। আমার থাকা ফ্রি, খাওয়াও ফ্রি। যে খাবার লর্ড সিন্‌হার ফ্যামিলি, তাঁর অতিথিবর্গ এবং স্টাফরা (staff) খেতেন আমিও তাই খেতে লাগলাম। কারণ আমিও স্টাফের একজন হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার আলাদা চাকরও ছিল একজন, একটা 'বয়'। আরও সুবিধা পেলাম অনেক। ফ্রি ওয়াশ্ (wash), ফ্রি মোটরকারের ইউস্ (use) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সব তো পেলাম। কিন্তু কোন কাজ নেই। সেজেগুজে টিপ্‌টপ হয়ে আপিসের চেয়ারে বসা আর ম্যাগাজিনের পাতা-ওল্টানো। দিন সাতেক এইভাবে কাটল। আমাকে যে কি কাজ করতে হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। খাঁচার পাখিদের যে কি কষ্ট তা সেই কদিনে অনুভব করেছিলাম। দিন সাতেক এইভাবে কোনক্রমে কাটালাম। তারপর আর পেরে

উঠলাম না। এ. ডি. সি. সাহেবকে গিয়ে বললাম, আমাকে কাজ দাও, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব যে। সাহেব তখন আমার হাতে appointment letterটি দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ফ্রেঞ্চ জানো ?' রিপ্লাই নেগেটিভ। সাহেব তখন বললেন, 'ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে। বই আনিয়ে দিচ্ছি।' একটি 'ক্যাসেল্স্ ফ্রেঞ্চ টু ইংলিশ' ডিক্শনারি আনিয়ে দিয়ে বললেন, 'গেট্ দি হাউস মেন্যু।' গভর্ণমেণ্ট হাউসের মেন্যুটা নিয়ে এলাম। তাতে যে ফ্রেঞ্চ নামের ডিশগুলো ছিল সেইগুলোতে দাগ দিয়ে বললেন, 'এগুলো মুখস্থ করে ফেল। আর ডিক্শনারি থেকে এদের মানে আর ঠিক উচ্চারণ-গুলো জেনে নাও। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এস, বুঝিয়ে দেব।' যাক্, কাজ পেলাম একটা। যদিও বদখত কাজ—তবু এক সপ্তাহ মেহনত করে খানিকটা রপ্ত হ'ল। উচ্চারণটা হ'ল না, মানেগুলো বুঝলাম—।"

"ফ্রেঞ্চ কাটলেট খেতে খুব ভালো, না ?"

হঠাৎ গোবর্ধন বলে উঠলেন।

"চমৎকার।"

"আমার বড় ছেলেটা কাটলেট বড্ড ভালোবাসে। আপনার গল্প শুনে তার জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। সত্যি, জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। তাকে একদিনও কাটলেট খাওয়াতে পারিনি হোটেলে। এক বিয়ে বাড়িতে কোথায় যেন খেয়েছিল। অথচ কি-ই-বা দাম !"

"আপনি একটা মহৎ কাজ করেছেন যা আমি পারিনি।"

"কি।"

"বাবার সেবা।"

"হ্যাঁ, তা যতটা পেরেছি করেছি। একটু আগেই বাবার কথা মনে হচ্ছিল। কোলকাতাতেও এইরকম বৃষ্টি নেবেছে কিনা কে জানে। বৃষ্টির সময় বাবার ঘনঘন তামাক চাই। জগন্নাথ পারছে কিনা কে জানে।"

"জগন্নাথ কে ?"

"আমার মেজ ছেলে। তাকে তামাক সাজাটা শিখিয়েছি ভালো করে। বাবা তার সাজা তামাক পছন্দও করছেন আজকাল। নিন বলুন। তারপর কি হল—।"

"তারপর সাহেব একদিন আমাকে মেন্যু তৈরি করতে বললেন। উনিই আগে মেন্যুটা করতেন। আমি নির্বোধের মতো অনেক ভুল করলাম। বকলেন আমাকে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়ে দিলেন। মাসখানেক মক্শ করবার পর মেন্যুর ব্যাপারটা সড়গড় হ'ল। একমাস পরে আমিই স্বাধীনভাবে মেন্যু তৈরি করতে লাগলাম নির্ভুল-ভাবে। তারপর সাহেব আমাকে কেটারিং শেখালেন। তারপর শেখালেন হাউস ম্যানেজমেণ্ট। তারপর পেট্রোল বিল চেক্ করা। তারপর ক্রমশ আরও বিবিধ বিষয়ে পরিপক্ব করে তুললেন আমাকে। সিণ্ডেরিলা নাচ, অ্যাট হোম ডিনার, Dejeunor, গার্ডেন পার্টি, Priority table (এটা বড় শক্ত কাজ) সব শিখে ফেললাম একে একে। তারপর আস্তে আস্তে কনট্রোলার অব্ হাউস্-হোল্ডের যা যা কর্তব্য তাও শেখালেন। আমিই সব চালাতে লাগলাম শেষে। দিনকতক পরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সর্বঘটেই আমি বিরাজমান। আমার চাহিদাই হ'ল সবচেয়ে বেশী। A. D. C. নামেই রইলেন, তাঁর সব কাজ আমিই করতে লাগলাম। গভর্ণমেণ্ট

হাউসের স্টাফ্ সবাই আমার উপর খুশি। এমন কি His Excellencyও নাকি একদিন বলেছিলেন সান্যাল is indispensible. যে ব্রেট সাহেব আমার প্রতি অবিচার করে আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন তিনিও আমার উপর সন্তুষ্ট হলেন। এই ব্রেট সাহেবই উত্তর-জীবনে আমার মস্ত বড় পেট্রন হয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব। সাহেবরা যার উপর তুষ্ট হয় তাকে চড়চড় করে তুলে দেয়, আর যার উপর রুষ্ট হয় তাকে এক কোপে সাফ করে ফেলে।"

বাইরে ঝড়ের বেগটা আবার বাড়ল। সেই ঝপ্ ঝপ্ শব্দটাও। গেরুয়াধারী নীরব হয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, "ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। জানি না ভগবান আজ কপালে কি লিখেছেন।"

গোবর্ধন সান্ত্বনার সুরে বললেন, "ওসব ভেবে আর কি হবে! যা বলছিলেন বলুন। অন্যমনস্ক থাকাই ভালো। তারপর কি হ'ল— ?"

"এরপর সব হিল্ স্টেশনে টুর হতে লাগল। সব জায়গাতে A. D. C. র বদলে আমিই সব করতে লাগলাম। ডিনার পার্টি, গার্ডেন পার্টি, সিণ্ডেরিলা নাচ—সব আমিই ব্যবস্থা করতাম। এর পরই লর্ড সিন্হা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হৈ হৈ পড়ে গেল। কোলকাতা থেকে ডক্টার আহ্মেদ এসে দু'দিনে তাঁর বারোটা দাঁত তুলে দিলেন। তখন আমরা পাটনা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এসেছি। লর্ড সিন্হার রাত্রে ঘুম হয় না, ভালো হজম হয় না। তিনি তখন দু'মাসের ছুটি নিয়ে সিমলা চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তো গেলেনই, আর কয়েকজন চাকর-বেয়ারাও গেল। কিন্তু তিনি A. D. C. কে সঙ্গে নিলেন না। বললেন, সান্যাল থাকুক, তাহলেই হবে। সিমলাই থাকতে থাকতেই তিনি রেজিগ্নেশন দেন। তারপর এলিশিয়ম রোয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে কোলকাতায় গেলাম। তিনি বললেন, 'পাটনায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে আমার personal silver kits, type-writer প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে, সেগুলো এখানে তুমি পেঁছে দিয়ে যাও।' মার্ক, এসব জিনিস তাঁর A.D.C. বা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে যেতে বললেন না, আমাকে বললেন। সত্যিই আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন তিনি। তিনি এবং লেডি সিন্হা আমাকে বললেন, 'তুমি আপাতত আমাদের কাছে থাক। পরে ভালো চাকরি করে দেব। বর্ধমানের মহারাজা তোমারই মতো একজন করিৎকর্মা অথচ ভদ্র ছেলে খুঁজছেন A. D. C. করবেন বলে। আট শ টাকা মাইনে দেবেন। সেটা বেড়ে বেড়ে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত হবে।' আমি পাটনায় ফিরে এলাম সোল্লাসে। লর্ড সিন্হার জায়গায় বিহার এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার তখন অ্যাক্টিং গভর্ণর হয়েছেন। আমি এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যে A. D. C. আমাকে চাকরি দিয়ে মানুষ করেছিল সেই ক্যাপ্টেন হ্যাস্কেট্ আমাকে যেতে দিলে না। বলতেই মাথা নেড়ে বলে উঠল—'ও, নো, নো, নো, নো।' মিস্টার ব্রেটও আপত্তি করলেন। শুনলাম নতুন গভর্ণরও নাকি আমাকে ছাড়তে চান না। তখন আমি মাইনে পাচ্ছি ৫৬০ টাকা প্লাস ফ্রি বোর্ডিং, ফ্রি ধোবি, ফ্রি মোটরকার, ফ্রি পার্সোনাল চাকর। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি, আখের অনেক ভালো। থেকে গেলাম। এক হিসেবে ভালোই হ'ল, কারণ ঠিক তার পরই এলেন প্রিন্স অব্ ওয়েলস্। ও মশাই, থপ্ করে কি একটা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। দেশলাই এনেছেন তো?"

"এনেছি, জ্বালাচ্ছি—"

গোবর্ধনবাবু দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছিলেন। ভিজে গিয়েছিল, সহজে জ্বলে না। খস খস শব্দ হতে লাগল কেবল। অবশেষে একটা কাঠি জ্বলল, ভজুয়াদের লণ্ঠনটা তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু গেরুয়াধারীর ঘাড়ে কি লাফিয়ে পড়েছে সেটা বোঝা গেল না। অনেক চেষ্টা করে লণ্ঠনটা জ্বালা হ'ল শেষকালে। তারপর আবিষ্কৃত হল কোণে একটা কোলা ব্যাং বসে রয়েছে। বড় বড় চোখ বার করে চেয়ে রয়েছে গেরুয়াধারীর দিকে একদৃষ্টে। গোবর্ধনের মনে হ'ল যেন অবাক হয়ে গেছে গেরুয়াধারীকে দেখে। যেন বলতে চাইছে লাট বেলাটের সঙ্গে যার দিন কেটেছে সে এখানে কেন!

"বাবু, বাবু—।"

দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে এক নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে, ভজুয়ার বউ?"

"জি হাঁ।"

"কি?"

কোন উত্তর দেয় না। গোবর্ধন আলোটা তুলে ধরলেন। মুখে আলো পড়তেই মুচকি হাসল ভজুয়ার বউ, তারপর ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। দেখা গেল তার হাতে একটা ডালার মতো কি রয়েছে।

"কি ওতে?"

ক্ষীণ লজ্জিত কণ্ঠে যা বললে তার থেকে বোঝা গেল কিছু খাবার এনেছে।

"নিয়ে আয় দেখি—"

খুলে দেখা গেল অনেকখানি মালাই, কয়েকটা কলা এবং কিছু সন্দেশ এনেছে সে। আর একটা ছোট ঘটিতে দুধ আর ছোট্ট একটা নতুন সরা।

গোবর্ধন বললেন, "মালাই এনেছিস আবার দুধ কেন?"

গেরুয়াধারী বললেন, "দুধ আমার পেটে সহ্যও হয় না। ক্ষীর, মালাই সহ্য হয় কিন্তু এমনি জোলো দুধ হয় না। এ এক আশ্চর্য রহস্য।"

ভজুয়ার বউ এর উত্তরে মৃদুকণ্ঠে যা বললে তাতে শিউরে উঠতে হ'ল দু'জনকেই। ও দুধ আর কলা এনেছে পীরবাবার সাপের জন্য। বললে রোজ রাত্রে ও সাপকে দুধ কলা দিয়ে যায়। ব্যাংও ধরে দিয়ে যায়। কাল একটা বড় ব্যাং ধরে গর্তে পুরে দিয়েছিল।

"সাপকে এরকম আশকরা দেওয়া কেন!" বলে উঠলেন গেরুয়াধারী।

ভজুয়ার বউ বললে, "পীরবাবা খুব জাগ্রত। তাঁরই গা ঘেঁষে তাই যাত্রীর ঘর বানিয়েছি আমরা। পীরবাবা কোনও অনিষ্ট করেন নি তাদের। ভালোই করেছে। আর ওই সরপ্ (সর্প) মহারাজও এই কবরের আশে-পাশে বরাবর আছেন। কারও কোনও অনিষ্ট করেন নি, তাই আমরা ওকে খেতে দি—।"

গেরুয়াধারীর কানের পাশ দিয়ে লাফিয়ে ব্যাংটা ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে চলে গেল।

ভজুয়ার বউ বললে—"এই যে সেই ব্যাংটা। এখনও খায়নি ওটাকে। বড় ভালো সাঁপ, খুব শুধ্ধা।"

গেরুয়াধারী বললেন —"এ তো বড় ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনে পড়া গেল মশাই !"

"কুছ্ ডর নেই সাধু বাবা।"

সাহস দিলে ভজুয়ার বউ।

গোবর্ধন বললেন, "যা হবার হবে। আপাতত তো দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।"

গোবর্ধন আর গেরুয়াধারী দু'জনেই ভূরিভোজন করলেন। মালাই অনেকখানি ছিল। সন্দেশও কম ছিল না।

"ভজুয়া ফিরেছে ?"

জিজ্ঞেস করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ। আমি না গেলে ফিরত না। কালালিতে হাল্লা করছিল। আপনার জন্যে একটা হুক্কাও এনেছি। দোকানদার দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকান খুলিয়ে নিয়ে এলাম। তামাক খেতে না পেলে কি রকম কষ্ট হয় তাতো জানি। আমি এখানেই তামাক হুঁকো বোড়্শি সব দিয়ে যাচ্ছি। জলটা একটু ধরেছে—।"

গোবর্ধন বললেন, "এ ঘরের তো চারদিকেই চুঁইছে। তোর ঘর কেমন ?"

"আমার ঘরেরও ওই হাল (অবস্থা)। পিয়ক্কড় (মাতাল) লোককে নিয়ে ঘর করি, ও কি কিছু দেখে !"

"সাধুবাবার থলিটা ভিজে যাচ্ছে—।"

"আচ্ছা, ওটা আমাকে দিন, আমার সিন্দুকে রেখে দিচ্ছি গিয়ে।"

"বেশ, সেই ভালো। ওতে দরকারি একটা চিঠি আছে। ভিজে গেলে লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

গেরুয়াধারী তার থলিটা দিয়ে দিলেন ভজুয়ার বউকে। নস্যির ডিবেটা বার করে রাখলেন শুধু। ভজুয়ার বউ যাবার আগে দুধে কলাটা চট্‌কে পাকা দেওয়ালটার এক কোণে রেখে গেল।

সে চলে যাবার পর গেরুয়াধারী এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বললেন, "ওয়াণ্ডারফুল। আজ এই অশিক্ষিতা বিহারী গ্রাম্যবধূর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব। এরই ব্যাক্-গ্রাউণ্ডে আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সে কথা পরে বলব। আমরা এদের হতশ্রদ্ধা করে ওই হারামজাদীদের নকল করি। তাই আমাদের এই দুর্দশা। বেশ্যা আর লুচ্চায় দেশ ভরে গেল !"

গোবর্ধন বললেন—"মানুষের পশুত্ব তো সহজে যেতে চায় না—"

"চায় না তা মানি। কিন্তু পশুত্ব নিয়ে আস্ফালন, পশুত্বের পূজা এখন যতটা হয়েছে আগে ততটা ছিল না।"

একটু পরেই ভজুয়ার বউ নতুন হুঁকোয় এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর নিয়ে এল কিছু তামাক আর কাঠকয়লা। তারপর একটা মাটির বোড়শিও দিয়ে গেল। বিহার অঞ্চলে এ জিনিসটার খুব চলন গরীবদের ঘরে। এতে আগুন থাকে। একটি ছোট লোহার চিমটেও নিয়ে এসেছিল সে। সব গুছিয়ে দিয়ে বললে, "আমি এবার চললাম। ওকে খাওয়াই গে—"

"ভজুয়া কি করছে ?"

"কি আর করবে, পড়ে আছে মড়ার মতো।"

মুচকি হেসে চলে গেল ভজুয়ার বউ।

হুঁকোয় একটা টান দিয়ে গোবর্ধন বললেন, "এবার বেশ জমেছে। নিন এবার শুরু করুন আপনার জীবন-কাহিনী। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার।"

"হয়েছে। কিন্তু তাতে আমার কৃতিত্ব আছে বলে মনে করি না। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই আমি গেছি।"

"তারপর কি হ'ল বলুন—"

"আমি তো ওই গভর্ণমেণ্ট হাউসের চাকরিতে রয়ে গেলাম। তারপরই নতুন হিড়িক— প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণে আসছেন। বিহারে সাতদিন থাকবেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসেই থাকবেন। থাকলেনও তাই। গভর্ণর তাঁকে পুরো গভর্ণমেণ্ট হাউসটি ছেড়ে দিয়ে নিজে টেণ্টে গিয়ে রইলেন।"

"প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মানে?"

"যিনি এড্‌ওয়ার্ড দি এইটথ্ হয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরে মিসেস্ সিম্পসনকে বিয়ে করে সে সিংহাসন ত্যাগ করেন—যিনি এখন ডিউক অব্ উইণ্ডসর নামে পরিচিত। তিনিই—"

"ও। তারপর?"

"তাঁর আসবার খবর আসতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল গভর্ণমেণ্ট হাউসে। শুধু গভর্ণমেণ্ট হাউসে নয়, সারা দেশময়। তাঁকে দেশের নেতারা অভ্যর্থনা করেন নি, ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে কিন্তু অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন করতে হ'ল। মিস্টার ব্রেট আমাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন নতুন জিনিসপত্র কিনতে। রাজপুত্র স্বয়ং আসছেন তাঁর জন্যে সব নতুন জিনিস চাই। মানি ইজ্ নো কোশ্চেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসকে রিজুভিনেট্ করতে হবে। চলে গেলাম কোলকাতায়। নতুন কাট্‌লারি, নতুন পর্দা, নতুন কার্পেট, নতুন বিছানা—আরও সব নানা রকম নতুন জিনিস কিনলাম আর্মি নেভি স্টোর্স এবং আরও অনেক বড় বড় দোকান থেকে। ছিলাম গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ হ'ল আমার হাত দিয়ে। কর্তারা আমার কাজের খুব তারিফ করলেন। পাঁচ হাজার টাকার একটি 'চেক' পেলাম বক্‌শিশ হিসাবে। আর্মি নেভি স্টোরের কর্তারাও আমাকে একটি হাজার টাকার বেয়ারার 'চেক' অফার করেছিলেন, কিন্তু আমি সেটি নিইনি। ব্রেট সাহেব আমার অনেস্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।"

গোবর্ধন সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—"আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি অনেস্ট লোক।"

"তাই নাকি! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যা চকচক করে তা-ই সোনা নয়। সোনার শেষ বিচার কষ্টিপাথরে—"

"থাক ও কথা। তারপর কি হ'ল বলুন—"

"তারপর নির্দিষ্ট দিনে এসে পড়লেন হিজ রয়াল হাইনেস। আমরা তাঁর জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম। যদিও বাইরে সব 'বয়কট্' চলছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হাউসে সাড়ম্বরে স্টেট ডিনারের বন্দোবস্ত হল। এখন স্টেট ডিনারের নিয়ম হচ্ছে রাজার পাশে রাণী থাকবে। কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অবিবাহিত, তাই তাঁর জন্যে একটি

অ্যাকটিং রাণীও ঠিক করতে হ'ল। এক বড় অফিসারের একটি সুন্দরী পালিতা কন্যা ছিলেন, তাঁকে রাণীর পদে বরণ করা হ'ল। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। ভজুয়ার বউকে দেখে তার কথাই মনে হচ্ছিল। সাত দিনের জন্য রাজপুত্রের স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার হয়ে এলেন স্কট্‌ল্যান্ড ইয়ার্ডের দুজন স্পেশাল চীফ কনস্টেবল্‌, তাছাড়া পার্সোনাল A. D. C, পার্সোনাল সেক্রেটারি, পার্সোনাল মোটর ড্রাইভার, স্পেশাল ভ্যালেটস্‌। দস্তুরমতো রাজকীয় আড়ম্বরে এলেন রাজপুত্র। সমস্ত ভারত-বর্ষের সি. আই. ডি অফিসাররা, বিহার পুলিশের আই. জি, ডি. আই. জি., এস. পি., ডি. এস. পি., আর ইনস্পেক্টররা সবাই চাপরাশি-উর্দি পরে পাহারা দিতে লাগলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউস সবগরম হয়ে উঠল—"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের গরীব গৃহস্থদের ঘর সরগরম হয়ে ওঠে বিয়ে-টিয়ে হলে। যাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় তাদের বাড়িও সেই সময় গমগম করে—"

"ঠিক বলেছেন, এ-ও অনেকটা সেই রকম। তবে বিয়েবাড়িতে বা দুর্গাপুজোতে যে আনন্দ হয় সে আনন্দটা এখানে নেই। সব যেন চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ। স্টেট ডিনার হচ্ছে, কিন্তু আনন্দ কলরব নেই, ফিসফিস কথা, মাঝে মাঝে ছোট্ট মেকি হাসি, আর কাঁটা চামচের শব্দ - ব্যস—"

"আমাদের দেশের বাড়িতে একবার দুর্গাপুজো হয়েছিল, কি যে আনন্দ হয়েছিল! গ্রামের সব গরীব দুঃখীদের বাবা খাইয়েছিলেন আর একখানা করে কাপড় দিয়েছিলেন। কি দিন ছিল! আজ আমাদের নিজেদের কাপড় কেনবার পয়সা নেই—"

"সবই টিকির টানের ব্যাপার। তাঁর যদি মর্জি হয়, সব হবে আবার।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। বলুন, তারপর কি হ'ল—"

"হিজ্‌ রয়্যাল হাইনেস যে ক'দিন রইলেন সে ক'দিন খুব সরগরম ছিল গভর্ণমেণ্ট হাউস। তারপর চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় আমাকে একটা সোনার সিগারেট কেস দিয়ে গিয়েছিলেন। আর শেকহ্যাণ্ড করে বলেছিলেন—Remember me when you wish. আমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। জিগ্যেসও করেছিলেন আমি কি চাই। উত্তরে আমি বলেছিলাম, কিছু না। যদি বলতাম আমাকে কোথাও District Magistrate করে দিন তাও দিতেন বোধহয়। কিন্তু আমার তখন সাংসারিক বুদ্ধি কিছু হয়নি। প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ চলে যাবার পর যিনি পার্মানেণ্ট গভর্ণর হবেন তিনি এলেন। তিনি সব নিজের স্টাফ নিয়ে এলেন। নতুন A. D. C., নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি এল। ব্রেট সাহেব গয়াতে ডিস্ট্রিক্ট্‌ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেলেন। হ্যাসকেট সাহেব চলে গেলেন বিলেতে। আমি অভিভাবকহীন হয়ে একটু অসুবিধায় পড়লাম। ব্রেট সাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি পুলিশে ঢোক। তাঁরই রেকমেণ্ডেশন পেয়ে অবশেষে নমিনেশন পেলাম। ট্রেনিং নিতে গেলাম হাজারিবাগে। জীবনে আবার নতুন পর্ব আরম্ভ হ'ল। অদৃশ্য হস্তটি আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আবার আমাকে নতুন জায়গায় নিয়ে এলেন।"

"আমিও পুলিশে ঢোকবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। পুলিশ হলেই যে মন্দ হবে এমন কি কথা আছে। আমাদের সীতারামবাবু দারোগা দেবতুল্য লোক ছিলেন।"

"দেবতুল্য লোক যে দৈত্যদের মধ্যেও আছে এ কথা তো আমাদের পুরাণেই আছে। শেষনাগ, প্রহ্লাদ এরা তো দৈত্যকুলের লোক।"

"আপনার পুলিশ লাইন কেমন লাগল ?"

"চাকরি, চাকরি ! ওর আবার লাগালাগি কি আছে। মনিবকে খুশি রেখে যতটা পার নিজের কোলের দিকে ঝোল টান, এই হ'ল মন্ত্র। এই ভাবে কাটল কিছুদিন। বেশ কিছুদিন। কয়েক বছরের কথা বাদ দিয়েই যাচ্ছি, কারণ বলবার মতো কোনও ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেনি ও ক'বছরে। কেবল দিনগত পাপক্ষয়—"

"দারোগাদের জীবনে তো অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে শুনেছি। আপনার জীবনেও নিশ্চয় ঘটেছে দু'একটা। তাই শুনি না - যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"রোমাঞ্চকর ঘটনা ? তা ঘটেছে বইকি। আচ্ছা একটা ঘটনা বলি। এর থেকে বুঝতে পারবেন কি ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে আমাকে। আমি তখন ছাপরা জেলার সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেকটার হয়ে কাজ করছি। এমন সময় একদিন এক সি. আই. ডি. এলেন। তাঁর নামটা আর করব না, ধরুন ইন্দ্রবাবু। তিনি এলেন একটা নোট জাল কেসের মাল-মসলা নিয়ে। তিনি ওই নোট জালের আখড়া কোথায় তা আন্দাজ করেছেন, কিন্তু প্রমাণের অভাবে হাতে-নাতে তাদের ধরতে পারছেন না। তিনি আমাকে তাঁর সহকারীরূপে নির্বাচন করলেন অতীব গোপনে। তিনি গিয়ে এস. পি.-কে অনুরোধ করলেন যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেপিউট (depute) করা হয়। এস. পি. রাজী হলেন, আমিও রাজী হলাম। তখন খাতায় পত্রে পুলিশ সার্ভিস থেকে আমাকে লোপাট করে দেওয়া হ'ল। গেজেটে ছাপা হয়ে গেল যে আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। এর কারণ পরে জানবেন, আমারই হিতার্থে করা হ'ল এটা। আমার বাড়িতে গিয়ে বলা হ'ল যে খবরটা ভুলক্রমে গেজেটে বেরিয়েছে। আমার চাকরি যায়নি, ঠিকই আছে। পুলিশ আপিস থেকে পুলিশের লোক এসে আমার স্ত্রীর হাতে মাইনে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। তবে ব্যাপারটা যেন কিছুতেই জানাজানি না হয়, কারণ এটা একটা টপ্ সিক্রেট। পাবলিক জানবে আমি আর পুলিশে চাকরি করছি না। এই বন্দোবস্ত হবার পর আমি আর ইন্দ্রবাবু একদিন বস্তি অভিমুখে যাত্রা করলাম। বলা বাহুল্য ছদ্মবেশে। ওখানে পৌঁছে ইন্দ্রবাবু আমাকে যা নির্দেশ দিলেন তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বললেন—'এখান থেকে সোজা উত্তরে চলে যাও। দিঘ্ওয়ারা গ্রামে পৌঁছবে। সেখান থেকে দক্ষিণমুখে চলতে হবে। রাস্তায় ভোল বদলে ফেলতে হবে একেবারে। কামাতে পাবে না, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি গজানো চাই। তোমার লম্বা চুল কেটে ছোট ছোট করে ফেলে একটি টিকি রাখবে। চুলে তেল দিও না, উস্কখুস্ক হওয়া চাই। বাঁ চোখটি ঈষৎ বুজে থাকবে, দাঁতে মিশি দেবে। গায়ে জামা থাকবে না, কাপড়টি হবে ময়লা এবং ছেঁড়া। অর্থাৎ একটি আস্ত উজবুক পাড়াগাঁয়ে ভূত সাজতে হবে তোমাকে। দিঘ্ওয়ারা থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণমুখো চলে একটি বটগাছ দেখতে পাবে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দেখতে পাবে একটি প্রকাণ্ড মাঠ। সেই দিকে গুটিগুটি এগুবে। একটু পরেই দেখতে পাবে প্রকাণ্ড একটি আউট হাউস্ রয়েছে, খড় দিয়ে ছাওয়া। তারই আশেপাশে ক্যাবলার মতো ঘোরাফেরা করতে থাকবে। তারপর সবই

অনিশ্চিত। ভগবান যা করেন তাই হবে। তোমায় একটি কাজ রোজ করতে হবে। ওখানে যা দেখবে বা শুনবে তা প্রতি বৃহস্পতিবার কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখে, যেমন করে পার রাত বারোটার পর তিন মাইল পশ্চিমে যে পুকুরটা আছে তার তীরবর্তী তালগাছের পাশে যাবে। সেখানে দেখবে নুড়ি-দিয়ে-চাপা-দেওয়া আর একটা কাগজ রয়েছে। সেই দুটো কাগজ নিয়ে আরও দু'মাইল গিয়ে পোস্ট-আপিসে —Crime assistant to D. I. G., C. I. D.—এই ঠিকানায় বেয়ারিং পোস্ট করে দেবে until further orders·"—এই ভয়ংকর নির্দেশ দিয়ে ইন্দ্রবাবু চলে গেলেন। আমিও রওনা হলাম। যথাসময়ে সেই বটবৃক্ষ আর খোড়ো আউট্-হাউসের সাক্ষাৎ পেলাম। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আমি সেই খোড়ো চালাটার কাছে এগিয়ে গেলাম আর একটু, তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। গা-টা ছমছম করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটি আলোর রেখা একটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখলাম একটা ঘোড়াও সেই ঘরে রয়েছে। কি করব ভাবছি এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলাম—"কৌন্ হ্যায়রে শালা!" আমি তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের মতো একটা লোক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসেই বলল, "তু শালা হিঁয়া কি করত্-বানি?"—বলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে প্রচণ্ড চড় মারলে একটা। টাল খেয়ে পড়ে গেলাম এবং পুলিশে চাকরি করার যে কি অপরিসীম আনন্দ তা তৎক্ষণাৎ অনুভব করলাম। তারপর উঠে হাতজোড় করে করুণকণ্ঠে বললাম—'জী অন্নদাতা, ম্যয় ভিখারী ছি, নোক্রি ঢুঁড়েইছি। তিনদিন কুছু ন খাইলবানি'—বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। থিয়েটার করা অভ্যাস ছিল তো, পার্টটা বেশ জমিয়ে ফেললাম। ডাকাত ব্যাটার প্রাণেও করুণার সঞ্চার হ'ল। বললে—'ঘোড়াকা কাম জানতানি? সহিস রে শালা।' বললাম, 'হাঁ, হজুর।' চাকরিটি হ'ল। আমার কাজ হ'ল একটি ছোট সাদা নেপালী ঘোড়ার ঘাস কাটা, ডলাই মলাই করা আর রোজ বিকেলে তাকে একটি খুঁটিতে বেঁধে চক্র-দৌড় করানো। আমার শোবার জায়গা হ'ল ওই আস্তাবলেই। ঘোড়ার মূত আর লিদ্দির উপর। মনিব একটি ছেঁড়া বিরাটগঞ্জের কম্বল দিলেন। সেইটিই আমার সম্বল হ'ল। ভাঙা মাটির সানকিতে লাল মোটা চালের ভাত দিত, ভাত ছাড়া তাতে থাকত প্রচুর কাঁকর আর ধান। তাই খুব মিষ্টি লাগত, কারণ হাঙ্গারের সস্‌টি ছিল। সমস্ত দিনে ওই একটিবার মাত্র খাওয়া জুটত তিনটে আন্দাজ। আস্তাবলটা আমি যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখতাম। 'লিদ্দি' বেশী জমতে দিতাম না। তাই বেশী গন্ধও হত না, মাছিও হত না। কিরকম মাছি শুনবেন? বিরাট বড় গো-মাছি। রাম-মাছি বললে আরও ঠিক হয়। ঘোড়াদের শত্রু। সর্বাঙ্গে ঘা করে দেয়। আমি আস্তাবলটা পরিষ্কার রাখাতে মাছির উপদ্রব কমল। আমিও বাঁচলুম, ঘোড়াটাও বাঁচল। সুযোগ পেলে মাছি মারতুমও। মেরে মেরেই প্রায় নির্মূল করে-ছিলাম। এই সব দেখে ঘোড়ার মালিক একটু সদয় হলেন আমার প্রতি। ঘোড়ার চেহারা দেখে খুশী হলেন। ভাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আচার দিতে লাগলেন।"

গোবর্ধন বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে যেন শার্লক হোম্‌স্-এর গল্প পড়ছি। তারপর?"

"আমার কাছে ক্যালেণ্ডার ছিল না। দেওয়ালে একটি করে দাগ কেটে রাখতাম

করে বৃহস্পতিবার ঠিক করার জন্যে। প্রতি বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে শুধু পায়ে হেঁটে কম্বল জড়িয়ে তিনটি মাইল পথ অতিক্রম করে সেই পুকুরধারে গিয়ে পেঁছিতাম আর সেই তালগাছের আশ-পাশে হাতড়াতাম নুড়ি-চাপা-দেওয়া কোনও কাগজ আছে কি না। সেখানে সাপ বিছে কাঁটা, বড় বড় মশা সবই ছিল, ভগবান আমাকে রক্ষা করতেন। প্রতিবারই কাগজ পেতাম এবং সেটা গিয়ে নির্দেশমতো পোস্ট করে দিতাম দুমাইল দূরের সেই পোস্টাফিসে। আমি নিজেও কিছু কাগজ আর পেন্সিল লুকিয়ে যোগাড় করেছিলাম। আমার রিপোর্টও সেই সঙ্গে পাঠাতাম as ordered by Indra Babu. চিঠি পোস্ট করে ওই পাঁচ মাইল পথ আবার হেঁটে ফিরে আসতাম নগ্নপদে ও নগ্নগাত্রে কম্বল জড়িয়ে। ফিরে এসেই শুয়ে পড়তাম। সকালে উঠে ঘোড়ার ডলাই মলাই তারপর ঘাস-কাটা।

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। ওই খোড়ো ঘরটার সামনে একটা ইঁদারা ছিল আর সেই ইঁদারার ধারে ছিল ফুলগাছের ঝোপ-ঝাপ। তরে মধ্যে ছিল একটা পাথরের চৌতারা গোছের। ওই ডাকাতের মতো লোকটা তার উপর প্রায় সমস্ত দিন বসে থাকত। কখনও রুটি বানাচ্ছে, কখনও ডন করছে, কখনও খাটিয়া বিছিয়ে শুয়ে আর একটা লোককে দিয়ে গা হাত-পা টেপাচ্ছে। আমি যা যা দেখতাম প্রতি বৃহস্পতি-বার জানিয়ে দিতাম। এইভাবে চলল প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহের খেল। তারপর একদিন খুব ভোরে যবনিকা উঠল। দেখি এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সমস্ত মাঠটা ঘিরে ফেলেছে। রাত্রেই ঘিরেছে। ভোর না হতেই প্রায় পঁচিশটি মিলিটারি পুলিশ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এল, সঙ্গে তাদের স্বয়ং সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, তাঁর হাতেও রিভলবার। তারা এগিয়ে গেল ইঁদারাটার দিকে। তারপর সেটাকে ঘিরে ফেললে। তারপর সেই চৌতারাটার পাথর তুলে সরিয়ে দিলে দূরে। প্রকাণ্ড একটা টানেল বেরিয়ে পড়ল।"

"টানেল ?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ মশাই টানেল। বিরাট টানেল—"

"তারপর ?"

"টানেলে ঢুকে পড়ল সবাই। পুলিশ সাহেবসুদ্ধ—। দুম্ করে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর সব চুপচাপ। একটু পরে বারোটি লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বেরুলেন তাঁরা। সবিস্ময়ে দেখলাম অ্যারেস্টেড লোকেদের মধ্যে ইন্দ্রবাবুও রয়েছেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। ইন্দ্রবাবু ছদ্মবেশে ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করে ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। তিনিই রোজ তালগাছের নীচে গুপ্তখবর লিখে রেখে আসতেন প্রতি বৃহস্পতিবারে। আর আমি সেটা পোস্ট করে আসতাম। টানেলের ভিতর একটু খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। এস পি. একটি লোককে গুলি করে মেরে ফেলে-ছিলেন আর ওরা গড়াশা দিয়ে একটি পুলিশের একটি হাত কেটে দিয়েছিল। সেই নিহত ব্যক্তি এবং আহত পুলিশটিকে পুলিশ ভ্যানে চড়ানো হ'ল। নোট জাল করবার সব জার্মান-মেড যন্ত্রপাতিও ধরা পড়ল। শুধু তাই নয় নোট ছাপাবার কাগজ, একশ টাকা আর দশ টাকার অনেক ছাপা নোটও পাওয়া গেল। বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন জালিয়াত মহেন্দ্র মিশির দলবল সমেত। আমিও অ্যারেস্টেড হলাম। আমাকে আর অন্য বারোজন আসামীকে স্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। ব্যরো মাইল রাস্তা। আর সে কি রাস্তা! তাছাড়া পুলিশদের অকথ্য অত্যাচার, গালাগালি আর মার।

প্রস্রাব করতে বসলেও মারছে। পুলিশদের ব্যবহারে বেশ জখম হলাম মনে মনে। আমার সেই ঈষৎ-বোজা চোখ আরও বুজে গেল, ঝোলা-ঠোঁট আরও ঝুলে পড়ল। অবশেষে ছাপরা জেলে গিয়ে হাজির হলাম এবং ঢুকলাম একটা সেলে। প্রত্যেকেরই আলাদা সেল। কারও সঙ্গে কথা বলবার জো নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন।"

"তারপর?"

"কি আর করব? বসে রইলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। এক-একবার সন্দেহ হতে লাগল গবর্ণমেণ্ট কি আমার কথা ভুলে গেল? তা না হলে একি ব্যাপার! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! মনের মধ্যে হতাশার অন্ধকার ঘনীভূত হতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই ভগবান প্রসন্ন হলেন। গভীর রাত্রে অন্ধকার দূর করে সূর্য উঠল। মানে, আমার পূর্ব-পরিচিত জেলারবাবু একটি টিফিন-কেরিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে করে আমার সেলে ঢুকলেন। টিফিন কেরিয়ারে মাখন পাঁউরুটি আর ডিম, ফ্লাস্কে গরম চা। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। অনেকদিন পরে ভদ্র-খাওয়া খেয়ে বাঁচলাম। জেলারবাবু বললেন, কোনও ভয় নেই। আমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার লোক-দেখানো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার খাবার জেলারবাবু রোজ দিয়ে যাবেন। এস. পি. নিজে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রবাবুও আলাদা একটা সেলে আছেন এবং তাঁকেও জেলারবাবু চা-পাঁউরুটি খাইয়ে এসেছেন। এস. পি. বলেছেন আমি যেন আমার চোখটা আধ-বোজা করেই রাখি। অন্তত যখন কোর্টে দাঁড়াব তখন যেন চোখটা ওইরকমই থাকে। পরদিনই ছাপরা কোর্টে আমাদের হাজির করা হ'ল। খালি পা, শুধু গা, লম্বা গোঁফ দাড়ি, মাথার লম্বা চুলে জটা। পায়ে হেঁটে গেলাম ছাপরা শহরের ভিতর দিয়ে। ভারি লজ্জা করছিল, মনে হচ্ছিল ওই বুঝি কেউ চিনে ফেলল। সেখানে বাঙালীদের মধ্যে আমি খুব পপুলার ছিলাম তো, কালীবাড়িতে 'সীতা' প্লেতে রাম সেজে প্রভূত খ্যাতি ও একটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলাম। আমি হাঁটবার সময় মাথা হেঁট করে প্রায় দু'চোখ বুজেই চলছিলাম, খরগোশরা যেমন বিপদে পড়লে চোখ বুজে একজায়গায় বসে পড়ে—আমারও মনোভাব অনেকটা তেমনি হ'ল। এস. ডি. ও সাহেবের কোর্টে হাজির হলাম। সেখানে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং কোর্ট-সাবইন্সপেক্টার দরখাস্ত করলেন যে আমরা গভর্ণমেণ্ট আপ্রুভার হয়েছি, আমাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাড়া পেয়ে গেলাম। তারপরদিনই ভোলও বদল করে ফেললাম। গোঁফ দাড়ি কামিয়ে, চুল ছেঁটে সাবান দিয়ে স্নান করে পূর্ববৎ হয়ে গেলাম আবার। আধ-বোজা চোখ আর আধ-বোজা রইল না, পুরো খুলে গেল। তারপরদিন থেকে পুলিশের পোশাক পরে পুলিশের কাজ করতে লেগে গেলাম। এমন কি ওদের ট্রায়াল দেখতেও যেতাম। মহেন্দ্র মিশির আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা আমাকে আর ইন্দ্রবাবুকে আর চিনতেই পারল না। তাদের চক্ষে আমরা লোপাট হয়ে গেলাম। যথা নিয়মে বিচার হ'ল তাদের এবং যথাকালে জেল হয়ে গেল সব ক'টার। আমাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'ল এবং যাতে আমি ইন্সপেক্টার হতে পারি তার জন্যে রেকমেণ্ড করা হ'ল। ইন্দ্রবাবু ডি. এস. পি. হলেন এবং দু'হাজার টাকা পুরস্কার পেলেন। তিনি যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ—"

গেরুয়াধারী চুপ করলেন।

বাইরের ঝড়টা প্রবল হয়ে উঠল আবার। গঙ্গার পাড়-ভাঙার শব্দটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গোবর্ধন বললেন—"আপনার অভিজ্ঞতাটাও অসাধারণ।"

গেরুয়াধারী মৃদু হাসলেন।

"আপনাদের কাছে যেটা অসাধারণ মনে হয় আমাদের কাছে সেটাই সাধারণ। ওই আমাদের জীবন। তবে একটা কথা বলব, এ জীবনে যেমন মন্দও দেখেছি তেমনি ভালোও দেখেছি অনেক। পঙ্ক আছে কিন্তু পঙ্কজও দেখা যায় মাঝে মাঝে দু'একটা।"

"তাই নাকি! শোনান না তাদের কথা। আপনি না থাকলে কি করে যে এই দুর্যোগের রাত্রি কাটত কে জানে। গল্পের নৌকোয় চড়ে যেন উদ্দাম পদ্মা অতি সহজে পার হয়ে যাচ্ছি।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী।

"আপনি কবি লোক দেখছি—"

তারপর চুপ করে ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, "আচ্ছা শুনুন তবে। দুটো ঘটনা মনে পড়েছে। প্রথমটা পঙ্কের, দ্বিতীয়টা পঙ্কজের। প্রথমটা আগে শুনুন। তখন আমি কটকে ডি. আই. জি'র সঙ্গে আছি। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি। সাদা পোশাকেই স্টেশনে এসেছি, কোমরে অবশ্য রিভলভার বাঁধা ছিল। পুরী এক্সপ্রেস তখন রাত আটটা কুড়ি মিনিটে দশ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ত। আমি আমার কম্পার্টমেন্টটির সামনে দাঁড়িয়ে নস্যি নিচ্ছি, এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ে ন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। রীতিমতো সুন্দরী, তাছাড়া ঠোঁটে রং, গালে রং, চোখে কাজল। মুখচোখে একটা উতলা অসহায় ভাব। মাথার আঁচল আর বুকের কাপড় বারবার খুলে খুলে পড়ছে। এসে কমনীয় কণ্ঠে বললেন,—'আমাকে একটু সাহায্য করবেন? বড় বিপদে পড়েছি।' জিগ্যেস করলাম,—'কি করতে পারি বলুন।' তিনি বললেন যে, 'কটকের আদালতে কালই আমার একটা জরুরি মকদ্দমা আছে। সেইজন্যে আমি কটক যাচ্ছি। কিন্তু এখানে হঠাৎ আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। তাতে আমার টিকিট টাকাকড়ি সব আছে। আপনি দয়া করে আমাকে কটক পর্যন্ত পেঁছে দিন!' হেসে উত্তর দিলাম, 'মাফ করবেন, আমি পারব না।' শুনে সরে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটাও ছাড়ল। আমি একটা সেকেন্ড ক্লাসের খালি কামরায় উঠে পড়লুম। ওমা, দেখি মেয়েটাও উঠেছে আমার পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে একটা ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা গোছের ছোকরা ট্রেনের ফুটবোর্ডে উঠে হাতল ধরে দাঁড়াল। ট্রেন ইতিমধ্যে 'স্পীড' নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়েছে। গুণ্ডাটাও ঢুকল কামরার ভিতরে এবং মেয়েটা তাকে দেখে বলে উঠল—'আরে, তুমি এখানে!' লোকটি ভুরু আর চোখের ইশারায় মানা করল তাকে কোন কথা বলতে। আমি বুঝলাম ব্যাপার সুবিধের নয়, গড়বড় আছে কিছু। ট্রেন তখন ফুল স্পীডে চলেছে। আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলাম একটি—'আমি পুলিশের লোক, সঙ্গে লোডেড রিভলবার আছে। বাড়াবাড়ি করলে নিজেরাই বিপদে পড়বেন।' একথা শুনে দু'জনেই নির্বাক হয়ে গেল। ট্রেন চলেছে, খড়্গপুরের আগে থামবে না। পাক্কা দেড়টি ঘণ্টা লাগবে খড়্গপুরে পেঁছতে। তিনজনেই নির্বাক হয়ে বসে কাটিয়ে

দিলাম সময়টা। ট্রেন খড়্গপুর স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনজন টি. টি. আই. উঠে পড়লেন আমাদের কামরায়। তিনজনই আমার খুব চেনা—মার্টিন, উইলিয়াম্‌স্‌ আর মজুমদার। তিনজনেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, হ্যালো, স্যানিয়েল কোথা চলেছ? বললাম, কটক। তারপর তাঁরা 'চেকিং' শুরু করলেন। মেয়েটির কাছে টিকিট চাইতেই তিনি কি বললেন জানেন? আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'উনি আমার স্বামী। ও'র কাছে টিকিট আছে।' আমি শুনে বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। মজুমদার আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন—'সত্যি নাকি?'

আমার বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল। মনে একটু রস-সঞ্চারও হ'ল। বললাম, 'আমার সাত পাকের বউ তো আমার বাড়িতে আছে। ইনি বোধহয় বিপাকের বউ হতে চাচ্ছেন!' হেসে উঠলেন মজুমদার। মার্টিন বাংলা জানেন না। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—What's the fun? বললাম, She poses to be my wife. It is a damn mendacious lie. ওদের দু'জনের কারো কাছেই টিকিট ছিল না, পয়সাও ছিল না। তাদের পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে টি. টি. আই-রা অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠল। বুঝুন ব্যাপারটা। পথে ঘাটে কত রকম বিপদেই যে পড়তে হয়। ভগবানই রক্ষা করেন সব।"

গেরুয়াধারী নীরব হলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমি কখনও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাল্লায় পড়িনি। একবার একটা ট্রেনে এক বাইজির সঙ্গে এক কামরায় গিয়েছিলাম কিছুদূর। আমি একধারে চুপ করে বসেছিলাম, সে-ও আমার দিকে নজর দেয়নি বিশেষ। এক দাড়িওলা মিঞা-সাহেবের সঙ্গেই গল্প করছিল সারাক্ষণ।"

"আপনি কুনো লোক। সারাজীবন কেবল বাবার তামাক সেজেছেন। দুনিয়ার কোন খবর রেখেছেন কি? রাখেন নি বলেই গায়ে কাদা লাগেনি। আমাকে যে কাদা-ঘাঁটার চাকরিই করতে হয়েছে সারাজীবন। তবে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো লোকও দেখেছি। পাঁকের গল্পটা তো শুনলেন, এবার পঙ্কজিনীর গল্পটা শুনুন।"

"বসুন—।"

গল্পটি রোমাঞ্চকর। কলকাতায় গেছি এক বিয়ের ব্যাপারে। সঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক টাকা। গিয়ে উঠলাম এক বন্ধুর বাড়িতে। টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে তার বাড়ি। বন্ধুটির নাম দ্বিজেন পাল। পাল বলেই ডাকি তাকে। গিয়ে দেখলাম বন্ধুর স্ত্রী নেই, বাপের বাড়ি গেছেন। বড়ই বিক্ষিপ্ত-মনা তিনি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে আমি একাই একটা ঘরে শুলাম। বন্ধু শুলেন আলাদা ঘরে। শোবার সময় চিরকাল লুঙ্গী পরে শুই। ব্যাগ থেকে একটি চেক-চেক মুসলমানী লুঙ্গী বার করে সেইটি পরে শুলাম। রাত চারটে আন্দাজ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম বাইরে ভয়ানক হট্টগোল হচ্ছে। বাইরের বারান্দায় উঠে এসে দেখি রাস্তায় পিলপিল করছে লোক। মশাল জ্বলছে। লোকগুলোর মুখে মুখোশ। তাদের হাতে তলোয়ার, লাঠি আর গাড়াশা। বুঝলাম ডাকাত পড়েছে। মার মার শব্দে দরজা ভেঙে আশপাশের লোকেদের বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। শিশুদের চীৎকার আর মেয়েদের আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। বুঝলাম ঘরে ঘরে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে। আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে তিন হাজার টাকার নোটগুলো আমার কোটের পকেটে

পুরে ফেললাম। তারপর খিল দিলাম দরজায়। বাক্সের তালাটা খুলে লাগিয়ে দিলাম দরজার কড়ায়। তারপর 'পাল' 'পাল' বলে চিৎকার করতে লাগলাম। সাড়া পেলাম না তার। শুনতে পেলাম গুণ্ডার দল মার মার শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমি একটা রুলের মতো হাতের কাছে পেলাম, সেইটে নিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলাম যদি পালাবার কোন পথ পাই। হঠাৎ নজরে পড়ল জানলার সামনে ওপর থেকে একটা পাকানো কাপড় ঝুলছে। জানলার গরাদে ছিল না। তড়াক করে সেই কাপড় বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় আমার ঘরের দরজা ভেঙে গেল। চার পাঁচজন লোক এসে আমায় ধরে ফেললে, তারপর চ্যাংদোলা করে ঘরের মধ্যে এনে চিৎ করে শুইয়ে দিলে। একটা লোক আমার বুকে চেপে বসল, চারটে লোক ধরে রইল আমার হাত পা। তারপর এগিয়ে এল একটা বিরাটকায় গুণ্ডা, তার হাতে মস্ত ছোরা। আর একটু দেরি হলে ছোরাটা বসিয়ে দিত আমার বুকে। কিন্তু বিপত্তারণ মধুসূদন আমায় রক্ষা করলেন। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক আর উপুড় হয়ে পড়ল আমার উপর। বললে, 'আগে আমায় মারো তারপর একে মেরো।' গুণ্ডাটা ওর হাত ধরে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিল ওকে। ইতিমধ্যে ঘটেছে আর এক কাণ্ড। একটা গুণ্ডা আমার কোটের পকেট থেকে নোটের তাড়া আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠল—টাকা, অনেক টাকা। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আর নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। তখন আমাকে ছেড়ে সবাই সেই নোট কুড়ুতে লাগল। তিন হাজার টাকা সব দশ টাকার নোটে ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই তার উপর। সেই স্ত্রীলোকটি সুযোগ পেয়ে তখন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমাকে বার করল ঘর থেকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। আমার পরনে ছিল লুঙ্গী, সকলে ভাবলে আমিও মুসলমান। ডাকাতের দলটাই ছিল মুসলমানের। নিচে যারা ছিল তারা আমাকে কিছু বলল না। মেয়েটি আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হল একটা মাঠের মাঝখানে। তার উপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার চেহারা ঠিক আমার ভায়ের চেহারার মতো। আমার সে ভাই আর বেঁচে নেই। তুমি আমার নতুন ভাই। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। তাই নিজের প্রাণ কবুল করে তোমাকে বাঁচিয়েছি। তুমি দৌড়ে পালাও এখান থেকে।' আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কে! সে বললো—'আমি ওই গুণ্ডাটার বউ যে তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। আমি সন্ধ্যে থেকেই এই বাড়ির ছাতে লুকিয়ে বসেছিলাম, আমিই ওদের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছি। আমি যখন তোমাকে দেখলাম তখন ওরা ঢুকে পড়েছে। তখন আমি ছাত থেকে একটা শাড়ি পাকিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, যদি পালাতে পার। কিন্তু পারলে না। যাক—এখন পালাও।'

আমি লাইন বরাবর ছুটতে ছুটতে যাদবপুর স্টেশনে এসে যখন পেঁছিলাম তখন সূর্যোদয় হয়েছে। একবার ভাবলাম থানায় খবর দি। কিন্তু তখনই মনে হ'ল তাহলে বিশ বাঁও জলে পড়ে যাব। তাছাড়া পুলিশে খবর দিলে যদি ওই গুণ্ডার বউটাও ধরা পড়ে! যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তাকে কি ধরিয়ে দেওয়া উচিত? সুতরাং ও আহাম্ময়া ছেড়ে দিলাম। গিয়ে উঠলাম আর এক বন্ধুর বাড়িতে লেকের ধারে। দিন পাঁচেক পরে খবর পেলাম পালকে ওরা কেটে ফেলেছে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, "আপনার একটা জীবনে এত সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে এ যেন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না!"

"এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। আমার জীবনটা একটি আশ্চর্য ঘটনার অভিধান বিশেষ। ঠিকই বলেছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। সেইজন্যে কারও কাছে বলিও না। আজ এই দুর্যোগের রাত্রে আপনাকে পেলাম তাই সময় কাটাবার জন্য বললাম কয়েকটা—হয়তো অবিশ্বাস্য।"

গেরুয়াধারীর কণ্ঠে একটা অভিমানের সুর যেন ধ্বনিত হ'ল।

গোবর্ধন বললেন, "না, না, আপনার কথা অবিশ্বাস আমি করিনি। ফার ফ্রম ইট্। আরও কি ঘটনা ঘটেছে বলুন। অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছি—।"

গেরুয়াধারী এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "আনন্দ পাচ্ছেন এইটেই পরম লাভ। আর আমারও পরম লাভ যে আপনার মতন সহৃদয় শ্রোতা পেয়েছি একজন। অনেক ঘাটের জল খেয়েছি তো। অনেক স্রোতে ভেসেছি। তাই অভিজ্ঞতাও নানারকম হয়েছে। শুনুন তাহলে আর একটা ঘটনা। এটাও আমার পুলিশ-জীবনেই ঘটেছিল। এ ঘটনা রূপান্তরিত করে দিয়েছিল আমার পরবর্তী জীবনকে।"

"বলুন বলুন শুনি। তামাক সাজি দাঁড়ান আর এক কলকে—"

সোৎসাহে তামাক সাজতে লাগলেন গোবর্ধন। কলকেটি ধরিয়ে, হুঁকোর মাথায় বসিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন। প্রচুর ধোঁয়া বেরুল।

"এইবার বলুন—"

"তখন আমি রেলের পুলিশে কাজ করি। সার্জেণ্ট মেজর হয়েছি। ট্রেনে গার্ডের ডিউটি। কিউলে পাঞ্জাব মেলটা এসে দাঁড়িয়েছে। কোন একটা কম্পার্টমেণ্টে উঠব বলে ছুটোছুটি করছি। হঠাৎ সামনে একটা ফার্স্ট ক্লাসের দরজা খোলা পেয়ে উঠে পড়লাম তাতে। উঠে দেখি শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ইংরেজ ভদ্রলোক একটি বেঞ্চের এক কোণে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছেন। ট্রেনটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল ততক্ষণ আমি বসে রইলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই ফুল মিলিটারি বাও করে বললাম—'একটি আইরিশের টিকিট নেবেন কি?'

সাহেব আমার হাত থেকে টিকিটের বইটি নিয়ে ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর আমার হাতে সেটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'সরি'। শুধু 'সরি' বলেই যদি থেমে যেতেন তাহলে ওইখানেই ব্যাপার চুকে যেত। কিন্তু তিনি আমাকে ধমকে উঠলেন।

বললেন, 'আপনি পুলিশের ইউনিফর্ম পরে কি করে এই টিকিট বিক্রি করছেন? এটা কি allowed? আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব!'

আমিও দমবার ছেলে নই। বললাম, 'স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। এই আমার নাম আর ঠিকানা। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখুন—হিজ্ এক্সেলেন্সি দি গভর্ণর অব বেহার একজন পাকা আই. সি. এস। তিনি রেড ক্রশ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। রেড ক্রশ সোসাইটির জন্য চাঁদা আদায় করতে তিনি ইতস্তত করেন না, কারণ রেড ক্রশ হচ্ছে আর্ত আতুরদের জন্য। স্বয়ং গভর্ণর যদি এ কাজ করতে পারেন তাহলে আমিই বা এ কাজ করতে পারব না কেন? আইরিশ হস্পিটাল ট্রাস্ট একটি বিশ্বব্যাপী হিউম্যানিটেরিয়েন্ অরগ্যানিজেশন্। এর জন্যে টিকিট বিক্রি করা মানে রোগীদের

সাহায্য করা। আপনি রিপোর্ট করলে যদি আমার চাকুরি যায় তাহলে সেটা আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করব। তখন সব সময়ই এ কাজ করতে পারব তাহলে "

সাহেব হিপনোটাইজ্‌ডের মতো হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার নাম ঠিকানা লেখা যে কার্ডখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম সেটা পকেটে পুরে ফেললেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে একটি পাতায় গোটাকতক আঁচড় টানলেন। ঠিক যেন বক উড়ে যাচ্ছে। তারপর কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন 'মাই বয়, এই কাগজটা যত্ন করে রেখে দিও। ভবিষ্যতে এটা তোমার প্রভূত উপকারে আসবে।'

আমি অবাক হয়ে কাগজটা নিলাম, নিয়ে নিজের মনিব্যাগে রেখে দিলাম। সন্দেহ হতে লাগল লোকটা সম্ভবত পাগল। সাহেব কাগজটি আমার হাতে দিয়ে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমার দিকে আর ফিরেও চান নি। আমি আর একটা বেঞ্চির কোণে বসে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন একটা স্ট্যাচু। অনেকক্ষণ দু'জনে এক কামরায় রইলাম, কিন্তু নীরবে। উনি যদি সাহেব না হয়ে বাঙালী হতেন তাহলে পরস্পরের হাঁড়ির খবর আমরা জেনে ফেলতাম। কিন্তু তা হ'ল না, আমার প্রাণ যদিও আনচান করছিল কিন্তু সাহেবের মুখ ওলোপ দেওয়া হাঁড়ি! একটি বাক্য বেরুল না সেখান থেকে। অবশেষে পাটনা জংশনে এসে গাড়ি থামল। আমি আবার মিলিটারি বাও করে নেমে যাচ্ছি, সাহেব উঠে এসে আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলেন। এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে মনে হ'ল কব্জিটা বুঝি ভেঙে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে গিন্নীকে বললাম—এটা রেখে দাও, দরকারি জিনিস। গৃহিণী মাত্রেই পুরুষকে বোকা, উড়নচণ্ডে, খামখেয়ালী—এইসব বলে মনে করেন। গিন্নী কাগজটি দেখে বললেন, কি ছবি আঁকা শিখছ নাকি? বক-ওড়ার ছবি ভালোই হয়েছে। ও নিয়ে আমি কি করব, তুমি রেখে দাও তোমার চিত্রশালায়। ভালো ছবি সংগ্রহ করার বাতিক ছিল আমার, এখনও আছে। ওই কাগজের চিরকুটটা সেখানেই রেখে দিলাম একটা চামড়ার কেসের মধ্যে। এর কিছুদিন পরেই হ'ল ভূমিকম্প, ভয়াবহ ভূমিকম্প, যার কথা আপনি বলছিলেন একটু আগে। ওই ভূমিকম্পতে আপনার চাকরি গেল, কিন্তু আমার হ'ল পোয়া বারো।"

"কি রকম?"

"বলছি দাঁড়ান। এক টিপ নস্যি নি।"

তিনবার 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করে গেরুয়াধারী নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "ও মশায়, আলোটা একটু উস্কে দিন তো। ও পাশটায় কি যেন খসখস করছে, সাপটা আবার বেরুল না কি। হ্যাঁ, ওই যে সরাতে মুখ দিয়ে দুধ কলা খাচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড। কার্বলিক লোশনের তোয়াক্কাই করলে না!"

গোবর্ধন বললেন—"পীরবাবার সাপ যে। ওহো, একটা জিনিস তো বড় ভুল হয়ে গেছে—"

"কি?"

"আমাদের এঁটো খাবারগুলো পড়ে আছে। সেই কুকুরটাকে ডেকে দি। দেখি কোথায় গেল—"

গোবর্ধন বাইরে বেরিয়ে ডাকতে লাগলেন—"আঃ, আঃ তু, তু—"

তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, "ভাগ্যে বেরিয়ে দেখলাম। আশা করে বসেছিল।"

এঁটো খাবারগুলো নিয়ে গেলেন বাইরে।

গেরুয়াধারীর মনে হ'ল এই ভাঙা ঘরে, এই সাপ, কুকুর আর ওই অচেনা লোকগুলোকে নিয়ে এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই যেন একটা সংসার গড়ে উঠেছে। সাপটাকেও আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

গোবর্ধন ফিরে এসে বললেন, "আকাশে আবার বেশ তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গঙ্গাও বাড়ছে। রাতটা পোয়ালে বাঁচি। বলুন আপনার ভূমিকম্পের কাহিনী। ভূমিকম্পে আপনার পোয়াবারো হয়ে গেল কি রকম?"

"ব্রেট্ সাহেব যে আমার উপর প্রসন্ন ছিলেন। নানারকমে চেষ্টা করছিলেন কি করে আমাকে ওপরে তুলে দেবেন। সাহেব প্রসন্ন হলে সে যুগে পাথর-চাপা কপালেও রাজসম্মান জুটে যেত। আমি তখন জামালপুরে বদলি হয়ে এসেছি। ছেলে-মেয়েরা মজঃফরপুরে, পিসের বাড়িতে। ভয়াবহ সব খবর শুনছি আর ভগবানকে ডাকছি, ভগবান রক্ষা কর। গৃহিণীকে উপর্যুপরি ছ'টা টেলিগ্রাম করেছি, কোন জবাব নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝুন। হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বললেন টেলিগ্রাম পাননি। প্রচণ্ড শীত। তার পর টেলিগ্রাফের লাইন সব ঠিক হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিগ্রাম পেলাম আই-জির কাছে থেকে—একজন দারোগা পাঠাচ্ছি, তাকে চার্জ দিয়ে দাও। তুমি মিস্টার ব্রেটের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট সিলেক্টেড্ হয়েছ। মিস্টার ব্রেট তখন রিলিফ ও রিকনস্ট্রাক্শন বিভাগের সেক্রেটারি হয়েছেন। একজন স্পেশাল মেসেঞ্জারও এল ওই সব খবর নিয়ে। স্পেশাল ট্রেনও এল সেইদিন রাত্রে। তাতে গভর্ণর, তাঁর স্টাফ, মিস্টার ব্রেট এবং আরও সব সাহেব ছিলেন। আমার জন্যে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা ঠিক করা ছিল। আমি মিস্টার ব্রেটের পি. এ. হলাম। ১৯৩৪ সালটা তাঁর সঙ্গে টুর করে কাটল। অনেক টাকা কামালাম। রিকনস্ট্রাক্শনের অত বড় একটা রাজসূয় ব্যাপার আমার হাত দিয়েই তো হ'ল। আমার মাইনেই ছিল পাঁচশ টাকা। ফার্স্ট ক্লাসে বরাবর গেছি। কখনও কখনও এরোপ্লেনে। ১৯৩৫ সালে রিলিফ কমিশনারের আপিস উঠে গেল। আমি আবার পুনর্মূষিক হলাম। ব্রেট সাহেব চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ইন্সপেক্টার করে দিতে, কিন্তু হ'ল না। সি-আই-ডিতে বদলি হয়ে চলে গেলাম পাটনায়। ওই লাইনেই কাটল কয়েক বছর। ১৯৪৮ সালে পেন্সন পেলাম। তার পরই হ'ল ভানুমতীর খেল। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিলেত থেকে হঠাৎ এক চিঠি এল। আইরিশ সুইপের আপিস থেকে। চিঠিতে লেখা—'অনেকদিন আগে একজন সাহেব তোমাকে একটুক্রো কাগজে কয়েকটা আঁচড় কেটে দিয়েছিলেন। তোমরা একই ট্রেনের একই কম্পার্টমেন্টে ছিলে। সে কাগজ যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেইটে নিয়ে অবিলম্বে বিলেতে চলে এস বাই প্লেন। তোমার আসা-যাওয়া এবং লণ্ডনে থাকার খরচ আমরা দেব।' আকাশ থেকে পড়লাম! ভাগ্যে সেই কাগজটা ভালো করে রেখেছিলাম। আর কালবিলম্ব না করে বিলেত চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওই সাহেব ওঁদের বড় চাঁই একজন—ম্যানেজিং ডিরেক্টার অব্ আইরিশ সুইপ। সেই কাগজের টুক্রো দেখে তাঁরা আমাকে আইরিশ সুইপ্ স্টেকের ওয়ান্ অব্ দি ডিস্ট্রিবিউটার্স ইন্

ইণ্ডিয়া করে দিলেন। ফিরে এসে অনেক টাকা কামাতে লাগলাম। হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছি এর দৌলতে। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্যে টিকি ধরে নিয়ে গিয়ে যেন লক্ষ্মীর দরবারে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। কিছুদিন পরে আবার সব ধ্বস্। ফরেন এক্সচেঞ্জের রেস্ট্রিক্শন্ হয়ে গেছে আজকাল। আমাদের টিকিট বিক্রি একেবারে বন্ধ। এখন বিরলে বসে প্রহর গুণছি কবে আবার সুদিন আসবে, কবে আবার সূর্য উঠবে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, "সত্যি আশ্চর্য আপনার জীবন-কাহিনী। একজন লোকের জীবনে যে এত রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্বাসই হয় না। মনে হয় যেন বানানো গল্প—"

"একটিও মিছে কথা বলিনি। সব সত্যি—"

"ফোঁস্—"

দু'জনেই চমকে দেখলেন সেই সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে আর গেরুয়াধারীর দিকে ছোবল মারছে। গেরুয়াধারীর মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হ'ল সহসা। তিনি সাপটার দিকে হাতজোড় করে বলে উঠলেন, "না, সব সত্যি নয়, অনেক মিছে কথা বলেছি। নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অনেক বাড়িয়ে বলেছি, না বললে গল্প জমে না। মাফ কর আমাকে।"

সাপটা ফণা নামিয়ে গর্তের ভিতর চলে গেল।

নির্বাক হয়ে বসে রইল গোবর্ধন। বাইরে শব্দ হতে লাগল—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। গঙ্গার কূল ভাঙছে।

"ও মশাই, এ কি হ'ল—"

হঠাৎ সেই পাকা দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল। তারপর সেই ঘরটাও। গেরুয়াধারী ধসের সঙ্গে তলিয়ে গেলেন। গোবর্ধন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

পরদিন বেলা দশটা।

ভজুয়া, ভজুয়ার স্ত্রী দু'জনেই ব্যস্ত। গোবর্ধন আর গেরুয়াধারীর সর্বাঙ্গে সেঁক দিচ্ছে তারা। দু'জনেরই জ্ঞান হয়েছে। গোবর্ধন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লাফিয়ে পড়েছিলেন বলেই গেরুয়াধারীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কারণ তিনি সাঁতার জানেন না।

ভজুয়ার স্ত্রী বক্রির দুধ গরম করে চামচ দিয়ে খাওয়াচ্ছে দু'জনকে। ভজুয়ার কাছে মদ ছিল, সে খানিকটা মদ মিশিয়ে দিয়েছে দুধের সঙ্গে।

শরীরে একটু বল পেতেই গেরুয়াধারী উঠে বসলেন। ভজুয়ার স্ত্রীকে বললেন, "আমার থলিটা বার করে দাও তো মা—"

ভজুয়ার স্ত্রী সিন্দুক খুলে থলিটা বার করে নিয়ে এল। গেরুয়াধারী তখন তার থেকে একটা চিঠি বার করে গোবর্ধনকে বললেন, "পীরবাবা সত্যিই জাগ্রত দেবতা। তিনি আপনার কথা শুনেছেন। নিন—"

"কি ওটা?"

"সৌদামিনী দেবীর স্বামীকে অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেন্ট। আমি আত্মগোপন

করবার জন্যে আপনাকে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আসলে আমি একজন সি. আই. ডি. অফিসার। সৌদামিনীর স্বামীটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। অনেক খুন করেছে। একে যে ধরে দিতে পারবে গভর্ণমেণ্ট তাকে পাঁচ হাজার টাকা বখশিশ দেবেন ঘোষণা করেছেন। আপনি সেই বখশিশটা নিন। কি করে তাকে ধরতে হবে তার সুলুক সন্ধান আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। অতি সহজে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। আর বাকি পাঁচ হাজার আমি আপনাকে নিজে দেব, কারণ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে আপনি কেশিয়ার হয়ে যান—"

গোবর্ধন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "সে কি হয়! আপনার টাকা আমি নেব কেন। বাবা আমাকে নিতেই দেবেন না—"

গেরুয়াধারী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন গোবর্ধনের দিকে।

গোবর্ধন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

নাটক

শৃঙ্খল

(একাঙ্ক নাটিকা)

উৎসর্গ

মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, এম-বি (কলিকাতা)
এফ. আর. সি. এস (এডিন্‌)
ডি. এল্‌-ও (লণ্ডন)
শ্রদ্ধাস্পদেষু

খগেনদা,

মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ। যে সব স্মৃতি মনে জেগে আছে তার প্রত্যেকটি পবিত্র ও আনন্দময়। আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। এসব ছাড়াও আপনি একজন নাট্যরসিক এবং সু-অভিনেতা। এই নাটকটিতে আমি বর্তমান যুগের পটভূমিকার উপর স্বামীজির বাণী-মূর্তিকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কি না তা রসিকেরা বিচার করবেন।

সব কথা স্মরণ করে 'শুণ্বন্তু' আপনার নামে উৎসর্গ করলাম, উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলাম। ইতি

১৪. ৩. ৬৩ — স্নেহধন্য

ভাগলপুর — বলাই

[প্রান্তর। চারিদিক স্বল্পালোকিত অন্ধকারে ঢাকা। একটু দূরে আবছাভাবে একটা মন্দির আভাসিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি এই মন্দিরের বিষণ্ণ ছায়াই বাইরে অন্ধকারের রূপ ধরেছে। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পাঁচটি শিক্ষক বেরিয়ে এলেন। সকলেরই চেহারা জরাজীর্ণ কঙ্কালসার, বেশবাসে দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট, মুখে হতাশার ছাপ। বাইরে থেকে মনে হয় সকলেই দরিদ্র, কিন্তু তাঁরা যখন কথা বললেন বোঝা গেল তাঁদের অন্তরে ঐশ্বর্য আছে।]

প্রথম শিক্ষক। এই অন্ধকারের ভাষা কি আমাদের মর্মে প্রবেশ করেছে? এর অন্তর্নিহিত বাণী আমরা শুনেছি কি? তার অর্থ কি বুঝেছি?

দ্বিতীয় শিক্ষক। শুনেও শুনিনি, বুঝেও বুঝিনি।

একটা কবন্ধ অস্পষ্টতা
আমাদের বুদ্ধির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত বাড়িয়ে।
আমাদের যুক্তিকে গিলে খাচ্ছে,
স্তব্ধ করে' দিচ্ছে আমাদের প্রয়াসকে
ছায়াপাত করছে আমাদের বিবেকের উপর।
অসহায় হয়ে পড়েছি আমরা,
লজ্জিত বিমর্ষ হয়ে পড়েছি।

তৃতীয় শিক্ষক। নিজের অস্তিত্বের অর্থ হারিয়ে ফেলেছি যেন।

আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
অবিশ্বাস্য প্রহেলিকার মতো মনে হচ্ছে।
টলমল করছে সব বিশ্বাসের ভিত্তি
প্রতারণা করছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

চতুর্থ শিক্ষক। অথচ আমরা শিক্ষক।

আমরা সেই ভগীরথের দল
যাদের শঙ্খধ্বনি শুনে
জ্ঞান-গঙ্গার পবিত্র ধারা
অবতীর্ণ হন মর্ত্যলোকে,
দুর্গম গিরিশিখর লঙ্ঘন করে'
হিম-কন্দর ভেদ করে'
অবতরণ করেন সমতলে,
শ্যামল করেন উষর মরুভূমিকে
শস্য সম্পদে,
অরণ্যকে রূপান্তরিত করেন জনপদে,
বহন ক'রে আনেন
ইহলোকের সুখ
পরলোকের শান্তি।

কিন্তু আমরা কি আর
সে শংখধর্নি করতে পারছি ?

দ্বিতীয় শিক্ষক। অসহায় হয়ে পড়েছি আমরা,
লজ্জিত, বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছি।

প্রথম শিক্ষক। অন্ধকারের ভাষা
আমাদের মর্মে প্রবেশ করেনি !
আমরা শ্নতে পাইনি
এর অন্তর্নিহিত নিগ্ঢ় বাণী,
দেখতে পাইনি এর রহস্যময় ইঙ্গিত।

তৃতীয় শিক্ষক। অথচ আমরা অন্ধ নই।
বধির নই
ম্ক নই।
তব্ আমরা দেখতে পাই না
শ্নতে পাই না
বলতে পারি না।

দ্বিতীয় শিক্ষক। একটা কবন্ধ অস্পষ্টতা
দাঁড়িয়ে আছে দ্'হাত বাড়িয়ে।
প্রাচীরের মতো, অথচ প্রাচীর নয়,
প্রেতের মতো অথচ প্রেত নয়,
গ্রাস করছে আমাদের আত্মার প্রকাশকে।
ঘন মেঘ যেন
ঢেকে রেখেছে স্র্যকে,
সংশয়-কুজ্ঝটিকার অন্তরালে
আচ্ছন্ন হয়ে আছে সব।

চতুর্থ শিক্ষক। অথচ আমরা শিক্ষক,
অন্ধকার মোচন করাই আমাদের কাজ
কিন্তু আমাদের ঘিরেই অন্ধকার নামছে।

[পঞ্চম শিক্ষক এতক্ষণ কিছ্ বলেন নি। নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন শ্ধ্। তিনি এবার কথা বললেন]

পঞ্চম শিক্ষক। আমরাই ম্তিমান অন্ধকার।
আমাদের দীপ নিবে গেছে।
আমাদের আলো আমরা বন্ধক রেখেছি,
বিক্রি করেছি,
বণিকের কাছে
শয়তানের কাছে
ধ্র্তের কাছে।
আলো তারা নিবিয়ে দিয়েছে।

তারা শিখিয়েছে প্রদীপটাকেই আলো বলতে,
শিখাহীন প্রদীপকেই আলো বলছি আমরা।

[হঠাৎ খাপছাড়া রকম হেসে]

শিখাহীন প্রদীপকেই আলো বলতে শিখেছি।

[বাকী চারজন চাইলেন তার দিকে]

প্রথম শিক্ষক। দুর্দশার ওইখানেই শেষ নয়।
আমরাও ওই শিখাহীন প্রদীপটাকে
বিশ্বাস করছি আলো ব'লে।
মনে করছি ডিগ্রিটাই বিদ্যা

তৃতীয় শিক্ষক। তাই অন্ধকার নামছে,
পাখী গান গাইছে না,
সূর্য মেঘের আড়ালে,
ফুলেরা ফুটছে না
হাসছে না শিশুরা।

দ্বিতীয় শিক্ষক। তাই যুবতীরা পা বাড়িয়েছে বিপথে।
লোলুপ ব্যাঘ্রিনীর মতো
অদৃশ্য বিদ্যুতের মতো
সঞ্চরণ করছে অন্ধকারে,
ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিকারের উপর।
জননী নেই
ভগিনী নেই
কন্যা নেই
সব স্বৈরিনী।
অন্ধকার নামছে।

চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ অন্ধকার নামছে।
নিষ্ঠুর বৃষ্টিধারার মতো,
নিঃশব্দ প্রস্রবণের মতো,
নামছে, নামছে, ক্রমাগত নামছে।

প্রথম শিক্ষক। আলোর মৃত্যু হয়েছে।
এখন অন্ধকারই আমাদের আলো,
শত্রুই আমাদের মিত্র,
ষড়রিপুই আমাদের সহচর।

তৃতীয় শিক্ষক। সহচর নয়, প্রভু।
উঠছি বসছি তাদের কথায়
নাচছি ডিগবাজি খাচ্ছি!
অথচ আমরা শিক্ষক,
মানুষ তৈরি করবার দায়িত্ব আমাদের।

পঞ্চম শিক্ষক। মানুষ নেই
যুবকরা অসুস্থ, মত্ত, বাক্‌সর্বস্ব।
রাস্তায় দিশাহারা হয়ে ঘুরছে সবাই
কুকুরের মতো, কীটের মতো।
গুণ্ডা অভিনয় করছে ক্ষত্রিয়ের!
তামসিকতা পরেছে আধ্যাত্মিকতার মুখোশ,
চণ্ডাল সেজেছে ব্রাহ্মণ।

চতুর্থ শিক্ষক। অন্ধকার ভেদ ক'রে সূর্য ওঠে
পঙ্ক ভেদ ক'রে ফোটে কমল।
কিন্তু আর সূর্য উঠছে না,
কমল ফুটছে না।

তৃতীয় শিক্ষক। পাখী গাইছে না,
হাওয়া বইছে না।
মায়ের বুকে দুধ নেই
ভায়ের বুকে স্নেহ নেই

[হঠাৎ] ও কে—ও কে—ও কে—

[অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সভয়ে আস্তে আস্তে বললেন—ও কে—ও কে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একটি মেয়ে চলেছে। যুবতী, সুন্দরী, মোহিনী। তার লীলায়িত গতি-ভঙ্গীতে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে, একাগ্র চোখের দৃষ্টিতে, শিকারী শ্বাপদের ছবি প্রতিভাত হচ্ছে। সে এত একাগ্র যে সমবেত শিক্ষকদের দেখতে পেল না। নিঃশব্দ গতিতে এল এবং চলে গেল।]

তৃতীয় শিক্ষক। ও কে!
দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রেতিনী!
প্রথম শিক্ষক। কিন্তু কি অপরূপ!
চতুর্থ শিক্ষক। মূর্তিমতী শিখা। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা।
তৃতীয় শিক্ষক। কে বলুন তো?
পঞ্চম শিক্ষক। ও, আমার মেয়ে।
প্রথম শিক্ষক। সে কি! তোমার মেয়ে?
কোথায় যাচ্ছে এখন!
পঞ্চম শিক্ষক। সর্বনাশের আগুন জ্বালতে।
সমাজের শবদেহকে
চড়ানো হয়েছে চিতায়,
তাতেই ও আগুন দেবে।
সেই আগুনে অন্ধকার আলোকিত হবে হয়তো।

[এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সবাই]

প্রথম শিক্ষক। এ অন্ধকার বাইরের নয়
ভিতরের,
মূর্চ্ছিত চেতনার।
পাপের আলো কি উজ্জ্বল করতে পারবে তাকে ?
দ্বিতীয় শিক্ষক। না।
পাপের দাহ আছে, দীপ্তি নেই।
তৃতীয় শিক্ষক। তাই পাখীরা গান গাইছে না
সূর্য মেঘের আড়ালে
ফুলেরা ফুটছে না
নদী বুজে আসছে
সমীরণ স্নিগ্ধ নয়
হাসি নিবে গেছে
অশ্রু জমে গেছে
সুস্থ ক্ষুধা রূপান্তরিত হয়েছে
দুষ্ট ক্ষুধায়।
যা দেখছি
তা সূর্যের আলো নয়,
আলেয়ার মায়া।
চতুর্থ শিক্ষক। আমাদের হিমশীতল অসাড় অস্তিত্বে
ও আলো সাড়া জাগাতে পারবে না।
প্রথম শিক্ষক। (পঞ্চম শিক্ষককে) তুমি শিক্ষক না ?
প্রায়-উলঙ্গিনী মেয়েকে
লালসার প্রতীক ক'রে
অন্ধকারে একা ছেড়ে দিয়েছ !
দ্বিতীয় শিক্ষক। কিসের আশায় ?
তৃতীয় শিক্ষক। তোমার উদ্দেশ্য কি !
চতুর্থ শিক্ষক। সর্বনাশ ! ওই মেয়েকেই তো
তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিলে।
প্রথম শিক্ষক। উদ্দেশ্য কি তোমার ?
খোলসা ক'রে বল।

[পঞ্চম শিক্ষক ক্ষণকাল চুপ করে থেকে তারপর যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন]

পঞ্চম শিক্ষক। আমি খেতে পাই না, খেতে পাই না,
খেতে পাই না !
ওই মেয়েই আমাকে খাওয়াচ্ছে।
কেমন ক'রে খাওয়াচ্ছে সে প্রশ্ন আমি করি না,
সে প্রশ্ন করতে ভয় হয়।
তোমাদেরও হয়।

[প্রত্যেকের দিকে তর্জনী আস্ফালন করে]

তোমার ছেলে ঘুস-খোর,
তোমার ছেলে কালোবাজারি,
তোমার ছেলে চুরি করে
তোমার ছেলে চরিত্রহীন মাতাল।
সবাই রোজগেরে ছেলে কিন্তু।
তোমরা কি প্রশ্ন কর
কি ক'রে রোজগার করছে তারা ?
তোমরা সব জান,
সব বোঝ
কিন্তু প্রশ্ন কর না।
প্রশ্ন করতে তোমাদেরও ভয় হয়,
পাছে প্রশ্নের খোঁচায়
ফেটে যায় আপাত-রঙীন বেলুনটা।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি
আমাদের কারো নেই।
সবাই আমরা এক নৌকোয়
পাড়ি জমাতে চাইছি উত্তাল পঙ্ক-সমুদ্রে,
প্রাণপণে ধরে আছি একটি মাত্র হাল
যার নাম স্বার্থপরতা
যার নাম পশুত্ব
যার নাম হীনতা।
হা—হা—হা—হা—

[বিকট হাসিটা অদ্ভুত শোনালো, হাসি থামতে না থামতেই কয়েকজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তর্ক করতে করতে প্রবেশ করল কয়েকটি যুবক। সকলেরই পরিধানে কোট, প্যাণ্ট, হাওয়াই শার্ট ইত্যাদি বিদেশী পোশাক। তারা সবাই তর্কে নিমগ্ন, শিক্ষকদের দেখতে পেল না]

প্রথম যুবক। আরে রেখে দাও তোমার নিরঞ্জনবাবু। উনি আমাদের পার্টিতে আসবেন না, আর না এলে আমরা ওঁকে ভোট দেব না। রঘুবাবুকে দেব।

দ্বিতীয় যুবক। [সবিস্ময়ে] রঘুবাবুকে ! নিরঞ্জনবাবুর মতো অমন সচ্চরিত্র বিদ্বান লোককে না দিয়ে ওই চরিত্রহীন মাতালটাকে দেবে ? নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে রঘুবাবুর তুলনা হয় ?

তৃতীয় যুবক। হয় না। রঘুবাবু এই ইলেকশনে নিজের পকেট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করছেন। নিরঞ্জনবাবু বলেছেন একটি পয়সা খরচ করব না।

দ্বিতীয় যুবক। [চতুর্থ যুবককে] তুমি কার জন্যে চেষ্টা করছো ?

চতুর্থ যুবক। রঘুবাবুর জন্যে। রঘুবাবু বলেছেন তিনি আমার ভাইপোর চাকরি জোগাড় ক'রে দেবেন।

দ্বিতীয় যুবক : কিন্তু দেখ নিরঞ্জনবাবু—

চতুর্থ যুবক। আমি কিছু দেখব না, কিছু শুনব না। কানে তুলো গুঁজে চোখ বুজে আমি রঘুবাবুর জন্যেই চেষ্টা ক'রে যাব খালি। আমার বখাটে ভাইপোটার তিনি যদি গতি ক'রে দেন একটা—

পঞ্চম যুবক। আমি কিন্তু ব'লে দিচ্ছি রঘুবাবুও হবেন না, নিরঞ্জনবাবুও হবেন না। হবেন পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালা। তিনি মস্ত লোক। আমাদের গ্রামে একটা হাইস্কুল করিয়ে দেবেন বলেছেন, তাছাড়া আমাদের প্রত্যেককে চাকরি দেবেন।

দ্বিতীয় যুবক। আশ্চর্য ! তোমরা সচ্চরিত্র বিদ্বান লোককে না নির্বাচন করে, কে চাকরি দেবে, কে স্কুল করে দেবে এই সব অলীক প্রতিশ্রুতির পিছনে ধাওয়া করবে না কি। নিরঞ্জনবাবুর মতো লোককে ছেড়ে—

তৃতীয় যুবক। আমাদের জীবন অভাবে অনাহারে শুকিয়ে খট্-খট্ করছে। তেল দিয়ে যিনি তাকে একটু মোলায়েম করবেন তাকেই আমরা ভোট দেব।

[দূরে শোনা গেল—'জয় জগদীশবাবুর জয়'। আর একদল যুবক এল। তাদের হাতে প্রকাণ্ড একটা পোস্টার। তার উপর লেখা—'জেল-ফেরত জগদীশ দাঁকে ভোট দিয়া কৃতার্থ করুন'।]

পঞ্চম যুবক। জগদীশবাবু কি পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালার সঙ্গে পারবে ? সিঙাড়াবালার কত টাকা !

আগন্তুক দলের একজন। জগদীশ দাঁও টাকার ঘড়া উপুড় করে দিয়েছে। শুধু টাকার নয়, মধুরও। জগদীশ দাঁ আত্মত্যাগী দধীচি, তার হাড় থেকে বজ্র তৈরি করব আমরা। চল হে, চল চল, মীটিংয়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে। জগদীশবাবু ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আসবেন মীটিংয়ে। জয় জগদীশবাবুর জয়। ওহে রাম শ্যামকেও আমাদের দলে টানতে হবে, ওরা এলে কাজের খুব সুবিধে হবে। দুজনেই খুব কাজের। চল—

[আগন্তুক দল চলে গেল। যারা আগে এসেছিল তারা নির্বাক হ'য়ে সব দেখছিল, শুনছিল। তারা চলে গেলে এদের মুখে কথা ফুটল]

দ্বিতীয় যুবক। যাই বল তোমরা, এখনও দেশে আদর্শবাদী লোক আছে। অনে—ক আছে। তাদেরই মোবিলাইজ করতে হবে। যাই লেগে পড়ি—

[দ্বিতীয় যুবক চলে গেল]

প্রথম যুবক। [তার প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে] কিস্সু হবে না, কিস্সু হবে না।

তৃতীয় যুবক। চল হে, রঘবাবুর জন্যে আমরাও একটা মীটিংয়ের ব্যবস্থা করি গে। মীটিং একটা করা দরকার। একটা বুলেটিনও ছাপাতে হবে। চল, চল।

[প্রথম যুবক ও তৃতীয় যুবক চলে গেল]

পঞ্চম যুবক। [বাকি ক'জনকে উদ্দেশ্য করে] এঁরা পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালাকে চেনেনি এখনও। আমার হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন তিনি (পাঁচটা আঙুল বিস্তারিত করে দেখালেন)—তাঁর বিরুদ্ধে একটি মীটিং হতে দেব না আমি। গুণ্ডা

লাগিয়ে ভেঙে দেব সব। ট্রাক ভাড়া করেছি আমরা, বড় বড় ট্রাক, তার উপরেই মীটিং হবে আমাদের, চলন্ত মীটিং। বারোটা লাউড স্পীকার আমাদের হাতে। অনেক রিক্শা ভাড়া করেছি। বারোটা রিক্শায় বারোটা লাউড স্পীকার গাঁক্ গাঁক্ করে বলবে, ভোট ফর সিঙাড়াবালা। তোমাদের বলছি তোমরাও এই দলে এস। তা না হলে শেষে পস্তাবে। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে—

[যুবকরা সবাই চলে গেল]

প্রথম শিক্ষক। আজকাল রাজনীতিই জীবন-নীতি।
ধর্মকে ধরে নেই কেউ আজকাল
রাজনীতিকে ধরে আছে।

দ্বিতীয় শিক্ষক। রাজনীতি এক নয়, অনেক।
ধর্ম কিন্তু এক।

তৃতীয় শিক্ষক। ধর্মও এক নয়।
নানা ধর্মের ছিটে
মানব-সমাজ সাজিয়েছে নিজেকে
যুগে যুগে।
আজ রাজনীতি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে
ধর্ম নিয়েও অনেক যুদ্ধ হয়েছে অতীতে।
অনেক রক্ত প্লাবিত করেছে পৃথিবীকে
ঝরেছে অনেক অশ্রু;
আকাশের নীলকে আরও নীল করেছে
আর্তের হাহাকার।
সে সব কাহিনী দগদগে ঘায়ের মতো
দগদগ করছে ইতিহাসের পাতায়।

দ্বিতীয় শিক্ষক। রাজনীতিই এককালে ধর্মের মুখোশ পরেছিল।
মুখোশের মতোই তাই তার—
নানা রং, নানা ঢং, নানা বৈচিত্র্য।
মুখোশের তলায় ছিল
রাজনীতি
স্বার্থ-নীতি
পীড়ন-নীতি
জয়-নীতি
অহংকারের আস্ফালন-নীতি।
ধর্ম কিন্তু এক
শুদ্ধ, শান্ত, নিরঞ্জন।

পঞ্চম শিক্ষক। সূর্য নেই
তাই আলো নেই।

চতুর্থ শিক্ষক। [সহসা দূরের দিকে চেয়ে] ওই দেখ, ওই দেখ, আর একদল আসছে। ও বাবা, সঙ্গে পুলিশ যে! চল একটু আড়ালে যাই।

পঞ্চম শিক্ষক। আড়ালে যাওয়ার দরকার নেই।
আমরা সবাই অন্ধকারের বোরখা পরে আছি
আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

[তিনটি যুবককে নিয়ে দুটি পুলিশ কনস্টেবল এল। যুবক তিনটির হাতে হাত-কড়ি, কোমরে দড়ি। তারা এল এবং চলে গেল]

প্রথম শিক্ষক। এ কি, আমার ছেলে যে, বিনুকে পুলিশে ধরেছে,—সে কি !

দ্বিতীয় শিক্ষক। অ্যাঁ, আমার ছেলে যোগেনকেও ধরেছে দেখছি, কি সর্বনাশ !

তৃতীয়। ঘাবড়ো না, ঘাবড়ো না, তৃতীয় ব্যক্তিটি আমারই সুপুত্র শুকুল। মামা সাধ করে নাম রেখেছিল শুক্লকুমার। হয়েছেন কৃষ্ণকুমার। কালোবাজারি। আরও দু'বার ওকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। এবারও আনব। না আনলে চলবে না। কারণ ওই একমাত্র বংশ-প্রদীপ।

প্রথম শিক্ষক। কি করে আনবে !

দ্বিতীয় শিক্ষক। যোগেনকেও ছাড়িয়ে আনতে হবে, উপায় কি বল তো ?

তৃতীয় শিক্ষক। [স্মিতমুখে] আজকাল একটি মাত্র উপায়ই উপায়। এ অন্ধকারে একটিমাত্র আলোই আলো,
একটি মাত্র পাখীই গান করে,
একটি মাত্র ফুলই সুন্দর,
একটি মাত্র চাবিই সব তালা খোলে,
একটি মাত্র শাস্ত্রই শাসন করে,
একটি মাত্র তলোয়ারই সর্ব-বাধা ছিন্নকারী—
টাকা—টাকা—টাকা—
[টাকা বাজাবার মুদ্রা দেখিয়ে]
টাকা যোগাড় করতে হবে।

দ্বিতীয় শিক্ষক। ঠিক বলেছ, টাকা চাই। কোথায় পাওয়া যায় বল তো।

তৃতীয় শিক্ষক। অগাধ ঐশ্বর্যের অধীশ্বর টংকনাথবাবুই আমাদের ভরসা। তিনিই আমাদের প্রভু। চল তাঁর কাছে যাই।

প্রথম শিক্ষক। ঠিক বলেছ। শুনেছি, পুলিশও তাঁকে খাতির করে।

তৃতীয় শিক্ষক। সবাই তাঁকে খাতির করে, তাঁর টাকা আছে যে ! চল, আর দেরি করে কি হবে।

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টলতে টলতে প্রবেশ করল এক মাতাল। কারো দিকে না চেয়ে টলতে টলতে এল এবং টলতে টলতে চলে গেল]

চতুর্থ শিক্ষক। উনিই আমার কুল-তিলক। সমস্ত দিন মোষের মতো খাটে। সন্ধে থেকে মদ খায়। ওকে দোষও দিতে পারি না। সমস্ত দিন এতো খাটুনির পর একটু নেশা না করলে—

পঞ্চম শিক্ষক। দিন আর রাতের তফাত করতে পার না কি তুমি !
আমি তো দেখি সব সময়ে অন্ধকার।
আকাশে সূর্য চন্দ্র তারা কিছু নেই,

থাকলেও দেখতে পাই না,
হয় নেই,
না হয় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি।
তুমি দেখতে পাও ?
সূর্যোদয় দেখেছ ইদানিং ?

চতুর্থ শিক্ষক। দেখবার সময় পাইনি।

পঞ্চম শিক্ষক। [সাগ্রহে] সূর্য ওঠে কি ?

চতুর্থ শিক্ষক। হয়তো ওঠে। অত খেয়াল করিনি।

[দূরে কলরব শোনা গেল। দিব্যকান্তি কিশোর বালক আলোক ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল উর্ধ্বশ্বাসে। তারপর সে ঘাড় তুলে ঘুরে ঘুরে অস্পষ্ট মন্দিরের আভাসটাকে দেখতে লাগল। তার ভাব-ভঙ্গি থেকে মনে হল সে যা দেখছে তা যেন অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। তারপর দূরের দিকে চেয়ে সে চীৎকার করে উঠল]

আলোক। স্বপ্ন সফল হয়েছে, মেঘ নয়, ছায়া নয়, মন্দির [সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে] মন্দির, মন্দির, মন্দির। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

চতুর্থ শিক্ষক। [সবিস্ময়ে] মন্দির !

আলোক। এই যে আপনার সামনে ! দেখতে পাচ্ছেন না ? ভারতবর্ষের চিরন্তন মন্দির, এতকাল অন্ধকারে ঢাকা ছিল, ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করছে। আমি স্বপ্নে দেখে-ছিলাম যেন করেছে। সফল হয়েছে আমার স্বপ্ন। সবাইকে ডেকে আনি।

[সোৎসাহে চলিয়া গেল]

চতুর্থ শিক্ষক। [কপালের উপর হাত রেখে অস্পষ্ট মন্দিরটাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন] হ্যাঁ, মন্দিরের মতোই কি একটা মনে হচ্ছে যেন। ওই তো চূড়ো—

[পঞ্চম শিক্ষক নির্নিমেষে চুপ করে চেয়েছিলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। [পঞ্চম শিক্ষককে] তুমি দেখতে পাচ্ছ কিছু ! মন্দিরের মতোই তো দেখতে। কিন্তু এখানে মন্দির আসবে কোথা থেকে !

[পঞ্চম শিক্ষক নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে কথা বললেন]

পঞ্চম শিক্ষক। তাঁর ইচ্ছা হলে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়,
অশুচি ভেদ করে দেখা দেয় মন্দির
মূক হয় বাচাল
গিরি লঙ্ঘন করে পঙ্গু।
আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কিছু,
মন্দির দেখার চোখ অনেক কাল হারিয়েছি।

চতুর্থ শিক্ষক। ও কিসের শব্দ—

[অন্ধকারের ভিতর থেকে মৃদু গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ শোনা গেল। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে, তারপর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হল সেটা। মনে হ'ল মন্দিরের ভিতর থেকে কে-যেন উদাত্ত কণ্ঠে বার বার বলছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিনাদিত হ'তে লাগল এই মন্ত্র। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। স্পষ্টতর হ'ল মন্দির, অন্ধকার হ'ল আর একটু আলোকিত। তারপর হঠাৎ নীরব হয়ে গেল সব।]

পঞ্চম শিক্ষক। এ যে উপনিষদের বাণী! অনেক দিন আগে শুনেছি। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কে বলছে—

চতুর্থ শিক্ষক। কে তা জানি না। মনে হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে মন্ত্র পড়ছে কেউ!

পঞ্চম শিক্ষক। মন্দির কই? এখনও দেখতে পাইনি। পুরাতন সূর্য কতদিন আগে অস্ত গেছে। সে সূর্য না উঠলে আর মন্দির দেখতে পাব না।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার সেই উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হল। অন্ধকারে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'ল যেন]

উদাত্ত কণ্ঠ। ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

ভক্তি-নত-চিত্তে সূর্যকে প্রণাম কর। আকুল কণ্ঠে তাঁকে ডাক। তিনি দেখা দেবেন। পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই।

[অন্ধকার আরও স্বচ্ছ হ'ল। মন্দির আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল]

পঞ্চম শিক্ষক। কার কণ্ঠস্বর!

চতুর্থ শিক্ষক। কণ্ঠস্বর কি তা জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কথাগুলি বিবেকানন্দের। ছেলেবেলায় পড়েছি মনে হচ্ছে।

পঞ্চম শিক্ষক। তাহলে কি বিবেকানন্দই এলেন আবার। তাঁর মতো লোকের কি মুক্তি হয়নি এখনও।

[মন্দিরের ভিতর উদাত্ত কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হ'ল]

উদাত্ত কণ্ঠ। আমি মুক্তি চাই না। আমি চাই তোরা মানুষ হ'। একটা মানুষ তৈরি করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত। আমি দিব্যচক্ষে দেখছি তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগা। ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ। দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। তোদের মঙ্গলকামনাই আমার জীবনের ব্রত। তোরা সব পচে গলে মরবি আর আমি মুক্ত হয়ে যাব, সে মুক্তি আমি চাই না।

[অন্ধকারের পটভূমিকায় মন্দির আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রমশঃ তাতে ফুটে উঠল একটা উজ্জ্বল গৈরিক দীপ্তি]

পঞ্চম শিক্ষক। (সোল্লাসে) দেখেছি, দেখেছি, এইবার দেখতে পেয়েছি, আর ভয় নেই।

চতুর্থ শিক্ষক। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!

পঞ্চম শিক্ষক। প্রণাম কর, প্রণাম কর, তিনি এসেছেন আর ভয় নাই।

[উভয়ে প্রণত হ'ল। তারপর উঠে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের ভিতর থেকে আবার ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ। আলোকের সঙ্গে রাম শ্যাম হরি যদু প্রভৃতি একদল লোক প্রবেশ করল। কেউ উৎসুক, কেউ উত্তেজিত]

আলোক। (উদ্ভাসিত মুখে) ওই দেখ।

রাম। আশ্চর্য তো!

হরি। শুধু আশ্চর্য নয়, ভয়াবহ। কোথাও কিছু ছিল না, মন্দির এল কোথা থেকে!

আলোক। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি যাই, সকলকে ডেকে ডেকে দেখাই।

[আলোক চলে গেল]

যদু। সত্যই অদ্ভুত ব্যাপার। এমন গেরুয়া রঙের মন্দির তো কখনও দেখিনি বাবা। মন্দিরের গা থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে।

শ্যাম। চল কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখা যাক।

মাধব। থাম, থাম, ফট্ করে ছুঁতে যেও না। আজকাল ইলেক্‌ট্রিসিটির যুগ, অ্যাটমিক এনার্জির যুগ, সেটা মনে রেখ। হয়তো আমেরিকা বা রাশিয়া কোন experiment করছে। কিছু বলা যায় না।

রাম। চীনও হতে পারে।

মাধব। [চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষকদের] এই যে মাস্টারমশায়রাও এসেছেন দেখছি। কি ব্যাপার বলুন তো—! আপনারা হাতজোড় করে আছেন কেন!

চতুর্থ শিক্ষক। অপূর্ব এ আবির্ভাব! অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সত্য।

রাম। কিসের আবির্ভাব বলছেন?

চতুর্থ শিক্ষক। দেবতার। মন্ত্র শুনতে পাচ্ছেন না?

শ্যাম। মন্ত্র ওই মন্দির থেকে বেরুচ্ছে না কি?

চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ।

[সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। স্পষ্টতর হয়ে উঠল মন্ত্র। প্রথমে গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছিল]

শ্যাম। কিন্তু ওটা মন্দির না মায়া, সত্য না ছলনা, সেইটে আগে ঠিক করা দরকার।

মাধব। কিন্তু আমি বলছি ফট্ করে ছুঁতে যেও না। শেষকালে কি হতে কি হবে।

যদু। [মাধবকে ধমকে] যাও, তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার তৃতীয় পক্ষের বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাক গে যাও, [শ্যামকে] চল হে আমরা ছুঁয়ে দেখি। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ মন্দির গজিয়ে উঠল ফাঁকা মাঠে! এস—

[শ্যাম প্রথমে উৎসাহ দেখিয়েছিল। কিন্তু কার্যকালে ইতস্তত করতে লাগল]

শ্যাম। [রামকে] চল না, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

রাম। ভাবছি। ব্যাপারটা ভৌতিক নয় তো!

যদু। তুমি রাম, ভৌতিক যদি হয় তোমার নামেই তো ভূত পালাবে। ভূত দেখে তুমি ভয় পেলে আমরা কোথায় যাব?

হরি। কেন, তুমি তো যদুপতি, তুমিও কম কিসে হে।

যদু। ভূতের ব্যাপারে যদুপতির চেয়ে রঘুপতির দাপটই বেশী। (হাস্য) সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাই ভয় করছে।

রাম। আমারও।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। বীর হ। সর্বদা বল 'অভীঃ' 'অভীঃ'। সকলকে শোনা মাভৈঃ মাভৈঃ। ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। 'আমি অমর চিন্ময় আত্মা' এই ভাব দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ কর।

[উদাত্ত কণ্ঠ নীরব হ'ল। মন্দিরের ভিতর থেকে মন্ত্রোচারণ হ'তে লাগল, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ। পঞ্চম শিক্ষক এতক্ষণ নিমীলিত নয়নে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন, এইবার তিনি কথা কইলেন।]

পঞ্চম শিক্ষক। ভয় মৃত্যু, ভয় পাপ, ভয় নরক, ভয় অধর্ম

এই কথা জপ কর
প্রাণপণে জপ কর, অহোরাত্র জপ কর।
ভয়েরই অন্ধকার নেমেছে চতুর্দিকে,
শাস্ত্র-ভয়, সমাজ-ভয়, রাজ-ভয়, মনিবের ভয়,
মৃত্যু-ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, অপমানের ভয়,
সব অলীক সব মিথ্যা।

মাধব। আপনি যদি নির্ভয় হয়ে থাকেন তাহলে এগিয়ে গিয়ে ছুঁয়ে দেখুন ওটা সত্যিই মন্দির কি না।

পঞ্চম শিক্ষক। হাত দিয়ে নয়

মন দিয়ে স্পর্শ করেছি।
তোমরাও তাই কর
তাহলেই নিঃসংশয় হবে।

চতুর্থ শিক্ষক। স্বামীজির আবির্ভাব হয়েছে সন্দেহ নেই। যেমন করেই হোক, যে কোনও কারণেই হোক, তিনি এসেছেন এখানে। আমি যাই কানু কীর্তনীয়াকে ডেকে আনি। সে এখানে এসে কীর্তন করুক। স্বামীজি গান ভালোবাসতেন।

[চতুর্থ শিক্ষক চলে গেলেন]

রাম। (শ্যামকে) চল হে আমরা গিয়ে ছুঁয়ে দেখি। যা থাকে কপালে!

মাধব। তোমরা যাও, আমি যাব না। আমি দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি। তাতেও বিপদ আছে। তোমাদের যদি কিছু একটা হয়ে যায় সাক্ষী দিতে হবে আমাকে। সেটাও কম বিপদ নয়।

যদু। বেশ, বেশ, তুমি যেও না। চিরকালই গা বাঁচিয়ে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছ তুমি। আমরাই যাব। শ্যাম এস। হরি, তুমিও যাবে না কি?

হরি। আপত্তি নেই।

রাম। তুমি যেও না হরি। তোমার উপাধি যদিও মণ্ডল, ফরসা কাপড় জামাও পর, রোজগারও ভালো করছ, কিন্তু ভুলে যেও না জাতে তুমি মুচি। ওটা যদি মন্দিরই হয়, তোমার কি লাফিয়ে গিয়ে সেটা ছোঁয়া উচিত?

শ্যাম। তুমি যা বলছ তা ঠিক। কিন্তু আজকাল আইন জানো তো?

রাম। জানি। কিন্তু ওটা বাইরের আইন। (হরিকে) তোমার বিবেকের আইন কি বলে?

পঞ্চম শিক্ষক। (অস্ফুট কণ্ঠে) অন্ধকার, অন্ধকার, চতুর্দিকেই অন্ধকার।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই, 'ছোঁব না, ছোঁব না' বলে আমরাই এদের হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা, কাপুরুষতায় ভরে গেছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরাই এখন জগতের ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস। ভুলো না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। তুমিও কটি-মাত্র বস্ত্রাবৃত হ'য়ে সদর্পে ডেকে বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ঃ আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

[এই বাণী শুনে বিস্মিত হয়ে গেল সবাই। উদাত্ত কণ্ঠের গম্ভীর নির্ঘোষ থেমে যাবার পরও ব্যায়ত আননে দাঁড়িয়ে রইল সকলে মন্দিরটার দিকে চেয়ে]

রাম। এর ভিতর একটা ষড়যন্ত্র আছে ভাই!

শ্যাম। বাই-ইলেক্‌শন হচ্ছে, কংগ্রেসের চাল বোধহয়।

মাধব। ভালো মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা কি হতে পারে!

যদু। যাই হোক, ভিতরে বুজরুকির গন্ধ পাচ্ছি। ওসব চালাকি আমাদের কাছে চলবে না। চলহে দেখি গিয়ে ওই আজগুবি মন্দিরের ভিতর কি আছে। কোনও লোক, না রেডিও!

[আবার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। তোরা চালাকি নিয়েই সারা জীবন আছিস। নিজেরা চালাক হয়েছিস আর সকলের চালাকি ধরে ধরে বেড়াচ্ছিস। কিন্তু জেনে রাখ চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না। জেনে রাখ, আমাদের দেশে মহৎ কর্মের মহা উদ্বোধন শুরু হয়ে গেছে, তোদের মতো ধূর্ত বাক্যবাগীশরা তাকে আর থামাতে পারবে না। হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতরা আর দাবাতে পারবে না ছোট জাতদের। তোদের এখন একমাত্র কল্যাণ হবে যদি দু'হাত বাড়িয়ে ওদের বুকে টেনে নিতে পারিস। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়ে ওদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ওদের আপন করে নে। তবেই তোরা বাঁচবি।

[কণ্ঠস্বর থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর থেকে কেবল মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে লাগল —উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।]

রাম। ঠিক ভিতরে ট্রান্সমিটার আছে।

শ্যাম। ট্রান্সমিটার নয়, মানুষ। ঠিক আমাদের কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছে শুনছ না?

মাধব। (মাথা নেড়ে) যাই হোক, ব্যাপারটা জটিল। আমার মনিবকে খবরটা দেওয়া দরকার।

[যদু যেন নিজেকে ব্যাপারটার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। নানাভাবে দেখছিল মন্দিরটাকে]

যদু। আমরা শিক্ষিত লোক, আমরা একটা ভাঁওতায় ভুলে যাব !

[সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল উদাত্ত কণ্ঠস্বর]

উদাত্ত কণ্ঠ। তোমরা শিক্ষিত নও। যাকে শিক্ষা বলে তা তোমরা পাওনি। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা ! যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এইসব স্কুল কলেজে পড়ে তোরা এক ডিস্পেপ্টিক্ জাত তৈরি হয়েছিস। এই যে চাষা-ভুষো, মুচিমুদ্দফরাস এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাইরের হাল-চাল বদলেছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচু জাতের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি' 'যো চাকরি' করে লোপ পেয়ে যাবি। এরাই জগতের মেরুদণ্ড। এরা কাজ বন্ধ করলে, তোরা অন্নবস্ত্র কোথা পাবি ?

পঞ্চম শিক্ষক। শোন, শোন

কান পেতে শোন সবাই
এ অমৃতময় বাণী
এ বহুদূরাগত চিরন্তন সঙ্গীত।
বহুকাল আগে শুনেছিলাম
আবার শুনছি।
একা শুনে তৃপ্তি হচ্ছে না
ডেকে আনি সকলকে।

[পঞ্চম শিক্ষক চলে গেলেন। হরি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বিবেকানন্দের এই বাণী শুনে সে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল]

হরি। ওই মন্দির সত্য কি মিথ্যা তা জানি না, কিন্তু ওর ভিতর থেকে যে বাণী নির্গত হচ্ছে তা সত্য, তা অপরূপ। আমি গিয়ে দেখব কে ওই মহাবাণীর প্রবক্তা। উনি আমার মনের কথা বলেছেন।

[যেতে উদ্যত হ'ল]

রাম। একটা কথা কিন্তু মনে রেখ। ওই বাণীতে যে সব নীচ-জাতীয় শ্রমিকের কথা শোনা গেল, তুমি পুরোপুরি তা নও। তুমি নীচ-জাতীয় মুচি বটে কিন্তু তুমি লেখাপড়া শিখে তোমার কুল-কর্ম ছেড়েছ। আমাদেরই মতো কেরানী হয়েছ তুমি। চাকরি পেয়েছ বিদ্যা বা প্রতিভার জোরে নয়, হরিজন বলে।

হরি। আমরা বহুযুগ ধরে তোমাদের পায়ের তলায় কীটের মতো ছিলাম। আজ কর্তৃপক্ষ যদি এই অন্যায়ের প্রতিকার-কল্পে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব করেই

থাকেন, তাতে দোষটা কি হয়েছে ? মুচির ছেলে বলে আমাকে চিরকাল জুতোই সেলাই করতে হবে এমনই বা কি কথা আছে।

যদু। [শ্যামকে] এ আবির্ভাবটা সত্যিই কিন্তু অদ্ভুত !

[উদাত্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। অদ্ভুত বলে বিশেষ কিছু একটা নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান, তাঁর কথা ভাব। সিংহ-গর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর। জীবকে অভয় দিয়ে বল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তোমরা সবল হও, শক্তিমানই আত্মাকে লাভ করতে পারে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

[কণ্ঠস্বর নীরব হ'ল। তারপর আবার ধীরে ধীরে ধ্বনিত হতে লাগল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত]

হরি। আমি যাব।

[দৌড়ে মন্দিরের দিকে চলে গিয়ে আকুলভাবে মন্দির স্পর্শ করতে লাগল]

রাম। কি দেখছ হে, সত্যি দেওয়াল ?

শ্যাম। ঢোকবার কোন দুয়ার আছে ?

যদু। দেখ তো ভিতরে কোনও লোক আছে কি না।

[হরি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল, গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল]

রাম। হরি মূর্চ্ছা গেছে। কি সর্বনাশ !

মাধব। (বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে) দেখ, কি কাণ্ড হ'ল। আমি ঠিক এই আশংকাই করেছিলাম (রাম শ্যাম যদুকে) দেখ, দেখ, তোমরা। আমি যাই টংকনাথবাবুকে একটা খবর দিয়ে আসি। না দিলে অন্যায় হবে।

[মাধব চলে গেল]

যদু। সরে পড়লে কেমন দেখলে ? ও টংকনাথবাবুর চাকরি করে তা ঠিক, কিন্তু সেখানে এখন যাওয়ার দরকারটা কি ?

রাম। ওটা একটা ছুতো।

শ্যাম। হরি, হরি, কি হ'ল তোমার। উঠে পড়। ও হরি।

রাম। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তো। চল, দেখি গিয়ে। এস না, সব দাঁড়িয়ে আছ সঙের মতো। এসো চল, এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

[যদু ও শ্যামের হাত ধরে টানতে লাগল]

যদু। হাত ছাড়, হাত ছাড়, যাচ্ছি—

শ্যাম। গিয়েই বা কি করব। আমরা কি ডাক্তার ? এই ফাঁকা মাঠে এক ফোঁটা জলও নেই যে মুখে ঝাপটা দেব। আমি বরং কোথাও থেকে একটু জল যোগাড় করে আনি। হাত ছাড় না—

রাম। আরে আগে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি ! সব একসঙ্গে যাই চল—কাম্ অন—

[কিন্তু যাবার আর দরকার হ'ল না। হরি এসে হাজির হ'ল। তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চারিদিকে চাইতে লাগল]

রাম। কি দেখলে হে ?

[হরি নিরুত্তর]

শ্যাম। হাত দিয়ে দেখলে ? মন্দিরের দেওয়াল রয়েছে ?

[হরি নিরুত্তর]

যদু। আরে কথা বলছ না কেন ?

[হরি তবুও নিরুত্তর। রাম তার কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকাতে লাগল]

রাম। তোমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল কেন হে। কিছু বল একটা। কি দেখলে—

হরি। যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় !

[নির্নিমেষে মন্দিরটার দিকে চেয়ে রইল]

শ্যাম। মন্দিরটা সত্যি মন্দির তো ? ছুঁয়ে দেখেছ ভালো করে? সলিড দেওয়াল ?

[হরি নিরুত্তর। দূরে খোলের শব্দ শোনা গেল। হরি আরও কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল]

রাম। পাগল হয়ে গেল না কি ছোকরা !

শ্যাম। ওহে এই দলবল নিয়ে কানু কীর্তনীয়া আসছে। মহা হল্লা জুড়ে দেবে এখনই। ওসব হৈ-হল্লা শুনলে বুক ধড়ফড় করে আমার, ডাক্তারবাবু করোনারি সন্দেহ করছেন। তাছাড়া বাজার করা হয়নি এখনও। আলোকের কথা শুনে দৌড়ে চলে এলুম।

যদু। আলোক কোথা গেল বল তো ?

শ্যাম। সব্বাইকে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে। হুজুকে ছোঁড়া তো।

রাম। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। আমার মনে হয় পুলিশে একটা খবর দিয়ে দেওয়া উচিত।

শ্যাম। ঠিক বলেছ। তারাই investigate করুক। আমি বাজারে চললুম। তোমরা থানায় চলে যাও, থানা তো পাশেই—

[রাম শ্যাম যদু চলে গেল। চতুর্থ শিক্ষকের সংগে খোল করতাল বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করল কানু কীর্তনীয়ার দল। তারা গান ধরেছে—ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী···। চতুর্থ শিক্ষক ভাবে গদগদ হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে গানের সংগে হাততালি দিতে লাগলেন। মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়ে উঠল]

উদাত্ত কণ্ঠ। স্তব্ধ হও। এখন বৃন্দাবনের বাঁশিবাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজো। গীতগোবিন্দ নয়, এখন গীতার বাণী শোনাতে হবে সবাইকে—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিত-
মনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

সবাইকে ডেকে বল, এই সংকটকালে এ মোহ তোমার কোথা থেকে এল ? এ যে আর্যগণের অযোগ্য, এ যে স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক, এ যে অকীর্তিকর। হে অর্জুন,

তুমি ক্লীবভাব ত্যাগ কর। কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন বীর, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোরা সবাই ক্লীব হয়ে গেছিস, যে বাণী শুনিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ক্লীবত্ব ঘুচিয়েছিলেন সেই বাণী এখন জপ কর। এখন প্যান প্যান করে প্রেমের গান নাকি সুরে গাইলে আরও ক্লীব হয়ে যাবি। রাধার নয়, এখন চণ্ডীর রূপ ধ্যান কর—

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী,
যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী
যা রক্তবীজাশনী
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী
যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটিমূর্তিসহিতা
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।

যে চণ্ডী মধুকৈটভকে দলন করেছেন, মহিষাসুরকে বিনাশ করেছেন, ধূম্রলোচন চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করেছেন, যিনি রক্তবীজ ভক্ষণ করেছেন সেই শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য-দলনী চণ্ডীকে ডাক এখন।

[উদাত্ত কণ্ঠস্বর নীরব হ'ল। স্তব্ধ হয়ে গেল চতুর্দিক। কানু কীর্তনীয়ার দল ও চতুর্থ শিক্ষক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জমিদার টংকনাথের প্রবেশ, সঙ্গে মাধব। জমিদার টংকনাথের প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। চোখ দুটিও বড় বড় এবং রক্তাভ। হাতে একটি রূপোবাঁধানো মালাক্কা বেতের লাঠি। গায়ে দামী শাল, আঙ্গুলে দামী আংটি, পায়ে দামী পামশু। খানদানি জমিদারের চেহারা]

মাধব। (কানু কীর্তনীয়ার দলকে) ওহে তোমরা সরে যাও, সরে যাও। হাল্লা করো না এখানে। জমিদারবাবু এসেছেন।

চতুর্থ শিক্ষক। (শশব্যস্ত) ও, টংকনাথবাবু এসেছেন!

মাধব। আমি গিয়ে ওঁকে নিয়ে এলাম। এখানে ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে যে। এ জমির উনিই মালিক।

চতুর্থ শিক্ষক। কোন জমির?

মাধব। এই জমির, যে জমিতে মন্দির উঠেছে। (কীর্তনীয়াদের) ওহে তোমরা যাও এখান থেকে।

[কীর্তনীয়ার দল চলে গেল। টংকনাথ সবিস্ময়ে মন্দিরটা দেখছিলেন]

টংকনাথ। সত্যিই, আশ্চর্য ব্যাপার। আমার অনুমতি না নিয়ে কে মন্দির তুললে আমার জমিতে। মাধব যখন বললে আমি বিশ্বাসই করিনি। এখন দেখছি সত্যি। কে তুললে এ মন্দির, (চোখ পাকিয়ে) তার নামে কেস করব আমি। কে তুললে?

[জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চতুর্থ শিক্ষকের দিকে চাইলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। আমি জানি না কে তুলেছে।

[আর একদল ছেলের সঙ্গে আলোকের প্রবেশ]

আলোক। (উদ্ভাসিত চক্ষে মন্দিরের দিকে চেয়ে) ওই দেখ, ওই দেখ আমার

স্বপ্ন সফল হয়েছে, মন্দির উঠেছে। মন্দিরের ভিতর থেকে স্বামীজি কথা বলছেন। ওই যে—শোন, ভালো করে শোন।

[মন্দিরের ভিতর থেকে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ]

টংকনাথ। তুমি কে হে ছোকরা। এ মন্দির কে তুললে।

আলোক। তা জানি না। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম মন্দির উঠেছে এখানে একটা। দেখছি, সত্যিই উঠেছে। আর কিছু জানি না।

টংকনাথ। স্বপ্ন দেখলে আর মন্দির উঠে গেল! আমাকে বোকা ঠাউরেছ না কি (ধমক দিয়ে) কে তুললে এই মন্দির সত্য করে বল।

আলোক। আমি জানি না, বোধ হয় আপনি উঠেছে।

টংকনাথ। আপনি উঠেছে! কে তুই? কার ছেলে?

আলোক। আমার বাবার নাম শ্রীশংকরসেবক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখানকার শিবমন্দিরের পুরোহিত।

টংকনাথ। ও শংকর পাণ্ডার ছেলে তুমি! বুঝেছি। সেই তাহলে স্বপ্নের গুজবটা ছড়িয়ে রাতারাতি এই মন্দির তুলেছে। বুঝেছি, এতক্ষণে বুঝেছি। তোমার বাবাকে বলে দিও, আমি টংকনাথ, ভাঁওতায় ভোলবার লোক নই। মন্দিরের ভিতর মন্তর আওড়াচ্ছে কে? তোর বাবা, না আর কেউ।

আলোক। (সভয়ে) আমি জানি না।

টংকনাথ। (আলোকের সঙ্গে যে কিশোর দল এসেছিল তাদের লক্ষ্য করে) তোমরা দেখে এস তো মন্দিরের ভিতর কে আছে—

[ছেলেরা চলে গেল। আলোকও গেল তাদের সঙ্গে]

টংকনাথ। (চতুর্থ শিক্ষকের দিকে চেয়ে) ও, মাস্টারমশাই না কি! আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। আপনিও এর মধ্যে আছেন দেখছি। এখন তো আপনার আমার ছেলেকে পড়াতে যাওয়ার কথা। আপনি এখানে কি করছেন? আমাদের বাড়িতে যান নি?

চতুর্থ শিক্ষক। গিয়েছিলাম। আপনার গৃহিণী বলে পাঠালেন ছেলে আজ সিনেমা দেখতে যাবে, পড়বে না। তাই চলে এলাম।

টংকনাথ। ও আচ্ছা। এখানে ব্যাপার কি বলুন তো। আমার জমিতে মন্দির ওঠালে কে?

চতুর্থ শিক্ষক। কে ওঠালে তা জানি না, কিন্তু উঠেছে দেখছি। আমরা কয়েকজন শিক্ষক এই মাঠে বেড়াতে এসেছিলাম। হঠাৎ মন্দিরটা দেখতে পেলাম। ওই আলোকই ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

টংকনাথ। আলোক? ও, ওই ফরসা ছোঁড়াটা? আগে থাকতে ওকে চিনতেন না কি।

চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ। ও আমাদের স্কুলে ক্লাশ টেনে পড়ে যে। হীরের টুকরো ছেলে। প্রত্যেক বিষয়ে ফার্স্ট হয়। যেমন মেধাবী তেমনি বিনয়ী।

টংকনাথ। তাই নাকি! কোন মাস্টার পড়ায় ওকে বাড়িতে বলুন তো।

চতুর্থ শিক্ষক। প্রাইভেট টিউটর রাখবার পয়সা নেই ওর বাবার। নিজেই পড়ে, খুব ভালো ছেলে।

টংকনাথ। কিন্তু ওর বাবা শংকর পাণ্ডা তো একটা লোফার, মহা ধূর্ত। মনে হচ্ছে এ মন্দিরের ব্যাপারে ওরই হাত আছে। এখুনি এর একটা কিনারা করে যেতে চাই। কই, ছেলেগুলো এখনও ফিরল না তো। মাধব দেখ তো গিয়ে।

[মাধবকে আর যেতে হ'ল না। ছেলের দল সমস্বরে গান গাইছে গাইতে ফিরে এল। সকলেই শংকরাচার্যের শিবাষ্টক স্তোত্রটি গাইছে—প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীন মহীশ গরাভরণম্। রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম্, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ইত্যাদি—]

টংকনাথ। আরে, গান গাইছ কেন ! কি দেখলে, কে আছে ওই মন্দিরে—

[ছেলেরা কোন উত্তর দিলে না, গান গাইতে গাইতে চলে গেল]

টংকনাথ। এ কি, আমার কথার জবাব দিলে না ! ব্যাপার কি হে মাধব।

মাধব। আজকালকার ডেঁপো ছোকরাদের ওই রকমই ব্যাপার হুজুর। মানীর মান রাখতে ওরা শেখেনি। দেখি, আমি ওদের কাছ থেকে যদি কোন খবর আদায় করতে পারি।

টংকনাথ। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস না ব্যাপারটা কি।

মাধব। আমি ? হ্যাঁ, দরকার হলে নিশ্চয় যাব। আগে দেখি ও ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিছু বার করতে পারি কি না।

[মাধব চলে গেল। তার ভাবভঙ্গী থেকে মনে হ'ল সে নিজে ওই মন্দিরের ভিতর যেতে রাজী নয়। বাকী চারজন শিক্ষক প্রবেশ করলেন। টংকনাথকে দেখে পঞ্চম শিক্ষক ছাড়া আর সবাই হাত কচলাতে লাগলেন]

প্রথম শিক্ষক। আপনি এখানে। বিশেষ একটা দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক। আমরাও গিয়েছিলাম।

টংকনাথ। কি দরকার আপনাদের। আপনাদের ছেলেদের ব্যাপার না কি। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে খবর পেয়েছি।

প্রথম শিক্ষক। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তাদের বাঁচান।

দ্বিতীয় শিক্ষক। আপনি আমাদের মাতব্বর তাই আপনার কাছেই ছুটে গিয়েছিলাম।

তৃতীয় শিক্ষক। আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন। আপনি এক লাইন লিখে দিলেই দারোগা ওদের ছেড়ে দেবে।

টংকনাথ। তা দেবে। কিন্তু—আচ্ছা সে আপনারা পরে বুঝবেন। আপনাদের কাছে কাগজ আছে ? দিন লিখে দিচ্ছি এখুনি।

তৃতীয় শিক্ষক। আমার এই ডায়েরির পাতাটা ছিঁড়ে দিচ্ছি। কলম আছে।

টংকনাথ। দিন।

[ডায়েরির পাতায় খস খস করে লিখে দিলেন]

এই নিন। এখন আপনাদের ছেলেরা ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের নামে 'কেস' হবেই, সেটা ঠেকাতে পারা যাবে না। কেসে লড়তে পারবেন তো ?

দ্বিতীয় শিক্ষক। আমরা অসমর্থ অসহায় নিঃস্ব। যদি লড়তেই হয়, আপনিই আমাদের কৃপা করবেন।

টংকনাথ। আমি কত লোককে কৃপা করব !

তৃতীয় শিক্ষক। কৃপা আপনাকে করতেই হবে।

[হাঁটু গেড়ে টংকনাথের পায়ে হাত দিল।]

টংকনাথ। কি মুশকিল, উঠুন উঠুন। টাকা আমি দেব, কিন্তু শোধ করে দিতে হবে সেটা।

প্রথম শিক্ষক। (করজোড়ে) একসঙ্গে পারব না ক্রমে ক্রমে করব।

টংকনাথ। বেশ তাই করবেন। আপনাদের কাছ থেকে six per cent-এর বেশী নেব না।

দ্বিতীয় শিক্ষক। (সজল কণ্ঠে) আমরা আপনারই স্কুলের মাস্টার। আপনারই অন্নদাস। আপনারই চাকর, মারতে হয় মারুন, রাখতে হয় রাখুন। আমরা মরে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি—

[মন্দিরের ভেতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠের নির্ঘোষ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। কি কচ্ছিস ? এত লেখাপড়া শিখে ভিখারীর মতো হাহাকার কচ্ছিস ? জুতো খেয়ে খেয়ে, দাসত্ব ক'রে ক'রে তোরা কি মানুষ আছিস ? দেখছি ঘৃণিত কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়েছিস। এমন সুজলা সুফলা দেশ সেখানে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই। অন্নপূর্ণার দেশে তোদের একি দুর্দশা। ছি, ছি, ছি, ছি। অথচ নিজেদের প্রশংসায় তো তোরা পঞ্চমুখ। যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না সে জাতের আবার বড়াই—

[কণ্ঠস্বর যেন ক্ষোভে দুঃখে রুদ্ধ হয়ে গেল]

টংকনাথ। (কটমট করে মন্দিরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন) কে ব'সে আছে ওখানে। বেরিয়ে এস বলছি। বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, কে তুমি—

[টংকনাথ ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক সুট সুট ক'রে সরে পড়লেন। চিঠিখানা নিয়ে থানায় গেলেন সম্ভবত। টংকনাথের চীৎকার সত্ত্বেও মন্দির থেকে কোনও লোক বেরিয়ে এল না। বেরিয়ে এল একটা অপূর্ব গান। কে যেন সুললিত কণ্ঠে শংকরাচার্যের নির্বাণষটক গাইতে লাগল]

গান

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে
ন চ ব্যোমভুমি র্ন তেজো ন বায়ু
—চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্।
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু
র্নবা সপ্ত ধাতু র্নবা পঞ্চকোষাঃ
ন বাকপাণিপাদম্ ন চোপস্থ পায়ু
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্। ইত্যাদি—

[গানের উদাত্ত সুমধুর সুরে সম্মোহিত হ'য়ে টংকনাথ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কিন্তু একটু পরেই সম্বিত ফিরে পেলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক হাতজোড় করে মন্দিরের দিকে চেয়ে আছেন]

টংকনাথ। মাস্টারমশাইরা, একটু এগিয়ে দেখুন না, ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওখানে।

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।

টংকনাথ। মন্দিরের একটা দরজা আছে কিনা, সেটা তো বোঝা যাবে।

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি যখন বলছেন—যাই।

[চলে গেলেন]

পঞ্চম শিক্ষক। দরজা আছে,
কিন্তু বাইরে নেই।
আছে আপনার হৃদয়ের মধ্যে।
সেই দরজা দিয়ে যদি ঢুকতে পারেন
তাহলেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন।

টংকনাথ। একি, আপনি হেঁয়ালিতে কথা বলছেন দেখছি।

পঞ্চম শিক্ষক। সত্য অনেক সময় হেঁয়ালির মতো শোনায়। ও মন্দিরে ঢোকবার একমাত্র দরজা আছে বুকের মধ্যে, বিশ্বাস করুন এ কথাটা।

টংকনাথ। (স-শ্লেষে) বিশ্বাস করতাম কথাগুলো যদি আপনার মেয়ের রাঙা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু সে তো একদিন মাত্র এসে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চলে গেল, আর তো এল না।

পঞ্চম শিক্ষক। (শান্তভাবে) জানি না কেন আসেনি। বোধহয় আপনার চেয়ে বেশী ধনী ক্রেতা পেয়েছে কোথাও। মনে হচ্ছে, ঠিক জানি না।

টংকনাথ। আপনার মেয়ে কোথায় যায় তা আপনি জানেন না ?

পঞ্চম শিক্ষক। না। একটি কথা জানি শুধু।

টংকনাথ। কি সেটা।

পঞ্চম শিক্ষক। আমি অক্ষম, আমি পাপী।
দেশজোড়া ব্যভিচারের খর-স্রোতে
পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি
খড়কুটোর মতো ভেসে গেছি।
আমি ব্রাহ্মণ,
আমি শিক্ষক,
তবু দুরাত্মা ধনীর পায়ে
মাথা বিকিয়ে দিয়েছি
অন্নবস্ত্রের জন্য
নগ্ন হ'য়ে অনাহারে মরতে ভয় পেয়েছি।
আমি অক্ষম, আমি পাপী, আমি ভীতু।
দেশজোড়া তামসিকতার তোড়ে ভেসে যাচ্ছি
এই শুধু জানি, আর কিছু জানি না।

টংকনাথ। আপনি অক্ষম পাপী ভীতু হতে পারেন, কিন্তু দেশের সবাইকে আপনার

দলে টানছেন কেন ! আপনি তামসিক হ'তে পারেন, কিন্তু দেশের সবাই তামসিক এর কি কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে ? ননসেন্স !

[মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠ সহসা ধ্বনিত হ'ল]

উদাত্ত কণ্ঠ। দেখছ না, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবে গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করতে চায়, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করতে চায়, যেথায় ক্রূর কর্মী তপস্যাদির ভান ক'রে নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করে তোলে, যেথায় নিজের সামর্থ্য-হীনতার উপর দৃষ্টি কারো নেই, কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ ; বিদ্যা যেখানে কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবছে তার কি প্রমাণান্তর চাই ?

[টংকনাথ খোশামোদে অভ্যস্ত। মুখের উপর এইসব কড়া কড়া কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন]

টংকনাথ। (পঞ্চম শিক্ষককে) মনে হচ্ছে আপনারই কোনও উকিল ওখানে ব'সে আছে ?

পঞ্চম শিক্ষক। আমার একার নন, উনি সকলের উকিল।

[চতুর্থ শিক্ষক ফিরে এলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। না, কোনও দরজা দেখতে পেলাম না।

টংকনাথ। কাছে গিয়েছিলেন ?

চতুর্থ শিক্ষক। না, যেতে সাহস হচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে মন্দিরের গা থেকে।

টংকনাথ। আপনি এত ভীরু ? আমি যাব।

[টংকনাথ মন্দিরের দিকে চ'লে যাচ্ছিলেন। চতুর্থ শিক্ষক বাধা দিলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি যাবেন না, যাওয়া নিরাপদ নয়।

টংকনাথ। আমাকে যেতেই হবে। দেখতে হবে এ কিসের ষড়যন্ত্র।

[চ'লে গেলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। গেলেন বটে, কিন্তু কাছে ভিড়তে পারবেন না। আমি দেখলুম স্ফুলিঙ্গের মতো কি যেন ছিটকে ছিটকে বেরুচ্ছে। বিদ্যুৎ ছাড়া ও কিসের আলো হ'তে পারে।

পঞ্চম শিক্ষক। বিদ্যুতের আলো যেখান
থেকে আসে,
সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র যাঁর কাছে
আলোর জন্য ঋণী,
আমাদের যে আলো আমরা নিবিয়ে
ফেলেছি
এ সেই আলো, সেই আলো।

চতুর্থ শিক্ষক। সত্যিই কি তাহলে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন ওই মন্দিরের মধ্যে ? সত্যিই কি ? যে সব বাণী শুনছি এতো তাঁরই বাণী। সত্যিই কি তাহলে উনি

ওই মন্দিরের মধ্যে এসেছেন ! মন্দিরে কোন দ্বার নেই, কি ক'রে প্রবেশ করলেন তিনি ? কিছুই জানি না, আমরা শিক্ষক কিন্তু কোন জ্ঞানই নেই আমাদের। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারি না। নিজেদের বড়ই হীন মনে হচ্ছে। সাহস ক'রে ওই মন্দির স্পর্শ করতে পারলাম না। কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না। সত্যিই বড় ভয় করছে।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠের বাণী শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। ভয় কি ! বল আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান, আমি মায়ের সন্তান। সাহস ক'রে এগিয়ে যা দেখবি ভয় মিথ্যা। ভয় তামস প্রকৃতির লক্ষণ। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম এ দেশের মতো এতো অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইঁটপাটকেলের মতো জড়ত্ব। ভয় কি ! ভয় মিথ্যা। নির্ভয়ে চলে আয়।

[আলোককে টানতে টানতে মাধব প্রবেশ করলেন। উদাত্ত কণ্ঠ থেমে গেল]

মাধব। বল ছোঁড়া, এ মন্দির কোথা থেকে এল। এ নিশ্চয় তোদের কারসাজি। বল মন্দিরের ভিতর কে ব'সে আছে।

আলোক। আমি জানি না ; আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেখছি আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। এর বেশী আমি আর কিছু জানি না। তখন মন্দিরের কাছে যেতেই কে যেন আমার কানে কানে বললেন—শংকরের প্রভুমীশমনীশ স্তোত্রটা সুর ক'রে গা দেখি। তাই আমরা গাইছিলাম। উনিও যেন আমাদের সঙ্গে গাইছিলেন।

মাধব। 'উনি'টা কে ?

আলোক। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ।

মাধব। [ভেংচে] স্বামী বিবেকানন্দ। বল, সত্যি কথা বল এখনও।

[তার কান ধরে টানতে লাগলেন]

আলোক। আমার কান ছেড়ে দিন। আমি মিথ্যা কথা কখনও বলি না। কান ছেড়ে দিন—

[আলোকের চোখ-মুখে উদ্দীপনার এমন একটা ছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে মাধব পিছিয়ে গেলেন ! টংকনাথ নিজের ডান হাতটা দেখতে দেখতে ফিরে এলেন। তাঁর কপালে কুঞ্চন, মুখ গম্ভীর। তিনি এসে আবার মন্দিরটার দিকে চাইলেন]

টংকনাথ। [অস্ফুট স্বরে] আশ্চর্য !

চতুর্থ শিক্ষক। [সাগ্রহে] কি দেখলেন ?

টংকনাথ। ওখানে মন্দির নেই। দেওয়ালের মতো শক্ত কিছু হাতে ঠেকল না। হাত দিতেই হাতটা পুড়ে গেল। মনে হ'ল যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় হাত দিলুম। অথচ দেখছি হাতে কিছু হয়নি। মনে হয় জমি খুঁড়ে ওর মধ্যে কেউ পেট্রল বা স্পিরিট ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিচ্ছি।

আলোক। [সানুনয়ে] না না ওসব কিছু করবেন না। আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি রোজ স্বামীজিকে প্রাণভরে ডাকতাম। তিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

মাধব। [ধমক দিয়ে] চুপ কর ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। ওঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে। [টংকনাথকে] আমার একটা পরামর্শ শুনবেন ?

টংকনাথ। কি বল।

মাধব। একটু আড়ালে চলুন তাহলে।

[টংকনাথকে নিয়ে আড়ালে গেলেন]

আলোক। [অসহায়ভাবে] এরা বুঝতে পারছে না, এরা বুঝতে পারছে না। আমি গিয়ে সবাইকে খবর দিই। সবাই এসে দেখুক অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

[আলোক চ'লে গেল]

চতুর্থ শিক্ষক। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?
অসম্ভব যদি সম্ভবই হয়ে থাকে,
সত্যই যদি আবির্ভাব ঘটে থাকে
দেবতার,
আমরা কি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ?
অভ্যর্থনা করব না ?
পূজা করব না ?
আমি যাই ফুল নিয়ে আসি কিছু।
অর্ঘ্য নিয়ে আসি,
কাছে যেতে না পারি
দূরে থেকে অঞ্জলি দেব।
তোমার জন্যেও আনব কিছু ?

পঞ্চম শিক্ষক। এনো।
কিন্তু আমার অঞ্জলি আমি আগেই দিয়েছি।
প্রাণের অঞ্জলি,
আকুলতার অঞ্জলি,
পাপের অঞ্জলি,
এখন শুধু অপেক্ষা করছি।

চতুর্থ শিক্ষক। কিসের অপেক্ষা ?

পঞ্চম শিক্ষক। প্রায়শ্চিত্তের।

চতুর্থ শিক্ষক। মনে হচ্ছে খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চল, পূজার ব্যবস্থা করি গিয়ে। অন্তত কিছু ফুল নিয়ে আসি চল। মেয়েরা এসে শাঁখ বাজাক। চল, তোমাকে এখানে একা রেখে যাব না। এস।

[চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক চলে গেলেন। মাধবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে টংকনাথ প্রবেশ করলেন]

টংকনাথ। তুমি কথাটা মন্দ বলনি। মন্দির কি ক'রে এল, মন্দিরের ভিতর কে আছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

মাধব। কিছু লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আপনি জায়গাটা ভাল ক'রে ঘিরিয়ে ফেলুন। এখুনি খবরটা চাউর হ'য়ে যাবে। তখন দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করবে। সবাই যেতে চাইবে মন্দিরের কাছে। আপনি ওই রাস্তার দিকে অন্তত দুটো গেট করিয়ে দিন আর লোক বসিয়ে দিন তাতে। বেশী নয়, এক টাকা ক'রে মাথাপিছু টিকিট। দেখবেন, বেশ কিছু রোজগার হ'য়ে যাবে।

টংকনাথ। ঠিক বলেছ। মন্দির নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চল তাহলে আর দেরি করা ঠিক নয়। আমার নতুন বাড়িটা যেখানে হচ্ছে সেখানে আজ কাজ বন্ধ থাক। তারা এসে জায়গাটা ভালো ক'রে ঘিরুক।

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ চলুন। থানাতেও একটা খবর দিতে হবে। চলুন যাবার সময় ব'লে দিয়ে যাই, থানা তো মাঠের ওপারেই।

টংকনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল, চল।

[টংকনাথ ও মাধব চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল রাম, শ্যাম ও যদু]

রাম। মন্দির তো এখনও খাড়া রয়েছে দেখছি। এতো এক আচ্ছা আপদ হ'ল। এই মাঠেই আমাদের ইলেকশন মীটিংটা করব ভেবেছিলাম। কি ক'রে হবে বল দেখি।

শ্যাম। মন্দিরের ওপারে অনেক জায়গা আছে।

যদু। তাতো আছে। কিন্তু এই মন্দিরের সামনে জগদীশবাবুর মীটিং কি জমবে? শুধু মন্দির থাকলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর ভিতর থেকে বিবেকানন্দের বাণী বেরুলে তোমার রোগা বক্তা বিনু দাসের ক্ষীণ কণ্ঠ যে চাপা পড়ে যাবে। তোমাদের মীটিং এখানে জমবে না। অন্য মাঠে যাও। তুমি জগদীশবাবুর দলে জুটলে কি ক'রে!

রাম। (হাসিয়া) শ্যামও জুটেছে। এখান থেকে ফিরেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কেন জুটেছি? (টাকা বাজাবার মুদ্রা দেখিয়ে) অনেক টাকা ঢালছে ওরা। ফাঁকতালে কিছু কামিয়ে নেওয়া যাক।

যদু। শেষকালে জগদীশবাবুর দলে ভিড়লে! ও লোকটা যে কত বড় স্কাউন্ড্রেল তা জান?

রাম। তাতো জানবার দরকার নেই। আমাদের সমস্যা এই (পেট বাজিয়ে দেখাল)—এ সমস্যাটা উনি সমাধান করতে পারবেন কিনা সেইটেই জানবার ছিল। তা জেনেছি।

শ্যাম। এই পোড়া পেটের জন্য কি না করছি বল। জুতো খাচ্ছি, লাথি খাচ্ছি, সেলাম করছি, পা চাটছি, মাতৃভাষা ত্যাগ ক'রে হিন্দী শিখছি। যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা চাই।

যদু। টাকা পেয়েছ?

রাম। পেয়েছি।

শ্যাম। বহুত। ডেলি দশ টাকা করে। বহুদিন পেট ভ'রে খেতে পাইনি ভাই। দু'দিন পেট ভ'রে ভালোমন্দ খেয়েনি।

রাম। সুতরাং আমরা এখন রাতকে দিন করব, কুৎসিতকে সুন্দর বলব, জগদীশবাবুকে বলব পরম পূজনীয় দেশপ্রাণ নিষ্কলঙ্ক মহাত্মা।

শ্যাম। বহুদিন বেকার ব'সে আছি। তাঁর সুনজরে পড়লে, চাই কি একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। আমাকে উনি promiseই করেছেন।

রাম। ওসব promise-এর কোন মূল্য নেই। নগদ যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

যদু। কি করতে হবে তোমাদের?

শ্যাম। মীটিং অর্গানাইজ করতে হবে। ভলান্টিয়ার জোগাড় করতে হবে। শুনছি

সিঙাড়াওলা মীটিং ভেঙে দেবার জন্যে গুণ্ডা ভাড়া করেছে। পুলিশে খবর দিয়েছি আমরা।

যদু। পুলিশ কিছু করবে না। তারা সিঙাড়াওলার কোন কাজে বাধা দেবে না।

শ্যাম। তুমি কি ক'রে জানলে?

যদু। আমি সিঙাড়াওলার দলে যে। শহরের সব ট্রাক আর রিক্‌শা ভাড়া ক'রে ফেলেছি আমরা। ট্রাকে ট্রাকে আমাদের চলন্ত মীটিং হবে। আর রিক্‌শাগুলোতে থাকবে লাউডস্পীকার। ওই যে পুলিশ এসে গেল।

[একজন পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনেস্টবল নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনজনেই খুব ঝুঁকে সেলাম করল]

রাম। আমরা সার ভেবেছি এই মাঠটাতে মীটিং করব। কিন্তু হঠাৎ এই মন্দিরটা কোথা থেকে গজিয়ে গেল বুঝতে পারছি না। শুধু মন্দির নয়, ওর ভিতর একজন লোক ব'সে বিবেকানন্দের বাণী আওড়াচ্ছে।

পুলিশ অফিসার। এ মাঠে আপনারা মীটিং করতে পারবেন না। টংকনাথবাবুর নায়েব মাধববাবু এখনি থানায় গিয়েছিলেন। এ মাঠ টংকনাথবাবুর সম্পত্তি। মাধববাবু বললেন, এ মন্দির তিনিই তুলেছেন স্বামীজির শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে। স্বামীজির ভক্তরা এখানে এসে পুজো দেবেন। মীটিংয়ের হামলা এখানে চলবে না। আপনারা অন্য মাঠে যান।

রাম। শহরে সব মাঠ যে অকুপায়েড সার, দুটিতো মোটে মাঠ। একটি দখল করেছেন নিরঞ্জনবাবু আর একটি—।

রঘুবাবু। আমরা ভেবেছিলাম এখানেই—

পুলিশ অফিসার। এখানে হবে না। এ মাঠ টংকনাথবাবুর, তিনি এখানে মন্দির তুলে পুজোর ব্যবস্থা করছেন, এখানে মীটিং হবে কি করে। আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন। [কনেস্টবলদের দিকে চেয়ে] তোমরা এইখানেই মোতায়েন থাকবে, দেখো কেউ যেন এখানে হামলা না করে। আমি চললাম। নমস্কার।

[কনেস্টবলদের নিয়ে চলে গেলেন]

যদু। [সহসা উল্লসিত] হুররে হুররে হুররে। তোমরা মীটিং করতে পারবে না। জয় সিঙাড়াওলার জয়, জয় সিঙাড়াওলার জয় [হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল] একটি সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, শুনবে?

রাম। কি বল।

যদু। পিয়ারী টকিতে খুব ভালো একটা ফিল্‌ম এসেছে, সেইটি দেখ গিয়ে। হিরোইনের কি চেহারা মাইরি, কি অভিনয়, কি নাচ। বসন্তবালার ওইটেই 'হিট' বই। আর কি অদ্ভুত গান, এখনও কানে বাজছে।

[গানের এককলি গেয়ে শুনিয়ে দিলে]

অঙ্গে নীলাম্বর, বুকের উপর
রঙিন কাঁচুলি বাঁধা
ডাগর গাগরী কাঁখেতে লইয়া
ঘাটেতে চলেছে রাধা
জল উছলি পড়ে,

গাগরীতে জল ধরে না ধরে না
উছলি পড়ে।

আর তার সঙ্গে কি খোল-করতাল বাজিয়েছে, সুপার্ব, চমৎকার—

[মন্দিরের ভিতর উদাত্ত ধ্বনি আবার জেগে উঠল]

উদাত্ত ধ্বনি। খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করেই দেশটা উৎসন্ন গেল। একে তো পেটরোগার দল, অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সারা দেশে কেবল খোল-করতালই বাজছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরি হয় না? তূরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ওই সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ সবাইকে শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়ে-মানুষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। রাজনীতি ভালো, নাট্যচর্চাও ভালো। কিন্তু আগে মানুষ হ, তবে তো ও সব মানাবে। বলিষ্ঠ অঙ্গেই অলংকার শোভা পায়। তোরা যে তলিয়ে যাচ্ছিস, ধাপে ধাপে নরকে নেবে যাচ্ছিস যে। এখন থেকে সাবধান না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি। আগে সুস্থ হ, সবল হ, মানুষের মতো মানুষ হ—তারপর ওসব করিস, তারপর ওসব সহ্য করতে পারবি।

[রাম, শ্যাম, যদু তিনজনেই চমকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল মন্দিরের দিকে]

যদু। বাপস্। কথাগুলো যেন ছররার মতো গায়ে এসে লাগল। কে বসে আছে বল দেখি ওখানে। লোকটা বলে ভালো।

রাম। যে থাকে থাক আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নই। এইটুকু শুধু বলতে পারি it is something uncanny. হরিটা মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েছিল, তারপর থেকে কেমন যেন ভম্ হয়ে গেছে।

শ্যাম। না, না আমরা ওর ভিতর যাচ্ছি না। আগে আমাদের মীটিংটা খাড়া করতে হবে। টাউনের ভিতর না পারি টাউনের বাইরে যাব। সেখানে প্রচুর ফাঁকা মাঠ আছে।

যদু। কিন্তু সেখানে লোক জুটবে না। নেহরু এলে জুটত। বিনু দাসের মিনমিনে বক্তৃতা শুনতে কেউ যাবে না সেখানে। আমরা কিন্তু ট্রাক আর লাউড-স্পীকার নিয়ে সর্বত্র যাব।

রাম। [দূরের দিকে চেয়ে] ওহে হরি আসছে। কাঁধে ঝোলা কেন। চল একটু আড়ালে দাঁড়াই। দেখা যাক কি করে। আমাদের দেখলে হয়তো অন্যদিকে চলে যাবে।

[তিনজনেই আড়ালে চলে গেল। শুধু গায়ে, শুধু পায়ে, কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে হরি প্রবেশ করল। ঝোলা থেকে যে জিনিস বেরিয়েছিল তাতে মনে হ'ল ওটা মুচিদের ঝোলা। হরি কোন দিকে না চেয়ে মন্দিরের সামনে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসল]

হরি। হে প্রভু তোমার কথায় আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আমি লেখা-পড়া শিখে কুলকর্ম ত্যাগ করে কেরানী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি মস্ত কিছু হয়েছি। আজ তোমার বাণী শুনে আমার সে ভুল ভাঙল। ঠিক করলাম আর চাকরি করব না,

মুচির কাজই করব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর—

হে চন্দ্রচূড়, মদনান্তক শূলপাণে,
স্থানো গিরিশ, গিরিজেশ মহেশ শম্ভো,
ভূতেশ, ভীত-ভয়-সূদন, মামনাথং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষঃ।

[প্রণাম করে উঠে গেল। পরক্ষণেই হা-হা-হা করে হাসতে হাসতে প্রবেশ করল রাম, শ্যাম, যদু। কিন্তু মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর বজ্রমন্দ্রে ধ্বনিত হয়ে থামিয়ে দিলে তাদের হাসি

উদাত্ত কণ্ঠ। তোমরা আর্যবাবাগণের যত জাঁকই কর না কেন, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা দশ হাজার বছরের মমি। তোমরা চলমান শ্মশান। তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলে বোধহয় যেন ঠানদির মুখে গল্প শুনছি, তোমরা যেন চিত্রশালিকার ছবি! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব একসঙ্গে। ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা। কেন তোমরা ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? পূর্বকালের অনেক মণিমাণিক্য রত্ন-পেটিকা এখনও তোমরা আঁকড়ে ধরে আছ, যত শীঘ্র পার তোমাদের জীবন্ত উত্তরাধীকারীদের সেগুলি দিয়ে দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। অনেক দিনের অত্যাচারের ফলে এরা পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, লাভ করেছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না···

[উদাত্ত কণ্ঠ নীরব হল]

রাম। পালাই চল।

শ্যাম। বেশীক্ষণ শুনলে আমরাও পাগল হয়ে যাব।

যদু। হ্যাঁ, পালাই চল।

[তিনজনেই চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক তাঁদের তিন ছেলেকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। ছেলে তিনটি সাহেবী পোশাকে সজ্জিত।]

প্রথম শিক্ষক। টংকনাথবাবু নেই দেখছি।

দ্বিতীয় শিক্ষক। যাক্। ভালোই হয়েছে। দুটো মনের কথা খুলে বলা যাবে।

তৃতীয় শিক্ষক। [ছেলেদের দিকে চেয়ে] নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অনেক কষ্টে তোমাদের ছাড়িয়ে এনেছি। আজ এখানে যে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে হয়তো তাঁরই কৃপায় টংকনাথবাবুর পাষাণ-প্রাণও বিগলিত হয়েছে। তোমরা ওই দেবতার কাছে প্রণাম করে শপথ গ্রহণ কর—আর পাপ কাজ করবে না।

প্রথম পুত্র। দেবতা! কই?

দ্বিতীয় শিক্ষক। ওই মন্দিরের মধ্যে।

প্রথম পত্র। [স-শ্লেষে] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, না যম ? কোন দেবতা ?

তৃতীয় শিক্ষক। মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন। তোমরা পাপ করেছ। তাঁর আশীর্বাদ পেলে তোমরা নির্মল হবে। প্রণাম কর।

দ্বিতীয় পত্র। পাপ ? আজকাল কোন কিছুই পাপ নয়। পাপের মৃত্যু হয়েছে। এখন যে যা করে তাই ঠিক। পাপের সম্বন্ধে সেকেলে আইনগুলো এখনও আছে বলেই মাঝে মাঝে কেউ ধরা পড়ে—তাই সবাই নয়, যাদের সুপারিশ করবার লোক আছে তাদের কিছু হয় না। আমরা যা করি তা সবাই করছে। শিক্ষক ছাত্র, শাসক শাসিত, ধনী দরিদ্র, আপামর ভদ্র সবাই চোর। আজকাল চোর মিথ্যাবাদী না হলে সমাজে টেকা যায় না। চোরের সমাজে চোর হয়েই থাকতে হয়, মিথ্যাবাদীর সমাজে সত্যবাদীর স্থান নেই।

দ্বিতীয় শিক্ষক। তর্ক কোরো না। তোমাদের ওসব তর্ক অনেকবার শুনেছি। আর শুনতে চাই না। সুযোগ পেয়েছ, প্রণাম কর। এ সুযোগ জীবনে আর আসবে না।

তৃতীয় পত্র। কই বিবেকানন্দ ? তাঁকে দেখতে তো পাচ্ছি না। দেখছি শুধু অস্পষ্ট একটা মন্দির।

দ্বিতীয় পত্র। যদি দেখতে পেতামও, তাহলেও প্রণাম করতাম না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কায়স্থ। তাঁকে প্রণাম করবার কোন মানে হয় ?

প্রথম শিক্ষক। প্রণাম করবে তাঁর মহত্ত্বকে, তাঁর সাধনাকে, তাঁর শক্তিকে, তাঁর স্বাধীন চিত্তকে, তাঁর নির্ভীক আত্মাকে, তাঁর স্বদেশ-হিতৈষণাকে। প্রণাম কর। প্রণাম করে কৃতার্থ হও।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। যেখানে ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, সেখানে প্রণাম অর্থহীন। তোরা নিজেদের প্রণাম করতে শেখ, নিজেরা প্রণম্য হ। সত্যিকারের প্রণম্য লোক দেশে বড়-একটা নেই। অনেকে নিজেদের পাকা আর্য মনে করেন। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা। ওঁদের ধারণা ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, কেবল এদেশের রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে রংটা কালো হয়ে গেছে। ইংরেজরা কিন্তু আমাদের সব এক জাত করে দিয়েছিল। রাজা-মহারাজা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী দরিদ্র তাদের চক্ষে সব এক জাত—নেটিভ। ও কালো রঙের মধ্যে এক আধ পোঁচ কম-বেশী তাদের নজরে পড়ে না। সব নেটিভ। ও টুপিটাপা মাথায় দিয়ে সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল। সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। কথাটা মনে রাখিস। তোরা আজকাল সবাই সাহেবী পোশাক পরে বেড়াস, কিন্তু মনে রাখিস তাদের চোখে তোরা কালো আদমি—নেটিভ। আর শাস্ত্রের চোখে তোরা ব্রাত্য, পতিত ব্রাহ্মণ। যতদিন ছুঁচোর গোলাম চামচিকে হয়ে থাকবি ততদিন এসব কথা মাথায় ঢুকবে না, কেবল কিচিরমিচির করবি। আগে নিজেদের শোধন কর।

প্রথম পত্র। বাবাঃ এ যে ম্যাজিক দেখছি।

দ্বিতীয় পত্র। ভেন্ট্রিলোকুইজম্। কে করছে বল তো।

তৃতীয় পুত্র। ও সব বুর্জোয়া ননসেন্স অনেক শুনেছি, ও সবে আর আস্থা নেই [নিজের বাবাকে] আপনি বাজে ব্যাপারে আর সময় নষ্ট করবেন না। টাকার জোগাড় করুন। ওরা মোকর্দমা করবেই।

প্রথম শিক্ষক। সে ব্যবস্থা করেছি। টংকনাথবাবু ধার দেবেন। কিন্তু এত বড় একটা আবির্ভাব তোমাদের হৃদয়-স্পর্শ করছে না এ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।

দ্বিতীয় শিক্ষক। লজ্জিত হয়েছি।

তৃতীয় শিক্ষক। [সক্ষোভে] হে ভগবান।

প্রথম পুত্র। যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুদ্ধি কম ছিল, তখন এই সব ম্যাজিক দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতুম। এখন আর হই না। মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় ধর্মের আদি পর্বে ধর্ম ম্যাজিক ছিল। এখনও তাই আছে। বাইরের ঢংটা বদলেছে কেবল। আমাদের ম্যাজিকে বিশ্বাস নেই। আমরা জানি ধর্মের ম্যাজিক দেখিয়ে একদল চতুর লোক চিরকাল বোকা মূর্খ লোকদের ঠকাচ্ছে। আমরা নাস্তিক, আমরা ও সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ধর্ম বা ঈশ্বর নয়, সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন বাঁচতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয় পুত্র। ওহে, আমরা যখন ছাড়া পেয়ে গেছি তখন চল না ক্লাবে যাই। আজ আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হবে।

প্রথম পুত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ চল। টংকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হলে খুশী হতুম। তিনি আমাদের হিতৈষী।

তৃতীয় পুত্র। তাঁকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন [হাতঘড়ি দেখে] ওহে, যাবে যদি চল, আর সময় নেই।

প্রথম পুত্র। হ্যাঁ চল।

[তিন জনেই চলে গেল]

প্রথম শিক্ষক। এই ছেলের বাপ আমি। মরে যেতে ইচ্ছে করে।

দ্বিতীয় শিক্ষক। সত্যি, এরাই দেশের ভবিষ্যৎ!

তৃতীয় শিক্ষক। [মন্দিরের দিকে ফিরে নতজানু হয়ে] ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, এই অভাগাদের।

[মন্দিরের ভিতর আবার উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হল]

উদাত্ত কণ্ঠ। সত্যের সন্ধানে আমিও একদিন নাস্তিক্যের মরুভূমিতে দিশাহারা হয়েছিলাম। তারপর ঠাকুর দয়া করলেন, সত্যকে সূর্যের মতো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনের উপর যে মায়ার আবরণ ছিল তা সরে গেল, দেখতে পেলাম সিংহকে। ওরাও পাবে। আত্মদর্শন করতেই হবে প্রত্যককে। ওরা এখন দিশাহারা হয়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যথাসময়ে সিংহের দেখা পাবে। পাবেই। যাদের মন সবল সতেজ যুক্তিবাদী তারাই সত্যকে দেখতে পায়, তাদের উপরই আমার আশা বেশী; কিন্তু যারা সব কথাতেই সায় দিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কেবল জি হুজুর করছে তারা অপদার্থ। তাদের পক্ষে সত্যের নাগাল পাওয়া শক্ত। ওরা তেজী ছেলে, ওরা পারবে।

[কণ্ঠ নীরব হল। মাধব একদল কুলি সঙ্গে প্রবেশ করল। তাদের হাতে খন্তা, কাটারি, দড়ি প্রভৃতি রয়েছে]

মাধব। দু' গাড়ি বাঁশ এখুনি এসে পড়বে। তোমরা এই মাঠটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেল। খুব মজবুত বেড়া হওয়া চাই। মন্দিরের ওপার থেকে আগে শুরু কর গিয়ে, তারপর এধারে এস। দুধারে দুটো গেট হবে। তোমরা খুঁড়তে শুরু কর, আমি আসছি।

[কুলির দল চলে গেল]

মাধব। [শিক্ষকদের] আপনাদের ছেলেরা তো ছাড়া পেয়ে গেছে দেখলাম। টংকনাথবাবুর চিঠিতে কাজ হয়েছে তাহলে। হবে না? কত বড় লোক! বিনিময়ে কিন্তু আপনাদেরও একটা কাজ করতে হবে। আমরা তিনটে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছি, তাতে লাউডস্পীকার থাকবে। আপনারা প্রত্যেকে এক একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। চারিদিকে প্রচার করে দিন স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে আবির্ভূত হয়েছেন। যাঁরা তাঁর বাণী শুনতে চান তাঁরা যেন এই মাঠে এসে কিউ দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ান এবং একে একে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেন। মাথাপিছু মাত্র এক টাকা করে প্রণামী দিতে হবে। দুটো গেট থাকবে, একটা পুরুষদের, আর একটা মেয়েদের। যান, আপনারা চলে যান।

প্রথম শিক্ষক। সেটা কি শোভন হবে?

মাধব। যখন টংকনাথবাবুর পায়ে ধরেছিলেন তখন কি সেটা শোভন হয়েছিল?

দ্বিতীয় শিক্ষক। যেতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু বিবেকানন্দের বাণী শোনবার জন্য টাকা দিতে হবে এইটে লাউডস্পীকারে চেঁচিয়ে বলাটা কি উচিত?

মাধব। সব মন্দিরেই প্রণামী দিতে হয়। এটা তো চিরকালের রেওয়াজ। এতে অনুচিতটা কোথায় দেখলেন।

তৃতীয় শিক্ষক। এ মন্দির সাধারণ মন্দির নয়, এই অভুতপূর্ব আবির্ভাবকে আপনারা ব্যবসার সামগ্রী করবেন?

মাধব। করলে ক্ষতি কি। মালিকের তাই ইচ্ছে। মালিকের এ-ও ইচ্ছে যে, আপনারা তিনজনেই গাড়ি করে এইটে প্রচার করুন। আপনারা শিক্ষক, আপনাদের মুখ থেকে এ কথা শুনলে লোকে বেশী বিশ্বাস করবে, দলে দলে আসবে।

প্রথম শিক্ষক। কিন্তু—

দ্বিতীয় শিক্ষক। মানে—

তৃতীয় শিক্ষক। আমি—

[তিনজনেই ইতস্তত করতে লাগলেন]

মাধব। দেখুন, আপনাদের একটা সাফ কথা বলে দিতে চাই। টংকনাথবাবুর এ অনুরোধটি যদি না রাখেন তাহলে আপনাদের ছেলেদের আবার পুলিশে ধরবে, তাদের চাকরি তো থাকবেই না, জেলও হয়ে যাবে। তখন কিন্তু তাঁর কোন সাহায্য আর পাবেন না আপনারা।

প্রথম শিক্ষক। না, না, বলছিলাম—

মাধব। কিছু বলবেন না, সোজা চলে যান।

দ্বিতীয় শিক্ষক। যাচ্ছি, যাচ্ছি, গাড়িগুলো কোথায়।

মাধব। মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে। চলুন আপনাদের গাড়িতে বসিয়ে দি।

তৃতীয় শিক্ষক। চলুন। হায় ভগবান!

[মাধবের সঙ্গে শিক্ষকরা চলে গেলেন। দূরে গান শোনা গেল—'প্রভুমীশমনীশম-শেষগুণং—' ইত্যাদি। গান গাইতে গাইতে আলোক ও তার সমবয়স্ক কয়েকজন কিশোর এসে প্রবেশ করল]

আলোক। দেখ, আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। মন্দির উঠেছে, তার মধ্যে স্বামীজি এসেছেন।

প্রথম কিশোর। কই স্বামীজিকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

আলোক। তাঁর দেহ তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! তবে ইচ্ছে করলে, তিনি হয়তো দেখা দিতেও পারেন। কিন্তু তাঁর বাণী অমর, সেই বাণী শোনা যাচ্ছে এখানে।

দ্বিতীয় কিশোর। কিন্তু কই কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো।

আলোক। আমি শুনেছি, তোরাও শুনতে পাবি। আয় সবাই প্রার্থনা করি। আয় সবাই চোখ বুজে স্বামীজির মূর্তিটা ধ্যান করি। আয়—

[সবাই চোখ বুজে বসল। একটু পরেই স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ। তোরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোরা ওঠ, তোরা জাগ, সত্যের সন্ধানে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়। দেশকে গড়তে হবে, জগতকে জাগাতে হবে। তোদের দায়িত্ব অনেক। এ দায়িত্ব বহন করতেই হবে তোদের। ভয় পেলে চলবে না। কোন কারণেই ভয় পাবি না। ভয় নেই, ভয় মিথ্যা, ভয় অলীক। তোরা সবাই নচিকেতা, তোদের প্রত্যেকের মধ্যেই সত্য-জিজ্ঞাসার আগুন জ্বলছে। সত্যকে জানবার জন্য নচিকেতা যমের, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। ভয় পায়নি। তোরাও তেমনি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়। তোরাও পারবি।

[উদাত্ত কণ্ঠ নীরব হ'ল। মাধবের প্রবেশ]

মাধব। এই ছোঁড়া দল পাকিয়ে আবার এসেছে দেখছি। ফের এখানে কি করছিস তুই?

আলোক। স্বামীজির পুজো করছি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, আমি ধন্য হয়ে গেছি।

মাধব। থাম, ফক্কোড় ছোঁড়া। এই বয়সে লম্বা লম্বা বুলি কপচাতে শিখেছে। যা এখান থেকে। এখানে কি করছিস?

আলোক। পুজো করছি।

মাধব। খানিকক্ষণ পরে আসিস। মাঠ ঘেরা হচ্ছে। উত্তর কোণের গেট দিয়ে ঢুকে যতক্ষণ ইচ্ছে পুজো করিস। এক টাকা টিকিট লাগবে।

আলোক। [বিস্মিত] তার মানে!

মাধব। তার মানে এই মাঠ টংকনাথবাবুর। তিনি বিনা পয়সায় বাজে লোককে এখানে হল্লা করতে দেবেন না। পালা, পালা শিগ্গির সরে পড়। ওই টংকনাথবাবু আসছেন, তোদের এখানে দেখলে ক্ষেপে যাবেন। যা না রে ছোঁড়া—

[তাড়া করে যেতেই আলোক আর তার বন্ধুরা চলে গেল। টংকনাথবাবু প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন স্থূলকায় মোহন্ত রয়েছেন। গেরুয়া পরা, কপালে নানা রঙের তিলকের ফোঁটা]

টংকনাথ। ওহে, আমাদের বড় সৌভাগ্য এঁরাও আজ এসে গেছেন। আমি চাই

গেটের সামনে এঁরা বসে থাকুন। এক গেটে ইনি, আর এক গেটে উনি। ওঁরা ওঁদের আশ্রমের জন্য আমার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছেন। আমি বলেছি—এই জায়গাটাই আপনাদের আশ্রম বানিয়ে ফেলুন না। এ খবরটা যদি একবার ভালো করে রটে যায় তাহলে টাকা নিয়ে শেষ করতে পারবেন না। কি অপূর্ব মন্দির উঠেছে দেখুন।

[মোহন্ত দুজন সবিস্ময়ে মন্দির দেখতে লাগলেন]

প্রথম মোহন্ত। কবে এ মন্দির আবির্ভূত হয়েছে।

মাধব। কবে তা জানি না, আজ আমরা দেখতে পেয়েছি।

দ্বিতীয় মোহন্ত। স্বামীজির বাণী আপনারা শুনেছেন ?

টংকনাথ। হ্যাঁ, স্বকর্ণে। অপূর্ব।

প্রথম মোহন্ত। আপনি ধন্য। আমাদের কি করতে হবে।

টংকনাথ। কিছুই না। এখুনি মাঠটাকে ঘিরে ফেলছি। দুটো গেট থাকবে। আপনারা গেটের সামনে অভয়মুদ্রা করে বসে থাকবেন, আর মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবেন। বাস্, আর কিছু করতে হবে না। [মাধবকে] মাঠটা ঘিরতে কতক্ষণ লাগবে হে ?

মাধব। ঘণ্টা-দুয়েের মধ্যে হয়ে যাবে। অনেক লোক লাগিয়েছি।

[জন-মজুরের দল পুনঃ প্রবেশ করল]

প্রথম মজুর। হুজুর, মাঠ ঘেরা যাবে না।

মাধব। যাবে না ? যাবে না কেন ?

দ্বিতীয় মজুর। বাঁশ পুঁতব কি ক'রে ? গর্ত খোঁড়া যাচ্ছে না।

তৃতীয় মজুর। পাথরের চেয়েও শক্ত।

চতুর্থ মজুর। আমি জোর করে খুঁড়তে গেলুম। আগুন ছিটকে বেরুল।

প্রথম মজুর। দেবতার ইচ্ছে নয় যে, এখানে বেড়া হয়। আমরা চললুম।

[মজুররা চলে গেল]

টংকনাথ। এ কি কাণ্ড ! চল, চল, দেখি—

[সকলে চলে গেল। চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক প্রবেশ করলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। তুমি অধীর হ'য়ো না।

পঞ্চম শিক্ষক। না, অধীর হব না। অধীর হবার শক্তি আমাদের নেই। আমরা অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অত্যন্ত সমঝদার জাত। প্রতি পদে হিসেব করে চলি কি করলে আমাদের স্বার্থরক্ষা হবে। কিন্তু [হঠাৎ অসহায়ভাবে] চেহারাটা ভুলতে পারছি না ভাই। জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, ঘাড়টা কাৎ হয়ে গেছে এক দিকে। ঝুলছে, দুলছে···[ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত] যাবার আগেও আমার জন্যে টাকা রেখে গেছে। নগদ এক হাজার টাকা। এই যে—[পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে] করকরে নগদ এক হাজার টাকা। চিঠি-খানাও অদ্ভুত। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু অদ্ভুত [পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়লেন] বাবা, আর পারলুম না, যাচ্ছি। ক্ষমা কোরো। [হঠাৎ হা হা করে হেসে] আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে ! আমার কাছে, আমার কাছে ! হা-হা-হা-হা। আমার কাছে ! [হঠাৎ থেমে গেলেন। ভ্রূতে কুঞ্চন রেখা দেখা দিল] ওর মৃত্যুর জন্যে কে

দায়ী জান ? তুমি ! ও যখন নিষ্পাপ ছিল তখন ও তোমার ছেলে দুলালকে ভালো-বেসেছিল। আমাকে বলেছিল বাবা দুলালের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। কিন্তু হ'ল না। রঘুনন্দন, মনু, চণ্ডীমণ্ডপের পাণ্ডারা, তোমার পিসি, আমার শালারা, এই অভিশপ্ত প্রেতপুরীর লক্ষ লক্ষ প্রেত, ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বিয়ে হ'ল না। তুমি বলেছিলে কুষ্ঠি মিললে বিয়ে দেবে, কিন্তু সেটা ছিল তোমার ছলনা। তুমি চাইছিলে পণ, তুমি জানতে আমি গরীব, পণ দিতে পারব না, তাই মিছে কথা বললে, কুষ্ঠি মেলে নি। তারপর থেকেই আমার মেয়ে পা বাড়াল বিপথে, আর তোমার ছেলে ধরল মদ। আজ আমার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তোমার ছেলে পড়ে আছে নর্দমায়। আমাদের গতি কি হবে ? রৌরব, না, কুম্ভীপাক ? না, আরও ভীষণ কিছু ?

চতুর্থ শিক্ষক। যা হবার তা হয়ে গেছে ভাই। অধীর হ'য়ো না। অধীর হয়ে লাভ কি !

পঞ্চম শিক্ষক। না, অধীর তো হইনি। আমি অতি-স্থির-চিত্তে এই মহা-আবির্ভাবের কাছে নগ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছি শাস্তির জন্যে। এই মহাবিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে এসেছি, আমি মহাপাপী, আমাকে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও, শাস্তি দাও—

[মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল]

উদাত্ত কণ্ঠ। শাস্তি দেবার বা ক্ষমা করবার অধিকার আমার নেই। কারো নেই। তোমার মনে সত্যিই যদি অনুতাপের আগুন জ্বলে থাকে তা হলে সেই আগুনেই তোমার সব পাপ পুড়ে যাবে। শুদ্ধ হবে তুমি। এ পাপ তোমার একার নয়, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত বহুজনের পাপ। অম্লান ফুলের মতো মেয়েদের তোমরা পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করে চলেছ যুগ যুগ ধরে। স্তূপীকৃত শবদেহের হিমালয় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে, অনুতাপের আগুনেই তা ভস্মীভূত হবে। অনুতাপ করো। পোড়ো, পোড়ো। পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হও। তারপর রুখে দাঁড়াও, বিদ্রোহ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

[উদাত্ত কণ্ঠ থেমে গেল]

পঞ্চম শিক্ষক। ওঃ ওঃ ওঃ—

[মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। হন্তদন্ত একটি যুবক প্রবেশ করল]

যুবক। একি ! আপনি এখানে কি করছেন। বাড়িতে পুলিশ এসে গেছে, চলুন, চলুন।

[পঞ্চম শিক্ষক দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। ওঠ, ওঠ, চল বাড়ি চল।—

[দুজনে ধরাধরি করে পঞ্চম শিক্ষককে অতি কষ্টে নিয়ে গেলেন। দূর থেকে কলরব ভেসে আসতে লাগল। বোঝা গেল মন্দিরের ওপারের মাঠে জনসমাগম হয়েছে। 'জয় বিবেকানন্দের জয়' ধ্বনিও শোনা গেল কয়েকবার। শঙ্খধ্বনিও। আলোক সদলবলে আবার 'প্রভুমীশমনীশ' গাইতে গাইতে প্রবেশ করল। তার গান শেষ হতে না হতেই উদভ্রান্ত টংকনাথ প্রবেশ করলেন]

আলোক। সত্যিই মাঠ ঘিরছেন নাকি। অনেক লোক তো এসে গেছে।

টংকনাথবাবু। খুঁটি পোঁতা যাচ্ছে না। সব শাবল ভোঁতা হয়ে গেছে।

আলোক। মন্দিরের দিকে চেয়ে দেখুন। কি সুন্দর!

টংকনাথ। [চেঁচিয়ে উঠলেন] ও মন্দির নয়, আগুন। জ্বলন্ত আগুন। এ আগুন আমি নিবিয়ে তবে ছাড়ব। আমার নাম টংকনাথ। আমার কাছে চালাকি—

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। আমি দমকলে খবর দিয়েছি, এখুনি এসে পড়বে তারা—

আলোক। [ব্যাকুলভাবে] দেখুন, দেখুন মন্দির মিলিয়ে যাচ্ছে। এ কি হ'ল— এ কি হ'ল—

[সত্যিই মন্দির মিলিয়ে গেল। দেখা গেল মঞ্চের উপর স্বামীজি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি, দেখেই চিনতে পারা যায়। শ্রোতারা তাঁর পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর সামনে বিপুল জনতা।]

স্বামীজি। হে ভারবাহী পশুর দল, তোমরা জাগ, তোমরা ওঠ। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন তোমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখন চেষ্টায় তেজ নেই, উদ্যোগে সাহস নেই, মনে বল নেই, প্রাণে আশা নেই। আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতি-দ্বেষ, আছে দুর্বলের যেন-তেন-প্রকারেণ সর্বনাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্য-বস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মীতা কটু-ভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে। তোমরা পশু হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব মূর্চ্ছিত হয়ে আছে তাকে জাগাবার সময় এসেছে এইবার। ঘরে বাইরে চারিদিকে শত্রু। বীর্যবলে তাদের বিদলিত করতে হবে। জাগো ওঠ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হও। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় আত্মবলিদান দাও। শক্তি-পূজার মহা-নবমী সমুপস্থিত। রঘুনন্দন বলছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমং। তাই কর তোমরা। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে! নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে। তোমরা জাগো জাগো। নিজে জেগে সবাইকে জাগাও। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

[দূরে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল]

আলোক। [হঠাৎ টংকনাথের পা জড়িয়ে ধরে] ওদের যেতে বলুন, যেতে বলুন, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবেন না, আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবেন না।

[দমকলের ঘণ্টা আরও নিকটবর্তী হ'ল]

যবনিকা

গল্পগ্রন্থ

ছিটমহল

উৎসর্গ

সাহিত্যবন্ধু শ্রীমান মধুসূদন মজুমদার
কল্যাণীয়েষু

৩।৩।৬৫
কলিকাতা

নিবেদন

গত দুই বৎসরে বিভিন্ন পত্রিকায় যে গল্পগুলি লিখিয়াছি, 'ছিটমহল' গ্রন্থে তাহাই সংগৃহীত হইল।

বনফুল

৩।৩।৬৫
কলিকাতা

বিকট গর্জন ক'রে একটা 'বাস' দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সিংহ এসে গর্জন করলে বন্দুক বার করতুম, মানুষ এসে গর্জন করলে তাকে থামতে বলতুম, কিন্তু 'বাসকে' কিছু বলা যাবে না। সমানে গর্জন করতেই লাগল।

বিজ্ঞানের দাপটে মানব-সভ্যতাই বিব্রত হয়ে পড়েছে। আমার বুড়ো মামাটা মরলে কিছু টাকা পাওয়া যেত, কিন্তু মামা মরবে না। এতো ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে যে মানুষের মৃত্যুর হারই না কি কমে গেছে। বুড়োরা আর মরছে না। পৃথিবীতে স্থানাভাবের খবর রোজই পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্যায় কাতর হ'য়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে জন্ম-নিরোধ-পন্থা বার করেছেন। তা যে মানবসভ্যতাকে আবার কি প্যাঁচে ফেলবে কে জানে। এমনি তো দেখছি যাদের জন্ম-নিরোধ করা উচিত তারা কিছু করছে না। করছে বড়লোকেরা বিলাস আর বদমায়েশির সুবিধা হবে ব'লে। কিছুদিন থেকে ষণ্ডাকৃতি নিঃসন্তান, বা কম-সন্তান মহিলারা সমাজের উপর যে ছায়াপাত করেছেন, তাতো আশঙ্কাজনক। বিজ্ঞানের কোনটাই বা ভালো। রেডিও হ'য়ে আমরা গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। রেডিওতে কোন বড় গুণী হয়তো গান গাইছেন বা বড় পণ্ডিত বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমরা রেডিও খুলে তার সামনে বসে হাসাহাসি গাল-গল্প করছি। তাঁদের গান বা বক্তৃতা শুনছি না। যদি কষ্ট ক'রে তাঁদের নাগাল পেতে হ'ত তাহলে কি আমরা এ বেয়াদপি করতাম? ফোনের কথাই ধরুন। স্বস্তিতে বসতে দেয় কি? ফোন বাজলেই 'হ্যালো' বলে সাড়া দিতেই হবে। রামা শ্যামা যেই হোক, সে ফদর ফদর ক'রে যত বাজে কথা বলুক আপনাকে শুনে যেতে হবে। ফোনের দাপটে বিশ্রাম, শান্তি সব বিসর্জন দিতে হয়েছে আমাদের। ট্রেন, ট্রাম, মোটর আমাদের সুখ-সুবিধার চেয়ে অসুখ-অসুবিধাই বেশী করেছে সব খতিয়ে যদি দেখা যায়। আগে যাঁরা হেঁটে তীর্থে যেতেন তাঁরা যে মনোভাব নিয়ে যেতেন এখন আমরা তা যাই কি? আমাদের ক্রমশ অমানুষ করে ফেলছে এই যন্ত্রগুলো। সব আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে বলে আমরা নিষ্ঠা ভুলেছি, তপস্যা ভুলেছি। তপস্যা করি এখন টাকার। এরোপ্লেন? এরোপ্লেন আমাদের আব্রু নষ্ট করেছে, শান্তি হরণ করেছে, আমরা সর্বদা সশঙ্কিত হয়ে আছি আকাশ-পথে ওই বুঝি শত্রু এসে মাথার উপর বোমা ফেলল। পারমাণবিক বোমার কথা শুনলে তো পেটের মধ্যে হাত পা সেঁদিয়ে যায়। পরমাণু-বিজ্ঞান মানব-সভ্যতাকে শেষ পর্যন্ত যে কোন ভাগাড়ে নিয়ে যাবে কে জানে।

দুয়ারে কড়া নড়ল।

'স্বদেশ' কাগজের সম্পাদক গণেশ গুড়গুড়ি এসে প্রবেশ করলেন।

"কি গুড়গুড়ি মশাই, এত রাত্রে?"

"আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। চাকরিটা গেল। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এখন কি যে করব বুঝতে পারছি না।"

"কি রকম? হঠাৎ চাকরি গেল কেন?"

চীৎকার করে উঠলেন গুড়গুড়ি মশায়।

"প্রগতি, প্রগতি, বিজ্ঞানের প্রগতি। দুটো মেশিন বেরিয়েছে, নিউক্লিয়ার মেশিন। অদ্ভুত কাণ্ড দাদা। একটা মেশিনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা যা খুশি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে আধঘণ্টা বসে থাকুন। একটু পরেই ছোট একটি কার্ড বেরিয়ে আসবে, তাতে লেখা থাকবে 'চলতে পারে' কিংবা 'অচল'। আমি যে সব গল্প কবিতা এতদিন অমনোনীত করেছিলাম ওই মেশিন তার সবগুলোকে মনোনীত করেছে। দ্বিতীয় মেশিনটা আরও আশ্চর্যজনক। একগাদা ভুল প্রুফ ঢুকিয়ে দিন তার মধ্যে, বতাম টিপে দিন একটা, একটু পরেই সংশোধিত ছাপা প্রুফ বেরিয়ে আসবে। আমাদের মালিক ওই দুটো মেশিনই কিনেছেন আর আমাকে নোটিশ দিয়েছেন। কয়েকটি সাব-এডিটরেরও চাকরি গেছে। ওই মেশিন দুটোই এখন কাগজ চালাবে। আমাদের আর দরকার নেই। আমি এখন কি করি বলুন তো। আপনার তো পাটের ব্যবসা আছে, দিন না একটা কিছু জুটিয়ে—"

বললাম, "আমি পাটের ব্যবসা তুলে দেব ভাবছি। ওদেশে মেশিনে ওরা যে রকম আর্টিফিশ্যাল পাট তৈরি করছে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য আমার নেই।"

গুড়গুড়ি মশায় হুহু ক'রে কেঁদে ফেললেন। তাঁর আবক্ষ বিলম্বিত দাড়ি বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল।

"আপনিও ব্যবসা তুলে দেবেন ? তাহলে আমাদের আর রইল কি। যাই তাহলে অবিনাশবাবুর কাছে। শুনেছিলাম তিনি একজন অভিজ্ঞ 'টুকিয়ে'র সন্ধান করছেন। যে মেয়েটি তাঁর লেখা টুকত সে না কি প্রেম ক'রে সরেছে।"

বললাম, "অবিনাশবাবু আর 'স্টেনো' রাখবেন না, তিনি একটা টেপ রেকর্ডার কিনেছেন।"

"ও, তাই না কি ? তাহলে—"

কি বলব ভেবে পেলাম না।

গুড়গুড়ি মশায় ব্যায়ত আননে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এক্সচেঞ্জে একটা নাম লিখিয়ে রাখি। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

গুড়গুড়ি মশায় চ'লে গেলেন।

আমি কিন্তু হাঁপটি ছাড়তে পারলাম না। দুয়ারের কড়া আবার নড়ে উঠল। এই কড়া আর কলিং বেলও বিজ্ঞানের কীর্তি ! চারিদিকে বিজ্ঞানের দৌরাত্ম্য !

"আসতে পারি ?"

"আসুন, আসুন—"

বিজ্ঞানের অধ্যাপক কুলদাবাবু প্রবেশ করলেন।

"আরে মশায়, বিজ্ঞানের আর একটা অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শুনেছেন ?"

"সবই তো অদ্ভুত। কোনটার কথা বলছেন ?"

"'ফেরি' বলে যন্ত্রটার নাম শোনেন নি ? যন্ত্র নয়, মিরাক্‌ল্ ! দু-হাজার টাকার টিকিট কিনে সে যন্ত্রের মধ্যে আপনার কোনও মৃত আত্মীয়ের নাম লিখে ছেড়ে দিন সে যন্ত্রকে। যন্ত্র বোঁ ক'রে আকাশে উড়ে যাবে আর একদিন পরে আপনার মৃত আত্মীয়কে সশরীরে এনে হাজির করবে। একটা 'ফেরি'তে পাঁচজন আসতে পারে। মেশিনটার দাম দশ কোটি ডলার। এক হিসেবে সস্তাই বলতে হবে। বন্ধের একজন

বিজনেস ম্যাগনেট কিনে এনেছেন যন্ত্রটা। রোজ দশ হাজার টাকা কামাচ্ছেন। প্রফেসর গাউফক-রাউটন (Gowfok Routon) 'ফেরি'র সম্বন্ধে আজ বক্তৃতা দিচ্ছেন সায়ান্স কলেজে। যদি যেতে চান সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে, আমি সেখানেই যাচ্ছি—"

কুলদাবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে শ' পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। এখনও শোধ দেননি। মাঝে মাঝে এসে আমাকে নানা সভায় নিয়ে যেতে চান। একটু মাখামাখি ক'রে অন্তরঙ্গতা করবার চেষ্টা আর কি।

বললাম, "না, যাব না। শরীরটা ভালো নেই তেমন।"

কুলদাবাবু চলে গেলেন। পরমুহূর্তে চমকে উঠতে হল।

"কিরে হাবা, চিনতে পারিস" একি, কার কণ্ঠস্বর! আমি জ্যোতির্ময় পুরকায়স্থ, ছেলেবেলায় আমার ডাক নাম যে হাবা ছিল একথা তো বেশী লোক জানে না।

কাছে আসতে হকচকিয়ে গেলাম।

"কে, পাঁচা? তুই—"

"হ্যাঁ, বিশ বছর আগে হাতুড়ে রামু ডাক্তারের ইনজেকশনের খোঁচায় পটল তুলেছিলাম। 'ফেরি'র দৌলতে আবার সশরীরে ফিরে এলাম।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ বম্বে গিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তার পুরোনো স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে। আর ভয় নেই ব্রাদার, ইহলোক-পরলোকে 'ফেরি' চলতে শুরু করেছে। এবার সবাই ফিরে আসবে। মহাত্মা দুরাত্মা, সব!"

আমি নির্বাক হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম।

"একটু কিন্তু মুশকিলে পড়েছি ভাই। সাহায্য করবি?"

"কি সাহায্য?"

"কোথাও বাড়ি পাচ্ছি না। তোর তো প্রকাণ্ড বাড়ি। থাকতে দিবি কিছুদিন?"

"তোর স্ত্রী যে বাড়িতে থাকত, সেটার কি হল?"

"দু'বছর বাড়িভাড়া বাকি পড়াতে বাড়িওলা তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। ব্যাপার কি হয়েছিল শোন্ তাহলে। আমি মারা যাবার পর আমার স্ত্রী বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ক্রিশ্চান হয়ে মিস্টার গোমেসকে বিয়ে করেছিল। আমার চারটি মেয়ে হয়েছিল, গোমেসেরও চারটি হয়েছে। তারপর হল ঝগড়া। চুলোচুলি, লাঠালাঠি। ডিভোর্স হয়ে গেল শেষে। এরপর আমার স্ত্রীর মাথায় ব্রেন-ওয়েভ এল একটা। গয়না-গাঁটি বিক্রি ক'রে বম্বেতে গিয়ে আমাকে আবার স্মরণ করলেন তিনি। না ক'রে করবে কি, আটটা মেয়ে নিয়ে সে প্র্যাকটিক্যালি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। আমি এসে পড়লুম। সব দেখে শুনে তো ভাই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়েছে। কিন্তু আফটার অল, আমি ভাই ভদ্রলোক, যার সঙ্গে একদিন সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলাম তাকে রাস্তায় ফেলে তো পালাতে পারি না। তুই অন্তত মাসখানেক আমাকে থাকতে দে। আমি যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি ইতিমধ্যে।"

বললাম, "এক হিসেবে তুই তো রেফিউজি। রেফিউজি ক্যাম্পে চলে যা না।"

"আমি আর কোথাও যাব না। এইখানে বসলুম।"

এই বলে সে আমার সোফায় বসে পড়ল।

"ওগো তোমরা চলে এসো না। হাবা আমার বাল্যবন্ধু—"

পাঁচু-গৃহিণী আটটি মেয়ে নিয়ে প্রবেশ করলেন। আমি ঘামতে লাগলাম। বুকের ভিতর কেমন যেন একটা যন্ত্রণাও হতে লাগল।

ভগবান কিন্তু দয়া করলেন। যন্ত্রণার অবসান হল। ঘুমটা ভেঙে গেল।

আর একটা কথা

'খুব সাজগোজ করেছ দেখছি। সোনালি রোদের পটভূমিকায় চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু কোথা যাচ্ছ জান?'

'না সে কথা তো ভাবিনি। তুমি জেনেছ না কি, তোমার তো জানা উচিত। এ পথে তুমিই তো আগে এসেছ, আমি তো এই সবে বেরুলাম। বেরুতে হয় তাই বেরুলাম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তাতো জানি না। সত্যি বলতে কি জানবার ইচ্ছাও নেই তেমন। আমি যে রূপ আর রঙের বাহারে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে সুরভির পশরা নিয়ে সবার দৃষ্টির সামনে আসতে পেরেছি এইই যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। চলছি সামনের দিকে। কোথায় গিয়ে পেঁছিব জানি না। তুমি জেনেছ না কি।'

'মনে হচ্ছে জেনেছি। কিন্তু সে কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে কথাটা পেড়েই ভুল করেছি।'

'কেন?'

'তুমি যে নূতন। তোমাকেও একদিন বিবর্ণ পুরাতনের দলে গিয়ে ভিড়তে হবে এ কথা এখন নাই শুনলে—'

আকাশে প্রকাণ্ড একটা সাদা মেঘ ভাসছিল বিরাট একটা দৈত্যের মতো। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত দৈত্যটা যেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পৃথিবীর দিকে। মনে হ'ল তার মুখে যেন একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল ঐকথা শুনে।

'শুনলেই বা। যাত্রাপথের শুরুতেই জেনে রাখা ভালো কোথায় যাচ্ছি।'

'আমাকে দেখলেই আন্দাজ করতে পারবে খানিকটা। তোমার মতো আমারও রূপ ছিল একদিন, আমিও একদিন বর্ণের হিল্লোলে মদিরতা বিকীর্ণ করেছি, আমার সৌরভ আর মধুও একদিন পাগল করেছিল কত মধুকরকে। কিন্তু আজ আমার দিকে দেখ।'

'দেখছি তো। তোমার বেশ-বাস বিস্রস্ত, মলিন, শিথিল। কিন্তু মুখের হাসি তো কমেনি। তাই মনে হচ্ছে আমারই স-গোত্র তুমি। আমাদের মুখের হাসি কখনও মুছে যায় না। কিন্তু সত্যই কি তুমি জেনেছ এ যাত্রার শেষ কোথায়? আমাকে বল না।'

'শেষ মরণে। মরণেরই ছায়া নেমেছে আমার সর্বাঙ্গে। কাল আর আমি থাকব না, অবলুপ্ত হ'য়ে যাব।'

'আমারও ওই পরিণাম?'

'সকলেরই।'

সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলটির মুখে শঙ্কার ছায়া নামল।
ভীত কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল মরণোন্মুখ ফুলটির দিকে।

পরদিন।

খুব ভোরে পূর্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। গান ধরেছে 'সদ্য-জাগ্রত' পাখীরা। আলোর আভাসে আর গানে চতুর্দিক পরিপূর্ণ।

পুরাতন ফুলটির পাপড়ি একে একে ঝরছে। তখনও কিন্তু তার মুখ-ভরা হাসি। নূতন ফুলটিকে সে যাবার সময় ডাক দিয়ে বলে গেল—ভয় পেও না। পূর্বাকাশে ওই দেখ মরণ এসেছে। দেখ, দেখ, কি অপরূপ সে। আজ আর একটা কথা জেনেছি, কাল সেটা জানতাম না। এই মুহূর্তে বুঝলাম এই শেষ নয়, আর একটা শুরু। ওই উষা-রঞ্জিত আকাশ আমার নব যাত্রাপথের স্বর্ণ-তোরণ। চললাম নূতন পথে।'

শেষ পাপড়িটি ঝ'রে গেল।

মনু

রমেন যখন শ্মশান থেকে ফিরল তখন অনেক রাত হয়েছে। পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। রমেনের মনে হ'ল, মা ঘুমিয়েছে কি ? কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত বাড়িটাই যেন মূর্তিমান শোকের মতো মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। বাড়িরও কি শোক হয় ? আমাদের মতো তারও কি সুখ দুঃখ আছে ? তার মা-হারা মেয়ে মনুই তো বাড়িটার প্রাণ ছিল। মনু আজ চলে গেল। বাড়িটাও কি প্রাণহীন হ'য়ে গেল সে জন্য ? এই ধরনের খাপছাড়া একটা চিন্তার ঝড় বয়ে গেল রমেনের মনে। বাইরেও একটা খাপছাড়া গোছের ঝড় উঠল। সামনের বাগানের গাছগুলোর ডালপালা সহসা আকুল হয়ে হাহাকার করতে লাগল যেন। ওরাও তো চিনত মনুকে।

…রমেন আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উঠল। যেন চোর। বারান্দায় একটা হাতলহীন চেয়ার ছিল। তার উপরই বসল সে নিঃশব্দে। তারপর পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে দিলে। পকেটে হাত ঢুকিয়েই বসে রইল সে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল চিতার ছবিটা। মনুর চিতার নয়। মনুর ছোট্ট দেহ, ছোট্ট চিতা, বেশীক্ষণ সময় লাগেনি, অন্ত্যেষ্টিতেও বিশেষ সমারোহ হয়নি—সেটার কথা মনে হচ্ছিল না রমেনের। সে কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টাই করছিল সে। আর একটা চিতার কথা মনে হচ্ছিল তার। ধনী জমিদার মহাজন এবং ব্যাংকার সুখলাল শেঠের চিতার ছবিটাই মনে ফুটে উঠছিল তার। সুখলাল শেঠও আজই মারা গেছেন। চন্দনকাঠ আর ঘি দিয়ে পোড়ান হয়েছিল তাঁকে। সঙ্গে তিন দল কীর্তনীয়া এসেছিল। সরগরম হয়ে উঠেছিল শ্মশান। সুখলাল শেঠ কিন্তু যখন চিতায় উঠলেন, তখন আর পাঁচজনের মতোই উঠলেন। উলঙ্গ, নিরলঙ্কার। হাতে সামান্য আংটিটি পর্যন্ত ছিল না। এইটে খুব ভালো লেগেছিল রমেনের। এইটে যেন তার মনে জোর যোগাচ্ছিল। পকেটের ভিতর মুঠোটা শক্ত ক'রে বসে রইল রমেন।

…ঝড়টা যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ থেমেও গেল। হঠাৎ অনড় হয়ে গেল সামনের বাগানের গাছপালাগুলো। এতে রমেন ভয় পেল একটু। তার মনে হল গাছপালাগুলো অবাক হয়ে তাকেই দেখছে। অস্বস্তি হতে লাগল। গাছগুলোর হঠাৎ-থেমে-যাওয়া স্থির ভঙ্গী ক্রমশঃ অসহ্য মনে হতে লাগল তার। চোখ বুজে বসে রইল সে। চেষ্টা করতে লাগল সেই মহাশূন্যতার মাঝে নিজেকে নিয়ে যেতে যেখানে ইহজগতের কোন রকম স্পন্দন পৌঁছয় না। এতে সে ঠিক কৃতকার্য হ'ল কি না তা বলা শক্ত। কিন্তু সে পকেটের মধ্যে হাতটা মুঠো ক'রে চোখ বুজে বসে রইল।

…অনেকক্ষণ বসে ছিল। যখন চোখ খুলল তখন চাঁদ উঠেছে। সামনের বাগানের গাছগুলোর সে উৎসুক, অবাক, হঠাৎ-থেমে-যাওয়া ভাব আর নেই। তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। রমেনের মনে হ'ল ব্যঙ্গের হাসি। তার ভয় ঘুচল খানিকটা। হোক ব্যঙ্গের হাসি, তবু হাসি তো। এর পরই কিন্তু যা ঘটল তাতে চমকে উঠল রমেন। ভয়ানক চমকে উঠল। চাঁদ উঠেছিল বলে সামনের বাগানের এক কোকিল তাকে অভ্যর্থনা জানাল—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু। কিন্তু রমেনের মনে হল যেন বলে উঠল—উহু, উহু, উহু, উহু। ভয়ানক কথা! এর ঠিক পরেই রমেন যা দেখল তা-ও ভয়ংকর। জ্যোৎস্নার একফালি আলো এসে পড়েছিল গোয়ালের সামনে। রমেনের মনে হ'ল, জ্যোৎস্নার স্বল্পালোক সত্ত্বেও সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল একটি ছোট মেয়ে গোয়ালের সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল খিড়কি দুয়ারের দিকে। তারপরই বাগানের সব পাখীগুলো ডেকে উঠল একসঙ্গে। যেন বলে উঠল—হয়েছে, হয়েছে, মজাটা খুব জমেছে এইবার। পাখীর ডাকে রমেন এসব কথা শুনল কি ক'রে! আশ্চর্য! কিন্তু স্পষ্ট শুনল সে। বজ্রাহতবৎ বসে রইল।

…একটু পরে আবার সংবিৎ ফিরে এল তার। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগল। ঘরের ভিতর তার মা কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন। মনুর গলা কি? পরমুহূর্তেই তার মা কপাট খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

"মনু, মনু, শোন, কোথা গেলি! ফিরে আয়।"

বারান্দায় বেরিয়েই রমেনকে দেখতে পেলেন তিনি।

"তুই কখন ফিরেছিস? আশ্চর্য কাণ্ড বাবা, মনু এখুনি এসেছিল। সে বললে, ঠাকুমা তুমি আমার হাতের বালা দুটো খুলে নিতে বারণ করেছিলে। ওরা কিন্তু খুলে নিয়েছে। সত্যি খুলে নিয়েছিস?"

রমেন কোন উত্তর দিতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল চেয়ার থেকে। আলগা হ'য়ে গেল হাতের মুঠো। পকেট থেকে সোনার বালা দুটো বেরিয়ে পড়ল।

মুণ্ড সমস্যা

॥ ১ ॥

ফুটকা গ্রামের দারোগা সর্বেশ্বর প্রসাদ বিরাট একটা চুরির তদন্ত শেষ ক'রে ভেবেছিলেন একটু আনন্দ করবেন। কিন্তু ভগবান তাঁর অদৃষ্টে সেদিন সুখ লেখেন নি। সর্বেশ্বর ঠিক করেছিলেন শিকারে যাবেন। ছোট দারোগাকে ডেকে তিনি বললেন, "ওহে বড়বাবু, আজ আমাকে একটু ছুটি দেবে?" ছোট দারোগাকে তিনি বড়বাবু বলে ডাকতেন। ছোট দারোগা মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন সর্বেশ্বর বাবুর দিকে।

"কোথাও যাবেন না কি?"

"হ্যাঁ, শিকারে। মাত্র একরাত্রি বাইরে থাকব। শুনছি 'মেঝেন' নদীর ধারে যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা আছে তার ঠিক নীচেই একটা বাঘ রোজ জল খেতে আসছে। বোংগা সর্দার খবরটা পরশুই দিয়ে গেছে আমাকে। ভাবছি আজই শার্দুল-প্রবরের সঙ্গে মোলাকাত করব। ভোরের দিকে আজ চাঁদও উঠবে। ভাবছি ওই অশ্বত্থ গাছেই রাতটা কাটাব!"

"একলাই যাবেন?"

"দোকলা নিয়ে শিকার হয় না। বোংগা হয়তো আসবে। ওর দোষ বড্ড বেশী ফিসফিস করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা বলে।"

তারপর একটু হেসে বললেন, "তুমি ফৈজু গাড়োয়ানটাকে খবর পাঠিয়ে দাও। সন্ধের সময় যেন গাড়িটা নিয়ে আসে তার। আমার বাইকটার চাকা দুমড়ে গেছে কাল—"

"আচ্ছা—"

এমন সময় চৌকিদার এসে খবর দিল—"পুকুরধারে একটা মড়া প'ড়ে আছে হুজুর। কে যেন ছুরি মেরে গেছে। মুণ্ডটাও নেই।"

বাঘ-শিকার মাথায় উঠল।

সর্বেশ্বর প্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠে ছুটলেন পুকুরের দিকে। গিয়ে দেখলেন বিরাট লাসটা পড়ে আছে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। পিঠের উপর একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ হ'য়ে আছে, মাথাটা নেই। সর্বেশ্বর প্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মনে হ'ল যদিও মুণ্ডটা নেই, তবু যেন লোকটাকে চিনতে পারছেন একটু একটু। তাঁর সঙ্গে দু'জন কনেস্টবল গিয়েছিল। তাদের একজনকে বললেন, "ডান হাতটা তোলো তো।"

ডান হাতটা তুলতেই সর্বেশ্বর প্রসাদ ঝুঁকে দেখলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

"বাঁ হাতটা তোল।"

আবার ঝুঁকলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। ঝুঁকেই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"যাক্, পেয়ে গেছি।"

উল্কি দিয়ে লেখা 'আলিজান' নামটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই আলিজানকে অনেক দিন থেকেই খুঁজছিলেন তিনি। যোগেন গোয়ালার কুমারী মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিল লোকটা মাসখানেক আগে। সর্বেশ্বর প্রসাদ একটু দুঃখিত হলেন। আলিজানের মৃত্যুর জন্য নয়। আলিজানকে তিনি যদি জীবন্ত ধরতে পারতেন তাহলে তাঁর চাকরিতে কিছু উন্নতি হতো। এখন হবে না। যে লোকটা ওকে খুন করেছে তাঁর মতে সে একটা সৎকার্যই করেছে। আলিজান একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ছিল। কিন্তু আইন সে কথা শুনবে না। আইনের চক্ষে এ ধরনের সৎকার্যও খুন ব'লে গণ্য হবে। খুনী ধরা পড়লে বিচারে তার ফাঁসীও হবে হয়তো।

লাশটাকে সদর হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে আবার থানায় ফিরলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। গিয়ে শুনলেন আর একটা খুনের খবর এসেছে।

"আর একটা ?"

"জি হুজুর। এটা মেয়েছেলে। মণিবাবুর বাগানে প'ড়ে আছে, হুজুর।"

আবার যেতে হ'ল সর্বেশ্বর প্রসাদকে।

বাগানটা পুকুরের পাড়ে। বাগান পুকুর দুইই মণিবাবুর। সর্বেশ্বর গিয়ে দেখলেন এ মেয়েটা চিৎ হয়ে আছে। এরও বুকে ছোরা বেঁধানো। তিনি যোগেন গোয়ালাকেও থানায় ডেকে পাঠালেন। আর যে ক'টা দাগী গুণ্ডা ছিল ও অঞ্চলে তাদের গ্রেফতার ক'রে আনতে হুকুম দিলেন। এই রুটিন। মণিবাবুকেও ডাকতে হ'ল, কারণ তাঁর বাগান এবং পুকুরের ধারেই লাশ পাওয়া গেছে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যা পাওয়া গেল তা-ও একটু বিস্ময়জনক। আলিজানের রিপোর্টটাই বেশী বিস্ময়জনক। আলিজানের মুণ্ডটা না কি কোনও শাণিত অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়নি। মুচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। আলিজানের মতো তাগড়া লোকের মুণ্ডটা ছিঁড়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিপোর্টটা পড়ে সর্বেশ্বর হাসলেন একটু। তারপর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন।

"মানুষের মুণ্ড কি ছিঁড়ে নেওয়া সহজ ডাক্তারবাবু! ও কি ফুল, যে টপ ক'রে ছিঁড়ে নেবে কেউ ?"

"আমি তো তা বলিনি কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। ওখানকার মাস্‌ল্‌, নার্ভ, আর্টারি, ভেন্‌, হাড় দেখে মনে হ'ল শার্প ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দিয়ে কাটা হয়নি। মনে হয় কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। অবশ্য ব্লাণ্ট (blunt) কোন ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দিয়ে ওরকম হ'তে পারে। যেমন ধরুন, লোহার ডাণ্ডা, বা হাতুড়ি। খোঁজ করে দেখুন, আমার যা মনে হয়েছে তাই লিখেছি। আপনার থিয়োরি কি—"

সর্বেশ্বর প্রসাদ বললেন, "মেয়েটা যোগেন গোয়ালারই মেয়ে। যোগেন তাকে আইডেন্‌টিফাইও করেছে। আলিজান ওকেই নিয়ে পালিয়েছিল। সুতরাং মনে হয় আলিজানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এ কাজ করেছে।"

"সম্ভবত।"

ডাক্তারবাবুর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার খুব ঝোঁক। তাঁর মনে হ'ল শার্লক হোমস, পইরো বা চেস্টারটনের সেই পাদরী ডিটেকটিভ থাকলে এ সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারত। এরা কি পারবে ?

বললেন "কোন ভালো ডিটেকটিভকে খবর দিন—"

"দিয়েছি। মুশকিল হয়েছে ক্ষুরধারবাবু বিলেতে গেছেন।"

"ক্ষুরধারবাবু আবার কে?"

"তিনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্রফেসারি করেন। অঙ্কের প্রফেসার। তিনি অনেক সময় আমাদের অনেক সমস্যা সমাধান ক'রে দেন।"

"ক্ষুরধার? নাম শুনিনি তো!"

"ওইটে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছেন। তাঁর আসল নাম মুকুল দত্ত।"

"ও মুকুল দত্তের নাম শুনেছি বই কি! খুব বিদ্বান লোক। তাঁর এ শখও আছে না কি?"

"খুব। ফুলবিবি মার্ডার কেসটার 'ক্লু' তো তিনিই ব'লে দিয়েছিলেন।"

"তাঁকে চিঠি লিখুন।"

"আজই লিখব।"

॥ ২ ॥

পুলিসের তদন্ত-বিভাগে যত রকম কৌশল এবং অস্ত্র ছিল সবই ব্যবহৃত হল একে একে। শেষপর্যন্ত দুটো কুকুরও এল। কিন্তু খুনের কোনও কিনারা হ'ল না। ক্ষুরধার বিলেত থেকে চিঠি লিখলেন ঃ

প্রিয় সর্বেশ্বরবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আপনি যে সব খবর পাঠিয়েছেন তা অধিকাংশই বাজে খবর। আসল দুটি দরকারি খবর দেননি। মেয়েটির সম্বন্ধে আরও খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখছি—আলিজানের মুন্ডের ক্ষতটা clean cut নয়। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করেছেন কেউ যেন মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। রেললাইনে কাটা পড়লে অনেক সময় ওই রকম হয়। হ'তে পারে, আলিজানের পিঠে ছুরি মেরে প্রথমে তাকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তাকে রেললাইনের উপর ফেলে রেখে আততায়ীরা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার উপর দিয়ে ট্রেন চ'লে গিয়ে মুন্ডটা যখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তখন তারা ধড়টাকে এনে পুকুরপাড়ে ফেলে পালিয়েছে। উদ্দেশ্য পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। আপনি বলতে পারেন রেলে কাটা পড়লে কি রেলের ড্রাইভার জানতে পারত না? সে কি কোন খবর দিত না? দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকালকার ড্রাইভারদের ব্যাপার দেখছেন তো কাগজে। রোজই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। সবাই প্রায় অমনোযোগী। তাছাড়া গভীর রাত্রে স্টেশন থেকে দূরে যদি কোন লোকের গলাটি শুধু রেলের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে ড্রাইভার অনেক সময় টেরও পায় না। সুতরাং কাছে-পিঠে রেললাইনের ধারে খোঁজ করুন, কোন মুন্ড পাওয়া যায় কি না। যদি না পাওয়া যায় তাহলে ধ'রে নিতে হবে হয় যারা খুন করেছে তারা মুন্ডটা সরিয়েছে, কিংবা কোন জন্তুজানোয়ারে সেটা নিয়ে গেছে। মুন্ড যদি না পাওয়া যায় তাহলে আর একটা সম্ভাবনার কথাও মনে রাখবেন। হত্যাকারীরাই যদি মুন্ড সরিয়ে থাকে তাহলে কেন সরিয়েছে এ প্রশ্নটারও মীমাংসা করতে হবে। খুব সম্ভবত

প্রতিশোধ কামনা। ছিন্নমুণ্ড হয়তো উপহার দিয়েছে কাউকে। মেয়েটির সম্বন্ধেও কিছু অনুসন্ধান করবেন। আপনি লিখেছেন মেয়েটির বিবাহ হয়নি। জানা দরকার তার অন্য কোনও প্রণয়ী ছিল কি না। মনে রাখবেন এটা খুব দরকারী খবর।

আমার দেশে ফিরতে এখনও দেরি আছে। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

ক্ষুরধার

সর্বেশ্বর প্রসাদ রেললাইনের আশপাশে অনেক খোঁজ করালেন, কোনও মুণ্ড পাওয়া গেল না। যোগেন গোয়ালার মেয়ের সম্বন্ধেও যে সব খবর পেলেন তার একটিও আশ্বাসজনক নয়। প্রত্যেকেই বলল, মেয়েটি খুব ভালো ছিল। গুণ্ডা তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার কোনও দোষ ছিল না। সর্বেশ্বর প্রসাদ সন্দেহবশত যাদের গ্রেফতার করেছিলেন তাদের ছেড়ে দিতে হ'ল একে একে। ব্যাপারটা ক্রমশ ধামা-চাপা প'ড়ে গেল।

এইবার সর্বেশ্বর প্রসাদ একদিন ঠিক করলেন মেঝেন নদীর ধারে যে বাঘটা জল খেতে আসছে রোজ রাত্রে, তার সঙ্গে একবার মোকাবিলা করবেন।

সেদিনও ভোর রাত্রে চাঁদ ওঠবার কথা। নদীর ঠিক ধারেই যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা আছে, সন্ধে থেকেই সেখানে গিয়ে বসতে হবে। বোংগা সর্দার কদিন আসেনি। তবু তাকে খবর পাঠালেন যে তিনি সন্ধের পরই সেখানে পৌঁছবেন। সে-ও যেন আসে।

॥ ৩ ॥

ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটার ঘন পত্রগুচ্ছের আড়ালে নিস্পন্দ হ'য়ে বসেছিলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। বোংগা আসেনি। বোংগা সাঁওতাল, তাঁর খুব বাধ্য। সে না আসাতে একটু অবাক হয়েছিলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। একটু পরেই অন্ধকারকে স্পন্দিত করে শুরু হ'ল ঝিল্লীধ্বনি। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে ঝাঁঝর বাজাচ্ছে কে যেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে এই একঘেঁয়ে একটানা শব্দ শুনতে লাগলেন সর্বেশ্বর। শিকার করতে হ'লে ধৈর্য চাই। একটু পরে একটু বৈচিত্র্য এল। কোঁক্ কোঁক্ ক'রে শব্দ হ'তে লাগল একটা। সর্বেশ্বর ভাবলেন সাপে বোধহয় ব্যাং ধরেছে। তিনি পক্ষীতত্ত্ববিদ্ হলে বুঝতে পারতেন ওটা একরকম প্যাঁচার ডাক। ছোট ছোট কুটুরে প্যাঁচা। খানিকক্ষণ এই ডাক চলল। তারপর থেমে গেল। তারপর একদল তীক্ষ্ণকণ্ঠ ঝিল্লী আসরে নামল। তাদের স্বর অনেকটা সানাইয়ের ছোট ছোট আওয়াজের মতো। মনে হয় অন্ধকারের গায়ে যেন ছুরি মারছে। তারপর হু হু ক'রে হাওয়া উঠল একটা। আকুল হয়ে উঠল অশ্বত্থ গাছের ডালপালাগুলো। তারপর হঠাৎ থেমে গেল হাওয়াটা। মনে হ'ল প্রকৃতি হঠাৎ যেন থমকে গেল, কি যেন মনে পড়ে গেল তার। তারপর এল গোটাকয়েক বাদুড়, গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল। সর্বেশ্বর বাবুর একটু একটু গা ছমছম করছিল। কিন্তু সহসা চমকে উঠলেন। গাছের উপরে কারা যেন কথা বলছে!

"ভাই ফতিমা, আলিজানকে তোমার এতো ভালো লেগেছে কেন বল তো।"

"ওই আলিজান নামটার জন্যেই প্রথমে তাকে ভালো লাগে। ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাস পড়েছিলাম যে! ফতিমা-আলিজানের গল্প পড়নি তুমি? সেই যে কাঠুরে—"

"না। আমি কোন বইই বিশেষ পড়িনি। আমি তোমাকে দেখেই পাগল হয়েছি ফতিমা। কিন্তু তুমি তো আমার দিকে একবারও ফিরেও চাইছ না ফতি। আলিজান যখন তোমাকে ফেলে ওই গয়লানী মেয়েটাকে নিয়ে পালাল তখন তুমি গলায় দড়ি দিলে। আমিও দিলুম। তারপর থেকে সর্বদাই তোমার পিছু পিছু ঘুরছি। তুমি বলেছিলে ওদের শাস্তি দিতে, তা-ও দিয়েছি। তুমি বলেছিলে আলিজানের মুণ্ডটা তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে হয়েছে, তোমার সে ইচ্ছাও পূর্ণ করেছি। মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তোমার কবরখানায় রেখে এসেছি। কিন্তু তবু তো তুমি আমার দিকে ফিরে চাইছ না।"

"আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি আলির মুণ্ডটা আমার কবরে রেখে এসেছ বটে, কিন্তু তবু কোন আনন্দ হচ্ছে না। কবরে পড়ে আছে আমার ক'খানা হাড়। বুঝতে পারছি ওই হাড় আমি নই—"

"দেখ ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না—"

হঠাৎ উপরের ডালপালাগুলোতে ভীষণ আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেল। মনে হ'ল একটুকরো ঝড় যেন উপরের ডালগুলোকে ঝাঁকাচ্ছে।

সর্বেশ্বর প্রসাদ আর গাছে বসে থাকতে পারলেন না। দুড় দুড় ক'রে নেবে পড়লেন।

তার পরদিন সকালেই তিনি হোসেনপুর কবরখানায় গেলেন। গিয়ে দেখলেন সত্যিই একটা কবর থেকে খানিকটা মাটি যেন খোড়া হয়েছে। সেটা আরও খোঁড়ালেন তিনি। যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল। দেখলেন একটা কঙ্কাল একটা পচা মুণ্ডকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে আছে।

বোংগা সর্দার এসে বলল—ওই গাছটায় ক'দিন থেকে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে বলে তার বউ তাকে আসতে দেয়নি।

পোস্টকার্ডের গল্প

"তুমি আমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছ কেন। আমার বড় লজ্জা করে।"

"লজ্জা আবার কি। পর-স্ত্রীকে তো লিখিনি, নিজের স্ত্রীকেই লিখেছি।"

"রাণীর স্বামী তাকে চিঠি লেখে। কি সুন্দর খাম, কেমন রঙীন কাগজ, কেমন ভুরভুরে গন্ধ। সবুজ কালী দিয়ে কত বড় চিঠি লিখেছে দেখলুম।"

"তাতে কি হয়েছে। রঙীন খামে বড় চিঠি লিখলেই কি বেশী ভালোবাসা দেখানো যায়? পোস্টকার্ডেও সাঁটে অনেক কথা বলেছি আমি। তুমি হয়তো বুঝতে পার নি। পড় তো চিঠিটা—"

গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা হইতেছিল। যুবতী বধূ ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে পোস্টকার্ডটি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

"কল্যাণীয়াসু, তুমি মনে করছ অনেক দূরে চলে এসেছি। দুমকা আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর বটে। কিন্তু সত্যি কথা আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি ভালো করে খুঁজে দেখো। চাকরির চেষ্টায় বিদেশে বেরুতেই হবে, উপায় কি। এখনও কিন্তু চাকরি জোটাতে পারিনি। চাকরি যদি না-ও জোটে তবু তোমার জন্যে একটা কুলো আর একটা চুপড়ি কিনে নিয়ে যাব। এখানে দেখছি এগুলো তৈরি করে। আমার অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি"—

"কুলো আর চুপড়ি পছন্দ হয়েছে তো?"

"হয়েছে।"

আসল কথাটা সে কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিল না। গাড়ি ভাড়া, বাস ভাড়ার পয়সা রাখিয়া, হোটেলে খাইয়া, কুলো আর চুপড়ি কিনিবার পয়সা বাঁচাইয়া তাহার হাতে আর খাম কিনিবার পয়সা ছিল না। পোস্টকার্ড কিনিতেই সব পয়সা ফুরাইয়া গেল। একটা বিড়ি পর্যন্ত কিনিতে পারে নাই।

বৃন্ত-চ্যুত

নীল অপরাজিতা ফুলটি চোখ মেলেই দেখতে পেল আর একটি নীল স্বপ্ন তার সামনে হেলেছে দুলছে। তারপর সে স্থির হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর একটি কিশোরের মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের ভাষায় যে কথা সে বলল সে কথা চিরকাল সবাই বলছে।

বলল, "আমি তোমাকে চাই।"

শুধু বলল না, তার চাওয়ার আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল লতা-কুঞ্জে, সোনালি রোদে, পাখীর গানে, হাওয়ার হিল্লোলে। কে এই যাদুকর!

বিস্মিত অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি? আমাকে চাইছ কেন?"

"আমি আকাশ। আমারই আগ্রহ আজ মূর্তি ধরে কামনা করছে তোমাকে। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

"আমাকে চাইছ কেন?"

"তুমি যে নীল। আমার সঙ্গে তোমার মিল আছে। আমি মহাশূন্য, আমার রঙ্গিনী কেউ নেই। তুমি আমার সঙ্গিনী হবে চলো।"

"কিন্তু তুমি যে কত বড় আর আমি কতটুকু। আমি কি তোমার সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত?"

"আমি যে অনেক বড়, এইটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। আমার শূন্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার দোসর হতে পারে এমন কেউ নেই।"

অপরাজিতা সবিস্ময়ে চুপ করে রইল।

আকাশ আবার বললে, "অনেকে মনে করে সময়ও আমার মতো অনাদি অনন্ত। কিন্তু সেটা ভুল। সময় তোমাদেরই সৃষ্টি। আমারই মাপকাঠিতে তাকে তোমরা মাপ। সময় ব'লে আলাদা কিছু নেই, আমিই সময়। আমার শূন্যতায় সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের সমারোহ দেখতে পাও, কিন্তু তারা আমার আপনার লোক নয়। তারা পথিকের দল, আমি মহাশূন্য, আমার কেউ নেই, তুমি চল আমার কাছে—"

অপরাজিতা চুপ ক'রে রইল।

আকাশও তার মুখের দিকে চেয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "তুমি হয়তো ভাবছ সমুদ্রের কাছে কেন যাইনি। গিয়েছিলাম। সে বলে পৃথিবী ছেড়ে আমি তোমার কাছে যেতে পারব না। সে বলে, বাষ্প হয়ে রোজই তোমার কাছে যাচ্ছি তাতে তোমার মন ভরে না ? বললাম, না ভরে না। সে বাষ্প বৃষ্টি হয়ে আবার ফিরে আসে তোমার কাছে। আমি যেমন শূন্য তেমনি শূন্যই থাকি। সমুদ্রই আমাকে তোমার কথা বলেছে। চল, তুমি আমার সঙ্গে।"

"আমি কি ক'রে যাব—"

"এই যে রথ এনেছি তোমার জন্যে—"

হাত তুলতেই মূর্ত হ'ল রথ। অপূর্ব রামধনু-রঙে-রঞ্জিত শাদা মেঘের সুন্দর ফানুস একটি।

অপরাজিতা মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইল রথটির দিকে। এ যে কল্পনাতীত !

"এই রথে চড়ে কোথায় যাব ?"

"আমার কাছে। ওই দূরে অনন্ত আকাশে।"

"অতদূরে যেতে পারব কি ?"

"নিশ্চয় পারবে। আমার সঙ্গে যাবে তুমি। আমি তোমাকে অমরত্ব দান করব। চল।"

কিশোর বালক তখন হাত বাড়িয়ে ফুলটি তুলতে গেল। বৃন্তে টান পড়তেই আর্তস্বরে বলে উঠল অপরাজিতা—"পারব না, পারব না, পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারব না, বড্ড লাগছে ছেড়ে দাও।"

বৃন্ত-চ্যুত ফুল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তিনমুণ্ডী

তাহার সহিত আমার প্রথম দেখা বাজারে। মাংসের বাজার হইতে বাহির হইয়াই যেখানে চাল, ডাল, মশলা, ডিম, তরি-তরকারি প্রভৃতির একটা ছোটখাটো বাজার আছে তাহারই একধারে সে ছোট একটি ডালা লইয়া বসিত। ডালায় থাকিত ডিম। আমার ডিম-ওলা রহিম। ডিমের দরকার হইলে সোজা তাহার কাছেই যাইতাম। সে বাছিয়া, জলে ডুবাইয়া, যত্ন সহকারে ডিমগুলি মুছিয়া, ঠোঙায় পুরিয়া আমার গাড়িতে দিয়া আসিত। সুতরাং অপরের কাছে ডিম লইবার প্রশ্নই আমার মাথায় কখনও জাগে নাই। কিন্তু একদিন জাগিল। হঠাৎ অসময়ে বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। আমাদের তখন খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে। সকালে মাছ মাংস যাহা কিনিয়াছিলাম সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর নির্দেশে আবার বাজারে ছুটিতে হইল। তখন বেলা দুইটা। গিয়া দেখি মাছমাংসের দোকান উঠিয়া গিয়াছে। রহিমের দোকানও বন্ধ। মফঃস্বলে কলিকাতার মতো সবসময়ে মাছমাংসের দোকান খোলা থাকে না। মহামুশকিলে পড়িলাম। এমন সময় আমার পরিচিত একটি ঝাঁকা-ওলা কুলি খবর দিল—তিনমুণ্ডীর কাছে ডিম পাইতে পারি। তিনমুণ্ডী কে আবার ? রাবণের মাথায় দশটা মুণ্ড ছিল শুনিয়াছি। আজকালকার বাজারে একটা মুণ্ডকেই সামলাইয়া রাখা

কঠিন। তিনমুণ্ডী কোথা হইতে আসিল আবার? কুলিটা তখন ওই বুড়িটাকে দেখাইয়া দিল। দেখিলাম একটা মাংস-পিণ্ডের মতো বুড়িটা একধারে বসিয়া আছে। একমাথা তৈলবিহীন রুক্ষ চুল। ঘাড়টাও বাঁকা। মুখটা আকাশের দিকে উঁচু করা। কুলিটাই আমাকে তাহার কাছে লইয়া গেল।

"এই তিনমুণ্ডী ডাক্তারবাবুকে ডিম দে—" বলিয়াই ছোঁড়াটা সরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তুবড়ি ফাটিয়া গেল যেন! গালাগালির তুবড়ি! এত রকম দুর্বোধ্য, অশ্রাব্য, অশ্লীল গালাগালি এত দ্রুত উচ্চারিত হইতে কখন শুনি নাই। একটা বিরাট বিস্ফোরণ হইয়া গেল যেন। খানিকক্ষণ হতবাক হইয়া রহিলাম। গালাগালি শেষ করিয়া বুড়ি হাঁপাইতে লাগিল।

"আমাকে ডিম দে।—ক'টা আছে?"

"সতেরোটা আছে।"

"সবগুলোই দে। ভালো তো ডিমগুলো?"

"সে কথা মুর্গীদের জিগ্যেস কর গে যাও। আমি জানব কি ক'রে। ভালো মন্দ তারা যা পেড়ে দিয়েছে, দিয়েছে, নিয়ে এসেছি—"

"খারাপ ডিম পয়সা দিয়ে নিয়ে যাব কি ক'রে?"

"তুমিই দেখ না, পছন্দ না হয় নিও না।"

"তুমি দেখে দেবে না?"

"আমি পারব না। আমার বেটা যেদিন মরেছে সেই দিন আমার চোখের আলোও নিবে গেছে। তুমিই দেখে নাও। আমি অনর্থক পাপের ভাগী হ'তে পারব না।"

নিরুপায় হইয়া আমি সবগুলিই লইলাম। যে বিচক্ষণ দৃষ্টি থাকিলে কেবল দেখিয়া ভালো ডিম খারাপ ডিম চেনা যায় সে দৃষ্টি আমারও ছিল না। বুড়ি যখন ডিমগুলি গণিয়া দিতেছিল তখন লক্ষ্য করিলাম বুড়ির কুঁজ আছে, বুকের মাঝখানেও মাথার মতো কি যেন একটা উঁচু হইয়া রহিয়াছে। ছেলেবেলায় ভিটামিনের অভাবে অনেক ছেলেমেয়ের বুকের কাছটা পায়রার বুকের মতো উঁচু হইয়া যায়। ভাবিলাম, হয়তো বুড়িরও তাহাই হইয়া থাকিবে। মোট-কথা 'তিনমুণ্ডী'র তাৎপর্যটা বুঝিতে পারিলাম।

"কিসে ডিম নেবে?"

"ঠোঙা নেই?"

"না। কাপড় পাত না, খুঁটের একধারে বেঁধে দিচ্ছি।"

পাশের মুদির দোকান হইতে একটা ঠোঙা চাহিয়া লইলাম। ঠোঙায় ডিমগুলি পুরিয়া বুড়িকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম।

"আমার কাছে ভাঙানি নেই। ভাঙিয়ে এনে দাও—" রহিমের দোকান খোলা থাকিলে আমাকে এসব দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। সে ভালো ডিম বাছিয়া ঠোঙায় করিয়া ডিম আমার গাড়িতে পেঁছাইয়া দিত। তাহার নিকট ভাঙানির কখনও অভাব হইয়াছে এ কথাও মনে পড়ে না। আবার সেই মুদির শরণাপন্ন হইলাম।

"আমাকে এই পাঁচটাকা ভাঙিয়ে দাও ভাই। দু'এক টাকার খুচরোও করে দাও। আচ্ছা এক বুড়ির পাল্লায় পড়েছি। ও যা রাগী দেখছি, ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতেও ভয় করে—"

"হ্যাঁ, ও সাংঘাতিক বুড়ি। গোখুরো সাপ যেন, ফণা তুলেই আছে। মাথায় বোধহয় ঘৃতকুমারীর রস ঘসে, কিন্তু ফল যে বিশেষ হয়েছে তাতো মনে হয় না।"

"ঘৃতকুমারীর রস ঘসে না কি! কি করে জানলে সেটা?"

"ওর মাথায় চাঁদির খানিকটা চৌকোণো ক'রে কামানো। পয়সা দেবার সময় লক্ষ্য করবেন। যারা ঘৃতকুমারীর রস মাথায় ঘসে তারা ওই রকম ক'রে কামায়।"

দাম দিবার সময় লক্ষ্য করিলাম সত্যই বুড়ির মাথার মাঝখানটা কামানো।

॥ ২ ॥

পরদিন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। ব্যাপারটা বেশ গম্ভীর এবং শোকাবহ। আমার বন্ধুর একমাত্র পুত্রটি কিছুদিন আগে মারা গিয়াছে। বন্ধু ধনী লোক। তিনি পুত্রের একটি ছবি ভালো শিল্পীকে দিয়া আঁকাইয়া সেটি একটি মর্মর বেদীর উপর স্থাপন করিয়াছেন। এখন তাহার সম্মুখে একটি রেশমের পর্দা টাঙানো আছে। আমাকে গিয়া সুতা টানিয়া সেই পরদাটি সরাইয়া দিতে হইবে। তাহারই উৎসব। গিয়া দেখিলাম শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘরে ফুলের মালা এবং ধূপধূনার সমারোহ। সভা আরম্ভের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' সুললিত কণ্ঠে গাহিলেন একটি সুবেশা সুন্দরী মহিলা। খুব দরদ দিয়া গাহিলেন। বন্ধুপত্নী একটি গরদের কাপড় পরিয়া একধারে নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন। আমি একটি কবিতা পাঠ করিয়া চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলাম। তাহার পর জনৈক শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদ হইতে কিছু পাঠ করিলেন। তাহার পর একটি সুমুদ্রিত ছাপানো পুস্তিকা বিতরিত হইল। তাহাতে আমার বন্ধুপুত্রের একটি ছবি এবং সম্যক পরিচয় ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর আর একটি রবীন্দ্র-সংগীতের পর সভা সমাপ্ত হইল। অতঃপর কিছু জলযোগান্তে ডিসপেন্সারিতে আসিয়া দেখি তুমুল কাণ্ড। ডিসপেন্সারির রাস্তার উপরে সেই তিনমুণ্ডী একদল বালকের বাপান্ত করিতেছে। তাহারা বুড়িকে ক্ষেপাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে, বুড়ি চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম ব্যাপারটা আরও মর্মান্তিক হইয়াছে এই কারণে যে বেসামাল হওয়াতে বুড়ির ডিমের ঝুড়িটাও রাস্তায় পড়িয়া গিয়া তাহার প্রায় সবগুলি ডিমই ভাঙিয়া গিয়াছে। বুড়ি খানিকক্ষণ চীৎকার করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া আমার ডিসপেন্সারির বারান্দার উপর বসিল। সেখানে আগেই একটা নাপিত আসিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম বুড়ির সহিত তাহার আলাপ আছে।

"আমার মাথার মাঝখানটা কামিয়ে দিবি? অনেক চুল হ'য়ে গেছে। আজ কিন্তু পয়সা দিতে পারব না, সব ডিমগুলো ভেঙে গেল, দেখলি তো।"

"আমি এখন ধারে কামাতে পারব না, এখনও আমার 'বউনি' হয়নি।"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, "তুই ডাক্তারবাবুর কাছে একটা ওষুধ চেয়ে নে না। এমন সব ভালো ওষুধ আছে যে একবার লাগিয়ে দিলে সব চুল উঠে যাবে, আর হবে না।"

কয়েক মিনিট পরে বুড়ি আমার চেম্বারে ঢুকিয়া মাথা দেখাইয়া ঔষধ চাহিল।

"ওখান থেকে চুল উঠিয়ে দিতে চাইছ কেন ? ঘৃতকুমারী লাগাও নাকি ওখানে ?"

"ঘৃতকুমারী তোমরা লাগাও গে যাও। আমি লাগাতে যাব কোন দুঃখে !"

"তবে ? ওখানকার চুল উঠিয়ে দিতে চাইছ কেন ?"

বুড়ি উর্ধ্বমুখে নির্বাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। সহসা লক্ষ্য করিলাম তাহার চোখের দুই কোণ দিয়া জল পড়িতেছে। অবাক হইয়া গেলাম।

"কি হ'ল ?"

"কেন ওখানটা কামিয়ে ফেলি তা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে ?"

"করব না কেন ?"

বুড়ি তখন প্রায় চুপি চুপি বলল, "ওটা আমার ছেলের আসন। সে রোজ আসে আমার কাছে, ওইখানে তাকে বসাই। আর কোথায় বসাব বল ? বুকের উপর হাড় উঁচু, পিঠে তো কুঁজ। তাই মাথায় আসন করে দিয়েছি। চুলে পাছে কুট কুট করে তাই ওটা কামিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। সে কম্বলের আসনে বসতে পারত না, তার জন্যে একটা কার্পেটের আসন কিনেছিলাম--"

"তোমার ছেলে !"

"হ্যাঁ বাবু আমার ছেলে। ওই হতভাগা ছোঁড়াদের পাল্লায় প'ড়ে গাছে উঠেছিল। সেখান থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। সে কিন্তু আসে আমার কাছে। বিশ্বাস কর তুমি। তাই তার জন্যে আসন করে রেখেছি—।"

বুড়ির সহিত আর তর্ক করিলাম না। বলিলাম, "আচ্ছা, এই ওষুধটা নিয়ে যাও, লাগিয়ে দেখো।"

"এর দাম কত ? আমি ডিম দিয়ে দিয়ে এর দাম শোধ করে দেব। এখন কাছে পয়সা নেই।"

"দাম তোমায় দিতে হবে না।"

"সে কি হয়। এর দাম তোমায় নিতেই হবে।"

বুড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সমারোহপূর্ণ যে শোকসভায় কিছুক্ষণ পূর্বে গিয়াছিলাম সহসা সে কথাটাও মনে পড়িল।

তারা

মিনু, জিতু, হারু আর ফনুতি সেদিন রাত্রে ছাতের উপর শুয়েছিল মাদুর পেতে। আকাশ ভরা তারা। তারার দিকেই চেয়েছিল সবাই। হঠাৎ মিনু বললে— "আচ্ছা তারাগুলো কি রকম দেখতে লাগছে বলতো !"

জিতু। যেন একরাশ শাদা মার্বেল ছড়িয়ে আছে কালো মেঝের উপর।

হারু। মার্বেল নয়, শাদা পুঁতি।

ফনুতি। যাঃ, ওসব বাজে কবিত্ব করছিস। আমার কি মনে হচ্ছে বলব ?

মিনু। বলু।

ফনুতি। আমাদের ওই মোটা কুচকুচে কালো দাইটার সর্বাঙ্গে যদি খোস বেরোয়, তাহলে যেমন দেখতে হয় তেমনি দেখাচ্ছে।

মিনু। ছি, ছি, তোর মনটাই কুৎসিত, তাই ওরকম ভাবতে পারলি।

এমন সময়ে ওদের বড়দা সুরেন এল ছাতে।

মিনু। বড়দা নক্ষত্রগুলোকে কেমন দেখাচ্ছে বলতো—

বড়দা। একরাশ কাবুলী মটর যেন ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে।

হারু। আমার আর একটা উপমা মনে হয়েছে। আকাশে বোধহয় দেয়ালী হচ্ছে, অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়েছে দেবকন্যারা।

বড়দা বি. এস. সি ক্লাসের ছাত্র।—

তিনি বললেন, "ওগুলো প্রদীপ বটে। কিন্তু ছোট ছোট নয়। প্রত্যেকটি বিরাট। বিরাট বিরাট আগুনের গোলা দুলছে—মহাশূন্যে —"

বড়দা নক্ষত্রদের বিজ্ঞান-সম্মত কাহিনী শোনাতে লাগলেন। ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

মিনু স্বপ্ন দেখল যেন একটি তার বয়সী ফুটফুটে মেয়ে তার কাছে এসে ব'সে মুচকি মুচকি হাসছে।

"আমাকে তোমরা কেউ চিনতে পারনি।"

"কে তুমি ?"

"আমি তারা। আমি তোমার চোখে আছি।"

ব'লেই সে একটা উল্কার মতো আকাশে উড়ে গেল। মিনুর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল অগণ্য তারা। সবাই মুচকি মুচকি হাসছে তার দিকে চেয়ে।

পুনর্মিলন

॥ ১ ॥

অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। ছবি এককালে আমার সহপাঠী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর বহুদিন দেখা হয়নি। জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দু'জনে দুদিকে গিয়ে পড়েছিলাম, আমি হয়েছিলাম কেরাণী আর সে হয়েছিল ডাক্তার। হঠাৎ একদিন দেখা হ'য়ে গেল রেলস্টেশনে। আমি তাকে চিনতে পারিনি। কাঁচাপাকা একমুখ গোঁফ-দাড়ি, চোখে চশমা, ঢিলেঢালা জামা-পাজামা-পরা লোকটার মধ্যে যে আমার বাল্যবন্ধু ছবি লুকিয়ে আছে তা ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। সে কিন্তু আমায় চিনতে পেরেছিল। আমার জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, তোবড়ানো ভাঙা গাল, নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। সে হঠাৎ আমার সামনে এসে বললে—"কে রে সতু ?"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আমি ছবি।"

তারপর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

"কোথা যাচ্ছিস—"

"লিলুয়া যাব।"

"লিলুয়ায় বাড়ি নাকি ?"

"না। ওখানে আমার ভগ্নীপতি থাকেন। রেলে কাজ করেন তিনি।"

"আয় এই বেঞ্চটায় বসা যাক, ট্রেনের এখনও দেরি আছে। আয় একটু গল্প-সল্প করা যাক। তোর চেহারাটা তো বড্ড কাহিল দেখছি।"

বেঞ্চিতে দু'জন পাশাপাশি বসলাম।

বললাম, "গত দশ বৎসর ধ'রে নানা ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগছি। ভাবছি এবার কোথাও চেঞ্জে যাব। আমার ভগ্নীপতি ছুটি নিয়ে পুরী যাচ্ছেন, তাই সেখানে যাচ্ছি, দেখি যদি তাদের দলে জুটে পড়তে পারি। একা চেঞ্জে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, না দৈহিক, না আর্থিক।"

হঠাৎ কথাগুলো ব'লে ফেলে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিলাম। নিজের দৈন্যের কথা অপরকে জানিয়ে লাভ কি।

ছবি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর যা বললে তা অপ্রত্যাশিত।

"আমার মধুপুরে বাড়ি আছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুইও চল আমার সঙ্গে।"

অবাক হ'য়ে গেলাম।

"না ভাই। কোনও অচেনা পরিবারের মধ্যে থাকতে চাই না। তুমি আমার বন্ধু হ'তে পার, কিন্তু তোমার পরিবারের লোকেরা আমার বন্ধু নয়, তারা আমাকে গলগ্রহ ভাববে।"

হো হো ক'রে হেসে উঠল ছবি। সে যে অত জোরে হাসতে পারে তা জানতাম না। সমস্ত প্ল্যাটফরমটা যেন গমগম ক'রে উঠল।

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার পরিবার নেই। বিয়ে করিনি। মধুপুরে টুকরাই আমার সব।"

"টুকরা কে—?"

"একটা সাঁওতাল চাকর। তুই আমার সঙ্গে চল, কোনও অসুবিধা হবে না।"

তার আমন্ত্রণে সত্যিই একটা আন্তরিকতার সুর বাজল।

চলে গেলাম তার সঙ্গে।

॥ ২ ॥

মধুপুরে গিয়ে চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ি। চারিদিকে বাগান। তখন শীতকাল। গোলাপ ফুলের হাট বসে গেছে যেন।

ছবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখান থেকে ডাক্তারের বাড়ি কত দূর ? আমার মাঝে মাঝে রাত্রে পেটে ব্যথা হয়—।"

"আমিই তো ডাক্তার। এখানে কিছু হবে না তোর। রোজ মুর্গি খা একটা করে। টুকরা রাঁধে ভালো।"

তার বাগানটা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখছিলাম। অনুভব করছিলাম ছবি শুধু ধনী নয়, শৌখীনও। কত রকম ফুল যে লাগিয়েছে। বাগানের এক কোণে একটা ছোট গাছ দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সর্বাঙ্গে ফুল, প্রত্যেক ফুলে সাদা বেগুনী আর গোলাপী রঙের ছিট। মনে হ'ল একটি কিশোরী মেয়ে যেন ছাপা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

"এটা কি গাছ ছবি—চমৎকার তো ?"

"এর নাম আমি জানি না। টুকরা কোথা থেকে বিচি এনে পুঁতেছিল। জংলি গাছ কোন—"

"বিচি পেলে আমিও নিয়ে যেতুম।"

"টুকরাকে বলব—"

মধুপুরে একমাস ছিলাম। আরও থাকতাম, কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে গেল। ওই একমাসেই কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি হ'ল। ছবি কোন ওষুধ দেয়নি। ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমার ব্যথাও আর হয়নি। যাওয়ার দিন ছবি বললে—"সুখাদ্যের অভাবই তোমার আসল রোগ। এখানে যা খেতে ওখানেও তাই খাবে।"

"অত টাকা কোথায় পাব ভাই।"

"আমি দেবো। আমি মাসে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাব।"

"কেন—"

"টাকা আছে আমার। খরচ করতে হ'লে বদ-খেয়ালে খরচ করতে হয়। তা করতে চাই না। তুই আমার বাল্যবন্ধু। এই একমাস ধরে তুই আমাকে যা দিয়েছিস তা আমি কোথাও পাইনি। তা দুর্লভ, তা অমূল্য। যখন ছুটি পাবি তখনই এখানে চলে আসিস।"

আমার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে বললে—"ভালো ক'রে খাবি। তুই বেঁচে থাকলে আমারও জীবনের একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। আমার কেউ নেই, আমি একা।"

ছবি আর্তনাদ ক'রে উঠল যেন।

আসবার ঠিক আগে টুকরা আমরা হাতে কালো রঙের একটা বিচি এনে দিলে।

"ওই গাছের বিচি বাবু। কোথাও লাগিয়ে দেবেন, গাছ হবে।"

বিচিটি খামে মুড়ে পকেটে রেখে দিলাম।

॥ ৩ ॥

বাড়িতে ফিরেই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম। দুটো ছেলের জ্বর, গিন্নীর কোমর ব্যথা, গোয়ালার অন্তর্ধান, চিনির অনটন, লাইট খারাপ, সাইকেলের চাকা ভেঙে যাওয়া প্রভৃতি দুর্যোগ যেন আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল। আমি আসতেই হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ল। বিচিটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল পনের দিন পরে। তখন জামার পকেটে সেটা আর খুঁজে পেলাম না। চারিদিকে খুঁজলাম কোথাও পাওয়া গেল না।

॥ ৪ ॥

বছর ঘুরে গেল। এর মধ্যে আর মধুপুর যেতে পারিনি। কেরানীর পক্ষে বছরে একবারের বেশী ছুটি পাওয়া যায় না। ছবি কিন্তু প্রতি মাসে নিয়মিত আমাকে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাত! নিতে দ্বিধা করতুম না। গরীব কেরানীর আত্মসম্মান সব সময়ে নিখুঁত নয়। কিন্তু যে জন্য সে টাকাটা পাঠাত সেটা প্রায়ই করা হতো না। অর্থাৎ নিজের খাবার জন্যে ফল, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ কিনতে পারতাম না। তার টাকায় আমার সংসার একটু বেশী সচ্ছল হয়েছিল এই যা। মাঝে মাঝে ভালো ভালো খাবার যে কিনতাম না তা নয়। কিনতাম, কিন্তু সেটা সবাই মিলে খেতুম। এক হিসেবে এটা প্রতারণা হচ্ছিল। কিন্তু গরীব কেরানীরা কি সব সময়ে প্রতারণা-মুক্ত থাকতে পারে? তাদের পরের দানও নিতে হয়, মাঝে মাঝে প্রতারণাও করতে হয়।

তারপর হঠাৎ একদিন বজ্রাঘাতটা পড়ল মাথার উপর। খবর পেলুম, ছবি আত্মহত্যা করেছে। ছুটে গেলুম মধুপুরে। তখন তার শবদেহ দাহ করা হ'য়ে গেছে। যাবার সময় সে নাকি লিখে গেছে—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি সুখী ছিলাম না, তাই আত্মহত্যা করেছি। চিঠিখানা শুনলাম পুলিশের কাছে আছে।

॥ ৫ ॥

মাস দুই পরে ছবির উকিলের একটি পত্র পেলাম। ছবি না কি তার উইলে আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছে। উকিলের কাছে সে আমার নামে একটি চিঠিও রেখে গিয়েছিল। ব'লে গিয়েছিল তার মৃত্যুর পর চিঠিটি যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উকিলবাবুর চিঠির সঙ্গে শিলমোহর করা আমার চিঠিও ছিল। ছোট্ট চিঠি।

ভাই সতু,

আর ভালো লাগছে না। এবার চললুম। তোর জন্যে দশ হাজার টাকা রেখে গেলুম, ভালো ক'রে খাওয়া দাওয়া করিস। ইতি—

ছবি

টাকার অভাবে আমার বড় মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না। টাকাটা পাওয়াতে তার বিয়ে দিতে পারলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মেজ ছেলে ছুটে এসে বললে—বাবা ওদিককার ওই আস্তাকুঁড়টায় কি সুন্দর একটা ফুলের গাছ হয়েছে দেখবে চল।

গিয়ে দেখি সেই অপরূপ গাছ যা ছবির বাগানে দেখেছিলাম, যার বিচি টুকরা আমাকে এনে দিয়েছিল, সর্বাঙ্গে ফুল ফুটিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। ছবিকেই আবার দেখতে পেলাম যেন।

পোকা

॥ ১ ॥

নিখিলরঞ্জন পোকার শত্রু ছিল। পোকা দেখিলেই মারিয়া ফেলিত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার এই অভ্যাস। মানুষের যেমন মুদ্রা-দোষ থাকে অনেকটা তেমনি। কোথাও পোকা দেখিলে তাহাকে না মারা পর্যন্ত সে স্থির থাকিতে পারিত না। ছেলেবেলায় সে বাড়ির আশেপাশে ঘুরিত পোকা ধরিবার জন্য। প্রজাপতি বা উড়ন্ত-পোকাদের প্রায়ই ধরিতে পারিত না, ধরিত সেই সব পোকাদের যাহারা পাতার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে। শশা বা ঝিঙের লতায় একরকম গোল গোল লাল পোকা থাকে। নিখিল সেগুলিরই বিশেষ শত্রু ছিল। কিছুদিন পরে কিন্তু আর এক ধরনের পোকার বিরুদ্ধে সে অভিযান শুরু করিল। পোকাগুলি ছাই-ছাই রঙের, সর্বাঙ্গ শক্ত খোলায় আবৃত। চোখ দুটি নিষ্ঠুর। একটি ছেলে নিখিলকে পোকাটির বিষয়ে জ্ঞান-দান করিল।

"ভয়ানক পাজি পোকা এগুলো। ওদের কান-কটারি পোকা বলে। এরা সুযোগ পেলেই কানে ঢোকে। সাংঘাতিক পোকা"—নিখিল তৎক্ষণাৎ পোকাটিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল। এবং তাহার পর হইতেই ওই পোকা দেখিলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিত। কত পোকা যে মারিয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বস্তুত বাল্যে এবং কৈশোরে পোকা-নিধনই তাহার একমাত্র ব্যসন (hobby) ছিল।

॥ ২ ॥

নিখিলরঞ্জন যখন কলেজে পড়িতে গেল তখন তাহার এই ব্যসনে খানিকটা ছেদ পড়িয়াছিল। কারণ পাড়াগাঁয়ে পোকার যত প্রাদুর্ভাব কলিকাতা শহরে তত নয়। কলিকাতার মানুষরাই পোকার মতো চারিদিকে কিলবিল করিতেছে। তবু মাঝে মাঝে দেখা যাইত, রাত্রে নিখিলরঞ্জন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলির দিকে ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া আছে। রাস্তার আলোগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পোকার ভীড়। কিন্তু সেগুলি তো নাগালের বাহিরে। নিখিলরঞ্জন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার মেসে ফিরিয়া যাইত। একদিন সহসা অনুভব করিল, তাহার কামিজের ভিতর একটা পোকা ঢুকিয়াছে, পিঠের দিকে সড়সড় করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি কামিজটা খুলিয়া ফেলিল, দেখিল পোকাই, সেই ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা। সঙ্গে সঙ্গে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। আরও মাসখানেক পরে যাহা ঘটিল তাহা একটু অদ্ভুত। নিখিলরঞ্জন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। গামছাটি নিজের হাতে কাচিয়া শুকাইতে দেয়। পরিষ্কারভাবে নিজের বিছানা নিজেই করে। মশারিটা ঝাড়িয়া স্বহস্তে টাঙায় সেটি রোজ। একদিন রাত্রে শুইয়া আছে, চোখে ঘুমটি সবে লাগিয়াছে, এমন সময় তাহার মনে হইল ঘাড়ের নীচে কি যেন সুড়সুড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া টর্চ জ্বালিল। কিছু দেখিতে পাইল না প্রথমে। তাহার পর বালিশ উল্টাইয়া দেখিল,

একটা পোকা তর-তর করিয়া পলাইতেছে। ছাই-ছাই রঙের সেই পোকা! পোকাটার কেমন যেন একটা স্পাই-স্পাই ভাব। এদিক ওদিক ক্রমাগত লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল, সহজে তাহাকে ধরা গেল না। কিন্তু নিখিল ছাড়িবার পাত্র নয়। পোকাটাকে অবশেষে সে ধরিয়া ফেলিল এবং তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। মরিবার সময় পোকাটা অদ্ভুত শব্দ করিল একটা। 'কিঁ—চ্'। শব্দটা ছুঁচের মতো নিখিলের কানে গিয়া বিঁধিল। ইহার পরই সে চোখ তুলিয়া দেখিল, মশারির চালে আর একটা পোকা রহিয়াছে। নিখিলের মনে হইল, কেমন যেন ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই উড়িয়া গিয়া তাহার কপালে আঘাত করিয়া অন্যত্র বসিল। নিখিলের মনে হইল পোকাটা যেন আক্রমণ করিল তাহাকে। রুখিয়া উঠিল সে। কিন্তু হাত বাড়াইয়া যে-ই পোকাটাকে ধরিতে যায়, অমনি সে সরিয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পোকা পারিবে কেন। খানিকক্ষণ পরে নিখিল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং দুই আঙুল দিয়া পিষিয়া মারিল। এ পোকাটাও শব্দ করিল—'কিঁ—চ'। নিখিল দেখিল ঘরের ছাতে কয়েকটা পোকা বসিয়া রহিয়াছে। নিখিলের মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সে বিছানা হইতে বাহির হইয়া ঝাঁটা হাতে টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। পোকাগুলি মেঝেতে পড়িবামাত্র লাফাইয়া নামিয়া যতগুলিকে পারিল পা দিয়া পিষিয়া মারিল। প্রত্যেক পোকাটাই মরিবার আগে অন্তিম আর্তরব করিল—'কিঁ—চ্'। সব পোকাগুলোকে নিখিল মারিতে পারে নাই। একটা পোকা জানালা দিয়া উড়িয়া গেল।

কিন্তু ইহার পর হইতে নিখিল লক্ষ্য করিল, ওই ছাই-ছাই পোকাগুলো যেন তাহার পিছু লইয়াছে। রোজই দেখিতে পায়—হয় ঘরের কোণে, না হয় বইয়ের শেলফে, না হয় আর কোথাও একটা না একটা বসিয়া আছে। নিখিল অবশ্য দেখিলেই মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করে, দুই একটা সরিয়া পড়িতেছে। আবার একদিন মশারির ভিতর দুইটা পোকা দেখা দিল। নিস্তার অবশ্য পাইল না, কিন্তু নিখিল চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল, উহাদের একটা মতলব আছে। মরিবার সময় 'কিঁ—চ্' করিয়া যে শব্দটা করে তাহা শব্দতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া কি অন্য পোকাদের খবর দেয়? নিখিল সর্বদা সতর্ক-দৃষ্টি হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিল! একদিন সে সবিস্ময়ে দেখিল তাহার ক্লাসে ডেস্কের উপরও দুইটা পোকা বসিয়া আছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।…হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে দারুণ যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙিয়া গেল তাহার। কানের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। কানের ভিতর প্যাঁচ-কসের মতো কি যেন চালাইয়া চলিয়াছে কে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কানে খানিকটা স্পিরিট ঢালিয়া দিল। স্টোভ জ্বালাইবার জন্য এক শিশি মেথিলেটেড স্পিরিট হাতের কাছেই থাকিত। তবু যন্ত্রণা থামে না। তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল বেচারা। সকালে ডাক্তার কানের ভিতর হইতে একটা মরা বড় পোকা বাহির করিলেন। ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা!

ইহার পর নিখিলের খরচ বাড়িয়া গেল। কানে গুঁজিবার জন্য তুলা কিনিতে লাগিল। রাত্রে শুইবার সময় কানে তুলা তো দিতই অনেক সময় দিনেও দিত। তাছাড়া, পোকা তাড়াইবার যে সব ঔষধ আজকাল বাজারে বাহির হইয়াছে সেগুলিও

কিনিত সে। নিজের বিছানায়, বসিবার জায়গায়, বইয়ের শেল্‌ফে, ঘরের কোণে কোণে, প্রায়ই সর্বত্রই সেই ঔষধ ছিটাইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু তবু সে লক্ষ্য করিত, ঔষধের নাগালের বাহিরে ছাই-ছাই রঙের পোকারা হয় ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে, কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বলা বাহুল্য, নিখিল পারত-পক্ষে তাহাদের রেহাই দিত না। ধরিতে পারিলেই পিষিয়া ফেলিত। কেহ গণিয়া দেখে নাই, কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নিখিল তাহার সারাজীবনে কয়েক সহস্র পোকাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তবু পোকা আসিতেছে। নিখিল কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না।

॥ ৩ ॥

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। নিখিলের কর্মজীবন শুরু হইয়াছে। বি. এ. পাশ করিবার পর কোথাও সে চাকরি জুটাইতে পারে নাই। অবশেষে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের পয়সায় সে চাল-ডালের ব্যবসাতে নামিয়াছে। সেদিন সে মাল খরিদ করিবার জন্য গুসকরায় যাইতেছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন একটি সম্পূর্ণ খালি থার্ড ক্লাস কামরা পাইয়া গেল। কামরাটিতে উঠিয়া সে সব জানালাগুলি তুলিয়া দিল। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছিল। আজকাল সে কানের তুলা প্রায় খোলেই না। দুই কানেই তুলা গোঁজা ছিল। কামরায় কেহ নাই দেখিয়া, সে পোকা-প্রতিষেধক একটা ঔষধ বাহির করিয়া সেটা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর বিছানা বাহির করিয়া সেটাও ভালো করিয়া ঝাড়িয়া একটা বেঞ্চে বিছাইয়া ফেলিল। হাতঘড়িতে দেখিল রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিল এইবার শুইয়া পড়া যাক। ঔষধটা আর একবার ছিটাইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—না, একটি পোকাও কোথাও দেখা যাইতেছে না। পোকার সম্বন্ধে সে বরাবরই সচেতন আছে। লক্ষ্য করিয়াছে, একটু অসাবধান বা অন্যমনস্ক হইলে সেই ছাই-ছাই রঙের পোকারা তাহার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করে। শুইবার পূর্বে নিখিল কামরার জানালাগুলো আর একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। না, সব ঠিক আছে। কোথাও ফাঁক নাই। শুইয়া পড়িল।

'কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ—'

নিখিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই পোকার আওয়াজ না? চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পোকা তো একটাও নাই। কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দটা কিন্তু ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ পোকার অন্তিম আর্তনাদ যেন সহসা একযোগে মূর্ত হইয়া উঠিল তাহার মানসপটে। ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হইল তাহা। একটু পরেই নিখিল অনুভব করিল—ছররার মতো কি যেন তাহার চোখে মুখে সবেগে লাগিতেছে। একটা আধটা নয় অসংখ্য ছররা। দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল। কিন্তু হাতেও ছররা আসিয়া লাগিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণা। হাত সরাইয়া ফেলিতে হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে তখন দেখিবার চেষ্টা করিল ছররার মতো কি ওগুলো। কিন্তু কোন কিছুই তাহার হাতে ঠেকিল না। কামরার বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার।

'কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্'

আর্তনাদের শব্দটা যেন উল্লাসের ধ্বনিতে পরিণত হইল। তাহার মনে হইল মুখটা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। সহসা দুই চোখে যেন দুইটা ছররা আসিয়া লাগিল। পড়িয়া গেল সে। তাহার পর অনুভব করিতে লাগিল, কে যেন কানের তুলা টানিয়া বাহির করিতেছে। মনে হইল, নাকের ভিতর দিয়া কি যেন ঢুকিতেছে। ইহার পরেই নিখিল জ্ঞান হারাইল। সকালে তাহার মৃতদেহটা যখন ট্রেনে পাওয়া গেল কি ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারিল না। ডাক্তার বলিলেন, 'শকে' মৃত্যু হইয়াছে।

বাবা

প্রভুরাম চক্রবর্তী প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারিতে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত কি না তাহা জানা নাই, কিন্তু এ কথাটা সুবিদিত ছিল যে হিন্দু-মুসলমান দুই দলই তাঁহার জমিদারিতে শান্ত হইয়া থাকিত। টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। টুঁ শব্দ হইলে বজ্রগর্জনে তিনি তাহা থামাইয়া দিতেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। প্রভুরাম নিজের একমাত্র সন্তান প্রণতির যখন বিবাহ দিলেন তখন সদ্বংশ এবং কৌলীন্যের উপরই নজর দিয়েছিলেন বেশী। সেই জন্য অনেক দেখিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারেই তিনি জামাতা-নির্বাচন করিলেন। জামাতা বিদ্বান এবং শিক্ষক। জামাতার পিতা ছিলেন সেকালের সদরবালা। প্রচুর যৌতুক এবং স্বর্ণালংকার সহ কন্যাটিকে তিনি বরেনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেকালের নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ এবং একশত ভরি গহনা একালের লক্ষাধিক টাকারও বেশী। সদরবালা সুরেন্দ্রনাথ এবং তৎপত্নী রোহিণীবালা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তাঁহাদের আর একটা বড় আশাও অবশ্য নেপথ্যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রণতি যখন প্রভুরামের একমাত্র সন্তান তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অত বড় জমিদারিটাও তাঁহাদের হাতে নিঃসন্দেহে আসিয়া যাইবে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুত্রবধূ প্রণতিকে সাধ্যাতিরিক্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল মানুষ অংক কষিয়া যাহা ঠিক করে অনেক সময় বিধাতার বিধানের সহিত তাহার হুবহু মিল হয় না। দুইটি ঘটনার দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হইল। প্রভুরাম চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন মাথার শির ছিঁড়িয়া মারা গেলেন। দেখা গেল তিনি একটি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এক ট্রাস্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যেন সম্পত্তির সমস্ত আয় হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-নিবারণ-কল্পে খরচ হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক। প্রণতির স্বামী বরেন সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল। তাহার চাকরি তো গেলই, তাহার চিকিৎসার জন্য সাংসারিক ব্যয়ও বাড়িতে লাগিল। সদরালা মহাশয় একদিন হিসাব করিয়া দেখিলেন সর্বসাকুল্যে তাঁহার বর্তমান মাসিক আয় মাত্র আড়াইশত টাকা। পুত্রের বিবাহে পণস্বরূপ যে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া কলিকাতায় একটুকরা জমি কিনিয়াছেন। আশা ছিল জমিদারিটা পাইলে বাড়ি করাইবেন। কিন্তু সে আশা মরীচিকার মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রণতির শাশুড়ি কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিলেন প্রণতিকে। তিনি

প্রচার করিতে লাগিলেন বউটা অপয়া। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য সে-ই দায়ী। স্ত্রীর নিকট বার বার শুনিয়া শুনিয়া সদরবালা স্থরেন্দ্রনাথেরও এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তাঁহারও মনে হইল বউটাই অলক্ষ্মী। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন বউটা আসিবার পর হইতেই বাড়িতে আরও নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পুরাতন বুড়ি দাইটা হঠাৎ মরিয়া গেল। ব্যাঙ্কের যে সদাশয় কর্মচারীটি নির্বিবাদে তাঁহার পেনসনের টাকাগুলি ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া দিত সে-ও হঠাৎ বদলি হইয়া গেল। কোথাও কিছু নাই আচমকা একটা ঝড় উঠিয়া পুরাতন নিমগাছের একটা ডাল ভাঙিয়া দিল। বাড়ির গাইটা বেশ দুধ দিতেছিল হঠাৎ সে দুধ একেবারে কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার একমাত্র বন্ধু একচক্ষু জিতু ভট্চাজও বলিলেন, "ভায়া তোমার বউমাটির লক্ষণ ভালো দেখছি না। সাবধান হও।"

"কি করে সাবধান হব?" সদরবালা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

"আমাকে একজন তান্ত্রিক সাধক বলেছিলেন বাড়িতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হ'লে তাকে অবহেলা করবে, যত্ন কোরো না! তাহলে কিছুদিন পরে সে নিজেই চলে যাবে।"

সদরালা খবরটি গৃহিণীকে দিলেন। গৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বেশ।" শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু ইহার পর হইতেই প্রণতির আহারে এবং কাপড়চোপড়ে যাহা প্রকটিত হইল তাহা অত্যন্তই বেদনাদায়ক। প্রণতি আগে সকাল-বেলা কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন পরোটা, কোনদিন বা দু'একটা সন্দেশ খাইত —এখন তাহার জন্য বরাদ্দ হইল শুকনো মুড়ি। দাই চাকর যে মোটা চালের ভাত খাইত প্রণতির জন্যও সেই ব্যবস্থা হইল। তরকারির সংখ্যাও মাত্র একটি। তাহার মিহি শাড়িগুলি যখন ছিঁড়িয়া গেল তখন তাহার পরিবর্তে আসিল শস্তা মোটা জ্যালজেলে মিলের শাড়ি। শৌখিন সাবান তেল মাখা অভ্যাস ছিল, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে অলক্ষ্মী-বিতাড়ন পর্ব চলিতে লাগিল। হয়তো প্রণতি না মরা পর্যন্ত চলিতেই থাকিত, কিন্তু একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সদরালা খাইতে বসিয়াছিলেন। যদিও মাছমাংসের তেমন সমারোহ ছিল না তবু শাকসবজির তরিতরকারি কয়েকটা ছিল। ভাজা, সুকতো, চচ্চড়ি, পোস্ত, আলুপটলের দম, ডাল, অম্বল। দইও ছিল। সদরালা খাওয়া আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ঠাস-ঠাস করিয়া তাঁহার দুই গালে কে যেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। তাহার পর শোনা গেল কে যেন ঘরের ছাদ হইতে বলিতেছে, "আমার মেয়েকে অনাহারে রেখে তুমি পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে খেতে বসেছ, লজ্জা করে না তোমার, শুয়ার কি বাচ্চা। ঠেঙিয়ে লাস ক'রে দেব তোমাকে আজ। আমি প্রভুরাম চক্রবর্তী, মরেছি কিন্তু মুক্তি পাইনি। কাল থেকে তোমার বাসায় এসেছি, আমার মেয়ের অবস্থা দেখে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে আমার। শিগ্‌গির তাকে ভালো খেতে দাও, ভালো কাপড় পরতে দাও, তা না হ'লে খুন ক'রে ফেলব সকলকে—"

যে অদৃশ্য হস্ত সদরালাকে চড় মারিয়াছিল সেই অদৃশ্য হস্ত তাঁহার ভাতের থালাকে শূন্যে তুলিয়া শানে আছড়াইয়া দিল। ঝন-ঝন করিয়া ফাটিয়া গেল কাঁসার থালাখানা, ভাত-তরকারি ছিটকাইয়া পড়িল চতুর্দিকে।

"ঠেঙিয়ে লাস করে দেব সকলকে—"

গৃহিণী পাখা হাতে কর্তাকে খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাত-গ্রস্ত কোমরে অদৃশ্য পায়ের লাথি খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিদারুণ ব্যাপার। মুক্তকচ্ছ সদরালা উঠানে বাহির হইয়া আসিলেন। শুনিতে পাইলেন গৃহিণী আর্তনাদ করিতেছেন—"আর মেরো না, আর মেরো না—না, ছেড়ে দাও গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!"

কিন্তু পা কোথা! পা যে দেখা যায় না। প্রভুরাম চক্রবর্তীর হুংকার শোনা গেল।

"শিগ্গির আমার মেয়েকে মিহি শাড়ি পরিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে দাও, তা নাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি।"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি। আর মেরো না। কোমরটা ভেঙে গেছে—"

গৃহিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বাহিরের বারান্দায় প্রণতিও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, "আমার ওই তাঁতের কাপড়টা তাড়াতাড়ি প'রে নাও। চল তোমাকে খেতে দিচ্ছি। উঃ, এ-কি কাণ্ড!"

মিহি তাঁতের শাড়ি পরিয়া প্রণতি আহার করিল।

সদরালা ও তাঁহার গৃহিণী রোহিণীবালা অতঃপর যাহা করিলেন তাহা হাস্যকর, কিন্তু ইহা না করিয়াও উপায় ছিল না। তাঁহারা উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া ছাতের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বেয়াই আমাদের বড় ক্ষিধে পেয়েছে, এবার খাব? আর কখনও তোমার মেয়ের অযত্ন আমরা করব না। আমাদের মাপ কর—"

শূন্য হইতে উত্তর আসিল—"খাও। আর আমারও খাবার ব্যবস্থা কর। আমার ভাত বেড়ে তোমাদের তুলসীতলায় রেখে এস, সেখান থেকেই আমি খেতে পারব।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি একথালা ভাত ও সবরকম তরকারি তুলসীতলায় সাজাইয়া দিলেন।

"ওই কটি ভাতে আমার কি হবে? আমি একসের চালের ভাত খাই—"

"আর তো ভাত নেই, তাহলে চড়িয়ে দিই—"

"দাও—"

কিছুক্ষণ পরে একসের চালের ভাত ও তদুপযুক্ত তরিতরকারি তুলসীতলায় রাখা হইল। নিমেষের মধ্যে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। খালি থালা ও বাটিগুলি পড়িয়া রহিল কেবল।

আহারান্তে প্রভুরাম চক্রবর্তী জ্ঞাপন করিলেন, "আমি এখন এইখানেই থাকব ঠিক করেছি। নিয়মিত আমার খাবার জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন।"

শুনিয়া সদরালা-দম্পতীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধু কানা জিতু ভট্চাজের শরণাপন্ন হইলেন। বাধ্য হইয়াই হইলেন, কথাটা বাহিরে প্রচার হোক এ ইচ্ছা তাঁহাদের মোটেই ছিল না।

কানা ভট্চাজ পরামর্শ দিলেন—ওঝা ডাকা হোক। একটি ভালো ওঝার ঠিকানাও বলিয়া দিলেন তিনি। তাহার সহিত চুক্তি হইল ভূত বিদায় করিতে পারিলে তাহাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং একজোড়া তাঁতের ধুতি দিতে হইবে। তাছাড়া এক সের তেজপাতা চাই। তেজপাতাটা পোড়াইতে হইবে। তেজপাতা পোড়ার ধোঁয়ায় ভূত নাকি পালায়। নির্দিষ্ট দিনে ওঝা আসিয়া নিজের চতুর্দিকে সিঁদুরের দিয়া একটা গণ্ডি

দিল এবং তাহার মধ্যে বসিয়া তেজপাতা পোড়াইতে পোড়াইতে মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ফল যাহা হইল তাহা অতি ভয়ংকর। ওঝার নাকের উপর প্রভুরাম চক্রবর্তী একটি ঘুসি মারিলেন এবং তাহার টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া উঠানের উপর এক আছাড় দিলেন। ওঝা উঠিয়াই চোঁ চা দৌড় দিল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত! পরদিন তাহার এক পত্র আসিল—"উনি সামান্য ভূত নন। উনি দুর্ধর্ষ একগুঁয়ে দানব। আমি উহাকে ঘাঁটাইতে পারিব না। ক্ষমা করিবেন।"

পরদিন প্রভুরামের নূতন আদেশও জারি হইল।

"রোজ রোজ শাক-পাতা খাওয়াচ্ছেন কেন। চালটাও খুব মোটা। আজ পেশোয়ারি চালের ভাত এবং মাংসের কোর্মা খাব। কাল ভালো রুই মাছ কিনে আনবেন।"

সদরালা করজোড়ে উত্তর দিলেন, "বেহাই, আমি বড় গরীব হ'য়ে পড়েছি। মাছ মাংস খাবার পয়সা নেই। যে চাল কিনছি তারই মণ সাইত্রিশ টাকা। এর চেয়ে বেশী দাম দিয়ে চাল কি ক'রে কিনব? ছেলেটি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না। স্ত্রীর গহনা বিক্রি ক'রে ফেলুন। আমি যে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলাম সে টাকা কোথা?"

"তা দিয়ে কলকাতায় এক টুকরা জমি কিনেছি—"

"বিক্রি ক'রে ফেলুন জমি। মোটকথা কাল থেকে ওই খাবার চাই।"

সত্যই সদরালা গৃহিণীর কিছু অলংকার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, প্রভুরামের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া চলিতে লাগিল। মাছ মাংস পোলাও কালিয়া দই মিষ্টি ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া তাঁহারা তুলসীতলায় প্রত্যহ প্রভুরামকে ভোগ দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, না দিলে তাঁহাদের জীবন সংশয়। দুর্ধর্ষ দানবের মায়া-দয়া নাই।

একদিন গভীর রাত্রে সকলে যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখন প্রণতি বাহিরের ঘরে আসিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বাবা—"

"কি—"

"তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। তুমি এবার এদের রেহাই দাও, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কষ্ট আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—"

"তোর জন্যেই তো এত সব করছি—ওরা তোকে যে অবস্থায় রেখেছিল—"

"সেই অবস্থাতেই আমি সুখী ছিলাম বাবা। এই আমার অদৃষ্ট, তুমি আর কি করবে। এখন তুমি যা করছ তাতে আমি ভালো খেতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি অমন কোরো না।"

"তুই বলছিস আমি চলে যাব?"

"তাই যাও।"

দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। ছাতের খানিকটা ফাটিয়া উড়িয়া গেল। প্রণতি সেই ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা তাহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছে।

শব্দ শুনিয়া সদরালা ও তাঁহার পত্নীও আলু-থালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

"কিসের শব্দ হ'ল বৌমা ?"
"বাবা চলে' গেলেন।"
"কি করে বুঝলে ?"
"ওই যে দেখুন না।"
নক্ষত্রটি তখনও সকৌতুকে হাসিতেছিল।

অমৃত

খুব ভোরে আমি যখন ট্রেন হইতে নামিলাম তখন আশা করি নাই যে নামিয়াই বুবুকে দেখিতে পাইব। যদিও অনেকদিন পরে দেখিলাম তবু তাহার কপালের কাটা দাগটা দেখিয়া তাহাকে চিনিতে অসুবিধা হয় নাই। বেনারসে আমার এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় কয়েকদিন ছিলাম। তাহারই মুখে শুনিয়াছিলাম বুবু এখানে টিকিট-কলেক্টার হইয়া আছে। বুবুকে দেখিতেই এখানে আসিয়াছি, ঠিক দেখিতে নয়, পরীক্ষা করিতে। বুবু যে আমাকে চিনিতে পারিবে সে আশংকা ছিল না। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়ার পাগড়ি, মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি এবং চোখে গগল্‌স থাকাতে অনেকে আমাকে পাঞ্জাবি মনে করে। আমি বাংলা ছাড়া আরও কয়েক রকম ভাষাও জানি। হিন্দু, উর্দু, গুরুমুখী মহারাষ্ট্র, গুজরাটিতে কথাবার্তা বলিতে পারি। সুতরাং বুবুর কাছে ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। আজকাল আমি আত্মগোপন করিয়াই বেড়াই। আমার সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে! জানি আমার সে পরিচয় লোকের উপহাসের খোরাক জোগাইবে। আমি যে একদা কানাইলাল, উল্লাসকরের বন্ধু ছিলাম, অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, বন্দেমাতরমের সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ যে একদিন আমার গুরু ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দকে যে একদা আমি দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছি —আমার এ পরিচয়ের কি এখন কোনও মূল্য আছে ? আমি জানি, নাই। তাই আত্ম-গোপন করিয়া বেড়াই। যেদিন দেশমাতৃকার বুকে খড়্গ হানিয়া হিন্দুস্থান পাকিস্থান হইল সেইদিনই আমি ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। স্ত্রী বহুদিন আগে মারা গিয়াছিলেন। ছিল একটিমাত্র পুত্র, সে মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। আমার শ্বশুরমহাশয় ছিলেন একজন রায়বাহাদুর, আমার শ্যালক বড় পুলিশ অফিসার। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না যে আমার পুত্র আমার সঙ্গে মানুষ হোক। মিথ্যাকথা বলিয়াছিল বলিয়া আমার ছেলেকে আমি একদিন চাবকাইয়াছিলাম। সেইদিনই আমার শ্যালক আসিয়া তাহাকে লইয়া যান। তাহার পর আর সে ফিরিয়া আসে নাই।

সন্ন্যাসীরা এদেশে এখনও খাইতে পায়। আমি সন্ন্যাসী বেশেই দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের দ্রুত অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি এখনও আমাদের দেশ গণতন্ত্রের উপযোগী হয় নাই। আমার অন্তরের হাহাকার, আমার লাঞ্ছিত আত্মসম্মানের মর্মন্তুদ বেদনা আমি কাহাকেও জানাই নাই। কাহারও করুণা বা অনুকম্পা আমি চাহি না। সত্যের ক্ষুরধার পথে একক যে যাত্রা আমি শুরু করিয়াছিলাম তাহা এইবার বোধহয় শেষ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া পার্থিব দুঃখ-কষ্টের উর্ধ্বে উঠিয়া কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বর্গরাজ্য একদিন এই পৃথিবীতেই নামিয়া আসিবে। তখন আর কোনও দুঃখ থাকিবে না।

আমি কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও মনকে ব্রহ্মে নিবন্ধ রাখিতে পারি নাই। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা, আমাদের ছল-চাতুরী, আমাদের নেতাদের ভণ্ডামি, সাহিত্যিকদের অধঃপতন আমার মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইয়াছে আমিই দণ্ডদাতা হইব। মা কালীর সম্মুখে বুকের রক্ত দিয়া লিখিয়া একদিন গুরুর কাছে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম—দেশকে উদ্ধার করিব। দুষ্টের দমন করিবার জন্য যদি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তাহাও দিব। পরাধীনতার পঙ্ক হইতে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইবে। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষণ অন্ধকারে একদিন যাত্রা করিয়াছিলাম। লক্ষ্যস্থলে পেঁছিয়াছি কি? এই চিন্তা মাঝে মাঝে আমাকে উন্মাদপ্রায় করিয়া তুলিত। ভাবিতাম আমিই দণ্ডদাতা হইব। কিন্তু যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি কই! ইহাই তো আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। আমরা বাক্যে বীর, হয়তো চিন্তার বীর, কিন্তু কর্মে বীর নই। কর্মক্ষেত্রে আমরা কেবল কেরানী, কেরানী ছাড়া আর কিছু নই। আমার প্রথম যৌবনে লর্ড কার্জনের সবুট পদাঘাত আমাদের মনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে, যে পরিবেশে মরণ-বিজয়ীর দল একদা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশকে পরাধীনতার পঙ্ক হইতে···না, এ সব কথা আর লিখিব না। বড় কষ্ট হইতেছে। যাহা লিখিব বলিয়া এখানে এই অজানা গ্রামের প্রান্তে অপরিচিত পরিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি সেই কথাটাই লিখিয়া ফেলি।

একটা পোড়ো বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছি। একটু দূরে দেখিতে পাইতেছি রঙীন-ছাপা-শাড়ি-পরা একটি মেয়ে জিলাপী ভাজিতেছে। আর তাহার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি শিশু। ওই মেয়েটিরই ছেলে বোধ হয়। ছেলেটি বারবার পিছন হইতে মেয়েটির বগলের নীচে মুখ ঢুকাইতে চাহিতেছে। স্তন্য পান করিতে চায়। মেয়েটি রাগিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ছেলেটি পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পাশের একটা সজিনা গাছে দুইটা কাক বসিয়াছিল। তাহারাও কা কা কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে। ময়রার দোকানের নীচে কয়েকটা চড়াই পাখী ও শালিকও ছিল, লক্ষ্য করিলাম তাহারাও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েটি হঠাৎ জিলাপীর কড়াই নামাইয়া ফেলিল, তাহার পর ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। মেয়েটির বয়স মনে হইল বেশী নয়। এইটিই বোধহয় প্রথম সন্তান। লক্ষ্য করিলাম ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি তাহাকে স্তন্যদান করিতেছে। নিজের শাড়ি দিয়া ছেলেটির আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিয়াছে। কেবল ছোট ছোট পা দুইটি বাহির হইয়া আছে। ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট আঙুলগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কি আনন্দেই দুধ খাইতেছে সে। না, সময় নষ্ট হইতেছে। লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ করি। যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ আসিয়া পড়িতে পারে। আমি যে একবারের জন্যও দণ্ডদাতা হইতে পারিয়াছি, অন্তত একবারও যে আমি আমার বিবেকের আদেশ মান্য করিয়াছি; এই কথাটা আমি লিখিয়া যাইতে চাই।

…বেনারসে রাজীবের সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এককালে একজন নিষ্ঠাবান টেররিস্ট ছিল। হঠাৎ দেখি সে প্রকাণ্ড একটা দামী মোটরে বসিয়া আছে। মুখখানা একটু ভারী হইয়াছে, চুলেও পাক ধরিয়াছে, কিন্তু চেহারা বদলায় নাই। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার কামানো থাকাতে তাহার যৌবনের মুখচ্ছবিটাই যেন দেখিতে পাইলাম। চিনিতে কষ্ট হয় নাই। আমি আগাইয়া গিয়া নিজের পরিচয় দিতে সে-ও আমাকে চিনিতে পারিল। শুধু তাই নয়, সমাদরে গাড়িতে তুলিয়া লইল। দেখিলাম সে বেশ বড়লোক হইয়াছে। শুধু কাশীতে নয়, কলিকাতায় এবং বম্বেতেও তাহার ফলাও ব্যবসা চলিতেছে। আমাকে বাড়িতে লইয়া গেল। প্রকাড পাকা বাড়ি, চারিদিকে প্রকাণ্ড হাতা। হাতায় চমৎকার বাগান। বড় বড় গোলাপ, বড় বড় ডালিয়া, বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা। রাজীবের বাড়িতে এক সপ্তাহ ছিলাম। ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম সে একজন কালোবাজারী। সে নিজেই আমাকে সব খুলিয়া বলিল একদিন। তাহার পর হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"তুইও আমার সঙ্গে চলে আয়। রাস্তায় রাস্তায় টো টো ক'রে ঘুরে মরছিস কেন? যদি রাজি থাকিস আমার বম্বের দোকানটার ভার তোর উপর দিতে পারি।"

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। যখন মুখ দিয়া কথা সরিল তখন বলিলাম, "রাজীব, তুই কালোবাজারী হয়েছিস একথা তোর মুখ থেকে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না।"

রাজীব হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল —"আমাদের দেশে এখন সবই কালোবাজার। যা দিনকাল পড়েছে তাতে এদেশে সৎপথে চলা যায় না। এদেশে প্রত্যেকে অসাধু হতে বাধ্য। আমাদের সে যুগের ইতিহাস এখন স্মৃতিমাত্র। সে স্মৃতিটুকুও এরা মুছে দিতে চাইছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আমি স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রেখেছি এখনও। দেখবি?"

একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া লোডেড রিভলবার বাহির করিল একটা।

"বারীনদা এটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রোজ এটাকে একবার প্রণাম করি। এ নিয়ে আর কিছু করা যাবে না এ যুগে। যা করা যাবে তাই করছি। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে। সেকেলে বিবেক একালে অচল। ফেলে দে ওটাকে। আবার নূতন ক'রে গীতা পড়। দেখবি কোন কাজই খারাপ নয়, যদি নির্বিকারভাবে করতে পারিস। টাকা না থাকলে এ যুগে কিছু করা যায় না। টাকা রোজগার ক'রে দেশের কাজেই সেটাকে দিয়ে দাও না। টাকা কিন্তু রোজগার করতে হবে। আমরাই তো এককালে ডাকাতি করেছি, মনে নেই?"

সেদিনই কথা প্রসঙ্গে সে বুবুর খবরটা আমাকে বলিয়াছিল। বুবুর ঠিকানাও দিয়াছিল। বুবু ঘুসখোর, বুবু মাতাল, বুবু চরিত্রহীন।

কথাটা শুনিয়াই আমার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। হয়তো ইহা আমার অহংকার, হয়তো দুর্বুদ্ধি,……।

সেইদিন রাত্রেই রিভলবারটি চুরি করিয়া লুকাইয়া বেনারস ত্যাগ করিলাম।

ট্রেন হইতে নামিয়াই বুবুকে দেখিতে পাইলাম। তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই বুঝিতে পারিলাম সে মদ খাইয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বাবাজী, টিকিট আছে তো?"

"টিকিট তো নেই। আমি সন্ন্যাসী লোক, টিকিট কেনবার পয়সা কোথায় পাব।"

আমার টিকিট ছিল, কিন্তু আমি বুবুকে পরীক্ষা করিতেছিলাম।

"টিকিট নেই? তাহলে ওই বেঞ্চে বস গিয়ে। পুলিস তোমার ব্যবস্থা করবে।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। হ্যাঁ, কাটা দাগটা ঠিক আছে। আমারই চাবুকের আঘাতে কপালটা কাটিয়া গিয়াছিল।

বলিলাম, "কিছু পয়সা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন বাবু।"

"কত পয়সা দেবে?"

একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলাম, "এর বেশী তো নেই।"

বুবু হাত বাড়াইয়া সিকিটি লইল।

"আচ্ছা যাও—"

পরমুহূর্তেই রিভলভারটা গর্জন করিয়া উঠিল। আমার বংশের শেষ প্রদীপটি সবল ফুৎকারে নিজেই নিবাইয়া দিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম।

লেখা শেষ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম। বুবুর রক্তাক্ত চেহারাটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তে পুলিশের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। বোধহয় একটু ঘুম আসিয়াছিল। খুট করিয়া শব্দ হইল। চোখ খুলিয়া দেখিলাম পুলিশ নয়। সেই মেয়েটি তাহার শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাতে একটি শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটি জিলাপী। ঠোঙাটি আমার পায়ের কাছে রাখিয়া সে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন ঠাকুর। বড্ড ভোগে—"

মনে হইল স্বয়ং দেশমাতৃকা যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

মৃত্যুর অতি সন্নিকটে আসিয়া অমৃতের সন্ধান মিলিয়া গেল।

ঠাকুমা

॥ ১ ॥

পুত্রের বিবাহ দিয়া শিবকিংকরবাবু দশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু পৌত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। মনে একটা দুঃখ লইয়াই তিনি মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে দুঃখ অনুভব করিতেন তাহা অপেক্ষা শতগুণ দুঃখ বাজিত তাঁহার স্ত্রী বিজয়ার বুকে। দশ বৎসর বিবাহ হইয়া গেল অথচ একটা ছেলে হইল না—বংশ লোপ হইয়া যাইবে যে! পুত্রবধূ লক্ষ্মী সত্যই রূপে গুণে লক্ষ্মী, তবু তাহার বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা আক্রোশ ঘনাইয়া উঠিত। কিছুতেই তাহার প্রতি তিনি যেন প্রসন্ন হইতে পারিতেন না। বধূটি যথাসম্ভব সসংকোচে বাস করিত সংসারে। ইহা তো তাহার দোষ নহে। কপালের দোষ। অকরুণ ভাগ্য-বিধাতার এ অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার তো নাই।

শিবকিংকরের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিজয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি আমার জীবনের সব সাধ পূর্ণ ক'রে দিয়েছ, এমন কি লণ্ডনের স্যাকরার তৈরি হার ব্রেসলেটও পরিয়েছ আমাকে। কোনও দুঃখ পাইনি জীবনে। কোনও সাধ অপূর্ণ রাখনি আমার। জীবনে একটি সাধ কেবল পূর্ণ হ'ল না। কিন্তু তা পূর্ণ করবার ক্ষমতা তো তোমার নেই। কারো নেই। ভবিতব্য!"

শিবকিংকর মৃদু হাসিয়াছিলেন কেবল। কোনও উত্তর দেন নাই।

॥ ২ ॥

শিবকিংকরের মৃত্যুর দুই মাস পরে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। লক্ষ্মী সন্তান-সম্ভবা হইল। প্রথমে কেহ বিশ্বাসই করিতে চায় না। স্থানীয় ডাক্তার বলিলেন—এখনও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। চতুর্থ মাসে লক্ষ্মীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল। একজন বড় ডাক্তার দেখিলেন। তিনি বলিলেন লক্ষ্মী সত্যই অন্তর্বত্নী। বিজয়া আগেই বাড়িতে শাঁখ বাজাইয়া দিলেন। মহাসমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠানো হইয়া গেল। লক্ষ্মীর কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মা এত কাণ্ড করিতেছেন শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হইয়া যায়। সে নিজেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে এ অসম্ভব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইবে। একটা অসম্ভব স্বপ্নকে কেন্দ্র করিয়া সকলের আশা ক্রমশ রঙীন হইতে রঙীনতর হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্মীর স্বামী বিজনবাবু নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও গোপনে গোপনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

॥ ৩ ॥

যথাকালে শিশু ভূমিষ্ট হইল।

বাড়ির সকলে যে আনন্দে অভিভূত হইলেন তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু বিজয়া শুধু আনন্দিতই হইলেন না, বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার একটু ভয়ও হইল।

আঁতুড় ঘরে সাধারণতঃ সব শিশুই অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়া থাকে। কিন্তু এ শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

বিজয়া ঝুঁকিয়া তাহার মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিলেন, "কি দাদু, কি দেখছ?"

বলিয়াই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। শিশুর চোখে শিবকিংকরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি নীরবে যেন তাঁহাকে বলিল, তোমার এ সাধও আমি পূর্ণ করিলাম।

বিজয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। আর একটা জিনিসও তাঁহার চোখে পড়িল। শিবকিংকরের দক্ষিণ গণ্ডে যে কালো তিল ছিল এ শিশুর গণ্ডেও তাহা রহিয়াছে। রোমাঞ্চিত কলেবরে তিনি নবজাতকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।*

॥ ৪ ॥

ইহার পর হইতে পাঁচ বছর যাহা ঘটিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। লক্ষ্মী খোকনকে প্রসব করিয়াছে বটে, কিন্তু খোকনকে মানুষ করিয়াছেন বিজয়া। খোকন চব্বিশ ঘণ্টা তাহার ঠাকুমার কাছে থাকিত। যখন দুধ খাইবার সময় হইত তখন তাহাকে মায়ের কাছে দিতেন। দুধ খাওয়া শেষ হইলেই আবার তাহাকে ঠাকুমার বুকে ফিরিয়া যাইতে হইত। ঠাকুমার স্নেহ খোকনকে অক্টোপাসের মতো জড়াইয়া ধরিয়াছিল। খোকন ঠাকুমার সহিত ঘুমাইত, উঠিত, বসিত, গল্প করিত, বেড়াইতে যাইত। ঠাকুমাই তাহার সব। ঠাকুমা তাহাকে মায়ের কাছে ঘেঁসিতে দিতেন না। লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকিত। নিজের ছেলে অথচ কাছে যাইবার উপায় নাই। শাশুড়ি সর্বদা আগলাইয়া আগলাইয়া বেড়াইতেছেন।

॥ ৫ ॥

আরও বছর দুই কাটিল। ঠাকুমার নয়নমণি হইয়া খোকন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। লক্ষ্মীও এখন লক্ষ্য করিল যে খোকনের মুখভাব অনেকটা শিবকিংকরের মতো। একদিন সে আড়াল হইতে শুনিল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন,—

"দাদু, আমাকে তোর পছন্দ হয়?"

"হ্যাঁ খুব, কেন?"

"আমাকে বিয়ে করবি?"

খোকন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"তোমাকে বিয়ে করতে যাব কেন? তুমি তো বুড়ী, মাথার চুল পাকা—"

"আমি বাইরে বুড়ী রে! ভিতরে ভিতরে আমি তোর বয়সী। আমার ছবি দেখবি?"

বিজয়া উঠিয়া গেলেন এবং নিজের ট্রাংকের ভিতর হইতে প্রাচীন একটি অ্যালবাম বাহির করিয়া আনিলেন। এ অ্যালবাম লক্ষ্মী কখনও দেখে নাই।

"এ কিসের অ্যালবাম মা?"

"আমার বাপের বাড়ির অ্যালবাম। আমার ছেলেবেলার দু'একটা ছবি আছে। দাদুকে দেখাই।"

অ্যালবাম খুলিয়া একটি ছবি তিনি দেখাইলেন। চার পাঁচ বছরের একটি খুকী হাসিমুখে চাহিয়া আছে। ছবিটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবু চেহারাটা বেশ স্পষ্ট আছে। লক্ষ্মীর মনে হইল, চোখের দৃষ্টি কি প্রখর।

॥ ৬ ॥

কিছুদিন পরে বিজয়া অসুখে পড়িলেন। জ্বর আর কাসি। বিজয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই চিরকাল অভ্যস্ত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাধির

আর উপশম হয় না। শেষে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেই হইল। তিনি বলিলেন যক্ষ্মা হইয়াছে। তখন যক্ষ্মার সুচিকিৎসা ছিল না তেমন। মৃত্যুই তখন যক্ষ্মার অনিবার্য পরিণতি ছিল।

বিজয়া কাসিতেছিলেন, খোকন তাঁহার সামনে বসিয়াছিল। ডাক্তারবাবু একদিন লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার ছেলেকে ওঁর বিছানায় যেতে দেবেন না। রোগটা ছোঁয়াচে।

লক্ষ্মী বিবর্ণ মুখে চুপ করিয়া শুনিল। কিন্তু সে জানিত শাশুড়ি খোকনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত থাকিতে পারিবেন না। তবু সে একদিন বলিল, "ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন খোকনকে আপনার বিছানায় না বসতে দিতে। রোগটা নাকি ছোঁয়াচে।"

"তোমার ডাক্তারবাবু কিছু জানে না। ওর ওষুধ আর আমি খাব না। ওকে আর আসতে হবে না।"

সেদিন হইতে বিজয়া সব ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

॥ ৭ ॥

একদিন লক্ষ্মীর কানে গেল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন, "দাদু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"কোথায়?"

"আমি যেখানে যাব।"

"তুমি কোথায় যাবে?"

"সে আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবি।"

"তুমি যাবে কেন? তুমি যাবে না।"

"আমাকে যেতেই হবে। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না! তোকেও যেতে হবে।"

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না।

"কি সব অলুক্ষণে কথা বলছেন মা—"

বিজয়া ইহার উত্তরে কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রিণীর দৃষ্টির মতো জ্বলিতে লাগিল।

মাসখানেক পরেই বিজয়া মারা গেলেন।

॥ ৮ ॥

মৃত্যুর পর দিনই খোকন জ্বরে পড়িল। সাতদিন পরেই মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিল। ডাক্তারবাবু আসিলেন। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কোনও আশা দিতে পাচ্ছি না। গ্যালপিং থাইসিস। ভগবানকে ডাকুন। আমাদের যা করবার সব করেছি।"

সেদিন বর্ষণ-মুখরিত অন্ধকার চতুর্দিকে। খোকন একটু ভালো আছে। লক্ষ্মী তাহার গায়ে হাত দিয়া শুইয়া আছে। চোখ বোজা, কিন্তু ঘুমায় নাই। খোকনের বাবার টুরের চাকরি। তিনি দুইদিন আগে মুঙ্গেরে চলিয়া গিয়াছেন।

"দাদু—"

বিজয়ার কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মী তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সামনের কপাটটা বন্ধ। তাহার ওপার হইতে শব্দটা আসিল।

"দাদু—"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া ফেলিল। সম্মুখে আবছা অন্ধকারে দেখিল বেণীদোলানো ছোট একটা ফ্রক পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখে প্রখর দৃষ্টি, মুখে হাসি।

"দাদু, আয়—"

লক্ষ্মী সভয়ে দেখিল খোকনও উঠিয়া বসিয়াছে। তারপরই সে আবার শুইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিল—মুখে রক্তের দাগ, দেহ প্রাণহীন।

মৃত্যুঞ্জয়

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিল এবার লাউডস্পীকার আনানো হয় নাই। ঝুমরির মায়ের কণ্ঠেই এবার লাউডস্পীকার বাজিতেছে। ঝুমরির মা তাহার বাঁকা কোমর সোজা করিয়া গলার শির ফুলাইয়া কাংস্য-কণ্ঠে যেভাবে তাহার ভাসুর-পো শিবলালের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতেছে, তাহাতেই যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। সে গোলমালে অবশ্য গানের লেশমাত্র নাই, কিন্তু গান যে একেবারে নাই তাহা নহে, মৃত্যুঞ্জয় জানে গানও আছে। সে গান ঝুমরির বুকের ভিতর বাজিতেছে। আর কেহ না শুনুক মৃত্যুঞ্জয় শুনিতে পাইতেছে সেটা। সে গানের গমক ঝুমরির চোখেমুখে ভাবে-ভঙ্গীতে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।

ঝুমরির জাঠতুতো দাদা শিবলাল 'চুমানা'য় আপত্তি করিয়াছিল। সে বলিতেছিল যে যদিও কাহার-সমাজে বিধবারা 'চুমানা' নামে একটা প্রহসন করিয়া দ্বিতীয় একটা পুরুষের সঙ্গে বাস করে, সেটা কি উচিত, না শোভন? বাধ্য না হইলে কাহারও 'চুমানা' করা উচিত নয়। শিবলালের মুখে একথা শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিল। ঝুমরির মা শিবলালকে তীক্ষ্মকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তবে তুই বউ মরিতে না মরিতে 'চুমানা' করিতে গেলি কেন।

শিবলাল বলিল, সে কখনই 'চুমানা' করিত না যদি ঝুমরির মা কিংবা ঝুমরি তাহার সংসারের ভার লইত। কিন্তু সে দিকে কেহ দৃকপাতও করিল না। সে একা কি পাঁচটা ছেলেমেয়ে লইয়া সামলাইতে পারে? বাধ্য হইয়া সে 'চুমানা' করিয়াছে।

এই সব যুক্তি মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ভালো লাগিতেছিল। কিন্তু যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকিল না। দেখা গেল ঝুমরি 'চুমানা' করিবেই এবং রামটহলকেই করিবে। তাহার মতে রামটহলের মতো যুবক বিরল। ঝুমরির দুটি মেয়ে আছে—সুখিয়া এবং দুখিয়া। দুজনেই খুব ছোট। রামটহল বলিয়াছে তাহার দুই মেয়ের ভারই সে 'গছিয়া' লইবে।

মেয়েরা বড় হইলে তাহাদের স্কুলে পড়াইবে, তাহার পর ধুমধাম করিয়া বিবাহ দিবে। রামটহলকে খুব পছন্দ তাহার। খুব ভালো। বয়সও অল্প। ঝুমরির চেয়ে বোধ হয় ছোটই। জব্বলপুরে পাকা ঘরদুয়ার আছে। চোখে মুখে কেমন একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। চমৎকার!

শিবলাল আর একটা 'হক্' কথাও বলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল একথা শুনিয়া হয়তো ঝুমরির মা অন্তত একটু ভাবিবে।

শিবলাল বলিয়াছিল—"যদি 'চুমানা' করতেই হয় তাহলে নিজের জাতের চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে করাই উচিত। নয়াবাজারের দুখন, ভিখনপুরের লখিয়া, আমাদের জাত, লোকও ভালো। অবস্থাও খারাপ নয়। দুখন বিড়ি পাকায়, লখিয়া রিক্‌শ টানে। এদের বউও অনেকদিন আগেই মরেছে, এরা দুজনেই 'চুমানা' করতে চায়। ঝুমরিকে পেলে তারা লুফে নেবে।"

এ কথাটা অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের ভালো লাগে নাই। ঝুমরিকে কেহ লুফিয়া লইতেছে এ দৃশ্যটা মোটেই মনোরম মনে হয় নাই তাহার। তবে এসব কথা শুনিয়া ঝুমরির মা যদি মত বদলায় এই আশায় ছিল সে।

মত কিন্তু বদলাইল না। ঝুমরির মা বলিল—"ঝুমরি যাকে পছন্দ করেছে তাকেই 'চুমানা' করুক। তুমি নিজেই তো অনেক দেখেশুনে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলে। তখন অনেক কিছু বলেছিলে তুমি। আমরাও তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, একটা ন্যাংটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। তার নিজের ঘরদুয়ার কিছু ছিল না। ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকত সে। রোজগার করত না এক পয়সা। তার ওপর ছিল রুগী। থাইসিস ছিল। আমাদের ডাক্তারবাবু তাকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল। তাই বেঁচেছিল কিছুদিন। না বাঁচলেই ভালো হ'ত। বেঁচে ছিল ব'লেই পর পর দুটো মেয়ে হ'ল। লাভ হ'ল কি তাতে! তুমি আর বিয়েতে কথা বলতে এসো না। ও নিজে পছন্দ ক'রে যাকে 'চুমানা' করছে তাকেই করুক।"

মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মর্মান্তিক কথাগুলি শুনিল। তাহার পর সুখিয়া দুখিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল খানিকক্ষণ।

ঝুমরির মা বলিল, "আমাদের সমাজে 'চুমানা' কে না করছে? আমিই তো আমার বড় ব্যাটার 'চুমানা' করিয়েছি। ঝুমরির কিই বা বয়স। এখনও চব্বিশ বছর পার হয়নি, তুমি আর বাগড়া দিতে এসো না।"

শিবলাল তবু ছাড়ে নাই। ঝুমরিকে আলাদা ডাকিয়া বলিয়াছিল—"তুই জব্বলপুরের ওই অচেনা ছোঁড়াটার সঙ্গে জুটেছিস কেন? ওকে কে চেনে? ও যে আমাদের জাত তারই বা ঠিক কি? যদি 'চুমানা' করতেই চাস আমি চেনা-শোনা ভালো ছেলে দেখে দিচ্ছি।"

ঝুমরি ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কানে মধুবর্ষণ করে নাই।

ঝুমরি বলিয়াছিল—"আমি স্বেচ্ছায় কুয়ায় ঝাঁপ দিচ্ছি তোমাদের তাতে কি? আমার ভৌজি (বৌদি) যখন মেরে আমাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিল তখন তোমরা কেউ আমাকে বাঁচাতে আস নি। আমি বাবুদের বাড়িতে 'নোকরি' ক'রে অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন তোমরাই আমার নামে ফুসফুস গুজগুজ ক'রে

নানারকম বলতে। দু'তিনটে বদমাস গুন্ডা সত্যিই রোজ আমার পিছু পিছু ঘুরতো, কিন্তু কই তোমরা তো কেউ এসে তাদের আটকাও নি! আমি নিজে রোজগার ক'রেই বরাবর খেয়েছি, তোমরা কেউ কোনদিন ডেকে আমাকে একমুঠো খেতেও দাওনি। এখন আমি একজনকে পছন্দ ক'রে 'চুমানা' করতে যাচ্ছি আর তুমি ফফরদালালি করতে এসেছ। লজ্জা করে না তোমার? তুমিই তো আমার সর্বনাশ করেছ, কি লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে তা কি তোমার মনে নেই—?"

ঝুমরির চোখ দিয়া যেন আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। নির্বাক নিরুপায় মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া দেখিল সব। বুঝিল ঝুমরিকে আর রোখা যাইবে না, সে রামটহলকেই চুমানা করিবে। সহসা মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে পড়িল, ঝুমরির ছোট মেয়েটা ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। সুখিয়াও ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে একধারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা হইল দুখিয়াকে কোলে তুলিয়া লয়। কিন্তু পারিল না।

যেদিন 'চুমানা' হইবে সেদিনও মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির পাশে পাশে ঘুরিতেছিল। নীরবেই 'চুমানা'র আয়োজন দেখিতেছিল সে। এমন সময় দেখা গেল বাহিরে একটা অচেনা লোক আসিয়াছে। সে বলিল জব্বলপুর হইতে রামটহলের বাবা তাহাকে পাঠাইয়াছে। তাহার বাবা খবর পাঠাইয়াছে যে, বেবা (বিধবা) মেয়ের সহিত রামটহলের চুমানা সে হইতে দিবে না। একটি কুমারী মেয়ের সহিত রামটহলের বিবাহ দিবে। শিবলাল নিকটে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় বুঝিল শিবলাল শেষ চেষ্টা করিতেছে। শিবলালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শেষ চেষ্টাও বিফল হইল। ঝুমরির মা সিংহিনীর মতো আগাইয়া আসিয়া গালাগালির তুবড়ি ছুটাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হইল লাউড-স্পীকারের অভাব পূর্ণ হইল এতক্ষণে!

পাড়ার সবাই আগাইয়া আসিয়া বলিল, এখন সব আয়োজন হইয়া গিয়াছে। এখন 'চুমানা' বন্ধ হইবে না। রামটহল সেই লোকটিকে বলিল, তোমাকে আমি চিনি না। যাই হোক, তুমি বাবুজিকে গিয়া বল আমি এখানেই 'চুমানা' করিব। কুমারী মেয়ে আমার চাই না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন।

শিবলালের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিতে লাগিল যদিও লাউডস্পীকার বাজিতেছে না কিন্তু অন্যান্য আয়োজন কিছু কম হয় নাই। রামটহল ঝুমরির জন্য অনেক জিনিস আনিয়াছে। দামী শাড়ি, দামী জামা, গহনাও অনেক। রুপার গহনাই বেশী, একটা সোনার টিকলিও আছে। ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আসিয়াছে। খাজা, টিকরি, বোঁদে, 'সেও'-ভাজা, মণ্ডা, লুচি। অনেক।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় দেখিতে পাইল সুখিয়া, দুখিয়ার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। রামটহল তাহাদের জন্যও রঙীন জামা কিনিয়া আনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নীরবে সব দেখিতে লাগিল। একবারও তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করিল না। একবারও না।

অবশেষে সিন্দুর-দান হইয়া গেল। সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া এবং তাহার উপর সোনার টিকলি ঝুলাইয়া ঝুমরিকে অপরূপ দেখাইতেছিল। সত্যই অপরূপ।

মৃত্যুঞ্জয় নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি তিনটার সময় দুইটা রিকশায় চড়িয়া বর-বধূ তাহাদের নূতন বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। মৃত্যুঞ্জয়ও তাহাদের রিকশার পিছু পিছু চলিল।

মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির প্রথম পক্ষের স্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাগলীর হাসি

আমাদের মন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখে। সর্বদাই সে এ কাজ করিতেছে। তাহার এই সংগ্রহশালার নাম স্মৃতি-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে সংগ্রহের পদ্ধতিটি কিন্তু অদ্ভুত। তাহা কোনও সামাজিক বা সাংসারিক নিয়ম মানিয়া চলে না। সেখানে ধনীর পাশে দরিদ্র বা মহারাজার পাশে ভিখারীর ছবি মোটেই বেমানান নয়। হাসির পাশে অশ্রু, সবলের পাশে দুর্বল, গম্ভীরের পাশে অগম্ভীরের সমাবেশ সেখানে দুর্লভ নয়। সকলের মনের মধ্যেই এই বিচিত্র 'মিউজিয়ম' আছে। আমরা কিন্তু সর্বদা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। প্রায়ই দেখা যায় একটা অন্যমনস্কতার পরদা এই সংগ্রহশালার দ্বারে ঝোলানো আছে। মাঝে মাঝে কিন্তু পরদাটা কোনও প্রবল আবেগের হাওয়ায় উড়িয়া যায়, তখন হঠাৎ আমরা এই বিচিত্র সংগ্রহের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া যাই। হয়তো একটা ছবি, হয়তো একটা অজানা ফুলের হঠাৎ-ভাসিয়া-আসা সৌরভ আমাদের আকুল করিয়া তোলে।

বিজন ডাক্তারও সেদিন একটি হাসির দিকে চাহিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল,—কি মনে হইল—তাহা পরে বলিব।

হাসিটি তিনি দেখিয়াছিলেন প্রথম যৌবনে। তখন তিনি চাকুরি করিতেন। সাঁওতাল পরগণার এক ডিস্‌পেন্সারিতে ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারখানার সামনে ভালো 'পীচ্'-বাঁধানো রাস্তা, সেই রাস্তার উপর বাস্-স্ট্যান্ড (bus stand) এবং সেই বাস-স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি দোকান। চায়ের দোকান; খাবারের দোকান, একটি ছোটখাটো হোটেল, পান-বিড়ির দোকান, একটি মনিহারী দোকানও। যখন 'বাস্' আসিত তখন সেই দোকানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো একটা মেলা বসিয়া যাইত যেন। নানারকম লোক। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল সব রকম লোকই আসিত। এই ভিড়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু হঠাৎ একদিন সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো চেহারা তাহার। সর্বাঙ্গে যৌবন প্রস্ফুটিত, মুখে একটা মৃদু মুচকি হাসি। বড় বড় চোখ দুইটিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। একপিঠ চুল। কখনও আলুলায়িত, কখনও খোঁপা-বাঁধা। খোঁপার উপর মাঝে মাঝে ফুলও থাকিত, কখনও পলাশ, কখনও জবা, কখনও বা আর কিছু। যখন ফুল জুটিত না, তখন গাছের সবুজ পাতাই সে খোঁপায় গুঁজিয়া দিত। পরনে আড়-ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাঝে মাঝে তালি-দেওয়া। কখনও ভালো শাড়িও পরিত, হঠাৎ দেখা যাইত ডগমগে রঙের একটা শৌখিন শাড়ি পরিয়া আছে। গায়ে কখনও জামা পরিত না, বুকের আঁচল সম্বন্ধেও খুব সচেতন থাকিত না সে, আঁচল বার বার খসিয়া

যাইত, ভ্রুক্ষেপ ছিল না তাহার। তাহার বাহিরের পোশাক মাঝে মাঝে বদলাইত বটে, কিন্তু তাহার মুখের হাসিটির কখনও পরিবর্তন হইত না। বিজন ডাক্তার যখনই তাহাকে দেখিতে পাইতেন, দেখিতেন তাহার মুখের সেই মৃদু মুচকি হাসিটি এবং চোখের কৌতুকদীপ্তি ঠিক তেমনই আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত—এই অনড় হাসির অর্থ কি। সকলে যে তাহার দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ইহা কি তাহারই প্রতিক্রিয়া? কিন্তু বিজনবাবু ও হাসিতে গর্বের কোন আভাস তো পাইতেন না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি, না কৌতুকের? বিজনবাবু ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। আর একটা ব্যাপারেও তাঁহার খুব অবাক লাগিত। অমন রাজরানীর মতো চেহারা কিন্তু ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। লোক নাম দিয়াছে পাগলী। কোন্ জেলার লোক ঠিক বোঝা যায় না। বাংলা কথা বলে, কিন্তু একটু বীরভূমি টান আছে, ক্রিয়াপদগুলি শুদ্ধ। অনেকে বলে ও জাতে বাউরি। কিন্তু রং কালো নয় বরং বেশ ফরসা। অনেকের মতে ওর মা নাকি এক সাহেবের রক্ষিতা ছিল। মোটকথা তাহার আসল পরিচয় কেহ জানিত না। মাঝে মাঝে সে বিজন ডাক্তারের বাড়িতে আসিয়াও হানা দিত। বিজনবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিত, "মাইজি, খাইতে দে, দু'দিন কিছু খাই নাই।"

বিজনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিতেন, "ভিক্ষে ক'রে পয়সা পাস, দু'দিন অনাহারে আছিস?"

"পয়সা পাই তো। এই যে! এইগুলো কিনলোম।"

কাপড়ের আঁচল হইতে প্ল্যাসটিকের-তৈরী কয়েকটা মাথার ফুল আর একগোছা রঙীন চুলের কাঁটা বাহির করিল। মুখে সেই মৃদু মুচকি হাসি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খেয়ে এই সব কিনেছিস? পাগলী সাধে বলে!"

পাগলীর চোখের কৌতুকদৃষ্টি আরও চিকমিক করিয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরে যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে পাগলী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে আসন্ন মাতৃত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট। সবাই ইহা লইয়া হাসি-তামাশা করিত। কোথাও খানিকটা বিষ্ঠা বা কফ পড়িয়া থাকিলে যেমন মাছি ভনভন করে তেমনি অশ্লীলতা-গন্ধী কিছু একটা পাইলে তথাকথিত রসিকেরও অভাব হয় না। পাগলীকে দেখিলেই অনেকে ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করিত তাহার নাগরটি কে, কোথায় থাকে। পাগলী কোন জবাব দিত না, রাগও করিত না মুখে মৃদু মুচকি হাসিটি ফুটাইয়া চুপ করিয়া থাকিত। সকলের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিত যেন কিছুই হয় নাই। তাহার চরিত্রের এই নূতন দিকটার পরিচয় পাইয়া দাতার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ রোজ প্রায় এক টাকা রোজগার করিত সে।

একদিন আবার সে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল।

"মাইজি, খাইতে দে। দু'দিন কিছু খাই নাই।"

"মুখপুড়ি, তোর লজ্জা করে না? এতো পয়সা পাস, কি করিস তা দিয়ে?"

"পয়সা পাই তো, এইগুলো কিনলোম।"

পেটকাপড় হইতে কয়েকটা ছোট ছোট জামা, একজোড়া ছোট মোজা এবং একটা

ছোট টুপি বাহির করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার-গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন তাহাকে খুব বকিবেন, কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসির দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রান্নাঘরে বাসী ভাত ছিল তাহাই বাহির করিয়া দিলেন। পাগলী বেশ খাইতে পারিত। সামান্য ডাল ও তরকারি দিয়া অনেকগুলি ভাত খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, "পেট ভরে নাই।—আরও দাও।"

"আবার কি দেব ? আর কিছু নেই। যা এখন।"

"ওই শশাটা দাও।"

তরকারির ঝুড়িতে একটা শশা ছিল। পাগলী সেইটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দিতেই হইল শশাটা। বাঁ হাতে শশাটা ধরিয়া কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতেই চলিয়া গেল। ডাক্তার-গৃহিণীর রাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরেই আবার প্রত্যাশিত দৃশ্যটি দেখা গেল। একটা সদ্যোজাত শিশুকে বগলদাবা করিয়া পাগলী বাস্-স্ট্যান্ডে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। শিশুর গায়ে নূতন জামা, পায়ে নূতন মোজা, মাথায় নূতন টুপি। তবু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে সে। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাইতেছে না। সকলের সামনে বুকের কাপড় খুলিয়া পাগলী তাহাকে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তবু তাহার কান্না থামিতেছে না। এজন্য কিন্তু পাগলীর মুখে কোনও বিরক্তি, আশঙ্কা বা বিব্রতভাব ফুটিয়া উঠিল না। ইহা লইয়া অনেকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গও করিল, কিন্তু পাগলীর মুখের মুচকি হাসিতে কোনও পরিবর্তন ঘটিল না। সে মুখের মুচকি হাসি বজায় রাখিয়াই তাহার রুদ্যমান সন্তানকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তার-গৃহিণী একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই ছেলেটাকে মেরে ফেলবি দেখছি। আমাকে দে আমি ওকে মানুষ করি।"

তাঁহার কোলে তখনও কোনও সন্তান আসে নাই। বীরেনের জন্ম হইয়াছিল অনেক পরে।

ওকথা শুনিয়া পাগলী ডাক্তার-গৃহিণীর দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের মুচকি হাসিতে আর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল যেন। ধীর শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল—"না, দিব না।"

কিছুদিন পরে দেখা গেল পাগলীর কোলে শিশুটি নাই। কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসিটি ঠিক আছে।

ডাক্তার-গৃহিণী একদিন ডাকিলেন তাহাকে।

"তোর খোকা কোথা ?"

"থাকল না, চলে গেল, মরে গেল।"

তাহার মুখের মৃদু হাসিটির দিকে চাহিয়া বিজন ডাক্তার অবাক হইয়া গেলেন। শোকের ছায়া সে হাসিকে একটুও ম্লান করে নাই।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রায় দশ বৎসর। অনেক ঠাকুরের নিকট অনেক আরাধনা করিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর কোলে বীরেন আসিয়াছিল। সে-ও কিন্তু

বেশীদিন রহিল না। হঠাৎ একদিন মারা গেল। বিজন ডাক্তার শোকাচ্ছন্ন হইয়া ছাতের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা শোকাবেগে তাঁহার মনের সংগ্রহশালার পরদাটা উড়িয়া গেল। তিনি সেই পাগলীকে দেখিতে পাইলেন, মৃদু মুচকি হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

বিজন ডাক্তারের সহসা মনে হইল নিষ্ঠুর নিয়তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমিও যদি অমনি হাসি হাসিতে পারিতাম!

ঢেউ

সেদিন খুব ভোরে খোকনের ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে কে যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল তার। ঠিক বুঝতে পারল না কি হ'ল। এপাশ ওপাশ করতে লাগল বিছানায়। ছোট্ট ছেঁড়া খাটিয়ায় বিছানা তার। বিছানাটাও ছেঁড়া আর ময়লা। দুঃখের জীবন খোকনের। মা-বাবা বহুকাল আগে মারা গেছেন। দূর-সম্পর্কের এক পিসের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সে। বয়স বছর সাতেক। লেখাপড়া এখনও আরম্ভ হয়নি। দিন-রাত পিসীমার ফরমাস খাটতে হয় কেবল। বাসন-মাজা কাপড়-কাচা সব। পিসেমশাই এক বাসনের দোকানে কাজ করেন। একটা চাকরের মাথায় কিছু বাসন চাপিয়ে 'চাই বা—সো—ন' বলে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি ক'রে বেড়ান। খোকনের খুব ইচ্ছে করে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে। কিন্তু পিসীমা যেতে দেন না।

খোকন চোখ বুজেই শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে পড়ল ঘুমই যখন আসছে না তখন বাসনগুলো মেজে ফেলা যাক। কাল রাত্রে যে থালাবাটিগুলো এঁটো হয়েছে সেগুলো কলতলাতেই প'ড়ে আছে। কলে জল ছিল না ব'লে ধোওয়া হয়নি।

এখন হয়তো কলে জল এসেছে। বাসনগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। কাজ চুকিয়ে রাখাই ভালো। উঠে পড়ল খোকন। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল পিসেমশায়ের ঘরের কপাট তখনও বন্ধ। তখনও ওরা কেউ ওঠেনি। খোকন উঠোনে গিয়ে জলের কলটা ঘোরাতেই কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। জল বেরুল না, বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি মুণ্ডু, একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ! ছোট্ট কচি খুকীর মুখ।

"তুমি খোকন?"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে খুকী।

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে চেন নাকি।"

"চিনি বই কি, যারা দুঃখী সবাইকে আমি চিনি। কতদিন এই কলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে তোমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি তুমি ঘুমুচ্ছ। তোমাকে ওঠাই নি। প্রায়ই তোমার কাছে আসি কিন্তু। আজ আমিই তোমার মনে ঢুকে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি।"

"তুমি কে?"

"আমি পরী। আমার নাম ঢেউ।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কি মিষ্টি হাসি!

"তুমি ঢেউ? কিন্তু তোমার চেহারা তো মানুষের মতো।"

"আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি হ'তে পারি! দেখবে—"

চট ক'রে ছোট্ট একটি পদ্মফুল হ'য়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হ'য়ে গেল আবার।

খোকনের বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। সে চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইল খুকীর দিকে। তার একটু গা ছমছমও করছিল। ভুত নয় তো!

"না আমি ভুত নই"—মুচকি হেসে বলল সে—"আমি পরী, আমি ঢেউ, আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, অচেনাকে চিনতে চাই। তাই তো তোমার কাছে এসেছি—"

"কলের নল দিয়ে এলে, তুমি জলে থাকো নাকি? শুনেছি একরকম জলপরী আছে—"

মিষ্টি হাসিতে আবার ভ'রে গেল তার মুখটা।

"এখন আমি জলে আছি, আমাকে জলপরী বলতে পার। কিন্তু আমি সব সময়ে জলে থাকি না। স্থলেও থাকি, আকাশেও থাকি। তোমাদের বাড়ির পাশের শিউলি গাছটাতে শিউলি ফুল হ'য়ে ফুটেছিলাম এক রাত্রে। তার পরদিন সকালেই ঝ'রে গেলাম। চ'লে গেলাম আকাশে। তারাদের সঙ্গে কাটালাম কয়েক রাত্রি। এখন জলে ভেসে বেড়াচ্ছি। তোমাদের গঙ্গার জলে কিছুদিন হ'ল এসেছি। তার আগে ছিলাম সমুদ্রে। সেখানে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি। কত রকম শাঁখ, কত রকম ঝিনুক, কত রকম মাছ, কত রকম হাঁস আর পাখি, কত রকম সাপ। নানা রঙের, নানা মাপের, নানা মেজাজের। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ছোট্ট রুপোলী পাখিটাকে। ইংরেজিতে ওটার নাম সিলভার বার (Silver bar), দেখলাম ছোট ছোট চারটি বাচ্চাকে মানুষ করছে। আর দেখেছি প্রকাণ্ড কালো চিলের মতো আকাশচারী শিকারী পাখিদের। একটার নাম রিনচপ্স্ (Rhynchops), আমি নাম দিয়েছিলাম কালো যমদূত, আর একটা অস্প্রে (Osprey)—বাংলা নাম বোধহয় উৎক্রোশ। কি বিশাল ডানা তাদের, বড় বড় মাছ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—"

খোকন বলল, "সাগরেই না মুক্তা থাকে শুনেছি—"

"থাকে। তোমার জন্যে তিনটে ভালো মুক্তা এনেছি। যাবার আগে দিয়ে যাব। তার আগে একটা কথা বলি শোন। তুমি অত ভীতু কেন? ভয় কিসের? ভয় মিথ্যা, ভয় নেই—"

"কিন্তু আমি যে ছোট, আমি যে গরিব, আমি যে দুর্বল—"

"কিন্তু ওইটেই তো ভুল। তুমি যদি ক্রমাগত ভাব আমি ছোট, আমি দুর্বল, আমি গরিব তা'হলে সত্যিই তুমি তাই হ'য়ে যাবে। তোমাকে ভাবতে হবে আমি বড়, আমি মহাধনী, আমার শক্তির সীমা নেই, তাহলেই তুমি বড় হ'তে পারবে—"

"তাই নাকি—"

"হ্যাঁ। তুমি নিজেই জান না তুমি কে! সেইটে জানতে চেষ্টা কর। তাহলেই তোমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এই কথা বলতেই আমি এসেছি।"

বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

"তোমার নাম ঢেউ?"

"হ্যাঁ আমি জলের ঢেউ, স্থলের ঢেউ, আকাশের ঢেউ, শব্দের ঢেউ, আলোর ঢেউ, ইথরের ঢেউ, ঝড়ের ঢেউ, আবার মৃদু হাওয়ারও ঢেউ। রেডিওতে তোমরা আমারই

গলা শোন, আলোতে তোমরা আমাকেই দেখ, আমিই বহন ক'রে আনি গান আর গর্জন। যে মহাকাশযাত্রীরা এখন আকাশ-পরিক্রমা করছেন আমি তাঁদের সঙ্গে আছি—"

হঠাৎ খুকী রূপান্তরিত হ'ল একটা জ্যোতির্ময় আলোক-শিখায়। খোকন সবিস্ময়ে দেখল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে অপূর্ব শিহরণে !

"ঢেউ, ঢেউ তুমি কোথা গেলে—"

চীৎকার করে উঠল খোকন।

"এই যে আছি—"

শিখা আবার রূপান্তরিত হল খুকীতে।

"তুমি কি এখনই চ'লে যাবে ? আমার ঘরে এস না একবার।"

"আমি বেশীক্ষণ এক জায়গায় থাকতে পারি না। এখনই চ'লে যেতে হবে আমাকে। এই নাও—"

"কি—"

"এই মুক্তো তিনটে এনেছিলাম তোমার জন্যে, নাও, ধর—। এরা সাধারণ মুক্তো নয়, এর একটি সত্য, একটি শিব আর একটি সুন্দর। এদের খুব মুঠো ক'রে চেপে ধর। এরা তোমার মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যাবে। প্রবেশ করবে তোমার দেহে, মনে, কল্পনায়।"

খোকন মুক্তো তিনটি হাতে মুঠো ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সবিস্ময়ে। একটু পরে মুঠো খুলে দেখল হাত খালি। মুক্তো তিনটি অন্তর্ধান করেছে।

"বাঃ"

হাততালি দিয়ে উঠল ঢেউ।

"এইবার দেখো, কি হয়। আমি চললুম।"

জলের কলের ফাঁক দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

হ'তে পারে এটা স্বপ্ন।

খোকন কিন্তু অস্বীকার করে। সে বলে প্রত্যক্ষ দেখেছিল সে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। খোকন সত্যিই বড়লোক হয়েছে। তার অসামান্য প্রতিভাবলে অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যে উজ্জ্বল করেছে দেশের মুখ। তার প্রতিভার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। সে আজ দেশের গৌরব।

একদিন সে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিল। চেয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। তার মনে হ'ল সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

শেষ ছবি

প্রথম যৌবনে তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বন্ধুত্ব হইবার পর মনে হইয়াছিল এমন একটা জিনিস পাইলাম যাহা সহজে পাওয়া যায় না। রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় বেশ ভালো নম্বর পাইয়াছিলাম। সেই নম্বরই আমাকে ঠেলিয়া

প্রেসিডেন্সী কলেজের কলে তুলিয়া দিয়াছিল। কলে দেখিলাম বাঁশী হাতে শ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শ্যাম যে রাধার উদ্দেশ্যে বাঁশী বাজাইতেছে সে বৃন্দাবনবাসিনী রাধা নহে, সে বিদেশিনী। কখনও ফরাসী দেশে থাকে, কখনও বা রাশিয়ায়। সাহিত্যের কুঞ্জবনে শ্যামচাঁদ সেই অশরীরিণী নায়িকার মাঝে মাঝে দেখা পাইত এবং বাঁশী বাজাইত। সেই নায়িকা মুগ্ধ হইয়াছিল কি না জানি না কিন্তু আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। একজোড়া বাঁয়া-তবলা জোগাড় করিয়া তাহার সহিত মাতিয়া গেলাম স্বর-সাধনায়। কিছুদিন পরে আরও জমিয়া গেল, সুরের আসরে সুরা দেবীও আসিয়া যোগ দিলেন।

সকলে আমাদের বলিত মাণিকজোড়। এক সঙ্গে শোয়া-বসা, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, এক চায়ের দোকানে আড্ডা মারা, এক সঙ্গে কন্টিনেন্টাল উপন্যাস পড়া, এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখা। হায়, প্রগতির পথে পিতারা চিরকাল কণ্টকস্বরূপ। আমার পিতা একেবারে পর্বতের মতো পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম, অবিলম্বে চলিয়া এস। গেলাম। পিতা গাল-মন্দ করিলেন না, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে আর কলিকাতায় পড়িতে হইবে না, এখানকার কলেজেই ভরতি হইয়া যাও। পিতা অনমনীয় চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বহরমপুর কলেজেই ভরতি হইয়া গেলাম। এজন্য এখন এই বৃদ্ধবয়সে স্বর্গীয় পিতার চরণে বারম্বার প্রণতি জানাই। এখন আমি মুনসেফ, আশা আছে, রিটায়ার করিবার পূর্বে সাবজজ্ হইতে পারিব। শ্যামের সহিত বাঁশী বাজাইলে এসব হইত না।

শ্যামকে কিন্তু একেবারে বর্জন করিতে পারি নাই। চিঠি লেখালেখি চলিত। তাহার প্রথম চিঠিটার অংশ বিশেষ পড়িয়া এখন ভারি মজা লাগিতেছে।

"তোমরা ভালো ছেলে। ভালোত্বের বাঁধা সড়কে চলিয়া একদিন তোমরা একটা নির্দিষ্ট নাম-করা সরাই-খানায় পেঁছাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বাঁধা সড়কের ধার ধারি না, যে পথে কেহই চলে নাই আমরা সেই পথের পথিক। আমাদের পথের বর্ণনা কবি নজরুল ইসলাম দিয়াছেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। কিন্তু এ কবিতায় কবি কল্পনা করিয়াছেন সঙ্গে আরও যাত্রী আছে। কিন্তু আমি যে পথে চলিয়াছি, সে পথে কেহ নাই, আমি একা। এমন কি সুনামও আমার সঙ্গী নহে। সবাই বলে আমি বখাটে ছেলে। সামাজিক অভিধানে সম্ভবত উহাই আমার সংজ্ঞা। কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা শেলী, কীটস, গ্যয়টেও একদিন আমার দলের লোক ছিলেন। সমাজের কাছে তাঁহারা ভালো ছেলের সার্টিফিকেট পান নাই। কিন্তু আমি একটা অভাব বোধ করিতেছি। মেয়েরা সাধারণত পুরুষের প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তাহাকে অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত করিতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম মেয়ে কোথায়। সবই যেন ছাঁচে-ঢালা পুতুল। হয় খেঁদি-নেড়ি-বগী-বিন্দীর ছাঁচে-ঢালা, না হয় তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত সমাজের ছাঁচে-ঢালা। স্বকীয়তার দীপ্তি কাহারও মধ্যে দেখি না। মেরি ক্লগলে, বা হ্যারিয়েট বা লটির মতো মেয়ে আমাদের ভদ্রসমাজে কই। সবাই মুখস্থ করা নীতিকথা বলে, প্রাণের কথা কাহারও মুখে বড় একটা শুনি নাই। সোনিয়ার মতো মেয়ে এদেশের মাটিতে কল্পনাতীত। শেরীর দাম সম্প্রতি আকাশচুম্বী হইয়াছে। তুমি সিঁড়ি ছিলে অনেক আকাশচুম্বী রত্নই আহরণ করিতে পারিতাম।

এখন সাধারণ ব্র্যান্ডি জোটানই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ধান্যেশ্বরীর সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছি, যদি তাহার প্রেমে পড়িতে পারি। একজন বহুদর্শীর মুখে শুনিলাম, ধান্যেশ্বরী শুধু যে শস্তা তাহাই নন, শরীরের পক্ষে উপকারীও। তিনি অবশ্য গাঁজাকেই সর্বোচ্চ সম্মানের আসন দিলেন; কিন্তু ভাই গাঁজা খাইতে পারিব না…।"

দ্বিতীয় আর একটি পত্রে দেখিতেছি :

"ভাই শিবেন, শুনিলাম তুমি ভালো করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। জানি এইবার তোমাকে লাইন ধরিতে হইবে। এই লাইন ধরিয়া যে টার্মিনাসে পেঁৗছিবে তাহার একটা বাঁধাধরা ছবি তোমার জানা আছে। আমি যে পথে চলিয়াছি তাহারও একটি নাম সবাই জানে। সে নামটি 'অজানা'। আমি সম্প্রতি একটি খবরের কাগজে প্রুফরিডারের চাকরি পাইয়াছি। বেতন যৎসামান্য, সিগারেটের খরচটা কোন-ক্রমে উঠিয়া যায়। আমার বাকি খরচ যে চালায়, তাহার নামটা আর নাই বলিলাম, তাহার নাম আর পরিচয় শুনিলে তোমরা হয়তো শারীরিক ও মানসিক বিক্ষোভ হইবে। প্লীহা চমকাইয়া যাইবে, নাসিকাও কুঞ্চিত হইয়া কুৎসিত রূপ ধারণ করিবে। সুতরাং নামটা আর করিব না। শুধু এইটুকুই জানিয়া রাখ, মেয়েটি মানবীরূপে দেবী। সমাজ বা সংসার তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই। তবুও সে সদা হাস্যমুখী। তবুও তাহার গানের ঝঙ্কারে স্বর্গীয় সুর। যদি কোনদিন এ অঞ্চলে আস আলাপ করাইয়া দিব। আমার বাবাও একটি আশ্চর্য লোক। এখনও আমাকে টাকা পাঠাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বোধহয় এখনও আশা আছে, আমি বি-এ পাশ করিয়া তাঁহার আপিসে একদিন ঢুকিব। আমি যে অন্যত্র চাকুরি লইয়াছি সে কথা তাঁহাকে এখনও জানাই নাই। জানাইলে হয়তো তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দিবেন। এ বাজারে মাসে পঞ্চাশ টাকা তুচ্ছ করিবার মতো নয়। তবে এখন যে বন্দরে আমার নৌকা লাগিয়াছে তাহাতে মনে হয় আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। সোনা আমাকে একসেট ভালো কবিতার বই কিনিয়া দিয়াছে। ওই দেখ, নামটা শেষে বলিয়াই ফেলিলাম। কথাটা যেন চাউর করিও না। আলাপ হইলে দেখিবে, যে সব বড় বড় প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা তোমাদের বাণীমন্দির অলংকৃত করিতেছেন সোনা তাহাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু সমাজের চক্ষে সে পতিতা। আর কিছু নয়। স্যাফোর (Sapho) কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ, আমার মনে হয় সোনা স্যাফোরই সম-গোত্রীয়।

•

আর একটি চিঠিতে দেখিতেছি—

"ভাই, বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। বাবা এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। মেয়ে সুলক্ষণা এবং সদ্বংশীয়া। এ দুটি গুণ ছাড়া আর কোন গুণ নেই। দেখতে কুৎসিত, লেখাপড়ায় 'ক' অক্ষর গোমাংস। অত্যন্ত রোগা। আমি আপত্তি করেছিলাম। বাবা সেকেলে গোঁড়া লোক। আমাকে জানিয়েছেন—তুমি যদি বিয়ে না কর, তাহলে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব আর আমার বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব তোমাকে। আমি ওদের কথা দিয়েছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। ফেরত ডাকেই তোমার উত্তর চাই। আমি যে কি ক'রে এই গোঁয়ার-গোবিন্দ বাপের ছেলে

হলুম তা ভেবে পাই না। মত দিয়েছি, মানে, দিতে হয়েছে। তুই কি আমার বিয়েতে আসবি ?"

আমার যাওয়া হয় নাই। সামনেই পরীক্ষা ছিল। সেদিন পুরাতন চিঠি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শ্যামের আরও চিঠি পাইলাম। একটা চিঠি এইরূপ—

"ভাই সোনাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। বাবা কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া ক'রে পিসিমা আর আমার বউকে এখানে পাঠিয়েছেন। সোনা বলছে তুমি আর আমার এখানে থেকো না। তুমি নির্মলার কাছে গিয়েই থাক। তোমার যদি টাকার দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। সোনাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছি না। সে আমাকে কিছুতেই তার কাছে থাকতে দেবে না। আমি যে সোনার বাসাতে থাকি এবং সোনাই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন সব—একথা বাবা টের পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। তা না হ'লে এখানে বাসা ভাড়া করতে যাবেন কেন ? সোনার সঙ্গে রফা হয়েছে একটা শেষকালে। তাকে বলেছি নির্মলার কাছে মাঝে মাঝে যাব। ইতিমধ্যে একদিন গিয়েছিলাম। রাত্রি দুটো নাগাদ, মত্ত অবস্থায়। গলিতে ঢুকে দেখলাম আমাদের বাড়ির জানলার আবছা অন্ধকারে একটি রোগা মেয়ে গরাদে ধ'রে পথের দিকে চেয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ছুটে নেমে এসে কপাট খুলে দিলে। আমি কোনও খবর দিয়ে যাইনি। হঠাৎ মনে হ'ল রোজই দাঁড়িয়ে থাকে না কি ! জিগ্যেস করাতে চুপ করে রইল !"

শ্যামের আর কোন চিঠি পাইলাম না। সোনার এক নামজাদা ধনী বাবু ছিলেন। তিনি সোনাকে লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সোনার অনুরোধে শ্যামও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে গিয়াছিল। প্রায় তিন-চার বৎসর তাহার কোন খবর পাই নাই। হঠাৎ একদিন আমার আর এক বন্ধুর নিকট খবর পাইলাম শ্যাম খুব অসুস্থ। সে কলিকাতায় সোনার বাসাতেই আছে। একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতায় অন্য একটা কার্যোপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল, ভাবিলাম শ্যামকেও দেখিয়া যাই, অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই। তাহার বাসায় যখন পেঁছিলাম তখন সোনা বাড়িতে ছিল না। খবরটা শুনিয়া আরাম বোধ করিলাম। দেখিলাম শ্যাম একাই বিছানায় শুইয়া একটা বড় ছবির অ্যালবাম দেখিতেছে।

"তুই একাই রয়েছিস ?"

"হ্যাঁ, সোনা ডাক্তারের কাছে থেকে গেছে।

"শুনলাম তোর খুব অসুখ। কি হয়েছে ?"

"যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা। রাজকীয় জীবনযাপন করেছি তো—"

তাহার কোটরগত চক্ষু, খাঁড়ার মতো নাক, চোপসানো গালকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার সেই হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হ'য়ে অবশেষে এইখানে এসে পোঁছেছি। যবনিকা পড়বার আর দেরী নেই।"

খক খক করিয়া কাসিতে লাগিল।

"জীবনটা যে এত চট্ ক'রে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবিনি। শেষ হয়ে যাওয়াই নিয়ম অবশ্য।"

আবার কাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "ওসব কথা থাক। ইয়োরোপ গিয়েছিলি শুনলাম, কি কি দেখলি সেখানে—"

"দেখলাম দুরন্ত জীবন-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। আর দেখলাম ওদেশের আর্টগ্যালারিগুলো। প্রতিভাবান শিল্পীদের অমর সৃষ্টি সব। অনেক ছবি, অনেক মর্মর মূর্তি। আর দেখলাম সোনাকে। ওরকম মেয়ে হয় না, ও আমার জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন ভুল করেছি। রূপ, লেখা-পড়া, শিল্প, নাচ, গান, সাহিত্য এই সব নিয়েই তো জীবন কাটল—কিন্তু তবু মনে হচ্ছে—"

চুপ করিয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল—"ছবি তো অনেক রকম দেখলাম। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটি ছবিই কেবল চোখের উপর ভাসছে, আর বাকী সব মুছে গেছে—"

"কি ছবি সেটা?"

"একটা রোগা মেয়ে অন্ধকার রাত্রে জানলার গরাদে ধ'রে রাস্তার দিকে আকুল নয়নে চেয়ে আছে। এ ছবিটা সব ছবিকে আড়াল করে চোখের সামনে ফুটে উঠছে, মনে হচ্ছে ওইটেই শেষ পর্যন্ত থাকবে।"

বুঝিলাম আমি আসাতে শ্যাম একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। বেশীক্ষণ বসিলাম না, চলিয়া আসিলাম।

পরদিনই শুনিলাম শ্যামের মৃত্যু হইয়াছে।

বক্রেশ্বর সাধু

বৈঠকখানা ঘরে ব'সে রেডিও শুনছি। নামজাদা একজন গায়ক ইমন কল্যাণ গাইছেন। তন্ময় হ'য়ে ব'সে আছি। একটু পরে কালো বেঁটে রোগা গোছের একটি লোক প্রবেশ করলেন। আগে দেখিনি কখনও। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করে তাঁকে বসতে বললাম সামনের সোফায়। উপবেশন করে তিনি প্রশ্ন করলেন, "বিশ্বনাথবাবু এসেছেন কি?"

বিশ্বনাথ মুখুজ্যে আমার একজন বন্ধু, রোজই এই সময় আসেন, কিন্তু সেদিন তখনও আসেন নি।

বললাম "না এখনও আসেনি তো। বসুন, এখনই আসবে। রোজই আসে তো এ সময়ে—"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। একটু পরে প্রশ্ন করলেন, "সিগারেট খেতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। এই যে—"

নিজের সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলাম। তিনি একটা সিগারেট তুলে নিয়ে

বললেন, "সাধারণত আমি অন্যের সিগারেট খাই না। নিজে পাকিয়ে খাই। দেখা যাক এটা কেমন লাগে—"

ধরালেন। তখন তাঁর মুখটা ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম সারা মুখে একটা প্রচ্ছন্ন দর্প যেন চাপা-আগুনের মতো নীরব দাহ বিকীর্ণ করছে। রেডিওটার দিকে চেয়ে বললেন, "গান শুনছেন? শুনেছি আপনি গান-বাজনার সমজদার। কিন্তু গত কুড়ি বছরের মধ্যে একটি ভালো গাইয়ে আর হয়েছে কি? অবশ্য ভজ আর মতি ছাড়া। ওরা মন্দ গায় না।"

শুনে বিস্মিত হলাম। ভজহরি মিত্র আর মতিলাল আইচ আজকাল গান গায় বটে। কিন্তু ওরকম ওঁছা গান না গাইলেই ভালো হতো। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় বিশ্বনাথ ঢুকল। তার পিছনে একটা কুলি, কুলির মাথায় একটা বড় বাক্স।

"এই যে দাদা, আপনি এসে গেছেন দেখছি। রেকর্ডগুলো যোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। গ্রামোফোনও এনেছি একটা। ওই কোণে রেখে দাও।"

কুলিটিকে সাহায্য ক'রে বিরাট বাক্সটি বিশ্বনাথ কোণে রাখিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—"এঁকে চেনো না নিশ্চয়?"

"না—"

"ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত লাগবঙাবং স্পেশ্যালিস্ট রত্নেশ্বর সাধু। একশ'খানা রেকর্ডে নানা ঢঙে কেবল লাগবঙাবং বাজিয়েছেন। তোমার দোকান থেকে ওঁর রেকর্ডগুলো একটু পুশ করতে হবে, তাই তোমাকে রেকর্ডগুলো শোনাতে এসেছি।

বিপন্ন বোধ করলাম।

"বাজাই?"

"বাজাও।"

দশখানি রেকর্ড শুনলাম। সবই সেই একঘেয়ে লাগবঙাবং। প্রথমে দু'তিন খানা ভালো লেগেছিল, তারপর অসহ্য মনে হ'তে লাগল। থামিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, আমি পুশ করবার চেষ্টা করব।"

রত্নেশ্বরবাবু তখন বললেন, "আপনার কাছে আর একটা অনুরোধ আছে। বাদ্যযন্ত্র আর গ্রামোফোনের বড় বড় দোকানগুলোতে যদি একটু সুপারিশ ক'রে দেন—"

বললাম, "বিক্রি হয় বিজ্ঞাপনের জোরে। সেই ব্যবস্থা করুন।"

বিশ্বনাথ একটু নিম্ন কণ্ঠে বললেন—"উনি বদ্ধ কালা। গত ষোল বছর ধরে উনি একেবারে শুনতে পান না।"

তারপর রত্নেশ্বরবাবুর দিকে একটা মাথার ইঙ্গিত করতেই তিনি উঠে পড়লেন।

"এখন তাহলে আসি। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ।"

রত্নেশ্বরবাবু চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম—"ভজহরি মিত্র আর মতিলাল আইচের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ কি?"

"ও'রা দু'জন ওর চাটুকার, পোষা কুকুরও বলতে পার!"

বিস্মিত হ'য়ে ব'সে রইলাম।

কেনারামকে বিধুভূষণ বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার বাড়ির বারান্দায় রোজ 'ক' এসে বসছে কেন। ওকে বেশী আসকারা দিও না। ওরা সাংঘাতিক জাত!

সকলেই জানে কেনারাম উদার-হৃদয় লোক। একটা উঁচুদরের হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বললে—তুমি জাত তুলে কথা কও কেন। আমাদের জাতের মধ্যেই কত সাংঘাতিক লোক আছে তা জান?

বিধুভূষণ হাত জোড় ক'রে বলেছিল, ভাই তুমি মহাপুরুষ তা জানি। কিন্তু 'ক'-কেও জানি, তাই বন্ধু হিসাবে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তুমি নতুন বিয়ে করেছ, বউটি সুন্দরী!

একথা শুনে কেনারামের নাকটা কুঁচকে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণের মতো লোক যে এতদূর অশ্লীল হতে পারে তা তার কল্পনাতীত ছিল, তাই চট ক'রে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নাকটাই যা প্রকাশ করবার ক'রে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

বিধুভূষণ চলে গেল মুচকি হেসে।

দিন পনেরো পরে বিধুভূষণের নজরে পড়ল 'ক' কেনারামের বারান্দা থেকে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। কেনারামের দামী সোফায় ব'সে ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাই করছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে বিশ্রম্ভালাপ। বিধুভূষণের মনে হ'ল—এই রে সেরেছে।

বিধুভূষণও ঢুকে পড়ল বৈঠকখানায়। ঢুকে দেখল, 'ক' পান চিবুচ্ছে চবর চবর ক'রে আর বলছে—আপনার বউ যে এমন সুন্দর পান সাজতে পারে তা কে জানত! অপূর্ব, অদ্ভুত। এ যেন পান নয়, গজল।

বিধুভূষণ আবার মনে মনে বলল—এই রে সেরেছে।

কেনারাম বিধুভূষণকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু বিধু আপনাকে ভয় করে। ওর মনের গঠন এমন বিশ্রী যে সন্দেহ কিছুতে ঘুচতে চায় না ওর প্রাণ থেকে।

বিধুভূষণ হেসে বললে—আমি মহাপুরুষও নই পাথরও নই। আমি রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। তাই ভয়ও করি, সন্দেহও ঘুচতে চায় না। রাগ দুঃখ সবই আছে আমার।

'ক' দুলে দুলে হেসে বলতে লাগল—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। মনে প্রেম জাগান, প্রেম জাগলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ হেঁ · প্রেমই আসল চিজ।

এ শুনে বিগলিত কেনারাম কুন্ডুর মুখভাব মাখন-মাখানো পাঁউরুটির মতো হয়ে গেল। বিধুভূষণ আর একবার মনে মনে ভাবল—এই রে, সেরেছে!

দিন দশেক পরে কেনারামের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল বিধুভূষণের। রাস্তার মোড়ে। কেনারামের হাতে একটি খাসির রাং।

কেনারাম। এই যে বিধুভূষণ। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালোই হ'ল। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে খেও। আমার বউ কোর্মা রাঁধবে, আর 'ক' করবে "সামী" কাবাব।

বিধুভূষণ। কি রকম? হঠাৎ এ-সব কেন?

কেনারাম। ভাই বিধু, 'ক' যে কত ভালো, তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সে আমার স্ত্রীকে একটা দামী শাল উপহার দিয়েছে, আমি মানা করলাম, তবু শুনল না। তুমি যদি আজ আস, তাহলে দেখবে কি রকম দামী শাল আর কি চমৎকার তার কাজ। সে বললে, এটা আমার প্রেমের উপহার, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি আর বাধা দিতে পারলাম না।

বিধুভূষণ। দেখ কেনারাম, তুমি যে একজন মহামানব, তা আগে জানতাম, কিন্তু তুমি যে নপুংসক, এটা আমার জানা ছিল না। ক একজন নারী-ধর্ষণকারী গুন্ডা, এ-কথা কি তোমার জানা নেই ? থানার দারোগা সাহেবের কাছে গেলেই সব জানতে পারবে। তিনি প্রমাণ পেলে ওকে গ্রেপ্তার করতেন, কিন্তু পুরো প্রমাণ পাননি। কিন্তু তাঁর ঘোর সন্দেহ—

কেনারাম। দেখ বিধু, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাই একবার নারী-ধর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাই বলে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করতে পারিনি। কখনও পারব না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও 'স্পট' আছে, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো দিকটা দেখ—

বিধুভূষণ। তুমি দেখ, আমি চললাম।

কেনারাম। রাত্রে তুমি খেতে আসবে কি ?

বিধুভূষণ। না।

আরও মাসখানেক পরে।

কেনারাম বাড়ি ছিল না। হঠাৎ সে বাড়ি ফিরে দেখে 'ক' এসেছে। 'ক'-য়ের ছড়িটি বৈঠকখানা ঘরের কোণে ঠেসানো রয়েছে, কিন্তু 'ক' নেই। কেনারাম অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। 'ক' তার শয়নকক্ষে ব'সে তার স্ত্রীর থুতনি ধ'রে আদর করছে। অন্য কেউ হ'লে চেঁচামেচি করত, জুতো-পেটা করত, লাঠালাঠি করত। কিন্তু কেনারাম মহামানব। এ-সব কিছুই না ক'রে সে আবেগ-গদগদ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করল শুধু।

বলল, ভাই ক, তোমার এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। পুঁটিবালা আমার বিবাহিতা পত্নী, তার গায়ে এভাবে হাত দেওয়া বেআইনী। এ-কাজ তুমি আর কোরো না। ভেবে দেখ, এটা কি সঙ্গত ?

এর উত্তরে ক যা বলল, তাতে হকচকিয়ে যেতে হ'ল মহামানবকে।

ক বলল, বন্ধু কেনারাম, কয়েকটা ভুল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পুঁটিবালাকে তুমি বিয়ে করেছ, তা মানি। কিন্তু ওই নজিরেই যে তুমি পুঁটিবালাকে চিরকাল দখল ক'রে থাকবে, এটা আমি মানব না। আধুনিক সভ্যসমাজের মহামানবেরা কেউ এ-কথা মানবে না। তুমিও একজন মহামানব, তোমাকে একথাটা চিন্তা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। এ-সব ব্যাপারে পুঁটিবালার মতই তোমাকে মানতে হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ এটা !

এই বলে নাটকীয় ভঙ্গীতে ক বেরিয়ে গেল। পুঁটিবালা পিছন ফিরে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু। বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল না।

অন্য কেউ হলে চুলের ঝুঁটি ধ'রে চাবকাত তাকে। কিন্তু কেনারাম মহামানব। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর করবার কিছু ছিল না। তাই রইল সে।

আরও মাস দুই পরে।

সেদিনও কেনারাম বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে দেখল ক এসেছে। কস্তুত ক রোজই আসত। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে আসা বন্ধ করেনি। লাঠিটি যথারীতি বৈঠকখানার কোণে ঠেসানো আছে। সেদিন কিন্তু কেনারাম বাড়িতে ঢুকে যা দেখল, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়তে হ'ল তাকে। সে দেখল 'ক' শুধু যে তার শয়নকক্ষে রয়েছে তাই নয়, বিছানায় উঠে বসেছে এবং সে আর পুঁটি যে অবস্থায় রয়েছে, তা অবর্ণনীয়।

কেনারাম বলল, ভাই ক, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাকে আপনজন বলে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলাম, এই কি তার প্রতিদান?

কেনারামের মনে হ'ল 'ক' একথা শুনে যেন মরমে ম'রে গেল। তার মনে হ'ল, তার অন্তরে অনুশোচনার মেঘ দেখা দিয়েছে। যা আপাতদৃষ্টিতে হাসি ব'লে মনে হচ্ছে তা হাসি নয়, লজ্জা।

এই উপলব্ধি হওয়ামাত্র তার সব রাগ জল হয়ে গেল, মহামানবসুলভ আনন্দে সে যে লোকে গিয়ে হাজির হ'ল, তা ভূগোলে নেই।

পরদিন পুঁটিবালা অন্তর্ধান করলে।

'ক'-কেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনা বিধুভূষণের মুখে একদিন শুনেছিলাম।

বিধুভূষণ বলল, কেনারাম তার যথাসর্বস্ব বিক্রি ক'রে চৌমাথার কাছে একটুকরো জমি কিনেছে। সে জমির উপর সে একটি উঁচু মর্মরবেদী বানাবে, আর সেই মর্মরবেদীতে উঠে সে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তারস্বরে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজিতে যে বাণীটি ঘোষণা করবে তার সারমর্ম হচ্ছে—'অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুন্ডা, কিন্তু আমি এ-কথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট আছে, গোলাপে কণ্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে, সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে! লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভালানে' বলে বলুক। লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।' এই এখন ঠিক করেছে কেনারাম। মহামানবদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

অনেকদিন পরে কেনারামের একটি ডায়েরী পেয়েছিলাম। একটি অদ্ভুত খবর ছিল তাতে। ডায়েরীতে কেনারাম লিখেছে—আমি মহামানব। কিন্তু হায় আমাকে কেউ পোঁছে না। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আমি যে মহামানব, তা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব। দেখি, লোকে আমাকে পোঁছে কি না।

কেনারাম এখনও পাগলাগারদের বাইরেই আছে।

বিলাস প্রসঙ্গ

শীতকাল। স্থান—পশ্চিমের একটি শহর। শহরের পাশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত। বিলাসবাবুর তিন বন্ধু নিমাইবাবু অতুলবাবু এবং সতীশবাবু সেই শহরে থাকেন। বিলাসবাবু মাঝে মাঝে আসেন সেখানে। নিমাইবাবু বিলাসের সহধর্মী, দুইজনেই পক্ষী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক। নিমাই যদিও ডাক্তার কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিলাসবাবু আসিলে উভয়েই গলায় দূরবীন ঝুলাইয়া বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অতুলবাবু বিলাসের সহপাঠী। সতীশবাবু বিলাসের সহকর্মী ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে চাকুরিটি গিয়াছে। সতীশের স্ত্রীর ধারণা বিলাসবাবু যদি চেষ্টা করেন তাহা হইলে সতীশ আবার চাকরিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ বিলাসবাবু এখন চাকুরি-জীবনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন।

সেবার বিলাসবাবু কার্য উপলক্ষে যখন টুরে আসিলেন তখন অতুলবাবুর বাসাতেই উঠিলেন। প্রতিবারই ওঠেন। সেবার উঠিয়া স্যুটকেশ বিছানা প্রভৃতি অতুলের বাসায় নামাইয়া দিয়া একটা মোটর যোগাড় করিয়া পরিচিত সকলের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব। তাছাড়া তিনি অনেকেরই প্রিয়। লোকটি বিদ্বান, রবীন্দ্র-ভক্ত, কাছা-খোলা, মুক্তহস্ত, ভুলোমন, হুজুকপ্রিয় এবং ব্যস্তবাগীশ। এরূপ লোক সকলেরই প্রেম আকর্ষণ করে। তাছাড়া তিনি একজন বড় পক্ষীতত্ত্ববিদ্। যেখানেই যান আপিসের কাজকর্ম অবহেলা করিয়া পাখী দেখিয়া বেড়ান।

নিমাইবাবু ডিস্পেন্সারি হইতে ফিরিয়া আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলেন। মোটরের হর্ণে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বাহির হইয়া দেখিলেন মোটরে উত্তেজিত বিলাসবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার গলায় দূরবীন ঝুলিতেছে।

"শিগ্‌গির চলে আসুন। গঙ্গায় শুনছি নানারকম হাঁস এসেছে। চলুন গিয়ে দেখে আসি।"

নিমাইবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র তরঙ্গ বলিল, "আমিও যাব।"

"নিশ্চয় যাবে। চ'লে এস তাড়াতাড়ি।"

নিমাইবাবু যখন মোটরে উঠিলেন তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা। শীতকাল। সুতরাং সন্ধ্যা আসন্ন।

"কোথায় যাবেন?"

বিলাসবাবু গঙ্গার যে ঘাটটির কথা বলিলেন তাহা শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে। বিলাসবাবু ড্রাইভারকে অনুরোধ করিলেন—দুবেজি জোরসে চালাইয়ে।

দুবেজি জোরেই মোটর চালাইয়া তাঁহাদের গঙ্গার ঘাটে নামাইয়া দিল। ইহার পর নৌকায় উঠিতে হইবে। কোনও মাঝিই যাইতে রাজি হইল না। দেখা গেল অনিশ্চিত হাঁসের সন্ধানে যাত্রা করিবার উৎসাহ কাহারও নাই। দূরে একটা মাঝিহীন নৌকা বাঁধা ছিল। অদম্য বিলাসবাবু ছুটিয়া গিয়া তাহাতেই লাফাইয়া উঠিলেন।

"নিমাইবাবু, আসুন। গঙ্গায় জল তো বেশী নেই। আমরাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি লগি ঠেলছি আপনি হালে বসুন।"

এমন সময় একটা কালো লম্বা ছোঁড়া জুটিয়া গেল। সে হিন্দীতে বলিল যে সেই তাহাদের লইয়া যাইবে। কিন্তু এক টাকা বখশিস চাই।

"কুছ পরোয়া নেই। চলে এস। এ নৌকো তোমার ?"

"নেই। হামরা মামুকা—"

কিছুদূরে গিয়া হতাশ হইতে হইল। হাঁস কই ? অনেক দূরে দুই একটা চখা রহিয়াছে কেবল। চখা সাধারণ হাঁস। বিলাসবাবু পিংকফুট, বার্ণাকল্ বা গীজ দেখিতে পাইবেন আশা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দূরবীনে-নিবন্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

"আচ্ছা, ওটা কি দেখুন তো—"

গঙ্গার মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপের মতো। তাহার উপর কালো একটা পাখী। নিমাইও দূরবীন লাগাইয়া দেখিলেন। প্রথমে কোন সিদ্ধান্তেই আসা গেল না। নৌকা আর একটু আগাইতে নিমাইবাবু বলিলেন, "ময়ূর ব'লে মনে হচ্ছে—"

বিলাসবাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইতে গিয়া নৌকার খোলের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। পাটা একটু ছড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে দূরবীন লাগাইলেন।

"কি বলেন মশাই, গঙ্গার মাঝখানে ময়ূর আসবে কি ক'রে ? ওটা কররা হ'তে পারে। কিন্তু কররা তো একা থাকে না, চরেও থাকে না, তারা সাধারণত গম ক্ষেতে দল বেঁধে থাকে।"

এইবার নৌকা মাটিতে ঠেকিয়া গেল। জল খুব কম ছিল। কালো ছোঁড়াটা বলিল, "আর নেই চলে গা বাবু।"

বিলাসবাবু তখনও চোখে দূরবীন লাগাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"হ্যাঁ আমারও ওটা ময়ূর বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ময়ূর ওখানে কি ক'রে আসতে পারে ! কাছে একটা লোকও রয়েছে দেখছি। নৌকো এখানেই থাক, চলুন আমরা নেবে গিয়ে দেখে আসি !"

বিলাসবাবু তড়াক করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদেও পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দুইটি পা-ই কাদায় পুঁতিয়া গেল। অনেক কষ্টে যখন তাঁহাকে টানিয়া তোলা হইল তখন দেখা গেল তাঁহার এক পাটি জুতো কাদার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। নিমাইবাবু নামিতে সাহস করিলেন না। দেখা গেল জুতার জন্য বিলাসবাবুর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই। কিন্তু জ্ঞানপিপাসায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে ! বলিলেন, "ওখানে ময়ূর কেমন ক'রে এল তা ঠিক না ক'রে কি ফিরে যাওয়া উচিত হবে ? কিন্তু কি ক'রে ওখানে যাওয়া যায়।"

তরঙ্গ বলিল, "আমি গিয়ে দেখে আসব ?"

সে জলে নামিয়া পড়িল। তাহার ওজন কম। তাহার পা পুঁতিয়া গেল না। সে জলে ছপছপ করিতে করিতে চরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিলাসবাবু বলিতে লাগিলেন, "এ সময় বিদেশ থেকে অনেক ভালো ভালো হাঁস এখানে আসে। জার্মানি থেকে, রাশিয়া থেকে, হিমালয় থেকে, অদ্ভুত সব হাঁস।"

তরঙ্গ একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ওটা ময়ূরই। ওখানে একটা ধোপানী কাপড় কাচছে, তার ময়ূর, ময়ূরটা ওর পোষা। ওর সঙ্গে রোজ আসে।"

কালো ছোঁড়াটা বলিল, "আব চলিয়ে হুজুর। মামু গোস্‌সা করে গা—"

ঘাটে আসিয়া দেখা গেল মামু মারমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লম্বা চওড়া তাগড়া লোক, ঝাঁকড়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি।

সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দীতে বলিল যে তাহার একটা 'কেরায়াদার' ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত পাঁচ টাকার চুক্তি হইয়াছিল। অবিলম্বে পাঁচ টাকা না দিলে—। বিলাসবাবু ও নিমাইবাবুর পকেট ঝাড়িয়া দেখা গেল মাত্র সাড়ে চার টাকা আছে। বিলাসবাবু সেই সাড়ে চার টাকা লইয়া অদ্ভুত হিন্দীতে মামুকে মিনতি করিতে লাগিলেন। মামু বিগলিত হইল। তখন সাড়ে পাঁচটা। বিলাসবাবুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"ছি, ছি, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। সতীশবাবু আজ আমাকে চারটের সময় চা খেতে বলেছিলেন। এঃ, খুব অন্যায় হ'য়ে গেল—।"

দুবেজি মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল মোটরের পেট্রোল ফুরাইয়াছে।' অন্তত এক গ্যালন পেট্রোল না কিনিলে গাড়ি চলিবে না।

বিলাসবাবু সরল লোক। হাসিমুখে বলিলেন, "আমরা এখন কপর্দকশূন্য। যা ছিল সব মামুকে দিয়েছি। হেঁটেই চলে যাই তাহলে।"

দুবেজি চোখ পাকাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, একটা পেট্রোল পাম্প হইতে সে ধারে এক গ্যালন পেট্রোল কিনিয়া আনিবে কি?

বিলাসবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

শীতকাল। গঙ্গার ধারে প্রখর হাওয়া বহিতেছিল। বিলাসবাবুর পায়ে জুতা নাই, সর্বাঙ্গে কাদা, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তবু তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নানাবিধ হাঁসের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। বন্য হংসের যে কত প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে; আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী হাঁসের তফাত কি, প্রকৃত শাদা রাজহংস কোনও শব্দ করে না, তাহাদের গায়ের রং তুষারধবল—এই সব কাহিনী তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। গাড়িতে পেট্রোল ঢালিবার পরও যখন গাড়ি স্টার্ট হইল না, তখনও বিলাস দমিলেন না।

বলিলেন, "আসুন, আমরা ঠেলি—"

ঠেলিবার পর গাড়ি গর্জন করিল।

বিলাসবাবু নিমাইবাবুকে নামাইয়া দিয়া অতুলবাবুর বাড়িতে চলিয়া গেলেন। বলিলেন, সেখান হইতে সতীশবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন।

মিনিট পনেরো পরে হন্তদন্ত হইয়া বিলাসবাবুর পুনঃপ্রবেশ। নিমাই তখন সবে হাত-পা-মুখ ধুইয়া বসিয়াছেন।

"নিমাইবাবু, শিগ্‌গির চলুন। সতীশবাবুর হার্ট ফেল করেছে। পালস্‌ নেই। আপনার ব্যাগটা নিয়ে শিগগির আসুন—"

"সতীশবাবুর বাড়িতে?"

"না, তিনি অতুলের বাসায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। অতুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছে।"

নিমাই গিয়া দেখিলেন অতুলের বাসায় সতীশবাবু বাহিরের ঘরে একটি সোফায় আচ্ছন্নের মতো পড়িয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহাকে একটি ইন্‌জেক্‌শন দিলেন।

অতুল সন্তর্পণে বাথরুমের দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বেঁচে আছে, না মরে গেল!"

"না, না ভয় নেই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে এক্ষুণি।"

সত্যই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক হইয়া গেল। সতীশবাবুর নাড়ী ও জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে সব খুলিয়া বলিলেন।

"বেলা চারটের সময় আমার স্ত্রী বিলাসবাবুর জন্যে গরম কচুরি আর সিঙাড়া ভেজেছিলেন। বিলাসবাবু এলেন না দেখে আমাকে তিনি বললেন, তুমি অতুলবাবুর বাড়ি থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। হয়তো গল্পে মেতে আছেন। অতুলবাবুর বাড়িতে এসে দেখি বিলাসবাবু নেই। অতুলবাবু বললেন, সে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সে ফিরলেই তাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সব শুনে গিন্নী বললেন, তুমি ফিরে এলে কেন। ওখানেই ব'সে থাক গিয়ে। ফিরে এসেই আবার গল্পগুজবে মেতে যাবে। বিলাসবাবুকে চেন না? ব'সে থেকে ধ'রে নিয়ে এস ওঁকে। সিঙাড়া কচুরি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে কি খাওয়া যায়? আবার এলাম অতুলবাবুর বাড়িতে। আমাকে দেখে অতুলবাবু বললেন, কেন বার বার আপনি হাঁটাহাঁটি করছেন। ও এখনও ফেরেনি। আমি কথা দিচ্ছি ও এলেই ওকে নিয়ে আমি যাব। আপনি বাড়ি চলে যান। আমি বললাম, একটু বসি না, তাতে ক্ষতি কি। অতুলবাবু কিন্তু কিছুতেই আমাকে বসতে দিলেন না। বললেন, কতক্ষণ বসবেন আপনি। তার ফেরবার কি কোনও ঠিক আছে! কতক্ষণ ব'সে থাকবেন, বাড়ি যান। আবার বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে একা ফিরতে দেখে গিন্নি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তোমাকে পই পই ক'রে ব'লে দিলুম, বিলাসবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। ওখানে ব'সে থাক না গিয়ে! আমি কচুরি সিঙাড়াগুলো উনুনের পাশে রেখে দিয়েছি। তুমি যাও। আবার অতুলবাবুর বাড়িতে এলাম। অতুলবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে এক মাইল। আমার হার্টটাও বরাবর দুর্বল। তাই এখানে এসেই মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। তারপর কি হয়েছে কিছু জানি না।"

গাড়ি করিয়া বিলাসবাবু, অতুলবাবু এবং নিমাইবাবু সতীশবাবুকে লইয়া তাঁহার বাড়িতে গেলেন। ভুরিভোজন হইল। সিঙাড়া কচুরি দুইই বেশ গরম ছিল। বিলাসবাবু বলিলেন, চিংড়ির কাটলেটটিও চমৎকার হইয়াছে। আরও কয়েকখানা খাইলেন।

বিলাসবাবু বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার স্টেনো কয়েকটি ফাইল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল, কয়েকটি জরুরি চিঠি আজ পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু ডাক তো চলিয়া গিয়াছে। চিঠিগুলি না গেলে সমূহ ক্ষতি হইবে।

বিলাসবাবু বলিলেন, "বেশ, পরের ট্রেণ কখন?"

"রাত্ত দুটোর সময়—"

"কুছ পরোয়া নেই। এখুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। চিঠিগুলো নিয়ে একটা লোক চলে যাক। তুমি বস।"

অতুলবাবুর স্ত্রী এককাপ গরম কফি দিয়া গেলেন। বিলাস একটা কারুকার্যময় শাল গায়ে দিয়া উবু হইয়া বসিলেন এবং নিমীলিত নয়নে চিঠি ডিক্‌টেট্‌ করিতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একভাবে বসিয়া সব চিঠি শেষ করিয়া বলিলেন—"সবই তো হ'ল, কিন্তু যে ওয়াইল্‌ড্‌ গুজের সন্ধানে আজ বেরিয়েছিলাম, তারই দেখা পাওয়া গেল না।"

অতুল বলিলেন, "আমি তো সামনেই একটি 'ওয়াইলড্‌ গুজ' দেখতে পাচ্ছি! আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও তাহলে তুমিও দেখতে পাবে—"

বিলাস তাঁহার সেই শিশু-সুলভ হাসিটি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। মনে হইল একটু লজ্জিত হইয়াছেন।

প্রেমের গল্প, ১৯৩৪

ঘনঘোর বর্ষা নামিয়াছে। ভাবিতেছিলাম উপরে আমার যে খালি ঘরটি আছে সেখানে বসিয়া কবিতা লিখিব। বাড়ির সামনে কদম্ব গাছটি অসংখ্য ফুলে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি দিগন্ত রেখায় মেঘদূত-বর্ণিত হস্তীযূথের ন্যায় নিকষকৃষ্ণ মেঘমালা সমবেত হইতেছে। আমার সমস্ত হৃদয়·· এমন সময় পিওন প্রবেশ করিল। দেখিলাম সম্পাদক মহাশয়ের চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন পূজাসংখ্যার জন্য একটি ছোট গল্প চাই। প্রেমের গল্প হইলেই ভালো হয়। আমি আমার উপরের তলার খালি ঘরটিতে বসিয়া যে কবিতা লিখিতাম তাহাতে প্রেমের অভাব থাকিত না। আমার যে গৃহিণী রোজ ভাত রাঁধেন, কাপড় কাচেন, মশলা পেষেণ, সন্তান পালন করেন তাঁহারই উদ্দেশ্যে হয়তো আমি ভালো একটা প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিতাম, কিন্তু, হায়, সম্পাদক কবিতা চান না, গল্প চান। ভাবিলাম কবিতার ধাক্কাটাকে না সামলাইতে পারিলে গল্প মাথায় আসিবে না। উঠিয়া জানলাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভাবিলাম উপরের ঘরটাতে গিয়াও জানলা দরজা সব বন্ধ করিয়া বর্ষাটাকে প্রথমে ঠেকাইতে হইবে, তাহা না হইলে গল্প মাথায় আসিবে না। এমন সময় দ্বারদেশে তিন মূর্তি আবির্ভূত হইলেন। একজন নারী, দুইজন পুরুষ। নারীটি যুবতী, কিন্তু মাথায় সিঁদুর নাই। পুরুষ দুইটির মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে যুবক আর একজনের বয়স একটু বেশী, কিন্তু ঠিক কত তাহা আন্দাজ করিতে পারিলাম না। কেন জানি না আমার মনে হইল, ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটা অদৃশ্য প্রেমের ত্রিভুজ হয়তো মূর্ত হইয়াছে এবং তাহা যদি কোনও কৌশলে জানিতে পারি হয়তো ভালো গল্পের একটা প্লট পাওয়া যাইবে।

মহিলাটিই আগে কথা বলিলেন।

"শুনলাম আপনার উপরের ঘরটি খালি আছে?"

"না, ঠিক খালি তো নেই। ওই ঘরে বসে আমি লেখা-পড়া করি—"

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি আগাইয়া আসিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "অন্তত দিন সাতেকের জন্য দিতে পারেন না?"

"কেন বলুন তো—"

"এটি আমার মেয়ে আর এইটি হচ্ছে জামাই। একটু আগে আইনত রেজিস্ট্রারের কাছে এদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আমরা হিন্দু, সিঁদুর-দান, ফুলশয্যা এসব না হলে মন ভরে না, বুঝলেন। আমার একটি বাড়ি আছে, কিন্তু সেখানে তিল-ধারণের স্থান নেই। উদ্বাস্তুতে ভরতি। খোলা ছাতেও লোক গিজগিজ করছে। আপনি লেখক মানুষ, আপনি আমার মনের কথা বুঝবেন। তাই আপনার কাছে এলাম। আশা আছে, আপনি রাজী হবেন।"

রাজী হইতে হইল। গল্প লেখা আর হইল না।

একটু পরেই বাড়িতে পিলপিল করিয়া লোক ঢুকিতে লাগিল।

সাতদিন পরে সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যখন গেলেন তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। দেখিলাম টেবিলের উপর একটি খামের চিঠি রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলাম চিঠি নয়, চেক। একশ টাকার একখানি চেক। গল্প লিখিতে পারিলে আমি উহার বেশী পাইতাম না। তবু মনটা খারাপ হইয়া গেল। আমি তো টাকার জন্য উহাদের ঘরটা দিই নাই। দিয়াছিলাম···শীলার মুখখানাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল। আমার মেয়ে শীলা এম· এ· পাশ করিয়াছিল। কালো বলিয়া বিবাহ হয় নাই। ধরাধরি করিবার লোক নাই বলিয়া চাকুরি জোটে নাই। এদেশে আজকাল যে জিনিসটা সুলভ তাহাই জুটিয়া গেল অবশেষে। প্রেমিক জুটিল একটি। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া শীলা চলিয়া গেল। শুনিয়াছি তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। শীলা ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার প্রেমিক নাপিত-নন্দন। আধুনিক আইনে তাহাতে আটকায় না। তাহাদের ফুল-শয্যা, বাসর-ঘর হইয়াছিল কি? কোথায়? সহসা চোখে জল আসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তে চটিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

ছায়া ও বাস্তব

ডিস্‌পেনসারিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল একটি কালো কুচকুচে আসন্ন-প্রসবা মেয়ে বারান্দায় বসিয়া আছে। তাহার সামনে একটি নাক-বসা শিশু এবং তাহার পিছন দিকে একটি রোগাগোছের লোক। তাহার মুখের খানিকটা ঢাকা।

আমি যাইতেই আমার ডিস্‌পেনসারির চাকর সিতাবি বলিল—"এরা বাবু কাল রাত থেকে এখানে আছে—"

মনে পড়িল আমি গত সন্ধ্যায় ডিস্‌পেনসারিতে আসি নাই। সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম। সিনেমায় খুব ভালো 'হিট'-করা বই ছিল একখানা। গল্পটি চমকপ্রদ। এক বড়লোকের মেয়ে গান শুনিয়া এবং রূপে মুগ্ধ হইয়া একটি গরীব যুবকের প্রেমে পড়িয়াছিল। মেয়েটির 'বচ্‌পন্‌মে মা মর গয়ী থী'—সুতরাং তাহার বাবা কন্যা-স্নেহে প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মেয়ের কোন কাজে বাধা দিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। আদুরে মেয়ে যখন যাহা খুশি করিত। নাচিত, গাহিত, সাইকেল চড়িত, ঘোড়ায় চড়িত, তরঙ্গসঙ্কুল নদীর জলে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রকাণ্ড গাছে চড়িয়া গাছের মগডাল হইতে ফুল পাড়িয়া আনিত। বাবা কিছু বলিতেন না, সস্নেহে মাতৃহীনা

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন কেবল। মেয়েটির পরিচারক—যে আহাকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়াছিল—সে কেবল এইসব লইয়া ভাঁড়ামি করিত। বাবা মৃদু হাসিতেন। কিন্তু মেয়ে যখন এক অজ্ঞাতকুলশীল গরীব ছোকরার প্রেমে পড়িয়া গেল তখন বাবা রুখিয়া দাঁড়াইলেন। শুদ্ধ হিন্দীতে যাহা বলিলেন তাহার ইংরেজি করিলে দাঁড়ায়—Thus far and no further। তাঁহার বংশমর্যাদা, তাঁহার পূর্বপুরুষের ইতিহাস, তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর পবিত্র কৌলিক মহিমা এ সমস্তকে কলঙ্কিত করিয়া তিনি ওই বাঁশীওলা মাকাল ফলকে জামাই করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। মেয়েও হটিবার পাত্রী নয়। রাধা, মীরা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর উদাহরণ দেখাইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সে যখন বলিল—"দুনিয়াতে প্রেমই অমূল্য সম্পদ, সে প্রেম যখন ভাগ্যক্রমে আমার জীবনে আসিয়াছে তখন কিছুতেই আমি তাহার অসম্মান করিতে পারিব না। কুল? বংশমর্যাদা? প্রেমের চেয়ে বড় আর কি আছে জগতে—!" তখন তড়তড় করিয়া হাততালি পড়িয়া গেল। প্রায় দুই মিনিট ধরিয়া সে হাততালি চলিল। নায়িকা তাহার প্রেমাস্পদকে লইয়া অকূলে ভাসিয়া পড়িল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল উক্ত প্রেমাস্পদ শুধু নায়িকার নহে, বহু কুমারীর হৃদয়-হরণ করিয়াছেন। তিনি বহুবল্লভ। বাস্ অমনি আবার লাগিয়া গেল। ইহার পর গল্পের নায়িকা যাহা করিল তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। সে রূপসী ও সুগায়িকা, সুতরাং তাহারও প্রণয়ীর অভাব হইল না। শেষ পর্যন্ত একটি দুর্ধর্ষ ডাকাত তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িল। সেই ডাকাতের সহায়তায় সে বাঁশী-ওলা ছোকরাকে বন্দী করিয়া আনিল, তাহাকে তাহার পায়ের কাছে হাতজোড় করিয়া বসিতে হইল, কান মলিতে হইল, নাকে খৎ দিতে হইল। তাহার পর নায়িকা বলিল—'আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। পার্থিব প্রেম মানেই পাশবিক প্রেম, একথা আমি বুঝিয়াছি। পুরুষমাত্রেই পশু ইহাতেও আমার সন্দেহ নাই। তাই আমি স্থির করিয়াছি আমার পবিত্র প্রেম আমি মানুষকে দিব না, ভগবানকে দিব। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে গলিতে গলিতে তাঁহারই নাম কীর্তন করিয়া তাঁহাকেই আমি অনুসন্ধান করিব।' ডাকাতটি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—'চলুন দেবি, আমি আপনাকে বৃন্দাবনে পেঁছাইয়া দিতেছি।' ইহাই গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এছাড়া অবশ্য অনেক সিনসিনারি আছে, ছুটাছুটি আছে, পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য আছে, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে, যেখানে সেখানে নৃত্যগীত আছে, তীরন্দাজদের খেলা আছে, এবং আরও অনেক হাবভাব আছে—কিন্তু সে সব আমি বাদ দিলাম। প্রেমের এই উচ্চ পরিণতিটাই আমার সমস্ত চিত্তটাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। ডিস্পেনসারিতে যখন প্রবেশ করিলাম তখনও এ অনুভূতির রেশ কাটে নাই।

আমি চেয়ারে বসিতেই মেয়েটি সসংকোচে প্রণাম করিয়া আমার টেবিলের ওপাশে দাঁড়াইল। এদেশের গরীব রোগীরা সাধারণত যে ভাষায় কথা কয় তাহাকে 'ছেকা-ছেনি' ভাষা বলে। সেই ভাষাতেই আমাদের কথা হইতে লাগিল। আপনাদের হয়তো বুঝিতে অসুবিধা হইবে তাই তর্জমা করিয়া দিতেছি।

"কি হয়েছে তোর—"

"আমার নয় ডাক্তারবাবু। আমার স্বামীর। মাথা গরম হয়ে গেছে—"

"ডাক ওকে।"

আদেশের ভঙ্গীতে মেয়েটি বলিল—"এদিকে এস না।"

মাথায় কাপড়-ঢাকা লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

বলিলাম, "মুখের কাপড় সরাও।"

মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিতে পাইলাম—ডান চোখটা ঈষৎ বড়, ডান দিকের ঠোঁটের কোণটা ঈষৎ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখের ডানপাশটা ভাবলেশহীন।

বলিলাম,—"চোখ বোজ।"

ডান চোখটা ভালো বুজিল না।

"শিস দাও"—

শিস দিতে পারিল না।

বুঝিলাম মুখের ডানদিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে। ডাক্তারি ভাষায় ইহার নাম ফেসিয়াল প্যারালিসিস (Facial Paralysis)। অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে সিফিলিসও ইহার একটা কারণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার গর্মি হয়েছিল কখনও ?"

"না বাবু—"

মেয়েটি ধমকাইয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবুর কাছেও মিছে কথা বলছ। হ্যাঁ বাবু, ওর গর্মি, সুজাক (গণোরিয়া) সব হয়েছিল।"

বলিলাম—"ওর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। এবেলা এখানে থাকতে পারবে ?"

"থাকব বাবু—"

রক্ত লইলাম। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে।

লোকটা বাজারে খাবার আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী ছেলেটিকে লইয়া বারান্দায় বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মুখটি শুকনো, চুল উসকোখুসকো, পেটের ভারে বিব্রত।

"তুই অত কষ্ট ক'রে ওর সঙ্গে এসেছিস কেন ?"

"কি করব বাবু, ওর যে আর কেউ নেই। ওর হাতে টাকা দিতেও ভয় করে, হয়তো কোথায় মদ খেয়ে পড়ে থাকবে। বড় বদমাস।"

"তোর ছেলেপিলে কটি—"

"পাঁচটি বাবু, একটি পেট থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছেলেটাই সবচেয়ে ছোট—"

ছেলেটার নাক বসা। মাথার চেহারাও স্বাভাবিক নহে। বুঝিলাম কাল রোগ শিশুটার দেহেও সংক্রামিত হইয়াছে।

"রক্তে কি পেলেন ডাক্তারবাবু ?"

"গর্মি'র বিষ পাওয়া গেছে।"

"যাবেই আমি জানতুম—"

"তুই ওরকম একটা পাজি দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে আছিস কেন। ওকে ছেড়ে দিলেই পারিস—"

"তা কি পারি বাবু। ওর সঙ্গে আমার 'সাধি' (বিয়ে) হয়েছে সেই কোন ছেলেবেলায়। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। ওকে ছেড়ে যাব কেমন ক'রে—"

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে একটু যেন উষ্মার ভাব লক্ষ্য করিলাম। আমি আর কিছু বলিলাম না।

একটু পরেই লোকটা আসিয়া পড়িল। দেখিলাম গামছায় কিছু ছাতু বাঁধিয়া আনিয়াছে।

মেয়েটি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার সব কীর্তি ধরা পড়ে গেছে—"

লোকটা অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিলাম, "এদিকে এস। তোমার প্রেসক্রিপশন লিখে দি। কি নাম তোমার?"

"বুলবুল।"

প্রেসক্রিপশন লিখিতেছিলাম মেয়েটি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আপনার ফিস কত ডাক্তারবাবু?"

"দশ টাকা।"

সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার একখানা নোট সামনে রাখিল।

"কি করিস—"

"আমি মেছুনী বাবু। মাছ বিক্রি করি—"

"দশ টাকা দিতে যদি কষ্ট হয় তাহলে—"

"না বাবু। ডাক্তারের প্রণামী না দিলে অসুখ সারে না—"

তারপর হঠাৎ সে আমার পা'দুইটা জড়াইয়া ধরিল—"ওকে ভালো ক'রে দিন বাবু। আমি আমার জেবর (গয়না) বেচে ওর চিকিৎসা করাব—"

"পা ছেড়ে দে। ভালো হয়ে ও তো আবার বদমাইসি শুরু করবে—"

মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা করবে। জানেন বাবু, ও আমার কাছ থেকে পয়সা কেড়ে নিয়ে গিয়ে এইসব বদমায়সি করে। কি করব বাবু, আমার নসীব—"

প্রেসক্রিপশন লইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। ওই কালো কুৎসিৎ আসন্নপ্রসবা মেছুনীর মুখটাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। সিনেমার গল্পটা ও যেন মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

উপেনের ছেলে

॥ ১ ॥

উপেন আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু সেকথা আমার মনে ছিল না। ডিসপেনসারিতে বসিয়া আছি এমন সময় একজন ফতুয়াপরা লোক ডান হাতে এক ঠোঙা তেলেভাজা এবং বাম কাঁধে একটি শিশুকে লইয়া প্রবেশ করিল। শিশুটির বয়স বছর তিনেক হইবে। লক্ষ্য করিলাম তাহার দুইটি নাসারন্ধ্রই 'সিক্নি'তে ভরতি। লোকটি তেলেভাজার ঠোঙাটি আমার টেবিলের উপর নামাইয়া সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, "ডাক্তারবাবু, চিনতে পারেন?"

প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রায়ই আমাকে অপ্রস্তুত মুখে স্বীকার করিতে হয়, "না। ঠিক মনে পড়ছে না তো—।"

এ ভদ্রলোককেও তাহাই বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার নাম উপেন। কুঙ্কুমগঞ্জে স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম—"

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির যবনিকা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি কাঁচ কিশোর বালক স্কুলের পিছন দিকের ঝোপে-ঝাড়ে ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেছে।

"আরে উপেন! একদম বদলে গেছিস তো। নাকের নীচে অমন বাটার-ফ্লাই গোঁফ, মাথার সামনে টাক, একেবারে ভোল বদলে ফেলেছিস দেখছি। ব'স্ ব'স্—"

"দাঁড়া ছেলেটার নাকটা পরিষ্কার করে দি—"

উপেন ছেলেটাকে বাহিরে লইয়া গেল।

"ফোঁ কর, ফোঁ কর। এঃ ছি, ছি, তোমার মা কিছু দেখে না তোমাকে।"

দেখিলাম উপেন নিজের ফতুয়ার পকেট হইতে একটি রুমাল বাহির করিয়া তাহার নাক মুখ মুছাইয়া দিল।

"চল এবার তেলেভাজা খাওয়া যাক। দুটোর বেশি দেব না কিন্তু। পেটখারাপ হয়ে গেলে তোমার মা বকবে আমায়।"

উপেন ঘরের ভিতর আসিয়া বসিল এবং ঠোঙার ভিতর হইতে দুইটি ফুলুরি বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিল।

"তোর ছেলে নাকি—"

"না ভাই। হরেন কুণ্ডুর ছেলে। ওর বাসাতেই উঠেছি। তুই খাবি তেলে-ভাজা?"

তেলে-ভাজাতে আমার অরুচি নাই; কিন্তু ডাক্তারী বিবেকে বাধিতে লাগিল।

"কোথা থেকে কিনেছিস?"

"ওই যে রাস্তার ধারে ব'সে ভাজছে, ওই পানের দোকানটার পাশে—"

দোকানটা দেখিয়াছি। ওই নোংরা দোকানের তেলে-ভাজা খাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

"না ভাই, রাস্তার জিনিস খাব না—"

"আগে তো খুব খেতিস। দু'একটা খা না। কিছু হবে না; আমি তো রোজ খাই। কিছু হয় না। নে, দুটো খা—"

খাইতেই হইল। উপেন টপাটপ খাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠোঙা নিঃশেষ হইয়া গেল। ঠোঙাটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া উপেন বলিল, "জল খাস নি। জল খেলেই অম্বলটি হবে। তোর ছেলেপিলে কি?"

"দুটি মেয়ে দুটি ছেলে।"

"বাঃ বাঃ। বড়টির বয়স কত?"

"বছর সাতেক—"

"বাঃ। ছেলে, না মেয়ে—"

"মেয়ে।"

"বাঃ বাঃ।"

এই তুচ্ছ সংবাদগুলি সে যেন মহানন্দে উপভোগ করিতে লাগিল।

"তোর বাসা কতদূর এখান থেকে?"

"কাছেই—"

"তোর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। একে এর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। তারপর বাজারেও একটু ঘুরতে হবে। বিকেলে আসব। এইখানেই আসব। ক'টার সময় তুই আসিস?"

"চারটে সাড়ে চারটে—"

"ওই ঠিক হবে—"

"তুই কি করছিস?"

"ধান-চালের ব্যবসা। আমি চলি তাহলে, এটাকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। মহা বায়নাদার ছেলে, একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে ঝামেলা। কাল চেলো-পটিতে নিয়ে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিলাম এমন কান্না জুড়ে দিলে যে আমার ব্যবসা-ফ্যাবসা মাথায় উঠল, আবার রিক্সা ক'রে ওকে বাড়িতে পেঁাছে দিতে হ'ল। চোখ বড় বড় ক'রে কেমন শুনছে দেখ না। চল—"

উপেন ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেল। অনেকদিন পরে বেশ লাগিল উপেনকে।

॥ ২ ॥

বৈকালে সে আসিয়া আমার ছেলেমেয়েদের সহিত খুব জমাইয়া ফেলিল। আগডুম-বাগডুম খেলিল, গল্প বলিল, গলার ভিতর হইতে নানা রকম শব্দ বাহির করিয়া আমার ছোট মেয়েটাকে হাসাইয়া হাসাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

শেষে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "চল আমরা বেড়িয়ে আসি।"

আমার ছোট মেয়েটাকেও সে কাঁথা মুড়ি দিয়া কাঁধে করিয়া লইল। আমরা বারণ করিলাম, কিছুতে শুনিল না। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরিল তখন অবাক হইয়া গেলাম। আমার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য জামা কিনিয়াছে, খেলনাও প্রচুর। শিশি শিশি লজেন্স, টফি, চকোলেট, তা ছাড়া ভালো রসগোল্লাও এক হাঁড়ি আনিয়াছে দেখিলাম।

"কি কাণ্ড করেছিস তুই—"

"দেবতার পুজো করব না? ওরাই তো দেবতা।"

"অত খাবার কি ওরা খেতে পারবে?"

"পাড়ার ছেলেমেয়েদের দাও।"

উপেনের চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইল উহার উপর কি যেন একটা ভর করিয়াছে। আমার গৃহিণী চুপিচুপি আড়ালে আমাকে বলিলেন—"ওঁকে এবেলা আমাদের বাড়িতেই খেতে বল।"

কথাটা উপেনের কানে গেল। সে হাসিয়া বলিল, "আরে সে কথা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম এখুনি। ডাক্তারের সঙ্গে দরকার আছে আমার। আমার ছেলেটার পেটের অসুখ কিছুতে সারছে না। সেজন্য ওর কাছে প্রেসক্রপশন নিতে হবে—"

রাত্রে আমার ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ জাগিয়াছিল উপেন তাহাদের লইয়াই মত্ত ছিল সর্বদা। আমার ছোট মেয়েটাকে চটকাইয়া মটকাইয়া লুফিয়া, কাইকুতু দিয়া সে যে কাণ্ড করিতে লাগিল তাহাতে আমার গৃহিণীতো ভয়ই পাইয়া গেলেন।

"তোর ছেলের কি হয়েছে বল—"

"গ্রীন ডায়ারিয়া! আর বড্ড রোগা হ'য়ে গেছে—"

"বয়স কত?"

"পাঁচ মাসে পড়েছে—"

"দাঁত উঠবে বোধ হয়। ভয় নেই। আমি লিখে দেব ওষুধ একটা। তোর আর ছেলেপিলে কি?"

"ওইটেই প্রথম ছেলে। অনেক পরে বিয়ে করেছি যে। জীবনে অনেক স্ট্রাগ্‌ল্‌ করতে হয়েছে। তোমাদের মতো ভাগ্যবান তো আমি নই। তোমরা মহা ভাগ্যবান।"

পরদিন সকালে উপেন চলিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

বছর দুই তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। হঠাৎ তাহার দেখা পাইয়া গেলাম একটা মেলায়। মেলায় আমি গাই কিনতে গিয়াছিলাম। গাইটি কিনিয়া চাকরের সঙ্গে সেটি পাঠাইয়া দিয়া মেলাটা ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম উপেন একটা কাটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া আছে, তাহার সঙ্গে একটি শিশু। শিশুটির গায়ে সে জামা পরাইয়া দেখিতেছিল।

"উপেন যে। কি খবর—"

"আর তুই, এখানে কোথা থেকে?"

"আমি একটা গাই কিনতে এসেছিলাম। জামা কিনছিস?"

"হ্যাঁ ভাই, ছেলেটার জন্য একটা জামা কিনেছি।"

"এই তোর ছেলে না কি—?"

"না আমার ছেলে বাড়িতে আছে। এর মাপের জামা কিনলেই তার হবে। এটি হচ্ছে ওই আড়তদারের ছেলে।"

"তোর ছেলে আছে কেমন?"

"তুই তো ধন্বন্তরি। তোর এক প্রেসক্রিপশনে সে সেরে গেছে। তারপর থেকে আর কোনও অসুখই হয়নি।"

"আমাকে তো একটা খবরও দিলি না।"

"ওইটি ভাই পারি না। মুখ চলে, কলম চলে না। তুই কোথা উঠেছিস?"

"কোথাও না। গাড়িতে এসেছি, এখনি ফিরে যাব।"

"আমার ছেলেটা সেরে গেছে বটে, কিন্তু তেমন জোর হয়নি গায়ে। একটা টনিক লিখে দিবি?"

"টনিক খেয়ে আর কি হবে? ভালো ক'রে খেতে দে—"

"সব রকম দিই ভাই। ভালো ভালো বিলিতি ফুড্‌, মধু, কমলালেবুর রস, ছাগলের দুধ— ওর জন্যেই ছাগল পুষেছি।"

"তাহলে আর টনিক দরকার নেই।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে উপেন বলিল, "তবু একটা লিখে দে ভাই। তোর প্রেসক্রিপশনের গুণই আলাদা।"

দোকানীর নিকট হইতে এক টুকরা কাগজ চাহিয়া লইয়া একটা ভালো টনিকের নাম লিখিয়া দিলাম।

"আধ চামচে করে দু'বার খাওয়াবি—"

"আচ্ছা। এখন যাচ্ছিস ?"

"হ্যাঁ ভাই, যেতে হবে। একটা সঙ্গীন রুগী আছে।"

॥ ৪ ॥

বছর তিন আর উপেনের সহিত দেখাশোনা নাই। কোনও খবরও সে দেয় নাই। হঠাৎ একদিন ট্রেনে আবার তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। দেখিলাম এক জটা-জুটধারী সন্ন্যাসীর সহিত গাড়ির এক কোণে বসিয়া আলাপ করিতেছে। মনে হইল তাহার চেহারাটায় বার্ধক্যের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। মাথার টাকটা আরও বড় হইয়াছে। জুলপির চুল কাঁচা-পাকা। গাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাসিমুখে ভুরু নাচাইল। তারপর কোণ ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল।

"আশ্চর্য, আমি তোর কথাই রোজ ভাবছি। একদিন হয়তো গিয়ে পড়তাম। ভারি মুশকিলে পড়েছি—"

"কি হ'ল—!"

"ছেলেটার লিভারের দোষ হয়েছে।"

"কি করে জানলি লিভারের দোষ—"

"হরি কম্পাউন্ডার বললে। সেই তো ও অঞ্চলে নীলরতন সরকার।"

"কষ্ট কি হয় তার ?"

"কষ্ট বিশেষ কিছু নেই। খাচ্ছে-দাচ্ছে গায়ে-গত্তি লাগছে না। হাড়-পাঁজরা গোনা যায়।"

"আমার কাছে একবার নিয়ে আয় না। ভালো করে দেখে ওষুধ দেব—"

"নিয়ে যাব। সময় পাই না ভাই। ব্যবসা অতি পাজি জিনিস, নাকে দড়ি দিয়ে দিনরাত খাটিয়ে নিচ্ছে।"

"তোর শরীরটাও তো খুব ভালো নয় দেখছি।"

"না। বোধহয় বেশীদিন বাঁচব না। মনে সুখও নেই।"

"কিসের অসুখ তোর ?"

"সব কথা কি বলা যায় !"

উপেনের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি পরের স্টেশনেই নামিলাম। উপেন বলিল আমার কাছে শীঘ্রই সে ছেলেকে লইয়া আসিবে। কিন্তু আসে নাই।

॥ ৫ ॥

আরও বছর পাঁচেক কাটিয়াছে। উপেনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় একদিন একটি লোক আমার ডিস্‌পেন্সারিতে আসিয়া বলিল, "আপনার বন্ধু উপেন-

বাবুর কাছ থেকে আসছি, তিনি খুব অসুস্থ। আপনাকে একবার যেতে হবে। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।"

"উপেন কোথায় আছে?"

"তাঁর দেশের বাড়িতে। কালনার কাছে একটা গ্রামে—"

'না' বলিতে পারিলাম না।

উপেনের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম তাহার শেষ অবস্থা। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভাই তুই এসেছিস। আমি আশা করতে পারিনি। আমি আর বাঁচব না। একটা কথা বলবার জন্যে তোকে ডেকেছি—আমার ছেলেটাকে দেখিস, বিনা চিকিৎসায় যেন না মরে।"

"কোথা তোর ছেলে—?"

"আঁতুড়-ঘরে। সাতদিন আগে জন্মেছে। আমার অপুত্রক নাম ঘুচেছে। আমি এবার শান্তিতে মরতে পারব।"

"এতদিন তাহলে—"

"এতদিন তোকে মিছে কথা বলেছি। এতদিন আমি আঁটকুড়ো ছিলাম। মাণিক এতদিন পরে এল। একটু আগে এলেই হ'ত! তুই ওর ভার নে ভাই—"

প্রতিশ্রুতি দিলাম লইব।

সেই দিনই উপেন মারা গেল।

অদ্ভুত গল্প

আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে রাঘবগঞ্জে যাইতেছিলাম। রাঘবগঞ্জের পূর্বনাম ছিল পুঁটিচক। জনৈক ধনী জমিদার নাকি পুঁটিচক গ্রামটি সেকালে নীলামে খরিদ করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং শ্বশুর স্বর্গীয় রাঘবচন্দ্র কুণ্ডুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত গ্রামটির নাম বদলাইয়া রাঘবগঞ্জ রাখিয়াছিলেন। শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার হেতু আধ্যাত্মিক নয়, আর্থিক। শ্বশুর মহাশয়ের টাকাতেই গ্রামটি খরিদ করিতে পারিয়াছিলেন তিনি—ইহাই জনশ্রুতি। রাঘবচন্দ্র কুণ্ডু একটি ধনকুম্ভীর ছিলেন। লোকে বলে, ডাকাতি করিয়াই নাকি প্রথমে তিনি বড়লোক হন। এজন্য সকলেই ঘৃণা করিত তাঁহাকে। পারতপক্ষে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে চাহিত না। রাঘববাবুকে তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করিতেও বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেহই নাকি ডাকাতের মেয়েকে বধূরূপে ঘরে আনিতে চাহে নাই। অনেক চেষ্টার পর রাঘবচন্দ্র না কি জামাতাটিকে জোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন। গরীবের ছেলে শিবধন সাধু অবশ্য বেশীদিন গরীব থাকেন নাই, শ্বশুরের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তিনি এবং পুঁটিচককে রাঘবগঞ্জে রূপান্তরিত করিয়া ও অঞ্চলের লোকের থোঁতামুখকে ভোঁতাও করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের নামই রাঘবগঞ্জ হওয়াতে রাঘব নামটা সকলকে উচ্চারণ করিতে হইয়াছিল।

এ সব নাকি বহুকাল পূর্বের কথা, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। আমার সহযাত্রী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকই রাঘবগঞ্জের ইতিহাস আমাকে শুনাইতেছিলেন। তিনি গাড়ির

এক কোণে বসিয়াছিলেন, আমি রাঘবগঞ্জ যাইব শুনিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাহার পর গাড়ির লোকজন যখন নামিয়া গেল তখন আমার নিকট সরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাঘবগঞ্জে তো যাচ্ছেন ? রাঘবগঞ্জের ইতিহাস জানেন ?"

"না।"

তখন তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি আমাকে বলিলেন।

ভদ্রলোক কাছে সরিয়া আসিতে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিলাম। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, চোখের তারা কালো নয়, ধূসর। মুখের সমস্ত চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কপাল হইতে চিবুক পর্যন্ত থাকে-থাকে ঝুলিতেছে। এরকম মুখ পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। ভদ্রলোক ঈষৎ ঝুঁকিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"আপনি এত সব ইতিহাস জানলেন কোথা থেকে ?"

"আমি এককালে ওখানে ছিলাম যে। এখন অবশ্য সে রাঘবগঞ্জ আর নেই। এখন সেখানে স্টেশন হয়েছে, পোস্টাফিস হয়েছে, থানা হয়েছে, মিলও হয়েছে গোটা কতক! আগে কিছু ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ওখানে চাঁড়াল ফৌজরা থাকত। অনেক চাঁড়াল তখন ফৌজে ভর্তি হ'ত। একটা পাড়ার নামই ছিল ফৌজপাড়া।"

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলিয়া ঈষৎ ব্যায়ত-আননে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নীচের ঠোঁটের উপর তাঁহার জিহ্বার ডগাটি নড়িতে লাগিল। আমি হঠাৎ ভয় পাইয়া গেলাম। কে এ ভদ্রলোক! শুইয়া ছিলাম, উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়িতে আর কেহ নাই।

"রাঘবগঞ্জে আপনি কোথায় উঠবেন ?"

"পুষ্প পল্লীতে।"

ভদ্রলোকের মুখে মৃদু হাসি ফুটিল একটা।

"আগে ওটার নাম থাবা-পাড়া ছিল।"

"থাবা পাড়া ? ও নামের মানে কি!"

"এখন মানে নেই, আগে ছিল। ওখানে আগে অনেক কুকুরের থাবা ছড়ানো থাকত, আর তাই নিয়ে শকুনিরা ছেঁড়াছেঁড়ি করত।"

"কুকুরের থাবা ?"

"হ্যাঁ। আগে কুকুর কাটা হ'ত ওখানে। কুকুরের মাংস সরবরাহ করা হ'ত ফৌজদের। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ধ'রে আনবার জন্যে একদল লোকই ছিল—"

গাড়ির আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। শোঁ শোঁ করিয়া হাওয়া উঠিল একটা। অন্ধকারের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ট্রেন চলিতেছে। চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ আগে লক্ষ্য করি নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, অসংখ্য কুকুর বুঝি আর্তনাদ করিতেছে। একটা হাহাকারের ভিতর দিয়া আমরা যেন ছুটিয়া চলিয়াছি। একটু পরে ট্রেনটা থামিয়াও গেল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কোন স্টেশন দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর দড়াম্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গাড়ির কোন কপাট খোলা ছিল কি ? হাওয়ার বেগে হয়তো সেইটাই বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরে গাড়ি আবার চলিতে

আরম্ভ করিল। আলোও জ্বলিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

…একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম একটা। বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গায় বড় একটা বাড়ি রহিয়াছে। সেকেলে চক-মিলানো বাড়ি। দেখিতে অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতো। বাড়ির পাশে যে ফাঁকা মাঠটা রহিয়াছে তাহার একদিকে কয়েকটা বৃদ্ধ শিমুল গাছ। শিমুল গাছের উপর অনেক শকুনি। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা হাড়কাঠ পোঁতা রহিয়াছে। একটু পরেই ঢোলের বাজনা শোনা গেল। তাহার পর সবিস্ময়ে দেখিলাম, একদল বড় বড় কালো কুকুর গলায় ঢোল ঝুলাইয়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া সামনের পা দুটি দিয়া ঢোল বাজাইতেছে। সকলের মুখে একটা হিংস্র হাসি, সকলেই উত্তেজিত। তাহার পর যাহা দেখিলাম তাহা আরও ভয়ানক। দেখিলাম গ্রেট ডেনের মতো দুইটা বড় বড় কুকুর একটা লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে। একি, যে ভদ্রলোক আমাকে রাঘবগঞ্জের ইতিহাস বলিয়া গেলেন এ যে তিনিই। কুকুর দুইটি টানিতে টানিতে তাঁহাকে আনিয়া হাড়কাঠে ফেলিল। তাহার পর আর একটা বলিষ্ঠ কুকুর বিরাট একটা খড়্গ আনিয়া এক কোপে তাঁহার মুণ্ডটা উড়াইয়া দিল। ফোয়ারা দিয়া রক্ত ছুটিল। কুকুরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শকুনের দলও যেন তাহাদের সহিত সায় দিয়া একযোগে কলরব করিয়া উঠিল সমস্বরে।……ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম ভোর হইতেছে। ট্রেনে অনেক প্যাসেঞ্জারও উঠিয়াছে।

॥ ২ ॥

রাঘবগঞ্জে প্রায় বেলা বারোটার সময় পেঁাছিলাম। আমাকে স্টেশন হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য আমার দাদা আমাদের আর একটি আত্মীয়কে স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। কেহ না আসিলে অসুবিধায় পড়িতে হইত, কারণ রাঘবগঞ্জে পূর্বে কখনও আসি নাই। পিসামহাশয় কিছুদিন আগে এখানে আসিয়া একটি বাড়ি কিনিয়াছেন। খুব সস্তায় না কি।

বাড়িতে আসিয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। এই বাড়িই তো কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম! দেওয়ালগুলো শ্যাওলাধরা, কার্নিশে অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে, বাহিরের বারান্দার খানিকটা ভাঙা, অবিকল সেই বাড়ি। অথচ এ কথা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলাম না। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি প্রকাণ্ড চক-মিলান বাড়ি। দ্বিতলের একটি ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাইবামাত্র আত্মীয়-স্বজন আমাকে ঘেরিয়া ধরিল। নববধূ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। তাহার জন্য ভালো একটি শাড়ি আনিয়াছিলাম, সেটি তাহাকে দিলাম। পিসীমা বাড়ির সব খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুই সারা রাত ট্রেনে এসেছিস, তাড়াতাড়ি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। আজই তো বউভাতের খাওয়ানো; সন্ধে থেকেই আবার লোকজন আসতে আরম্ভ করবে। এখনই তুই বিশ্রাম করে নে একটু—"

পিসীমা চলিয়া গেলে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নীচে একতলায়

প্রকাণ্ড একটা দালান রহিয়াছে। বেশ বড় দালান—প্রায় একশত লোক সেখানে বসিয়া খাইতে পারে। বেশ বড় বাড়িটা। উপরে বারোখানি ঘর। নীচেও অনেক জায়গা। অথচ ঠিক এই বাড়িটা আমি কাল স্বপ্নে দেখিলাম কি করিয়া! এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে পড়িতে লাগিল। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল না। উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ির পাশ দিয়া একটা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়াই কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। এ কি, এ যে সেই মাঠ, এবং মাঠের ওপারে সারি সারি শিমুল গাছ! ঠিক সেই সময় প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। প্রখর দিবালোকে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু সেই অন্ধকারে মনে হইল একটা হাড়কাঠও যেন মাঠের মধ্যে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

ভোজের খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সবাই ঘুমাইয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। আমি আমার ঘরে একা শুইয়াছিলাম। সম্ভবত একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল নীচের দালানে—যেখানে নিমন্ত্রিতরা একটু আগে খাইয়া গিয়াছে—যেন বাসনের শব্দ হইতেছে। চোর নয় তো?—উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম চতুর্দিক অন্ধকার। নীচের দালানটায় দেখিলাম কাহারা যেন সারি সারি বসিয়া আছে। টর্চটা লইয়া আসিলাম ভিতর হইতে। জ্বালিয়া দেখি সারি সারি কালো কালো কুকুর বসিয়া খাইতেছে, আর একদল কুকুর তাহাদের পরিবেশন করিতেছে।

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গীতার ভাষ্য

ট্রেণের কামরায় আমি আর সেই লোকটি ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল একটি গীতার ভাষ্য এবং টর্চ। টর্চটি সামনেই রাখা ছিল। গীতার ভাষ্যটি মন দিয়া পড়িতেছিলাম। লোকটির সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। গায়ে ময়লা কামিজ, কাপড় শতছিন্ন; চুল উসকো-খুসকো, চক্ষু দুইটি লাল, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। নোংরা লোক। সে জানলার ধারে বসিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। একটু পরে বৃষ্টি নামিল এবং ট্রেণ একটা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"একটি পয়সা দাও না বাবু। সারাদিন খেতে পাইনি—"

জীর্ণ শীর্ণ একটি ছোট মেয়ে তাহার রোগা হাতটি বাড়াইয়া দিল। আমি কখনও ভিখারীকে প্রশ্রয় দিই না। লোকটি দেখিলাম মেয়েটিকে একটি পয়সা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘচাং করিয়া গাড়িটাও ছাড়িল—

"আরে—"

লাফাইয়া উঠিল লোকটা। উঠিয়াই জোরে চেন টানিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হ'ল—"

"পয়সাটা ওর হাত থেকে প'ড়ে গেল। আপনার টর্চটা একবার দিন তো—"

ট্রেণ থামিতেই টর্চটা লইয়া দ্রুতবেগে নামিয়া গেল সে। একটু পরে ভিজিতে ভিজিতে ফিরিয়া আসিল। চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

"খুঁজে দিয়ে এলুম পয়সাটা। প্লাটফর্মের ওপরই পড়েছিল—"

গার্ড সাহেব আসিলেন। সব শুনিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। এ সব ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত। পরের স্টেশনে কিন্তু দারোগা পুলিশ আসিয়া হাজির। চেনের প্রসঙ্গ উঠিল না। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি রামলাল ধর?"

"হ্যাঁ—"

পকেট হইতে একটি ফটো বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন।

"আপনি নিজের মেয়েকে খুন করেছেন?"

"হ্যাঁ। খুন ক'রে বাঁচিয়েছি তাকে। তাকে খেতে দিতে পারতুম না। ক্ষিধের যন্ত্রণায় দিন রাত কাঁদত, একদিন চুরি করেছিল, তাই—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

"যাব না—"

হঠাৎ লোকটা লাফাইয়া উঠিয়া দারোগার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। মহা হুলুস্থুল কাণ্ড। গতিক খারাপ দেখিয়া আমি সুট করিয়া নামিয়া পাশের কামরায় চলিয়া গেলাম।

বিক্রম হেমব্রোম

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন সাঁওতাল পরগণায় এক ডিস্‌পেন্সারিতে ডাক্তার হইয়া গিয়াছিলাম। তখন ট্রানজিসটার আবিষ্কৃত হয় নাই, ড্রাই-সেল ব্যাটারির রেডিও তখন অজ্ঞাত ছিল। সমস্ত দিন রোগীদের লইয়া কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার পর নিজের ভাঙা হারমোনিয়মটি লইয়া একাই গান করিতাম। শ্রোতা ছিলেন স্থানীয় পোস্টমাস্টার হরিভূষণবাবু। তিনিও সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসিতেন এবং চক্ষু বুজিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে আমার সঙ্গীত উপভোগ করিতেন। তাঁহারই মুখে খবর পাইয়াছিলাম দুমকা শহরের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রেডিও আছে। নাম শুনিয়া মনে হইয়াছিল, ডাক্তারবাবু সম্ভবতঃ আমার সহপাঠী। ভাবিলাম একদিন দুমকা গিয়া খোঁজ করিব। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি যেখানে ছিলাম দুমকা সেখান হইতে বেশ দূরে। আজকালকার মতো ঘন ঘন 'বাস্‌'ও ছিল না তখন।

তখনও আমার বিবাহ হয় নাই, একা একাই থাকিতাম। হাসপাতালের কাজ হইয়া গেলে, সময় যেন কাটিতে চাহিত না। এই সময় একদিন বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় যোগ দিবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। সভাটি নাকি প্রতি বছরই হয়। যদিও সভা আমার ডিস্‌পেন্সারি হইতে বেশ একটু দূরে হইবে শুনিলাম —প্রায় ক্রোশখানেক দূরে—তবু ঠিক করিলাম যাইব।

সেই সভাতেই প্রথমে আমি বিক্রম হেম্‌ব্রোমের সাক্ষাৎ পাই। দৃষ্টি আকর্ষণ

করিবার মতো পোশাক এবং চেহারা। মাথায় প্রকাণ্ড পিগ্‌স্টিক্‌ হ্যাট্‌ (হ্যাট্‌টা তিনি সর্বদা পরিয়াই থাকেন শুনিলাম), গায়ে ফুল-হাতা শার্ট, পায়ে ভারী বুট জুতা এবং পরিধানে খাকি ফুল-প্যান্ট। সৌম্য শান্ত চেহারা। মনে হইল যেন কালো পাথরের একটি মূর্তি এক ধারে বসানো রহিয়াছে। গোলগাল ভারী মুখ। পরিষ্কার কামানো। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং একাগ্র। দেখিয়া মনে হইয়াছিল বয়স চল্লিশের কোঠায় হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্তরের কাছাকাছি।

বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় কৃতী কর্মচারীদের গভর্নমেণ্ট পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পর সেদিন এস. ডি. ও সাহেব (অবশ্য তিনি সাহেব নন, বাঙালী) নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা কেউ যদি কিছু বলতে চান, বলুন।"

বিক্রম হেম্‌ব্রোম উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, "আমি কিছু বলব।"

"বলুন।"

হেম্‌ব্রোম বলিতে লাগিলেন, "এই বনকে আমরা ভালোবাসি। এই বনের আশ্রয়ে আমরা লালিত, এই বনের দাক্ষিণ্যে আমরা পালিত। এই বনের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ, এই বনের গাছপালা, লতাগুল্ম, পশুপক্ষী, ফুল-ফল আমাদের পরম আত্মীয়। এই বনকে আমরা ভালোবাসি, খুবই ভালোবাসি, বনকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ সব। এই বনই আমাদের জীবন। এই বন যখন আমাদের অধিকারে ছিল তখন এই বনকে আমরা সেবা করতাম, এই বনকে আমরা রক্ষা করতাম। এই বনকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারতাম। বনে যখন আগুন লাগত তখন আমরা দলে দলে ছুটে যেতাম সে আগুন নেবাতে। বনের ছোট গাছকে কেউ যদি আঘাত করতো আমরা শাস্তি দিতাম তাকে। অকারণে কোন গাছ কাটবার নিয়ম ছিল না, অসময়ে বা অকারণে বনের পশুপক্ষী শিকার করাটা আমরা পাপ বলে মনে করতাম। এখন কিন্তু বন আর আমাদের অধিকারে নেই। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আপনারাই বনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বনের সম্বন্ধে আমাদের কথা আর কেউ শোনে না। আইনতঃ এখন আপনারাই বনের রক্ষক। সত্যিই যদি রক্ষক হতেন, সত্যিই যদি এই বনদেবীকে আপনারা সেবা করতেন তাহলে আমাদের দুঃখ হতো না। এখন কিন্তু বড় দুঃখ হয়, কারণ আপনারা রক্ষক নন, ভক্ষক। সকলেরই লক্ষ্য বনকে লুট ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি, কিছু বলতে পারি না, কারণ বললেও আমাদের কথা কেউ শোনে না। আজ আপনি সুযোগ দিলেন তাই আমার মনের কথাটা ব'লে ফেললাম। আপনারা বনকে ভালোবাসতে শিখুন, তাহলেই আমার মনের দুঃখ আপনারাও অনুভব করতে পারবেন। আর আমার কিছু বলবার নেই, এইবার আমি থামলাম।"

বিক্রম হেম্‌ব্রোমের স্পষ্টবাদিতায় সেদিন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। সভার পর সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিক্রম হেম্‌ব্রোম সভার পরই চলিয়া গেলেন। শুনিলাম কোথাও তিনি খান না।

আর একদিনের ঘটনা।

হাসপাতালে কাজ করিতেছি। চারিদিকে সাঁওতাল রোগীর ভিড়। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি দ্বারপ্রান্তে বিক্রম হেমব্রোম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রতিটি সাঁওতাল রোগী হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আগাইয়া গেল এবং নতমস্তকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ইহাই নাকি সাঁওতালদের মধ্যে সম্ভ্রম প্রকাশের কায়দা।

অনুভব করিলাম বিক্রম হেমব্রোমকে সকলে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে তাহা আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখের চেয়ারটায় বসিতে বলিলাম। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন তাঁহাকে যে আমি বিশেষ খাতির করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিতেছি ইহা তিনি চান না। তিনি সকলের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে চান।

আমার আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তিনি চেয়ারে বসিলেন এবং বলিলেন তাঁহার একটি নাতির জ্বর হইয়াছে তাহার জন্যই ঔষধ লইতে আসিয়াছেন। পাঁচ দিনের টেম্পারেচার চার্ট তিনি মুখস্থ বলিয়া গেলেন। অন্যান্য লক্ষণও এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে মনে হইল আমি রোগীটিকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

আমি একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলাম, তিনি সেটি লইয়া ঔষধ লইবার জানালায় দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি বসুন। আমি এখানেই আপনাকে ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি।"

কম্পাউন্ডারকে ডাকিয়া প্রেসক্রিপশনটা তাঁহাকে দিলাম। বিক্রম হেমব্রোম কুণ্ঠিত অপ্রস্তুত মুখে বসিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহাকে কেহ বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছে ইহা তিনি চান না।

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাঁহার নজর পড়িল।

"ঘড়িটা বন্ধ দেখছি। সেট্ টমাসের ভালো ঘড়ি, চলছে না কেন?"

"কি জানি! আমি এসে থেকেই বন্ধ দেখছি।"

"আমাকে যদি দেন, আমি দেখতে পারি। যদি ভেতরে কিছু ভেঙে না গিয়ে থাকে, বোধহয় ঠিক ক'রে দিতে পারব।"

"আচ্ছা, আমি ওপরে লিখে দেখি, তাঁরা যদি বলেন সারাতে, দেব।"

"আচ্ছা।"

কম্পাউন্ডারবাবু একটু পরে ঔষধ আনিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন হেমব্রোম। যতক্ষণ বসিয়া ছিলেন মাথার হ্যাট্ একবারও খোলেন নাই। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেলাম। দেখিলাম তিনি সাইকেলে করিয়া আসিয়াছেন, সাইকেলের পিছনে জলের একটি ফ্লাস্ক বাঁধা রহিয়াছে। শুনিলাম তিনি বাহিরে কোথাও জল খান না, যেখানে যান সঙ্গে করিয়া ফুটানো জল লইয়া যান।

কম্পাউন্ডারবাবুর মুখে বিক্রম হেমব্রোমের আরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। জাতিতে তিনি সাঁওতাল, ধর্মে ক্রিশ্চান। ইংরেজদের আমলে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে সময় ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইঁহার চারিত্রিক নিষ্ঠার জন্য সকলেই ইঁহাকে খুব খাতির করিত, এমন কি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা পর্যন্ত। ইঁহার বিচার-বিবেচনার উপর সকলেরই আস্থা ছিল। ইংরেজদের আমলে ইনিই প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ইঁহার সে প্রতাপ আর নাই। ইনি এখন বনে বনে একা ঘুরিয়া বেড়ান, বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই ইঁহার অধিকাংশ সময় কাটে। ইঁহার আর একটা কাজ ঘড়ি-সারানো। এ অঞ্চলের সকলের বাড়ির ঘড়ি ইঁহারই তদারকে চলে। ইনি প্রতি সপ্তাহে গিয়া সকলের ঘড়ির খবর লইয়া আসেন।

কয়েকদিন পরে একটা 'কলে' যাইতেছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল বিক্রম হেমব্রোম একটি বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমি সাইকেলে যাইতেছিলাম, নামিয়া পড়িলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বাড়িতেও তিনি সেই বিরাট হ্যাট্ পরিয়া বসিয়া আছেন।

"এইটে আপনার বাড়ি নাকি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন।"

"আমি একটা রোগীর বাড়ি যাচ্ছি এখন। পরে আসব। সেদিন আপনাকে হাসপাতালের দেওয়াল-ঘড়িটি দিতে পারিনি। কারণ ওটা সরকারী জিনিস, ওপরের হুকুম না পেলে দিতে পারি না। তবে আমার একটা পুরানো সোনার ঘড়ি আছে। বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। সেই ঘড়িটা চলছে না, সেটা আপনাকে সারাতে দেব।"

"বেশ দেবেন। দেখব।"

আমি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"আপনার এই হ্যাট্‌টি বড় অদ্ভুত। এত বড় হ্যাট্ আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ, এটি আমি সর্বদা পরে থাকি। রাত্রে ঘুমোবার সময় কেবল খুলি। খুলে মাথার শিয়রেই রেখে দি। এটি আমার কাছে অতি মূল্যবান জিনিস। আমার স্ত্রী বনের কাঠ কুড়িয়ে হাটে বিক্রি করত। সেই পয়সা জমিয়ে সে তখনকার কমিশনার সাহেবের স্ত্রীকে দিয়ে বলেছিল—আপনি বিলেত থেকে আমার স্বামীর জন্য একটা উপহার আনিয়ে দিন। সেটা তাঁর জন্মদিনে তাঁকে দেব। মেমসাহেব এই হ্যাট্‌টা আনিয়ে দিয়েছিলেন! মেমসাহেব আমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি হঠাৎ এসে একদিন ফিতে দিয়ে আমার মাথার মাপ নিলেন। কেন নিলেন কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কিছু বললেন না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন কেবল। কিছুদিন পরে এই হ্যাট্ লণ্ডন থেকে এল। আমি যৌবনে খুব ভালো শিকারী ছিলাম। বর্শা দিয়ে শুয়োর শিকার করতে পারতাম। তাই বোধহয় এই হ্যাট্ আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমার স্ত্রীও নেই, সেই মেমসাহেবও নেই, হ্যাট্‌টা কেবল আছে। তাই ওটাকে মাথা থেকে আর নামাই না।"

হেমব্রোম একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। আমি রোগী দেখিতে চলিয়া গেলাম। রোগীর বাড়ি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম তিনি আমার ডিসপেন্সারিতে আসিয়া বসিয়া আছেন।

"কই আপনার ঘড়িটা দিন, দেখি।"

তাঁহার মুখে একটা শিশুসুলভ আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভারী ভালো লাগিল।

ঘড়িটি বাহির করিয়া আনিলাম। এরকম ঘড়ি আজকাল দেখা যায় না। ঘড়ির সঙ্গে আলাদা চাবি থাকে, সেই চাবি দিয়া দম দিতে হয়। ঘড়ির সামনেটা ঢাকা দেওয়া। মাথার দিকে টিপিলে ঢাকনা খুলিয়া যায়। পিছনের দিকেও একটা ঢাকনা আছে, সেটাও স্প্রিংয়ের কৌশলে খোলা যায়। সেখানে ঘড়িতে দম দিবার জন্য একটি এবং ঘড়ির কাঁটা সরাইবার জন্য আর একটি ছিদ্র আছে।

হেমব্রোম বলিলেন, "এ তো একটা অমূল্য জিনিস!"

দুই একবার নাড়িয়া ঘড়িটি কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন।

"না, চলছে না। কাল আমি বলব এটা সারাতে পারব কি না। যদি সারাতে না পারি, কালই ফেরত দিয়ে যাব। এখন আমি যাই। আপনি ধনেশ পাখি দেখেছেন?"

"না—"

"যদি এখন হাতে কাজ না থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আজ দুটো ধনেশ পাখি আসবে।"

"তাই নাকি? আজই আসবে কি করে বুঝলেন?"

"আমি জানি। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন ওরা আসে। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি—"

"চলুন।

সাইকেলে চড়িয়া উভয়ে রওনা হইলাম। বনের প্রান্তে আসিয়া হেমব্রোম বলিলেন, "সাইকেল থেকে এবার নামতে হবে। সাইকেল দুটো এখানেই থাক!"

"কেউ নিয়ে যাবে না তো—"

"না। আমার সাইকেলে গরম জলের বোতল বাঁধা আছে। কেউ নেবে না ওটা। আপনারটাও নেবে বলে মনে হয় না।"

এমন সময় বনের প্রান্তে একটি সাঁওতাল কিশোরীকে দেখা গেল। হেমব্রোমকে দেখিয়া সাঁওতালী কায়দায় অভিবাদন করিল সে। বনের ধারে সে কাঠ কুড়াইতেছিল।

"ঝুমরি, তুই আমাদের সাইকেল পাহারা দে। আমরা বনের ভিতর যাচ্ছি।"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া আগাইয়া আসিল। কুচকুচে কালো রং, তবু সে শ্রীমতী। মাথায় একটি নীলকণ্ঠ পাখির পালক গোঁজা।

বনের ভিতর কিছুদূর গিয়া হেমব্রোম দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন—"সামনে ওই দূরের গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন। দুটি ধনেশ বসে আছে। আজ সমস্ত দিন এই বনে থাকবে, তারপর চলে যাবে।"

বিরাটচঞ্চু ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

হেমব্রোম বলিলেন,—"ওরা আসাম থেকে আসে। আসামের বনের খবর ওরা আমাদের বনকে দিয়ে যায়। আর আমাদের বনের খবর নিয়ে যায় আসামের বনে।"

"কি করে বুঝলেন?"

অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন হেমব্রোম,—"আমি জানি!"

আমি অবাক হইয়া ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিতেছিলাম, হেমব্রোম বলিলেন, "চলুন ওই গাছটার তলায় বসা যাক—"

একটা বড় গাছের ছায়ায় গিয়া আমরা দুইজনে উপবেশন করিলাম।

হেমব্রোম বলিলেন, "এই গাছটার উপর আমার বিশেষ মায়া আছে। এই

গাছের তলায় আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মা রোজ বনে কাঠ কুড়োতে আসতেন। যখন প্রসব-বেদনা ধরে তখন তিনি এখানেই ছিলেন।"

একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "—আমি সময় পেলেই এখানে চ'লে আসি—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, "ওই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন, ওখানেও একটা গাছ ছিল। ঠিক এই গাছের জুড়ি। কেটে ফেলেছে ওরা গাছটাকে। কেটে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। বনের প্রতি কারো মমতা নেই, সবাই চোর।"

নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম দুইজনে।

পরদিন হেমব্রোম আসিয়া বলিয়া গেলেন ঘড়িটি তিনি সারাইয়া দিতে পারিবেন। তবে সারাইতে মাসখানেক লাগিবে। একমাসের কিছু পূর্বেই আমাকে আর একবার হেমব্রোমের বাড়ির দিকে যাইতে হইয়াছিল। ভাবিলাম জানিয়া যাই ঘড়িটা সারানো হইয়াছে কিনা। হেমব্রোম বাড়িতেই ছিলেন।

"ঘড়ি ঠিক হয়ে গেছে। তবে এখনও এক মিনিট স্লো যাচ্ছে। আজ ওটা দেব না, ঠিক একমাস পরেই পাবেন।"

তাহার পর ঘড়িটি বাহির করিয়া কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার চোখের পাতা দুইটি বুজিয়া আসিল, তন্ময় হইয়া তিনি ঘড়ির শব্দ শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন।

"আর একটু রেগুলেট করতে হবে। চমৎকার ঘড়ি। যত্ন ক'রে রাখবেন আর ঠিক সময়ে খাবার দেবেন।"

"খাবার ?"

"খাবার মানে দম। ঠিক একই সময়ে দম দেওয়া চাই। আমি সকাল সাতটার সময় রোজ দম দিচ্ছি। আপনিও তাই দেবেন।"

আবার ঘড়িটি কানের কাছে ধরিলেন। আবার তাঁহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

ঠিক একমাস পরে ঘড়িটি তিনি আমাকে দিয়া গেলেন। আমি একটু স-সংকোচে জানিতে চাহিলাম এজন্য কত দিতে হইবে।

হেমব্রোম হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুই দিতে হবে না। এটা আমার পেশা নয়। এটাকে আমি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আগে আমি এ অঞ্চলের সবই নিয়ন্ত্রণ করতাম। এখন আমার সে ক্ষমতা নেই। এখন কেবল ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করি। ঘড়ি ঠিক না থাকলে পাংচুয়ালিটি থাকে না। আর তা না থাকলে সমস্ত জীবনটাই এলোমেলো হয়ে যায়।"

হেমব্রোম হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেমব্রোম কতদূর লেখাপড়া করিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। কিন্তু ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছিলাম তিনি শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি।

একমাস পরে দৈবাৎ একদিন আমার সেই দুমকার ডাক্তার বন্ধুটির সহিত দেখা হইয়া গেল। নানা কথার পর সে বলিল,—"বিক্রম হেমব্রোমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে না কি।"

"তুমি কি করে জানলে—"

"ও প্রায় প্রতিদিনই রাত নটার সময় আমার কাছে যেতো, রেডিওতে ঘড়ি মেলাবার জন্য। তখনই ও বলেছিল তোমার একটা খুব ভালো ঘড়ি ও সারাচ্ছে!"

"অতদূরে যেত রোজ?"

"হ্যাঁ, সাইকেলে যেত। অদ্ভুত লোক!"

"ও রকম লোক আমি দেখিনি।"

আরও প্রায় বছরখানেক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে খবর দিল—"শিগ্‌গির চলুন। হেমব্রোম অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

"বাড়িতেই?"

"না, বনের মধ্যে।"

যে বনে ধনেশ পাখি দেখিতে হেমব্রোমের সহিত গিয়াছিলাম সেই বনেই সাঁওতালটি আমাকে লইয়া গেল। যে গাছের নীচে আমরা বসিয়াছিলাম সেই গাছের নীচেই হেমব্রোম চিত হইয়া শুইয়া আছেন। মাথার হ্যাট্‌টি খুলিয়া গিয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর কুড়ালের দাগ। মনে হইল গাছটাকে কাটিয়া ফেলা হইতেছিল। কুড়ালের ক্ষতচিহ্ন হইতে রস ঝরিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হেমব্রোম মারা গিয়াছেন।

ক্ষতের গভীরতা

সরকারি কার্য উপলক্ষে ভাগলপুরের নিকট একটি গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে স্টেশন আছে, কিন্তু রিক্‌সা নাই। একটি কুলির মাথায় আমার মালপত্র চাপাইয়া প্রায় মাইল খানেক হাঁটিয়া মাড়োয়ারিদের একটি ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম।

কুলি জিনিসপত্র নামাইয়া ধর্মশালার ম্যানেজারের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল, আমার বিছানা খুলিয়া পাতিয়া দিল এবং পাশের মিথিলা ভোজনালয়ের পাচক চাঁদু ঝাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল—"বাবু কলকাতা থেকে এসেছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খেতে দিও। কলকাতার বাবুরা শাফসুতরো পছন্দ করেন।" হিন্দীতে বলিল, আমি বাংলা অনুবাদ করিয়া দিলাম। তাহাকে তাহার মজুরি চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "কাল আমি সকালে সাতটার ট্রেনে যাব। তুমি আসতে পারবে কি?"

"নিশ্চয় আসব। ঠিক ছ'টার সময় হাজির হয়ে যাব আমি।" কুলি চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি কমনীয় কান্তি যুবক আসিয়া হাজির হইল। পরনে টেরিলিনের বুশ-শার্ট, ড্রেন পাইপ প্যান্টালুন, পাঞ্জাবী চপ্‌পল। চোখে কালো চশমা, মুখে কায়দা করিয়া ছাঁটা গোঁফ দাড়ি।

"আপনিই কি সুরেন বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি আসবেন সে খবর আমি পেয়েছিলাম। কবে ফিরবেন—"

"কাল সকাল সাতটার গাড়ীতে। আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন। আমি বিনায়ক বক্‌সি—"

"এখানে কি করেন—"

"কিছুই করি না। আমার এক ভগ্নীপতি এখানে আছেন, চাষবাস করেন। তাঁর কাছেই থাকি।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বক্‌সি মশায়ই আবার বলিলেন, "ইকনমিক্‌সে এম. এ. টা-তে থার্ডক্লাস পেয়ে গেলুম। এখানে মশাই বাঙালী ছেলেদের আর ভদ্রস্থ নেই। বিহারী এক্‌জামিনাররা বাঙালী ছেলেদের আর উঠতে দেবে না। ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস সব বিহারী।"

এসব কথা অনেকবার শুনিয়াছি, রক্ত উত্তপ্ত হইল না। নিকটেই একটা মোড়া ছিল। সেটা দেখাইয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "বসতে পারি ?"

"বসুন—"

বসিয়া তিনি নানারকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে হইল দেশের সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছেন। নেহেরু কি কি ভুল করিয়াছিলেন, চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, পাকিস্তানের সহিত মিটমাট করিতে হইলে নেতাদের এখন কি 'পলিসি' অবলম্বন করা উচিত, বাঙালীদের অতীত গৌরব কি করিয়া উদ্ধার করা সম্ভব—এই সব বিষয়ে তিনি নানা বক্তৃতা করিলেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। ভদ্রলোকের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বলিলাম—"আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে খুব খুশী হলাম। কিন্তু এখন আমাকে একটু বেরুতে হবে। থানাটা কোন দিকে বলুন তো—"

"থানা কাছেই। দারোগা বাবুর কাছ থেকেই খবর পেলাম, আপনি আজ আসবেন। ওহো, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। আপনি এখানে ক'দিন থাকবেন ?"

"কাল সকালের ট্রেনেই আমাকে ফিরতে হবে—"

"ও, তা'হলে তো ভালোই হ'ল। আমার বোন একশিশি গোয়াভা জেলি পাঠাতে চায় কলকাতায় মায়ের কাছে। আপনি যদি দয়া ক'রে নিয়ে যান, বড়ই উপকৃত হব—"

"কোথায় থাকেন আপনার মা—"

"নিউ আলিপুরে। আপনি ?"

"আমি শ্যামবাজারে থাকি। আপনি তা'হলে এক কাজ করুন। আমার ঠিকানাটা আপনার মাকে পাঠিয়ে দিন। তিনি যেন আমার বাসা থেকে কাউকে পাঠিয়ে 'জেলি'টা নিয়ে যান—"

আমার ঠিকানা-লেখা একখানা কার্ড তাঁহাকে দিলাম।

"ও, আপনার নিউ আলিপুরে যাওয়ার সুবিধে হবে না বুঝি ?"

"না। চৌরঙ্গীর ওপারে যাওয়া হয়ই না তেমন।"

"ভেরি গুড্‌। চিঠি লিখে দেব তাহলে—"

ভদ্রলোকের হাতে সুদৃশ্য দামী একটি রিস্টওয়াচ ছিল। সেটির দিকে চাহিয়া তিনি গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"জাস্‌ট সাড়ে তিনটের সময় আপনি বাসায় থাকবেন কি ?"

"থাকব।"

"তখনই আমি জেলিটা নিয়ে আসব তা'হলে।"

"আমি কাল সকাল ছ'টায় বেরুব। সে সময় নিয়ে এলেও চলবে।"

"ভেরি গুড্। তাই আসব। ছ'টার সময়ই আসব। সে সময় আমি মর্নিং ওয়াক করতে বেরুই—"

আমি ঘরে তালা লাগাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভদ্রলোকও সংগে সংগে চলিলেন। একটু দূরে গিয়া একটা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—"এইটে ধ'রে স্ট্রেট চ'লে যান, থানায় পেঁাছে যাবেন।"

পরদিন সকালে কুলিটা ঠিক ছ'টার সময় আসিল। কিন্তু সে ভদ্রলোকের দেখা নাই। তাহার পর তিনি আর আসেন নাই। সারা বৈকালটা আমি তাঁহার অপেক্ষায় ছিলাম। আর অপেক্ষা করা চলে না। সাতটায় ট্রেন ছাড়িয়া যাইবে।

ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছি। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম বিনায়ক বক্সি জেলির শিশি হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে। ভদ্রলোক হঠাৎ হোঁচট খাইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পড়িয়া গেলেন। জেলির শিশি ভাঙিয়া চারিদিকে জেলি ছিটকাইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, তাঁহার দামী রিস্টওয়াচটাও বোধহয় ভাঙিয়া গেল।

বছর খানেক পরে আবার উক্ত গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। স্টেশনে নামিয়াই আমি সেই কুলিটির খোঁজ করিয়াছিলাম। তাহার কালীচরণ নামটা আমার মনে ছিল। শুনিলাম সে আর কুলিগিরি করে না। ধর্মশালার কাছে একটা দোকান করিয়াছে। ধর্মশালায় পেঁাছিয়া দেখিলাম, ধর্মশালার কাছেই তাহার দোকানটি। খাবারের দোকান। মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু, কেক, পাঁউরুটি, চা—এই সব সাধারণ খাবার সেখানে পাওয়া যায়। দেখিলাম প্রচুর ভিড়। কালীচরণ আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং আগাইয়া আসিয়া নমস্কার করিল। দেখিলাম তাহার বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দোকানের আয় কি রকম হয়।"

"তা রোজ বিশ ত্রিশ টাকা হয়ে যায়। বক্সি বাবু সব হিসাব রাখে—"

"বক্সি বাবু?"

"হঁ্যা, ওই যে—"

তখন দেখিতে পাইলাম দোকানের পিছনে একটা ময়লা টেবিলের সামনে বিনায়ক বক্সি বসিয়া কি লিখিতেছেন। কালীচরণ হাঁক দিল—"ও বক্সি বাবু, নিস্পিট্টার সাহেব এসেছেন।"

"আরে! আপনি, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

উদ্ভাসিত মুখে বিনায়ক আগাইয়া আসিলেন।

এক কাপ চা খাইতে হইল। কালীচরণ কিছুতেই দাম লইল না। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ধর্মশালায় সীট পেয়েছেন?"

"না, এখনও যাইনি সেখানে।"

"চলুন।"

কালীচরণই আমার সীট ঠিক করিল এবং বিছানা বিছাইয়া এক বালতি জল

আনিয়া দিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আমিই আপনার খাবার পাঠিয়ে দেব হোটেল থেকে—।"

শুনিলাম বিনায়ক বক্সি এম. এ. নিরক্ষর কালীচরণের দোকানে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরি করেন। একটু পরে বিনায়কও আসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন, "ও মেড়ো ব্যাটার মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই। ভাগ্যে আমি আছি; তাই দোকানটাকে কোনক্রমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—!"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "ও, তাই নাকি!"

বিনায়ক উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুনন্দা

সুনন্দা দশটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্বেই লিফ্‌টের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। লিফ্‌টম্যান সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিল তাহাকে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সে দ্বিতলে নিজের আপিস ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে বেয়ারাও সেলাম করিয়া আপিস ঘরের পরদাটা তুলিয়া ধরিল। সুনন্দা নিজের চেয়ারে বসিয়া আপিসের ঘড়ির দিকে চাহিল একবার। বেয়ারা ঘরে ঢুকিয়া ফ্যানটা চালাইয়া দিল। ফ্যানের হাওয়ায় টেবিল হইতে কয়েকটা কাগজ উড়িয়া গেল। বেয়ারাই ছুটাছুটি করিয়া সেগুলিকে কুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিল এবং একটা পেপার-ওয়েট চাপা দিল। পেপার-ওয়েটটার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল সুনন্দা। শ্বেতপাথরের উপর কাজকরা চমৎকার পেপার-ওয়েট। এটা তো এখানে ছিল না, এখানে ছিল দস্তার বিশেষত্বহীন চাকতি একটা। এটা এখানে আসিল কি করিয়া।

"এ পেপার-ওয়েট কোথা থেকে এল!"

"চন্দরবাবু বদলে দিয়ে গেছেন—"

চন্দ্রকান্ত ঘোষ সুনন্দার প্রাইভেট সেক্রেটারি।

ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

"চন্দ্রবাবুকে খবর দাও একবার।"

বেয়ারা চলিয়া গেল।

একটু পরে আসিয়া বলিল, "চন্দরবাবু এখনও আসে নি—"

সুনন্দা ঘড়ির দিকে চাহিল একবার।

"আচ্ছা, চন্দরবাবু এলেই খবর দিও।"

বেয়ারা চলিয়া গেল। সুনন্দা দন্ত দিয়া নীচের ওষ্ঠটাকে কামড়াইয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

সুনন্দা দেবীর রং কালো, চোখ ছোট, চোখের ভ্রূ নাই, মুখখানি তালের মতো। কিন্তু সে বিদুষী। এম. এ., পি. এইচ. ডি। লণ্ডনে এবং আমেরিকায় গিয়া প্রচুর গবেষণা করিয়াছে। সুতরাং ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে চাকুরি সংগ্রহের জন্য খুব বেগ পাইতে হয় নাই। স্বীয় যোগ্যতার জোরেই একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছে সে। গরীবের মেয়ে। বাবা সামান্য কেরাণী। দশটি ভাই বোন। সুনন্দা

যদি বরাবর স্কলারশিপ না পাইত তাহা হইলে তাহার পড়াশোনা হইত না। গভর্ণমেণ্টের টাকাতেই সে বিলাত গিয়াছিল। স্বোপার্জিত মহিমায় সে মহীয়সী। বাবার সমস্ত দায়িত্বের ভার সে এখন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে।

পাশে কয়েকটি ফাইল ছিল। সেগুলি সে ক্লিয়ার করিতে লাগিল। ফাইল শেষ করিয়া আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এখনও চন্দ্রবাবুর দেখা নাই! আশ্চর্য কাণ্ড।

সাড়ে দশটার পর চন্দ্রকান্ত কাচুমাচু মুখে প্রবেশ করিলেন।

"ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখুন কটা বেজেছে—"

কাচুমাচু মুখে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "হ্যাঁ, আজও দেরি হ'য়ে গেল। স্ত্রীর শরীরটা ভালো নয়, ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হয়েছিল—"

সুনন্দা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"আপনি মিছে কথা বলছেন। আমি জানি আপনার এখনও বিয়ে হয়নি। আপনার বাবা আপনার জন্যে মেয়ে দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কেরাণী ছেলের জন্যে তিনি অর্ধেক রাজত্ব এবং রূপসী রাজকন্যা চান। সব খবর আমি জানি।"

চন্দ্রকান্ত যেন মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষু আনত হইল, মুখখানি সিক্ত পাঁউরুটির মতো দেখাইতে লাগিল।

"এ পেপার-ওয়েট কোথা থেকে এল?"

"ওটা আমার নিজের পেপার-ওয়েট, আপনার ব্যবহারের জন্য এখানে এনেছি। এখানে যেটা ছিল সেটা বিশ্রী—"

"আপনার পেপার-ওয়েট আপনি নিয়ে যান। আপিস যে পেপার-ওয়েট দিয়েছে তাতেই আমার কাজ চলবে।"

"আপনার হাতে ওটা কি?"

চন্দ্রকান্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "কাজু—"

"কাজু! আপিসে ব'সে ব'সে কাজু চিবুবেন?"

"আপনার জন্যে এনেছি। শুনেছিলাম আপনি কাজু ভালোবাসেন—"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল সুনন্দা। তাহার পর তাহার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল, চক্ষুর দৃষ্টি হইতে অগ্নিকণা ছুটিয়া বাহির হইল।

"এ সবের মানে কি! আপনি এখনি এ ঘর থেকে চলে যান। আপনাকে সাসপেণ্ড করলাম আমি। যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—"

চন্দ্রকান্ত ঘোষ হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার পর আগাইয়া আসিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে সুনন্দার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি অসহায়, আমাকে মাপ করুন, এবারকার মতো মাপ করুন—"

সুনন্দা তাহাকে মাপ করিল কিনা তাহা জানা গেল না, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছারপোকার কামড়ে সুনন্দার ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। বীভৎস জীবনটা হঠাৎ প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহার চোখের সামনে। সেই দুর্গন্ধ বিছানা, ময়লা দেওয়াল, আশে পাশে তাহার নগ্ন অর্ধনগ্ন ভাইবোনদের ঘুমন্ত চেহারা, পাশের ড্রেণের ভ্যাপসা গন্ধ। মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"সুনি ওঠ ওঠ। উনুনে তাড়াতাড়ি আঁচ দে। আজ সোমবার তোর বাবার আপিসের ভাত দিতে হবে না?"

মনে পড়িল কয়েক দিন আগে চন্দ্রকান্ত ঘোষ একদল লোক লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মনে পড়িল বাবা তাহাদের কি খোসামোদটাই না করিতেছিলেন। মনে পড়িল প্রায় দশ টাকার জলখাবার আনানো হইয়াছিল। চন্দ্রকান্ত কিন্তু তাহাকে পছন্দ করে নাই। সব মনে পড়িয়া গেল।

বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল তারপর।

"ওগো আজ সুনিকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখ বিকেল বেলা। আমাদের আপিসের রামতারণ মিত্তির আসবেন ওকে দেখতে—"

সুনন্দা লেখাপড়ায় ভালো ছিল। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হইত। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাবা তাহাকে আর পড়ান নাই।

সুনন্দা উঠিল। তাহার পর খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না। হয়তো খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ কলমে তাহার ছবি আপনারা দেখিয়াছেন, কিম্বা দেখেন নাই।

মতিভ্রম

আজ যিনি উদীয়মান কবি সুখরঞ্জন সাঁতরা তিনি যে এককালে সাব-ওভারসিয়র ছিলেন একথা অনেকে হয়তো বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু কথাটি সত্য। তাঁহার নাম এককালে 'সুরকি' বাবু ছিল। একটি 'সুরকি'র কলে তিনি চাকরিও করিতেন। পারিবারিক নাম ছিল বিনয়ভূষণ বসাক। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই দুই এক বছর পরে কাব্যরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছিল কিছু। ভালো সুরকি বাজারে পড়িতে পায় না, কিন্তু ভালো কবিতা গাদা গাদা পড়িয়া থাকে। কিন্তু একদিন বিধাতা সদয় হইলেন। 'নদনদী' পত্রিকার সম্পাদিকা তাঁহার একটি কবিতা একবার ছাপিয়া ফেলিলেন। বিনয়ভূষণের ছদ্মনাম 'সুখরঞ্জন সাঁতরা' নামটাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মহিলা ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.—সাঁতরা উপাধিটির তিনি মনে মনে অনুবাদ করিয়াছিলেন 'Swim on'—! সাঁতরাইবার সুযোগ তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সুখরঞ্জন মহানন্দে সাঁতরাইয়াও ছিলেন। কিন্তু একদিন বিপদে পড়িয়া গেলেন।

সেদিন সকালের ডাকেই 'নদনদী' পত্রিকার সম্পাদিকার একটি তীক্ষ্ম পত্র আসিয়া হাজির হইল।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি 'প্রাণেশ্বরী' সম্বোধন করিয়া সহজ গ্রাম্য গদ্যে যাহা আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহা এমন অনাবৃত অশ্লীলতা যে তাহা ছাপা গেল না। তাহা এত অশ্লীল যে পড়িবামাত্র আমি সেটি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিয়াছি। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি এরূপ স্বচ্ছ গ্রাম্য কবিতা আর আমাকে পাঠাইবেন না। ইতি

সম্পাদিকা নদনদী।

পুনশ্চ। কোন কবিতাই আর পাঠাইবার দরকার নাই।

দ্বিতীয় বজ্রাঘাতটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইল। তাঁহার রোরুদ্যমানা সাধ্বী পত্নী পুত্র-কন্যা এবং ডাক্তার সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন। সঙ্গে দশ সের বরফ এবং একটি আইসক্যাপ! স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"কি অদ্ভুত চিঠি লিখেছ তুমি এবার। কিছু বুঝতে পারলাম না। মাকে দেখালুম তিনিও পারলেন না। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন চিঠিখানা, তিনি বললেন—পাগল হয়ে গেছে। আর দেরি করা নয়। শিগগির চল—! ওগো, এ কি হল আমার—"

বিনয়ভূষণ যে ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন তাহা স্ত্রীকে কখনও জানান নাই। বুঝিতে পারিলেন স্ত্রীকে লেখা চিঠিটি সম্পাদিকাকে পাঠাইয়াছেন এবং আধুনিক কবিতাটি স্ত্রীর নিকট পেঁাছিয়াছে। খাম বদল হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়—কবিতার নীচে নিজের নামটি এবং চিঠির নীচে সুখরঞ্জন সাঁতরা নামটি লিখিয়া তিনি জটটিকে জটিলতর করিয়াছেন।

মতিভ্রম আর কি!